কাঁটায়-কাঁটায়

নারায়ণ সান্যাল

৬

পি. কে. বাসু—কাঁটা সিরিজের গোয়েন্দা কাহিনী

কাঁটায়-কাঁটায়

কাঁটায়-কাঁটায়

কাঁটায়-কাঁটায়

কাঁটায়-কাঁটায়

ষষ্ঠ খণ্ড

ড্রেস-রিহার্সালের কাঁটা 9

মোনালিজার কাঁটা 163

ইস্কাপন-বিবির কাঁটা 227

হরিপদ কেরানির কাঁটা 265

boiRboi.net

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ড্রেস-রিহার্সালের কাঁটা

রচনাকাল : 1996-97
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি 1998
প্রচ্ছদশিল্পী : বিজন কর্মকার
উৎসর্গ : শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায়
শ্রীভারতী মুখোপাধ্যায়

বাসুসাহেব জানতে চাইলেন, ঐ যে ভদ্রলোক কাউন্টারে বসে আছেন, উনি কি দোকানের মালিক না ম্যানেজার?

সেল্‌স্‌ম্যানটি বিনয়ে বিগলিত হয়ে হাত কচলে বললে, আইজ্ঞা হ।

বাসু বিরক্ত হলেন। বললেন, 'আইজ্ঞা হ' মানেটা কী? আইদার মালিক, অর ম্যানেজার—দুটোই তো 'আইজ্ঞা হ' হতে পারে না।

তাড়াতাড়ি ওপাশ থেকে এগিয়ে আসেন আর একজন বয়স্ক সেল্‌স্‌ম্যান। তিনি বুঝতে পারেন মূল সমস্যাটা কোথায়। প্রশ্নকর্তা ঐ স্যুট পরা বৃদ্ধটি হয়তো শুধু বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি জানেন, আর উত্তরদানকারী ছোকরা ওড়িয়া ছাড়া আর কিছু জানে না। সিনিয়র সেল্‌স্‌ম্যান এগিয়ে এসে আধা ওড়িয়া আধা হিন্দিতে যে দার্শনিক উক্তিটি করলেন তার বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ, ছার, এই ঁজগন্নাথধামে যা-কিছু দেখিছেন সব কিছুরই তো মালিক ঐ প্রভু 'কালিয়া'। উনি ম্যানেজার বটেন।

বাসু বললেন, আপনি সত্য কথাই বলেছেন, তবে 'হোল-ট্রুথ' নয়। প্রভু 'কালিয়া' শুধু জগন্নাথধামেরই মালিক নন, বিশ্বপ্রপঞ্চের মালিক! তা সে যাই হোক, আমাদের পছন্দ করা শাড়ি পাঁচখানা নিয়ে ঐ ম্যানেজারের কাছে চলুন। এস সুজাতা—

কাউন্টারের ম্যানেজার ভদ্রলোক এতক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলেন, এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, নমস্কার, আইজ্ঞা।

বাসু প্রতিনমস্কার করে বললেন, এই পাঁচখানা শাড়ি আমাদের পছন্দ হয়েছে। তবে পাঁচখানাই কিনব না। চারখানা রাখব, একটা ফেরত দেব। ফাইনাল নির্বাচন করবেন আমার

স্ত্রী। কিন্তু তিনি অসুস্থ। দোকানে আসতে পারবেন না। আপনি এই কার্ডখানা রাখুন, আমার ঠিকানা এতে লেখা আছে। আর এই পাঁচশো টাকার নোটখানা রাখুন, অ্যাডভান্স হিসাবে। সন্ধেবেলা আপনার লোক যেন শাড়িগুলো নিয়ে আমার বাড়িতে আসে। তার যাতায়াতের রিক্‌শা ভাড়াও আমি দিয়ে দেব!

—না, স্যার। রিশ্‌কাভাড়া লাগ্‌বেক নেই! সুবল সাইকেলে চাপ্যে যিব, আইজ্ঞা।

—ঠিক আছে, সেটা সুবলের সঙ্গে আমি ফয়সালা করে নেব। তবে ওর হাতে ক্যাশমেমো বইটাও পাঠিয়ে দেবেন, যাতে বাকি টাকা দিয়ে আমি রসিদ নিতে পারি।

ম্যানেজার স্বীকৃত হলেন। বাসুসাহেব সুজাতাকে নিয়ে রওনা দিলেন নির্গমন দ্বারের দিকে। দোকানটা স্বর্গদ্বারের কাছাকাছি। ভারত সেবাশ্রম আশ্রমের বিপরীতে, বড় রাস্তার উপরেই। কোল্যাপসিব্‌ল্‌ দরজা পাড়ি দিয়ে বড় রাস্তায় নামবার মুখেই কে যেন পাশ থেকে ডেকে উঠল, ব্যারিস্টারসাহেব না?

বাসু দাঁড়িয়ে পড়লেন পাপোসের উপর। মুখ তুলে দেখলেন। সুজাতা তার লেডিজ ছাতাটা সবে খোলবার উপক্রম করছিল। ক্ষান্ত দিল সে প্রচেষ্টায়।

বক্তা মধ্যবয়সী—না, বৃদ্ধই। পঞ্চাশের ওপারে। শৌখিন ব্যক্তি, তা তাঁর পোশাক-আশাকেই বোঝা যায়। পরিধানে ধাক্কা পাড় ধুতি, গায়ে গিলে করা পাঞ্জাবি, পায়ে শুঁড়তোলা নাগরা, হাতে হাতির দাঁতের মুঠওয়ালা ছড়ি এবং বাঁ হাতে গ্রহবারণ গোটা-চারেক আংটি—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটা একাই বেকসুর খালাস পেয়েছে।

বাসু তাঁর নিজের পরিচয়টা স্বীকার করে বললেন, আপনাকে তো ঠিক...

ভদ্রলোক সে কথার জবাব না দিয়ে বলে ওঠেন, ওফ্‌। কী সৌভাগ্য আমার! পুরীতে এসে এমন বেমক্কা আপনাকে অ্যারেস্ট করে ফেলব ভাবতেই পারিনি।

তারপর পাশে ফিরে বললেন, এ কী মা সুজাতা! দোকান থেকে খালি হাতে বেরিয়ে আসছ যে? কিছুই পছন্দ হলো না?

সুজাতাও সরাসরি ওঁর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললে, মাপ করবেন, আমিও কিন্তু আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না।

ভদ্রলোক এত জোরে অট্টহাস্য করে উঠলেন যে, রাস্তার লোকজন এদিকে ফিরে তাকালো। পথচলতি একটি ওড়িয়া মেয়ের কোলের বাচ্চাটা বেমক্কা চিক্কুড় পেড়ে কাঁদতে শুরু করলো। ঠিক সেই সময়ই নামলো গুড়ি-গুড়ি বৃষ্টি।

বাসু সুজাতাকে ডাকলেন, দোকানের ভিতরে চলে এস সুজাতা, নাহলে ভিজে যাবে।

ম্যানেজারের ব্যবস্থাপনায় খানতিনেক ফোল্ডিং চেয়ার এসে গেল। ম্যানেজার বিশুদ্ধ ওড়িয়াতে নবাগতকে বললেন, রায়মশাই কবে এসেছেন? থাকবেন তো কিছুদিন?

রায়মশাই শুদ্ধ ওড়িয়াতেই উত্তরে জানালেন, এসেছি গতকাল; কদ্দিন থাকব বলতে পারছি না।

এদিকে ফিরতেই বাসু বললেন, আপনার পূর্ণ পরিচয়টা কিন্তু এখনো পাইনি, রায়মশাই।

রায় পকেট থেকে স্টেট এক্সপ্রেসের একটা প্যাকেট বার করে বাসুসাহেবের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। বাসু অস্বীকার করে পকেট থেকে পাইপ-পাউচ বার করলেন। বৃষ্টিটা না ধরা পর্যন্ত পথে নামা যাবে না। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ চলছে। উল্টোরথ শেষ হয়েছে, দুর্গাপূজার হিড়িক শুরু হয়নি। ম্যানেজার দুই ধূমপায়ীর মাঝখানে নিশ্চুপ বসে থাকা সুজাতার দিকে একটি সুদৃশ্য পানের ডিবা বাড়িয়ে ধরে মাতৃভাষায় বললেন, আসুন মা, জর্দা দেওয়া নেই। নির্ভয়ে খেতে পারেন।

রায় বললেন, পুরো নামটা আমি বলব না, ব্যারিস্টারসাহেব, আপনাকে মনে করতে হবে। কিছু ক্লু অবশ্য আমি দিচ্ছি। আপনার জেরার সম্মুখীন হতে হয়েছিল আমাকে। একটা 'এম্বেজ্‌লমেন্ট' মামলায়, বছর আষ্টেক আগে। সাক্ষী হিসাবে।

পাইপে আগুন দিতে দিতে বাসু বলেন, উইটনেস্ ফর দ্য ডিফেন্স?

—নো, স্যার! উইটনেস্ ফর দ্য প্রসিকিউশন। আমি 'বার' নিয়ে গুলিয়ে ফেলেছিলাম। মানে বারবার আপনি কথার প্যাঁচে বারটা গুলিয়ে দিয়েছিলেন...

—'বার' মানে? আদালতের বার-অ্যাসোসিয়েশন, না জিম্‌ন্যাসিয়ামের প্যারালাল বার? নাকি ক্যাডবেরি চকোলেটের প্যাকেট?

রায়সাহেব মৃদু-মৃদু হাসছিলেন। গ্র্যান্ডফাদার ক্লকের পেন্ডুলামের মতো মাথা দোলাচ্ছিলেন।

—তবে কি শুঁড়িখানার 'বার'? অথবা এক্কেরে শেষ নিদান 'Let there be no moaning at the bar'?

—আজ্ঞে না! এখনো বুলস্ আই হিট করতে পারেননি!

পানের বোঁটা থেকে একটু চুন আঙুলে করে নিয়ে দাঁতে কেটে সুজাতা বললে, মামু ফেল করলে কি হবে, তাঁর ভাগ্নী পাস করেছে। আমি ধরে ফেলেছি। আপনি সোম-মঙ্গল-বুধ বেস্পতির কথা বলছেন!

—এক্‌জ্যাক্টলি!—রায় উৎসাহিত হয়ে ওঠেন।

তৎক্ষণাৎ বাসু বলেন, ভুল বললে সুজাতা! মামু ফেল করেনি। আজকাল গ্রে-সেলগুলোয় মাঝে মাঝে জট পাকিয়ে যায়। শুনুন রায়মশাই! য়ু আর স্পটেড: ব্রজদুলাল রায়। শ্যামবাজারের মোড়ে সেই 'নটরঙ্গ' হাউসের মালিক—অবশ্য মালিক তো প্রভু জগন্নাথ, আপনি তাঁর অছিমাত্র। পুলিস একটা নিরীহ বোকাসোকা লোককে চালান দিয়েছিল। সে নাকি আপনার ক্যাশ ভেঙে এক লাখ ছত্রিশ হাজার টাকা তছরুপ করে।

—ইয়েস, স্যার! ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সিক্স! কারেক্ট! হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট! সেই বোকাসোকা ছোকরাকে আপনি বেকসুর খালাস করেন। অপরাধীও ধরা পড়েছিল, জেলে গিয়েছিল। তবে গোটা টাকাটা উদ্ধার হয়নি।

—আপনার তো পুরীতেও একটা বাড়ি ছিল, তাই না?

—'ছিল' বলছেন কেন, স্যার? আছে। ঘটমান বর্তমানেও সেটা আছে। 'দ্য রিট্রিট'। সমুদ্রের উপরেই। আর সেখানেই আপনাদের নিমন্ত্রণ করতে চাইছি। পরশু রাত্রে ডিনারে। আপনাদের চারজনকেই—স্যাটার্ডে ইভনিং...

বাসু বললেন, একটু রয়ে সয়ে রায়মশাই। বদ অভ্যাসটা আপনার এখনো যায়নি মনে হচ্ছে। প্রথম কথা : আজ বুধবার, চৌঠা অক্টোবর। ফলে পরশু হচ্ছে শুক্রবার, ছয় তারিখ। শনিবার, সাত তারিখ হচ্ছে তার পরদিন, পরশু নয় সেটা। পরশুর পর : তরশু!

রায়মশাই মর্মাহত হলেন : ওফ্! আবার সেই বার নিয়ে বাড়াবাড়ি, বিড়ম্বনা। আজ্ঞে না, পরশু নয়, আমি শনিবার সাত তারিখ সন্ধ্যার কথাই বলছি...

—বুঝলাম। উপলক্ষটা?

রায়মশাই বুঝিয়ে বললেন সব কথা। ওঁর এক বিশেষ বন্ধুর জন্মদিন হচ্ছে উপলক্ষ। বন্ধুও বটে, আবার এমপ্লয়িও বটে। 'নটরঙ্গ'-এ একাদিক্রমে আঠারো বছর নায়কের চরিত্রে অভিনয় করে চলেছে। না, একাদিক্রমে নয়। মাঝে বছর দুই যাত্রায় যায়। আরও বছর দুই সিনেমার এত কন্ট্র্যাক্ট পায় যে, সপ্তাহে তিন দিন কমার্শিয়াল পাবলিক বোর্ডে হাজিরা দেওয়া শক্ত হয়ে

পড়েছিল। তারপর বাংলা চিত্রজগতে এল মন্দা। সিরিয়ালে ও ঠিক পাত্তা পেল না। বয়সটাও গেছে বেড়ে। হিরোর চরিত্রে ওকে মানায় না আর। অধিকাংশ নটের জীবনেই আসে এমন একটা ক্রান্তিকাল। প্রাকৃতিক নিয়মকে মেনে নিয়ে বাবা-কাকার চরিত্রে অভিনয় করবে, না স্বেচ্ছা অবসর নেবে! রায়-মশাই ওকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন 'নটরঙ্গ'-এ। থিয়েটারে B.C.U.-এর বালাই নেই—মানে, 'বিগ-ক্লোজ-আপ'! ফলে এখানে আরও বছর পাঁচেক ওকে হিরোর রোলে চালানো যাবে।

যে কথাটা রায়মশাই স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করলেন না, অথচ বুঝতে অসুবিধা হলো না বাসু-সাহেবের, সেটা এই : প্রৌঢ় নট বাধ্য হয়ে হয়তো হাফ-প্রাইসে চুক্তি করেছে।

সুজাতা বললে, আপনি কি 'ইন্দ্রকুমার'-এর কথা বলছেন?

—ওফ্! তোমার তো দারুণ বুদ্ধি মা-সুজাতা! ঠিক ধরেছ।

বাসু বললেন, এর সঙ্গে বুদ্ধির কোনো সম্পর্ক নেই। সুজাতা আর কৌশিক সুযোগ পেলেই থিয়েটার দেখতে যায়। অবশ্য ওরা গ্রুপ-থিয়েটারই বেশি দেখে; তবে শ্যামবাজারের ঐ থিয়েটার রোডেও যায় মাঝে মাঝে।

—শ্যামবাজারের 'থিয়েটার রোড'! সেটা আবার কোনটা?

—ঐ মধ্য কলকাতার 'থিয়েটার রোড'টা 'শেক্ষপীয়র সরণি' হয়ে যাবার পর শ্যামবাজার সাতমাথার কাছাকাছি যে রাস্তাটার নাম 'থিয়েটার রোড' হওয়া উচিত ছিল। ভবানীপুরে যেমন পর পর লক্ষ্মীবাবুর 'আসলি' সোনা-চাঁদির দোকান, ওখানেও তেমনি প্রতিটি হলেই দেখানো হয় সর্বসময়ে 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক'।

রায়সাহেব বলেন, ওফ্! এ না হলে ব্যারিস্টার! কিন্তু একটা কথা ব্যারিস্টারসাহেব, শ্যামবাজারের ঐ মোড়টা সাতমাথার নয়, পাঁচমাথার।

বাসু বলেন, না সাত। আমি নেতাজী আর তাঁর ঘোড়ার মাথাদুটো ধরে বলেছি। সে যা হোক। শুনুন মশাই। শনিবার সাত তারিখে আমরা দুজন যাব—

—দুজন কেন স্যার? মিসেস বাসু বা মিস্টার কৌশিক মিত্র আসেননি?

—এসেছেন। কিন্তু আমার স্ত্রী...

রায় বাধা দিয়ে বলেন, আই নো! আই নো! ঠিক আছে। তাঁকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। তা পুরীতে এলেন কী করে? আছেনই বা কোথায়?

বাসু ওঁকেও একটি কার্ড বার করে দিলেন, যার পিছনে ওঁর পুরীর অস্থায়ী আস্তানার ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বারটা লেখা আছে। বললেন, এসেছি প্লেনে, মানে আমরা দুজন। সুজাতা-কৌশিক ট্রেনে করে এসেছে আগেই। হুইল-চেয়ার আর গাড়ি নিয়ে ভুবনেশ্বরের এয়ারোড্রোমে অ্যাটেন্ড করেছিল।

—তা হোটেলে থাকার কী দরকার? আমার 'দ্য রিট্রিট'-এ আটখানা ডবল-বেড রুম আছে। কোন অসুবিধা হবে না।

বাসু বুঝিয়ে বললেন, যেখানে আছেন সেটা হোটেল নয়। ওঁর এক ক্লায়েন্টের বাড়ি। ফাঁকাই পড়ে থাকে। মাঝেমধ্যে কর্তারা এসে ওঠেন।

বৃষ্টিটা এতক্ষণে ছেড়েছে। বাসু জানতে চাইলেন, তা ইন্দ্রকুমারের জন্মদিন কলকাতায় না হয়ে পুরীতে প্রতিপালিত হচ্ছে কেন?

রায় বলেন, ওফ্! আপনার জেরার জ্বালায় জেরবার! শুনুন মশাই! জোয়ারের সময় প্রতিটি জন্মদিনকে মনে হয় 'হ্যাপি বার্থ-ডে' : কিন্তু ভাঁটার টান এলে মরা গাঙ ভাবে : জীবনের বরাদ্দ করা বার্থ-ডের একটা খসল! ইন্দ্রের বয়স পঞ্চাশ...

বাধা দিয়ে সুজাতা বলে, কী বলছেন! পঞ্চাশ?

—হ্যাঁ, মা! ম্যাট্রিক সার্টিফিকেট অনুযায়ী। যদ্দূর জানি, দুই বছর হাতে রেখে ওকে ইস্কুলে ভর্তি করানো হয়েছিল। সেটা ধরলে—জগন্নাথধামে দাঁড়িয়ে মিছে কথা বলব না—ওর এটা 'দু-কুড়ি-একডজন-মার্কা' জন্মদিন। কিন্তু আমরা অফিসিয়ালি এটাকে ওর ফর্টি থার্ড বার্থ ডে বলছি। বেয়াল্লিশ পার হয়ে এই সবে তেতাল্লিশে পা দিচ্ছে ইন্দ্র!

বাসু বলেন, কেন? বয়স নিয়ে এভাবে এম্বেজ্‌ল্‌মেন্ট করার কারণটা কী?

—ওফ্! আপনাকে কী করে বোঝাই! হিরোর একটা পাব্‌লিক-ইমেজ তো চাই! দেখলেন না, ওর বয়স পঞ্চাশ শুনে সুজাতা-মা কী ভীষণ আঁৎকে উঠেছিল!

সুজাতা বললে, তা সত্যি! আমি ভাবতেই পারিনি এতটা বয়স হয়েছে ইন্দ্রকুমারের!

—হ্যাঁ! দারুণ মেকআপ নিতে পারে ইন্দ্রটা! ও আমাকে বলেছিল শরৎবাবুর শুধু তিনটি বইয়ে ও নামভূমিকায় নামতে পারবে না—এক, 'রামের সুমতি'-র রাম, দুই, 'মহেশ'-র মহেশ, আর তিন, 'গৃহদাহ'-র আগুনে-পোড়া মহিমের বাড়িটা।

সুজাতা হেসে ফেলে। বলে, সত্যি, ওঁর মেকআপ নেবার ক্ষমতা দারুণ। আমি ওঁকে লেনিন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ—বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে দেখেছি। চেনাই যায় না!

রায় বলেন, কী জান, মা? একবার পেলেকে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন কলকাতায় নিয়ে এসে ইডেনে খেলায়। পেলে তার সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেনি। লোকে বলাবলি করেছিল : আসলে বহু টাকার টিকিট বেচে ওরা ইন্দ্রকুমারকে পেলে সাজিয়ে মাঠে নামায়!

সুজাতা খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

বাসু বলেন, চল এবার ওঠা যাক। বৃষ্টিটা ধরেছে।

—তাহলে আসছেন তো স্যার?

—শিওর। তবে চারজন নয়। দুজন।

দুই

পরদিন সকালে সবাই বসেছেন ব্রেকফাস্ট টেবিলে। রানীদেবী অনুযোগ করছিলেন, কলকাতার সোস্যাল-লাইফ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যেই কদিন পুরীতে পালিয়ে এলাম, আর তুমি এখানে এসেই ডিনারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বসলে! দারুণ নোলা বাপু তোমার!

বাসু বলেন, কী করব বল, রানু? আমি কি ইচ্ছে করে নিলাম? ইন্দ্রকুমারের নাম শুনেই সুজাতা এমন ছোঁকছোঁক করতে শুরু করলো যে, ভদ্রলোক তো প্রায় বাধ্য হয়েই নিমন্ত্রণ করে বসলেন।

সুজাতা কাপে কাপে কফি ঢালছিল। বললো, বাজে কথা একদম বলবেন না, মামু! সেই বাহান্ন বছরের বুড়োর জন্যে আমার তো রাতে ঘুম হচ্ছিলো না...

বাসু বললেন, উল্টোপাল্টা কথা বল না, সুজাতা। অফিসিয়ালি ওর বয়স বেয়াল্লিশ! বাহান্ন বছর কী বলছ?

কৌশিক টোস্টে একটা কামড় দিয়ে বললে, বয়সটা বাড়তি না কমতি? আই মিন, বেয়াল্লিশের পর কি তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ হবে, না উদো-বুধোর আইনে একচল্লিশ, চল্লিশের দিকে নামতে থাকবে?

বাসু কিছু বলার আগেই টেলিফোনটা বেজে উঠল। বিশু—সে যথারীতি এসেছে দলের সঙ্গে—আগ বাড়িয়ে ধরল টেলিফোনটা। তারপর শুনে নিয়ে 'কথামুখে' হাত চাপা দিয়ে বললে, সাহেবের ফোন।

—তাহলে নিয়ে আয় যন্ত্রটা।

যে ক্লায়েন্টের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন সে একজন ধনী ব্যবসায়ী। পুরীর বাড়িতে কুক-সার্ভেন্ট-মালী সব কিছুই পৃথক রাখা আছে। ফোনটাও কর্ডলেস। বিশ্বনাথ ফোনটা নিয়ে এসে বাসু-সাহেবের হাতে ধরিয়ে দিল।

—বাসু বলছি!

ও প্রান্ত থেকে প্রশ্ন হলো, বেরুচ্ছেন নাকি? আমি ব্রজদুলাল বলছি।

—না, এই তো বেড়িয়ে ফিরলাম। ব্রেকফাস্টে বসেছি। কেন বলুন তো?

—আপনার যদি অসুবিধা না হয় তাহলে আধঘণ্টা-খানেক পরে আমরা কজন আসছি। আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্য আমার অতিথিরা সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন। অবশ্য আপনাদের যদি অন্য কোনো প্রোগ্রাম থাকে...

বাসু বললেন, সুজাতা-কৌশিক বেরুবে। আমরা দুজন বাড়িতেই আছি। আসুন, গল্পগুজব করা যাবে। এসে ব্রেকফাস্ট সারবেন তো?

—না না, ওফ্! সে কি! আমাদের ব্রেকফাস্ট অনেকক্ষণ সারা হয়েছে।

—আমাদের বাড়িতে আসার পথের ডিরেকশনটা দেব?

—কোনো দরকার নেই। আপনার মক্কেল জওহরলাল আগরওয়াল একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। তাঁর বাড়িটা আমি চিনি। আমরা তাহলে আধঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই আসছি। আমরা ছয়জন।

—অল রাইট। ওয়েলকাম।—বলে টেলিফোনটা বিশের হাতে দিয়ে গৃহিণীর দিকে ফিরে বললেন, ওঁরা ছয়জন আসছেন। এত সকালে বীয়র বা জিন অফার করাটা কি ভালো দেখাবে?

রানী বললেন, না। দেখাবে না। পাঁড় মাতাল না হলে কেউ সকাল সাড়ে আটটায় মদ খেতে চায় না। সেকেন্ড-কাপ চা-বিস্কুট খেতে চায় তো ভাল, না হলে ডাব খাওয়াব।

একটু পরেই দুখানা গাড়ি বোঝাই হয়ে ওঁরা এলেন। একটা মারুতি ভ্যান, একটা ফিয়াট। প্রথমটি রায়মশায়ের, দ্বিতীয়টি শোনা গেল মিসেস্ মোহান্তির।

সুজাতা-কৌশিকের একটু মার্কেটিং-এ যাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ওঁদের আগমন পর্যন্ত প্রতীক্ষা করে গেল তারা। ব্রজদুলাল ব্যতিরেকে আরও যে পাঁচজন এলেন, তাঁদের পরিচয় এই রকম :

এক : ইন্দ্রকুমার চৌধুরী। বয়স 42/(52)। মাঝারি গঠন। গোঁফ-দাড়ি কামানো। মেকআপ ছাড়া(?) এখন দেখলে মনে হচ্ছে মধ্য-চল্লিশ। ব্যাকব্রাশ চুল। কুচকুচে কালো। কলপ রঙের। গায়ে একটি চক্‌রা-বক্‌রা কলার-ওয়ালা স্পোর্টিং শার্ট—যা বিশ থেকে পঁচিশের পক্ষেই শোভন হতো। নিম্নাঙ্গে জিন্‌স-এর প্যান্ট। হাঁটুর কাছে পকেট।

দুই : ডক্টর শিবশঙ্কর ঘোষাল, এম. ডি। বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। তিনি যে ইন্দ্রকুমারের স্কুলজীবনের সহপাঠী এ-কথাটা গোপন রাখতে ভালোবাসেন। কারণ তাঁর চেহারা দেখলেই বোঝা যায় যে, তিনি অর্ধশতাব্দী পাড়ি দিয়ে এসেছেন। ইন্দ্রকুমারের কলপ-কাম-জিন্‌স-কাম-চক্‌রা-বক্‌রা স্পোর্টিং শার্ট-এর সঙ্গে তাঁর ইন্দ্রলুপ্ত পাকা গোঁফ এতই বে-মানান যে, কথাটা উনি ইন্দ্রের ইমেজের খাতিরে চেপে যেতেই ভালোবাসেন। উনি একজন পশারওয়ালা

সাইকিয়ার্টিস্ট ডাক্তার। চুঁচুড়ায় নিজস্ব একটি নার্সিংহোম আছে। পাঁচতলা বাড়ি। লিফট্ আছে। সবসমেত তেরটি বেড। সাতটি ফিমেল বেড এবং ছয়টি পুরুষের। উনি নিজে থাকেন পৃথক বাড়িতে। কাছেই। একতলায় আউট-ডোর, চেম্বার, ও. টি. প্রভৃতি। ঘোষালসাহেব অকৃতদার। শোনা যায়—নিতান্ত বাল্যকালে তাঁর সঙ্গে কার বুঝি 'কাফ-ল্যভ' হয়। মেয়েটির অন্যত্র বিয়ে হয়ে যাওয়ায় উনি সারাজীবন বিবাহই করেননি। এ রটনা সত্য কি মিথ্যা তা হয়তো বলতে পারতেন ইন্দ্রকুমার। বলতেন না। স্বাভাবিক কারণে। তাহলে তাঁকে স্বীকার করতে হয় পঞ্চাশোর্ধ্ব বৃদ্ধ শিবুডাক্তার ওঁর বাল্যবন্ধু। এটা চাপা দেবার জন্য ইন্দ্রকুমার ঘোষালকে বারবার দাদা ডাকেন—হয় 'শিবুদা' নয় 'ঘোষালদা', অথবা 'ডাক্তারদা'।

তিন এবং চার : মা-মেয়ে। মিসেস্ আর মিস্ মোহান্তি। মিসেস্ মোহান্তি সাদা-ঘেঁষা একটা শিফন পরে এসেছেন। চুল বব্‌কাট, নখ ম্যানিকিওর করা। মুখে প্রচুর মেক-আপ, অরিজিনাল গাত্রবর্ণ কর্পূর! ঠোঁটে ভার্মিলিয়ান লিপস্টিক। তিনি প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী মোহান্তি সাহেবের বিধবা এবং বলে না দিলে বোঝা মুশকিল তাঁর বয়স চল্লিশোর্ধ্বে। মোহান্তি ছিলেন পট্টনায়কসাহেবের প্রিয়পাত্র। এককালে মোহান্তি সপাটে দোহাত্তা কামিয়েছেন। নির্বাচনে ওঁদের পার্টির মুখ্যমন্ত্রীর পরাজয়ের পরেই তাঁর বিরুদ্ধে সি. বি. আই. তদন্তে নেমেছিল। করুণাময় যমরাজের বদান্যতায় অব্যাহতি পেয়েছেন। ফলে গুণবতী মোহান্তি স্বামীর উপার্জিত কুবেরির্ষিত অতুল বৈভবের মালকিন হয়েছেন। জনশ্রুতি, কন্যাটিকে পাত্রস্থ করার পূর্বে তিনি পুনর্বিবাহ করবেন না।

কন্যা সুভদ্রা মোহান্তি পিতার জীবিতকালে পাস কোর্সে বি. এ. পাস করেছিল। স্কুলে-কলেজে তাকে অন্তত 'পাস-মার্ক'টুকু না দেবার ঔদ্ধত্য দেখানোর হিম্মৎ কারও হয়নি। হেতুটা সহজবোধ্য : পরীক্ষকদের, ট্যাবুলেটার এবং পর্ষদ ডিরেক্টরের ঘাড়ে ছিল যথারীতি এক-একটা করেই মাথা। কিন্তু রাষ্ট্রমন্ত্রী মোহান্তিসাহেবের 'পটলোৎপাদন'-এর পর সুভদ্রার পক্ষে এম. এ-তে সিট পাওয়াই অসম্ভব হয়ে পড়ে। পড়া বা পাস করা তো পরের কথা। গুণবতীর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু জমানা বদলে গেছে। স্বয়ং 'পট্টনায়ক-সাহেব' নির্বাচনে হেরে ভূত হলেন। প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রীর বিধবার কথা কে শুনবে? ফলে সুভদ্রা ঝুঁকল ফিল্‌ম-লাইনে। যৌবনের চটক এখনো আছে—ছাব্বিশ-এর কাছাকাছি। মুখটা ভাগ্যক্রমে ফটোজিনিক। কণ্ঠস্বরও মাইক ফিটিং। গাত্রবর্ণ কোনও ফ্যাক্টরই নয়, আজকালকার রূপসজ্জার দৌলতে। গুণবতী একমাত্র মেয়েকে কুচিপুডি নাচটা শিখিয়েছিলেন। সেটা সত্যিই ভালো করে শিখেছিল সুভদ্রা। দ্বিতীয়ত শিখেছে বাংলা ভাষাটা। অন্তত কথ্য ভাষাটা। ফলে 'ডবল-ভার্শান' ছবি হলে সুভদ্রার চান্সটা বেশি। খান-তিনেক বই করে সুভদ্রা এখন উদীয়মানা ওড়িয়া শিল্পী। ব্রজদুলাল তাকে নটরঙ্গ-এ পাকাপাকিভাবে নিতে চান।

দলের পঞ্চম ব্যক্তিটি জয়ন্ত মহাপাত্র। সুভদ্রার প্রায় সমবয়সী, হয়তো দু-চার বছরের বড়। অত্যন্ত সুদর্শন। বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া তিনটি ভাষাতেই নির্ভুল কথা বলতে পারে। তার অ্যাম্বিশন— ছবিতে নামা, কিন্তু আজও সুযোগ পায়নি। সুভদ্রাকে সে ভালোবাসে, হয়তো সুভদ্রাও বাসে ; কিন্তু গুণবতী ছোকরাকে বরদাস্ত করেন না। স্বাভাবিক হেতুতে। জয়ন্ত কলকাতায় ক্যানিং স্ট্রিটে একটা অফিসে কী একটা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিতে কাজ করে। মাস মাহিনা, না কমিশন বেসিসে তা জানা যায় না। ইন্দ্রদার জন্মদিন উপলক্ষে পুরীতে পার্টি হবে শুনে সেও দলে ভিড়ে গেছে। সে অবশ্য ব্রজদুলালের অতিথি নয়। তার এক মাসতুতো দাদার বাড়িতে উঠেছে।

বাসু জানতে চাইলেন, আপনারা তো ব্রেকফাস্ট সেরে এসেছেন বললেন, তাহলে এখন কী হবে? সেকেন্ড রাউন্ড চা-কফি, না ঠাণ্ডাই?

ব্রজদুলাল বললেন, ওফ্! তা নিয়ে এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? সেসব তো একটু পরেও হতে পারে। প্রথমে কিছুটা খোশগল্প চলুক!

ইন্দ্রকুমার বললেন, কৌশিকবাবুর কল্যাণে আপনার কাঁটা-সিরিজের বেশ কিছু কীর্তি-কাহিনী আমরা জেনেছি, বাসুসাহেব। আজ চাক্ষুষ দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে গেল। এরপর কোনো খুন-জখমের মামলায় জড়িয়ে পড়লে সরাসরি আপনার দ্বারস্থ হতে পারব। নতুন করে পরিচয় দিতে হবে না।

ব্রজদুলাল বলেন, একটা কথা ইন্দ্র, শুধু জড়িয়ে পড়লেই যেও। খুন হলে যেও না যেন!

ইন্দ্র জানতে চায়, তার মানে?

—ওফ্! সহজ কথাটা বোঝ না। 'খুন' হয়ে গেলে তো এক ঝুড়ি চন্দ্রবিন্দু লাগবে কথা বলতে; 'ব্যাঁরিস্টার সাঁহেব! আঁমার খুঁনের কিঁনারা কাঁইন্ডলি কঁরে দেঁবেন?'

সবাই হো-হো করে হেসে ওঠে। ব্রজদুলাল আরও বলেন, মিসেস্ বাসু পৃথক শয়নকক্ষে রাত্রিযাপন করেন কি না তা জানি না—জানতে চাওয়াও সৌজন্যে বাধবে—তবে তা যদি করেন তাহলে তাঁর জন্যেই আমার চিন্তাটা বেশি হচ্ছে! তিনি না হার্টফেল করে বসেন অত-অত চন্দ্রবিন্দুতে!

রানী খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠেন। জবাবে বলেন, আমার কিন্তু সৌজন্যে বাধছে না। আমার সরাসরি প্রশ্ন : আপনি একা পুরীতে এলেন কেন? মিসেস্ রায়কে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন না কেন?

—ওফ্! যে-বেদনার কথাটা ভুলে থাকতে চাই, আপনি সেই প্রসঙ্গটাই টেনে আনছেন! কলকাতায় আমার শয়নকক্ষে এভরিনাইট স্ত্রী ভূমিকা-বর্জিত নাটকের আয়োজন। অর্থাৎ কলকাতাতেও আমার শূন্যপুরী, এখানে তো ডবল শূন্যপুরী! আই মিন পুরীও শূন্যপুরী!

রানী বললেন, আয়াম সরি।

ডঃ ঘোষাল বলেন, না, না, ব্রজ উইডোয়ার নয়, কনফার্মড ব্যাচিলার!

বাসু বলেন, বাঃ! আপনারা তিন বন্ধুই তাহলে কনফার্মড ব্যাচিলার? ব্রজদুলাল, ডঃ ঘোষাল আর ইন্দ্রকুমার?

ব্রজদুলাল বললেন, আজ্ঞে না! একটু ভুল হলো আপনার। ইন্দ্রকুমার ব্যাচিলার, কিন্তু কনফার্মড ব্যাচিলার নয়। ওর বিয়ে করার বয়স এখনো যায়নি।

কৌশিক বলে, তা তো বটেই, পরশুই তো ওঁর উনচল্লিশ বছর শেষ হবে। চল্লিশে পা দেবেন। তাই না?

ইন্দ্র গম্ভীর হয়ে বলে, না। তেতাল্লিশে পড়ব।

ব্রজদুলাল যুক্তকরে বলেন, ব্যারিস্টারসাহেব যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে একটা কথা নিবেদন করি?

—বলুন না, কী এমন কথা?

—গাড়িতে আমার ক-একটা 'কেরুস্-জিন'-এর বোতল আছে। সিট্রা আর বরফের যোগানের ব্যবস্থাটা আপনি যদি করেন...

বাসু বলেন, ঠিক আছে; কিন্তু আমাকে বাদ দিয়ে। জিনটা আমার সহ্য হয় না। গলা শুকিয়ে ওঠে।

ডঃ ঘোষাল বললেন, আমারও তাই! আমিও জিন খাই না আদপে। তবে কোল্ডড্রিঙ্কস্ নেব।

boiRboi.net

সুজাতা উঠে গেল স্ন্যাকস্-এর ব্যবস্থা করতে। ফ্রিজ থেকে সিট্রা আর বরফ নিয়ে আসতে।

এক রাউন্ড জিন পান করার পর ইন্দ্র বললো, আমি সুইমিং ট্রাঙ্ক সঙ্গে করেই এনেছি। গাড়িতে আছে। এবার আমি সমুদ্রস্নানে যাব। এরপর রোদ চড়ে যাবে। কে কে আমার সঙ্গে যাচ্ছেন?

সুভদ্রা সবার আগে হাতটা তুলে বললো : আমি।

গুণবতী বললেন, এক্সট্রা শাড়ি-টাড়ি এনেছ?

সুভদ্রা অম্লানবদনে বললো, না। কিন্তু সুজাতাদি আমাকে নিশ্চয় একসেট পোশাক দিয়ে সাহায্য করবেন। সেটা পরেই আমি স্নান করব। আবার এই পোশাকে বাড়ি ফিরে যাব।

গুণবতী বলেন, তোমার সবেতেই বাড়াবাড়ি।

বাসু বললেন, এটাই যে ওর বয়সের ধর্ম, মিসেস্ মোহান্তি।

আর কেউ উৎসাহ দেখাচ্ছে না লক্ষ্য করে জয়ন্ত জিন-এর গ্লাসটা নামিয়ে দিয়ে বললো, চলুন। আমিও সীবাথ নেব!

ইন্দ্রকুমার প্রশ্ন করে, বাড়তি পোশাক সঙ্গে এনেছ?

—দরকার হবে না এক বেলা ভিজে প্যান্টে থাকলে, কী হবে? গায়েই ওটা শুকিয়ে গেলে আমার অসুখ করবে না।

কৌশিক আগ বাড়িয়ে বলে, তার কি দরকার? তোমাকে আমার একটা হাফপ্যান্ট দিচ্ছি, এস।

ওরা তিনজন স্নানে চলে গেল।

বাসু ডক্টর ঘোষালের কাছে জানতে চাইলেন, আপনার একটি নার্সিংহোম আছে শুনেছি চুঁচুড়ায়? তাই নয়?

—হ্যাঁ এবং না। অর্থাৎ ওটা নার্সিংহোম নয়। ওটা একটা মেন্টাল স্যানাটোরিয়াম। আমার নার্সিংহোমে যে কজন রোগী আছে তারা সবাই মানসিকভাবে অসুস্থ। আউট-ডোরেও শুধু মানসিক-রোগেরই চিকিৎসা করা হয়।

গুণবতী জানতে চাইলেন, শুধু মানসিক রোগের চিকিৎসা-ব্যবস্থা কেন?

—যেহেতু আমি মানসিক রোগের ডাক্তার। আমার সহকারীরাও সবাই তাই। আপনারা একটা কথা ভেবে দেখেছেন কখনো? আদমসুমারী মতে ভারতীয় জনসংখ্যার তিন শতাংশ 'মেন্টালি রিটার্ডেড' ; মানে কমবেশি মানসিক রোগাক্রান্ত। ছিটগ্রস্ত থেকে বদ্ধ উন্মাদ। কিন্তু হিসাব করে দেখুন—মানসিক রোগের জন্য 'বেড'-এর সংখ্যা শারীরিক অসুখের বেডের তুলনায় 0.003 পার্সেন্টও নয়। যেকটি আছে—সরকারি বা বেসরকারি—তা হচ্ছে বন্দিশালা! আপনি কিছু টাকা খরচ করতে রাজি থাকলে আপনার উন্মাদ আত্মীয়কে—বাবা-মা-সন্তান-স্ত্রীকে—ওরা চেন দিয়ে বেঁধে রাখতে রাজি আছে! ব্যস্!

রানী বলেন, এ রকম করে বলবেন না প্লিজ! আত্মীয়রা আর কী করতে পারে?

ডঃ ঘোষাল বলেন, শুনবেন? আমার হোমে পাঁচটি বদ্ধ উন্মাদ পেশেন্ট আছে—দুটি মহিলা, তিনটি পুরুষ—যাদের দেখতে কোনো ভিজিটার আজ পাঁচ বছরের ভিতর আসেনি!

সুজাতা জানতে চায়, কেন?

—কেন আসবে বলুন? হাসপাতালে দর্শনার্থীর ভিড় হয় স্বাভাবিক কারণে। কিন্তু আমার এখানে তারা কেন আসবে? রোগী/রোগিণী তো তাদের চিনতেই পারবে না।

বাসু বলেন, তাহলে ঐসব পেশেন্টের খরচ দেয় কে?

ঘোষাল বলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে চেক বা ড্রাফ্‌টে খরচ আসে।

বাসু আবার প্রশ্ন করেন, একজন আত্মীয়কে আপনার হাসপাতালে রাখতে হলে মাসিক খরচ কত পড়ে?

—জেনারেল বেড-এ এখন মাসিক তিনশ টাকা লাগে। আগে দুশ টাকা চার্জ ছিল—একেবারে প্রথমদিকে তো দেড়শ টাকাতেই কুলিয়ে যেত। এখন সব জিনিসপত্রের দাম এত বেড়ে গেছে...

রানু জানতে চান, মাত্র তিনশ টাকায় সব খরচ কুলিয়ে যায়?

—না যায় না। কিন্তু এর বেশি দেবার ক্ষমতা কজনের থাকে? তাই ডোনেশন থেকে সাবসিডি দিয়ে পুষিয়ে নিতে হয়। শুধু কি তাই? দু-একটি ক্ষেত্রে সে-টাকাও পাই না। আমার নিজের পকেট থেকেই খরচ করতে হয়।

কৌশিক বলে, কেন? আপনার কী দায়?

—মানবিকতার। পোঁটলায় বন্দী করে বেড়াল-ছানাকে যেভাবে দূরে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়, সেভাবে ওদের কোনো ফাঁকা রাস্তায় বসিয়ে দিয়ে পালিয়ে আসতে পারি না বলে!

রানী বলেন, হাউ সিক্‌নিংলি স্যাড!

—না, মিসেস্ বাসু, আমি এখনো 'স্যাডেস্ট পার্ট অব দ্য স্টোরিতে' আসিনি। শুনুন বলি। এজন্য আমি একবার খুন হতে হতে প্রাণে বেঁচে যাই।

কৌশিক ঝুঁকে পড়ে বলে, খুন! কেন? খুনের কথা উঠছে কি করে?

—শুনুন তাহলে।

কেস-হিস্ট্রিটা উনি বিস্তারিত জানালেন :

ওঁর একজন পেশেন্টের নাম কুন্তী। প্যারামনেশিয়ার রোগী। অতীতকে সে ভুলে গেছে। আরও নানান কম্‌প্লিকেশন। তাকে খাইয়ে দিতে হয়। বাথরুমে নিয়ে যেতে হয়। মেয়েটি অত্যন্ত সুন্দরী, বিহারী, হিন্দুস্তানি। এখন বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ। বছর বিশেক সে আছে ঐ উন্মাদাগারে। বিয়ের কয়েক মাস পরেই একটা বাস-অ্যাক্‌সিডেন্টে স্বামী মারা যায়। ওর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল বটে তবে বদ্ধ উন্মাদ। ওর শ্বশুর বড়লোক। শ্বশুর ও দেওর ওকে ভর্তি করে দিয়ে যায়। তারপর প্রথম দিকে মাস-মাস টাকা আসত। হঠাৎ সেটা বন্ধ হয়ে গেল। ডঃ ঘোষাল রেজিস্ট্রি চিঠি লিখে জানতে পারলেন ঠিকানাটা ভুয়ো। অর্থাৎ ঐ বিধবা পাগলিকে ডাক্তারবাবুর জিম্মায় নামিয়ে দিয়ে তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা মুক্তি পেয়েছে। বিশ বছর আগে মেয়েটির বয়স ছিল পঁচিশ-ছাব্বিশ। ভরা যৌবন তার। প্রতি মাসে প্রাকৃতিক নিয়মে চার-পাঁচ দিন সে অসুস্থ হয়ে পড়ত। ফিমেল ওয়ার্ড-অ্যাটেন্ডেন্ট ব্যবস্থাদি করত। তারপর তিন-চার দিন সে ভায়োলেন্ট হয়ে উঠত! সেক্স-ম্যানিয়াক্! তখন তাকে বেড-এর সঙ্গে বেঁধে রাখা ছাড়া উপায় থাকত না।

শেষে একদিন ওঁর একজন ওয়ার্ড-বয়, শম্ভু বসাক, এসে বললো, ডাক্তারবাবু! আপনি যদি আপত্তি না করেন তাহলে কুন্তীকে আমি ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি। কী ওষুধ ও চাইছে তা তো আপনিও বুঝছেন, আমিও বুঝছি।

ডাক্তারবাবু প্রথমটা চমকে উঠেছিলেন। তারপর জানতে চাইলেন, ঘরে তোমার কে আছে শম্ভু? বিয়ে করেছ?

—করেছিলাম, স্যার। বাচ্চা হতে গিয়ে বৌটা মরে গেল।

—ঠিক আছে। আমি ভেবে দেখি।

ডক্টর ঘোষাল চিফ মেট্রনের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তিনি রাজি হলেন রুদ্ধদ্বারের বাইরে

দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে। স্থির হলো, হাসপাতালের আর কেউ জানবে না ব্যাপারটা। কুন্তীকে ওষুধ ইন্‌জেকশনও দেওয়া হলো—যাতে সে গর্ভবতী না হয়ে পড়ে।

যা প্রত্যাশা করা গিয়েছিল, তাই ঘটল। ডাক্তারবাবুর এম. ডি. ডিগ্রি যে রোগ সারাতে পারেনি, শম্ভু বসাকের এক দাগ ওষুধেই সেই রোগিণী শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

কাজটা ঠিক হলো কি না ডক্টর ঘোষাল স্থির করে উঠতে পারেন না। মেডিকেল সায়েন্স কী বলে? মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স? বিচার-বিবেচনা করতে করতেই একমাস কেটে গেল।

কুন্তী আবার উন্মাদিনী হয়ে ওঠে! ওয়ার্ড-বয় আবার এসে দাঁড়ায়। হাত কচলে বলে, কী স্যার? আপনার ওষুধে তো কুন্তীর কিচ্ছু হচ্ছে না! খাটের সঙ্গে অহেতুক ওকে বেঁধে রেখেছেন। আমি দেব এক পুরিয়া? এবার আমাকে 'ফি' দিতে হবে কিন্তু—বিশ টাকা!

ডঃ ঘোষালের ইচ্ছে হলো হতভাগার গালে ঠাশ করে একটা চড় কষিয়ে দেন। তা দিলেন না কিন্তু। পরিবর্তে বললেন, ঠিক আছে। রাত দশটার সময় এস। টাকা-ফাকা দেব না!

আবার কথাটা বলতে হলো চিফ মেট্রনকে। ভদ্রমহিলা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। মধ্যবয়সী। ডিভোর্সি। এবার তিনি বললেন, কাজটা ঠিক হচ্ছে না, ডক্টর ঘোষাল।

—সে তো আমিও বুঝছি। কিন্তু কী করি বল? আমি তো ওকে রাত দশটায় আসতে বলেছি।

মেট্রন বললেন, ঠিক আছে। তবে এটাই শেষবার। না হলে কথাটা ভিন্নরূপ নিয়ে পাঁচকান হবে। আমাদের মেন্টাল-হোমের বদনাম হয়ে যাবে।

রাত দশটায় হাসপাতাল প্রায় নিশুতি। ডাক্তারবাবু সচরাচর সাড়ে আটটায় বাড়ি চলে যান। আজ যাননি। অফিসে বসে কাজ করছিলেন। এমন সময় একটা জিপ এসে দাঁড়াল হাসপাতালের সামনে। নেমে এল তিনজন গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক আর শম্ভু বসাক। পর্দা সরিয়ে চারজনে সরাসরি ঘরে ঢুকে পড়ল। অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন বোধ করলো না। মেট্রন ছিলেন ডাক্তারের ঘরে। উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, কে আপনারা? কী চান? এভাবে ঘরে ঢুকলেন কেন?

সামনের ঝাঁকড়া-চুল চোঙা প্যান্ট লোকটা বললে, ডাগদারবাবুর সঙ্গে আমাদের বাতচিৎ আছে, আপনি ফুটুন!

ডাক্তারবাবু বললেন, ঠিক আছে সিস্টার, তুমি যাও। আমি দেখছি কেসটা।

মেট্রন ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর ঐ লোকটা বলল, হমার নাম কাল্লু শেখ আছে! হামাকে চিনেন স্যার? না চিনেন তো স্ট্যান্ডিং এম্লেসাবকে টেলিফোন করে জেনে নিন, বাৎ ঠিক আছে কি না।

ডক্টক ঘোষাল বলেন, কী চাইছ তোমরা? কেন এসেছ?

—শম্ভু-শালার কাছে সব শুনছি হামরা। ঐ ছুকরির—কী নাম বে—? প্রশ্নটা করলো সে শম্ভুর দিকে ফিরে।

শম্ভু পাদপূরণ করে : কুন্তী দোসাদ!

—জী হাঁ। কুন্তী দোসাদ। এই রামভগত দোসাদ শালা আছে কুন্তীর দেবর। ভাবিজীকে ও শালা নিতে এসেছে। জিপ নিয়েই এসেছে। তিন দিন পরে আবার ওয়াপস দিয়ে যাবে। হর-মাহিনা আমরা এই তারিখে আসব। আপনার কোনো অসুবিস্তা হোবে না। তিন দিন কুন্তীকে ওষুধ দিয়ে ঠাণ্ডা করে রাখব। শম্ভু-শালা আপনার কাছে বিশ রুপেয়া ফিজ মাঙিয়েছিল? হারামজাদা...

সে মারতে ওঠে শম্ভুকে। শম্ভু দূরে সরে যায়। বলে, ট্যাকা তো নিইনি বাবা! ডাক্তারসাব দেব না বললেন, ব্যস! আমি তো মেনে নিলাম।

ডক্টর ঘোষাল কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। কাল্লু হাত দুটি জোড় করে বললে, অগর আপ বুরা না মানে তো ঔর এক বাত বাতাই, ডাগডরসাব?

—কী? কী কথা!

—ও ছুক্‌রি তো বেওয়ারিশ! শালীর ঘরওয়ালা আদমিরা তো কুছু দেয় না। আগর আপ্ চাহে তো ওয়াপস দিতে আসবই না। আপনি খাতায় 'ডেড' লিখে রাখবেন। একটা বেড ফাঁকা হইয়ে যাবে।

অনেক কষ্টে মেজাজ ঠিক রেখে ঘোষাল শান্তকণ্ঠে বলেছিলেন, দেখ কাল্লু! রাত দশটায় কোনও পেশেন্টকে রিলিজ করা যাবে না। কাল সকাল দশটার সময় এস, কথা হবে।

—কাল সুবে? দশ বাজে? আজ রাতে একঠো ইনজেকশন লাগবে তো হুকুম করুন।

দাঁতে দাঁত দিয়ে ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, ওকে কড়া ঘুমের ওষুধ দিয়েছি। কুন্তী এখন অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

এই পর্যন্ত বলে ডাক্তারবাবু থামলেন। বরফ দেওয়া সেভেন-আপ-এর গ্লাসটা টেনে নিলেন।

ব্রজদুলাল জানতে চান, তারপর? এ কেসটার কথা তো তুমি কোনোদিন বলনি, ঘোষাল!

—না, বলিনি। কখনো কাউকে বলতামও না। আজ বলছি নিতান্ত ঘটনাচক্রে। বাসুসাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যাওয়ায়।

কৌশিক জানতে চায়, কেন? মামুর সঙ্গে কেসটার কী সম্পর্ক?

ডাক্তার ঘোষাল বলেন, ঘটনাটা আজ থেকে চোদ্দ বছর আগেকার। আমি সে রাত্রেই এস. পি. সাহেবের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করি। সমস্ত কথাই খোলাখুলি জানাই। ওনার কাছে জানতে পারি কাল্লু শেখ লোকটা জেল পালানো আসামি। পোলিটিক্যাল শেলটার পাওয়ায় পার্টির তরফে গুণ্ডামি করে বেড়াচ্ছিল। সংক্ষেপে বলি : পরদিন ওরা চারজনই ধরা পড়ল আমার নার্সিংহোমে। তিনজনের দীর্ঘ মেয়াদী সাজা হয়ে গেল। একধিক কেস ঝুলছিল ফেরারী গুণ্ডাগুলোর মাথায়—রেপ, ডাকাতি, খুন। কাল্লু মিঞার খুনের দায়ে যাবজ্জীবন হয়ে গেল। যাবার সময় সে আমাকে শাসিয়ে গেছিল—ফিরে এসে বদলা নেবে।

বাসু জানতে চান: তারপর?

—দিন সাতেক আগে খবর পেয়েছি—পুলিসসূত্র থেকে—মেয়াদ খেটে কাল্লু শেখ ছাড়া পেয়েছে। একটু আগে ইন্দ্র-ভায়া বলছিল না যে, বেমক্কা খুন-জখম হয়ে গেলে—অবশ্য ব্রজর ঐ কথাটা আমার মনে থাকবে। জখম হলেই বাসুসাহেবের দ্বারস্থ হব। খুন হলে একঝুড়ি চন্দ্রবিন্দু নিয়ে দেখা করতে আসব না।

এবার আর কথাটায় কেউ হাসল না।

ব্রজদুলাল থার্ড পেগে জিন-এ সিট্রা মেশাতে মেশাতে বললেন, কুন্তী কি বেঁচে আছে?

—আছে। তবে তার আর সেই রূপযৌবনের জৌলুস নেই। স্মৃতিশক্তি ফিরে আসেনি, আসবেও না কোনোদিন। হরমোন চিকিৎসায় ওর ঐ সেক্সুয়াল টেন্ডেন্সিটা এখন অবশ্য সম্পূর্ণ সেরে গেছে।

রানী জানতে চান, এই পনের বছরে কেউ এর খোঁজ নিতে আসেনি? বাপের বাড়ি বা শ্বশুর বাড়ি থেকে?

—না, আসেনি। কিন্তু আমি আশা ছাড়িনি। আমি নিশ্চিত। দুনিয়া কুন্তীকে ভুলে গেলেও

একজন ভুলবেন না। তিনি আসবেন। যথাসময়ে! ওর আঁচলে পাড়ানির কড়ি থাক বা না থাক!

কোথাও কিছু নেই রানীদেবী ইমোশনাল হয়ে পড়েন। বেমক্কা প্রশ্ন করে বসেন, ঐ হতভাগিনীকে আপনি ভালোবাসেন, তাই না ডক্টর ঘোষাল?

ঘোষাল একটু চম্‌কে ওঠেন। বরফের একটা কিউব মাটিতে পড়ে যায়। হাসেন তিনি। বলেন, সেটাই তো স্বাভাবিক মিসেস্ বাসু! পেশেন্টকে যদি ডাক্তার ভালোই না বাসতে পারল তা হলে প্রাণ দিয়ে তার চিকিৎসা করবে কী করে?

তিন

শনিবার সকালেই ফোন করলেন ব্রজদুলাল। বলুন স্যার, কটা নাগাদ গাড়ি পাঠিয়ে দেব?

বাসু বললেন, না, না, গাড়ি পাঠানোর দরকার নেই। যাচ্ছি ডিনার খেতে, একটু হাঁটাহাঁটি না করলে খিদে হবে কেন? রাত আটটায় তো ডিনার টাইম?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু সবাই জমায়েত হবেন সন্ধে সাতটায়। একটু গল্পগাছা করে রাত আটটায় সবাই ডিনারে বসব।

—দলে আমরা কজন?

—ওফ্! আপনি একেবারে বুল্‌স্-আই হিট করে বসে আছেন!

—তার মানে?

—দলে আমরা তেরো জন। ইন্দ্র, ডাক্তার ঘোষাল আর আমি—এই তিনজন, আপনারা দুজন, হলো পাঁচ। পালিত আর মিসেস্ পালিত, একুনে সাত। মিস্ অ্যান্ড মিসেস্ মোহান্তি, ইজুক্যালটু: নয়। এ ছাড়া জয়ন্ত আর অনুরাধা—হলো এগারো। সর্বশেষে অ্যাবে শবরিয়া আর তাঁর মিসেস্ মারিয়া : তেরো!

বাসু বললেন, সবাইকে ঠিক চিনলাম না। অ্যাব্রাহাম শবরিয়াটি কে?

—ওফ্! আপনিও সেই ভুল করলেন! শবরিয়ার নাম অ্যাব্রাহাম নয়। ও হচ্ছে গুনপুর গির্জার একজন Abbey—এ-বি-বি-ই-ওয়াই—গ্রাম্য ধর্মযাজক। অ্যাব্রাহামের ডাকনাম 'অ্যাবে' নয়। আমার সঙ্গে দীর্ঘদিনের জানাশোনা। থাকেন গুনপুরে। আমি পুরীতে বেড়াতে এলেই ওঁকে সস্ত্রীক ডেকে পাঠাই। মুশকিল হয়েছে তাঁকে নিয়েই। এক টেবিলে তেরো জনে নৈশাহারে বসতে তিনি ইতস্তত করছেন। ইন্দ্র তাই বলছে, জয়ন্তকে বাদ দিতে। সেটা আবার আমার ঠিক পছন্দ নয়। জয়ন্ত বেচারি কলকাতা থেকে এতদূর এসেছে এই উৎসবে যোগ দিতে, তাকে কি বাদ দেওয়া যায়?

বাসু বললে, বুঝলাম। এ সমস্যার সমাধান তো সহজেই হতে পারে।

—কী রকম?

—আকাশ আজ পরিষ্কার। আপনি গার্ডেন-পার্টির ব্যবস্থা করুন। আপনার বাগানটা তো শুনেছি প্রকাণ্ড। চারখানা টেবিল পাতার ব্যবস্থা করুন। চার-চারে ষোল জন বসিবেক। যেহেতু আমরা কুল্লে তের জন, ফলে তিনটি চেয়ার ভেকেন্ট পড়িয়া থাকিবেক। অথবা অতিরিক্ত ইয়ে পান করার ফলে বে-এক্তিয়ার হইলে চেয়ার জোড়া দিয়া তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করা যাইবেক।

—ওফ্! দারুণ ব্যবস্থা করেছেন, স্যার।

—শুনুন, রায়মশাই। গাছে গাছে টুনি বাল্‌ব্ জ্বালানোর ব্যবস্থা করুন। একটা বড় কেক কিনে তার ওপর '43' এবং 'হ্যাপি বার্থডে' লেখানোর ব্যবস্থা করুন। যাতে প্রচারটা ঠিকমতো হয়। কেউ না ভুল করে ভাবে এটা ইন্দ্রকুমারের 'সিলভার জুবিলি জন্মদিন'! ও. কে.?

—এ না হলে ব্যারিস্টার!

—এক টেবিলে তের জন বসাতেই না অ্যাবে শবরিয়ার আপত্তি! এতে শাপটাও মরল, লাঠিটাও ভাঙল না! তাই না?

রায়মশাই এবার শুধু বললেন, ওফ্!

কাঁটায়-কাঁটায় সন্ধে সাতটায় বাসুসাহেব সুজাতাকে নিয়ে ব্রজদুলালের প্রকাণ্ড বাগান-ওয়ালা বাড়িতে প্রবেশ করলেন। পাড়া আর অবস্থানটা মোটামুটি জানা ছিল ; চিনতে কোন অসুবিধা হলো না। দুশ' মিটার দূর থেকেই গাছে গাছে টুনি বাল্‌ব্-শোভিত উৎসবগৃহটি নজরে পড়ছে সকলের।

বাগানের মাঝখানে একটি কংক্রিটের ব্যাডমিন্টন কোর্ট। জোরালো আলো জ্বলছে তাতে। একদিকে অনুরাধা আর জয়ন্ত, অপর দিকে ইন্দ্র আর সুভদ্রা। অ্যাবে শবরিয়া কাউন্ট করছেন উঁচু টুলে বসে।

ওঁদের আসতে দেখেই ব্রজদুলালের সেক্রেটারি অশোক চ্যাটার্জি এগিয়ে এসে সম্বর্ধনা করলো। কেতাদুরস্ত থ্রি-পিস স্যুট, কণ্ঠে কালো বো। হাতে নোটবই। বাগানের ও-প্রান্ত থেকে ব্রজদুলাল হাঁক পাড়েন, আসুন, আসুন স্যার! ওয়েলকাম সুজাতা-মা।

পানীয় সরবরাহ সবে শুরু হয়েছে। ব্রজদুলাল বাসুসাহেবের সঙ্গে ক্যাপ্টেন আর মিসেস্ পালিতের আলাপ করিয়ে দিলেন। ক্যাপ্টেন জে. পালিত আর্মিতে ছিলেন না, ছিলেন পাইলট। বর্তমানে অবসর নিয়েছেন। সচরাচর টি. ভি. দেখেই সময় কাটান। বয়স বেশি হয়ে গেছে বলে অবসর নেননি, নিতে বাধ্য হয়েছেন মাত্রাতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি পাওয়ায়। অ্যাভিয়েশন-আইন মোতাবেক 'ওজন-বয়স-উচ্চতা'র একটি সূত্র আছে। বয়স ও উচ্চতা হাতের বাইরে। ফলে সংযমের মাধ্যমে ওজনটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। পালিত সেখানে ব্যর্থ হয়েছেন। বাসুসাহেবের মনে হয় ভোজনরসিক হিসাবে এ ব্যর্থতা নয়, পানাসক্ততার পরিণাম এটি। ওঁর মধ্যদেশের স্ফীতিটা 'অ্যালকহলিক ফ্যাট'।

সুজাতার পরিধানে আজ একটি বিচিত্র বালুচরী। কোনো একটি কেস-এ কণ্টকোৎপাটনে সুজাতার সাফল্যের এটি পুরস্কার—বাসুসাহেবই কিনে দিয়েছিলেন। অনেকেই আঁচলটা হাতে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করছে। শাড়িটার প্রশংসা করছে।

একটু পরেই ব্যাডমিন্টন খেলা শেষ হলো। অনুরাধা আর জয়ন্ত বিপক্ষকে 'ল্যভ সেট' দিয়েছে। সুভদ্রা মর্মাহত! ইন্দ্রকুমারের জন্মদিন উপলক্ষেই এই আনন্দ-উৎসব। আর তাকেই এভাবে গো-বেড়েন দেওয়াটা কি উচিত হলো? জয়ন্ত বললে, তা তুমি আগে বললে না কেন যে, 'গড়াপেটা' খেলতে হবে?

অনুরাধা জানতে চায়, 'গড়াপেটা' খেলা কাকে বলে?

জয়ন্ত বলে, ঐ দেখ সুভদ্রা! অনুরাধাদি কথাটার মানেই জানে না—কেমন করে তোমাদের জিতিয়ে দেব?

সুভদ্রা প্রতিবাদ করে, জিতিয়ে দিতে তো বলিনি। তুমি কলেজে ব্যাডমিন্টন চাম্পিয়ান ছিলে, জানি। তা—বেশ তো! জেত! কিন্তু দু-একটা পয়েন্ট তো ছেড়ে দিতে পারতে! লোকটার আজ জন্মদিন! একেবারে ল্যভ সেট! তোমার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই।

অনুরাধা মুখ টিপে হাসে। 'গড়াপেটা' খেলা কাকে বলে তা সে বিলক্ষণ জানে। ন্যাকা

সাজছিল। বাসু অন্যদিকে তাকিয়ে পাইপ টানতে টানতে এদের কথোপকথন শুনছিলেন। তাঁর মনে হয় ব্যাডমিন্টন কোর্টে এখন যে খেলাটা চলছিল, রাজশেখরের ভাষায় সেটা : 'হারিত-জারিত-অমিতা-জমিতার প্রেমচক্র'! অনুরাধা ভালোবাসে ইন্দ্রকুমারকে। ইন্দ্রকুমার ভালোবাসে সুভদ্রাকে। জয়ন্তও ভালোবাসে সুভদ্রাকে! ঠিক 'হিডিয়াস হেক্সাগন' নয়, তবে জটিল কোনো জ্যামিতিক ফিগার!

উঁচু টুল থেকে নেমে এসে অ্যাবে শবরিয়া বাসুসাহেবের সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, আমার নাম উইলিয়ম শবরিয়া। আপনার নাম ও কীর্তিকাহিনী বেশ ভালোই জানা আছে; আজ সাক্ষাৎ পরিচয় হলো। ধন্য হলাম।

বাসু বললেন, বিলক্ষণ! আসুন আমরা মিসেস্ শবরিয়ার কাছে গিয়ে বসি। উনি একা-একা বসে আছেন।

অ্যাবে শবরিয়া বলেন, চলুন। উনি কিন্তু শবর ছাড়া আর কোন ভাষা বোঝেন না।

—তা হোক। সঙ্গ তো দিতে পারবেন।

খিদ্‌মদগারেরা টেবিল-চেয়ার সাজাচ্ছে অশোকের নির্দেশে। আবার অন্য একদল ট্রেতে করে পানীয় নিয়ে আসছে। স্ন্যাক্‌স্‌ও।

সুজাতা ব্রজদুলালকে জিজ্ঞাসা করে, ইন্দ্রকুমার ভিতরে চলে গেলেন কেন? একা একা কী করছেন উনি ওখানে?

ব্রজদুলাল প্রতিপ্রশ্ন করেন, তুমি দিল্লিবাসী আধারকারকে চেন?

—'দৃষ্টিপাত'-এর ড্রিংস-বিশারদ আধারকার?

—একজ্যাক্টলি! ইন্দ্রের ধারণা, ও নিজেও ঐ রকম একজন ড্রিংস-মিশ্রণের কনৌসার। আমার সেলারে বসে নানান ড্রিংস মেশাচ্ছে। ভালো কথা, মিসেস্ পালিত অথবা অনুরাধার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে? হয়নি? চল, আলাপ করিয়ে দিই।

সুজাতা দুজনের সঙ্গে পরিচিত হলো।

মিসেস্ ছায়া পালিত একজন নামকরা 'ড্রেস-ডিজাইনার'। সুশিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী। ব্রজদুলালের সঙ্গে তাই নিকট সম্পর্ক। নতুন নাটক মহড়া দেবার সঙ্গে সঙ্গে এক কপি পাণ্ডুলিপির জেরক্স পাঠিয়ে দেন মিসেস্ পালিতকে। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক—যাই হোক। কোন্ কুশীলবের কী পোশাক হবে—কোন দৃশ্যে সে পোশাকটা বদলে কোন পোশাক পরবে তার ডিজাইন করে ছায়া। প্রতিটি পোশাকে ট্যাগ দিয়ে দু-খানি চার্ট টাঙিয়ে দিয় দুটি গ্রীনরুমে। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের। ড্রেস-বিষয়ে ছায়া পালিত একজন কনৌসার। চৌকস, তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্না মহিলা।

ব্রজদুলাল বলেন, তোমার সেই সেকেন্দার শাহ্‌র মুকুটের গল্পটা ওকে শুনিয়ে দাও, ছায়া।

ছায়া লজ্জা পায়। বলে, বাদ দিন রায়কাকা!

—না, না, বাদ দেব কেন? তুমি তো আমাদের টিমের লোক গো। তোমার কৃতিত্বে আমাদেরও গর্ব!

সুজাতাও উৎসাহ দেখায়, বলুন রায়কাকা! কী ব্যাপার!

বছর পাঁচ-সাত আগেকার কথা। কোনো একটি কলেজের ছাত্রছাত্রী 'নটরঙ্গ' স্টেজটা ভাড়া করেছে তাদের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবের জন্য। ওরা ডি. এল. রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' মঞ্চস্থ করবে। ড্রেস এবং রূপসজ্জার দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন ব্রজদুলাল। ড্রেস-রিহার্সালে আলেকজান্ডারের মুকুটটা দেখে খেপে উঠেছিলেন ওদের পরিচালক। তিনিই সেকেন্দার শাহ্‌র চরিত্রটা করবেন। কলেজের ইকনমিক্সের অধ্যাপক। তিনি ব্রজদুলালের ম্যানেজারকে ধমকে ওঠেন, এটা কি

মুকুট হয়েছে? এ তো গণেশের মাথা! গ্রিক হেলমেট কেমন হয় জানেন না আপনারা? ম্যানেজার মিসেস্ পালিতের দিকে তাকায়। ছায়া পালিত এগিয়ে এসে বলে, আপনিই তো পরিচালক, তাই নয়?

একটি ছেলে—সেলুকাস সেজেছে—বললে, উনি আমাদের ইকনমিক্সের স্যার! হ্যাঁ, উনিই পরিচালনা করছেন।

ছায়া পালিত বলে, আপনাদের কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক অথবা হিস্ট্রি-অনার্স পড়েন এমন কোনো ছাত্র কি এখানে আছেন?

সেলুকাস থতমত খেয়ে যায়। ও-পাশ থেকে চাণক্য—মানে চাণক্য চরিত্রের অভিনেতা বলে ওঠে, কেন বলুন তো? আমার হিস্ট্রি-অনার্স।

—তাহলে আপনি বুঝবেন। এই রাজমুকুটটা একটা গ্রিক হেলমেটের অনুকরণে গড়া। কার্থেজে আবিষ্কৃত একটা মেডেলিয়ানে পাওয়া গেছে একটি স্বর্ণমুদ্রা—বর্তমানে সেটি প্যারীতে ল্যুভ সংগ্রহশালায় রক্ষিত। ঐতিহাসিকদের অনুমান এই বিশেষ রাজমুকুটটি আলেকজান্ডার তৈরি করিয়েছিলেন পুরুকে পরাজিত করার পর। হস্তী হচ্ছে পুরুরাজের প্রতীক। আপনাদের পরিচালক এসব বুঝবেন না। উনি ইকনমিক্স পড়ান তো? ওঁকে কাইন্ডলি বলে দেবেন, ল্যুভ সংগ্রহশালায় যে মুদ্রাটা রাখা আছে তার মূল্য না হোক মিলিয়ান ডলার্স। যা হোক সেই ট্র্যাডিশনাল আলেকজান্ডারের মামুলি হেলমেটটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। সব গোলামার্কা ডিরেক্টর যেটা অনুমোদন করেন। গণেশের মাথাটা এদিকে বাড়িয়ে দিন!

অনুরাধা বসু 'নটরঙ্গে'-এ আছে আজ টানা দশ বছর। বরাবর হিরোইনের চরিত্র করে চলেছে। চিত্রশিল্পের হিসেব অনুযায়ী ওর বয়স ত্রিশের নিচে। সাজলে-গুজলে সে-রকমই লাগে। কিন্তু হিসাবে যে কিছুটা গোঁজামিল আছে সেটা সবাই বোঝে। অনুরাধা বছরের পর বছর ইন্দ্রকুমারের বিপরীতে নায়িকার চরিত্র করে গেছে। এক্ষেত্রে নায়িকার একটা দাবি জন্মেই যায়। কেউ বলে অনুরাধা বিধবা, কেউ বলে ডিভোর্সি, আবার কারও মতে সে কুমারী। ব্রজদুলাল হয়তো ভিতরের কথা জানেন, প্রকাশ করেন না। তবে 'নটরঙ্গ'-এ সবাই জানে, ইন্দ্রকুমার প্রস্তাব দিলেই অনুরাধা নীড় বাঁধতে রাজি। ইন্দ্রকুমারই ইদানীং অনুরাধার প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে। ভাবখানা : "ঘরের কোণে ভরা পাত্র দুই বেলা তা পাই /ঝরনাতলার উছল পাত্র নাই।" রাতের পর রাত মঞ্চের উপর অনুরাধার সঙ্গে প্রেমাভিনয় করতে করতে বোধকরি ইন্দ্রকুমার ক্লান্ত। বীতশ্রদ্ধ। বিরক্ত।

ওদিকে শিউলি গাছতলায় খানতিনেক চেয়ার টেনে নিয়ে অ্যাবে শবরিয়া বাসুসাহেবকে বোঝাতে শুরু করেছেন—কী সূত্রে ব্রজদুলালের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়।

শবরিয়া আসলে আদিবাসী সমাজের লোক। ওঁদের গোষ্ঠীটার নাম 'শবর'। এরা আদিযুগে মুণ্ডাজাতীয় একটি অস্টো-এশিয়াটিক কথ্য ভাষার অধিকারী ছিল। এদের বাস ওড়িশার কোরাপুট আর গঞ্জাম জেলার সীমান্তে। গুনপুরের আশেপাশে। আজকের দণ্ডকারণ্যের বাইরে বটে, কিন্তু প্রাচীনকালে এদের দণ্ডকবনের বাসিন্দা বলেই ধরা হতো। এদের কিছু থাকে পাহাড়ী অঞ্চলে, যেখানে ওড়িশার কোরাপুট জেলা গিয়ে মিশেছে গঞ্জাম জেলায়। কিছু থাকে সমতল অঞ্চলে। সমতলবাসীদের কথা ভাষায় অসংখ্য তেলেগু আর ওড়িয়া শব্দ অনুপ্রবেশ করেছে। তুলনায় পাহাড়িয়া শবরেরা তাদের ভাষায় বৈশিষ্ট্য শুধু নয়, তাদের আদিম চরিত্র-বৈশিষ্ট্যও অবিকৃত রাখতে পেরেছে।

অ্যাবে শবরিয়া বোঝাতে চাইলেন 'শবর' শব্দটার একটা প্রাচীন ঐতিহ্য আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে শবরেরা বিশ্বামিত্রের বংশধর। সোমদেবের কথাসরিৎসাগরেই শুধু নয়, গ্রিক

পণ্ডিত টলেমির জবানীতেও জানা যায় ভারতবর্ষের গাঙ্গেয় উপত্যকায় শবর জাতির বাস। উচ্চবর্ণের হিন্দু জমিদার-জোতদারেরা শবরদের 'বন্ডেড-লেবার' করে রেখেছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী— 'ক্রীতদাস' বলতে যা বোঝায়। আমেরিকার প্লান্টার্সদের মতোই সে অত্যাচারের সীমা-পরিসীমা ছিল না।

এই নিপীড়িত সমাজের সেবা করতে এগিয়ে এসেছিলেন একদল খ্রিস্টান ধর্মযাজক। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি জেসুইট সোসাইটির তরফে ধর্মপ্রচার করতে ভারতে আসেন সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার। গোয়া বন্দরে তিনি পদার্পণ করেন 1534 খ্রিস্টাব্দে। সময়টা চিহ্নিত করতে বলা যায় যে, মুঘল সম্রাট হুমায়ুন তখন ভারতেশ্বর। কিন্তু গোয়া বন্দরে বোধকরি কেউ তাঁর নামই জানত না। বন্দর এবং সংলগ্ন ভূখণ্ডের মালিক ছিল পর্তুগিজ বোম্বেটের দল, যারা নাবিকবৃত্তি-তথা-বোম্বেটেগিরি ছেড়ে ভূসম্পত্তির মালিক হতে শুরু করেছে। জেসুইট সোসাইটির ধর্মযাজকেরা ক্রমে ছড়িয়ে পড়েন কেরালায়, ওড়িশায়, অন্ধ্রে। তারই একটি শাখা এসে গুনপুরে একটি ছোট্ট গির্জা বানায়। মূল গির্জাটা দু-তিনবার ধূলিসাৎ হয়েছে বটে কিন্তু জেসুইট সোসাইটির অর্থসাহায্যে পুনর্নির্মিত হয়েছে। উইলিয়ম শবরিয়া সেই প্যারিশ-চার্চের একজন অ্যাবে।

ওঁর গ্রামে দেড়শ' ঘর মানুষের বাস। সবাই শবর নয়, তবে সবাই খ্রিস্টান। কারণ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলে আদিবাসীরা অনেক সুযোগ-সুবিধা পেত এবং পায়, যা বর্ণহিন্দু সমাজপতিরা ওদের দিতে চাইত না।

বাসুসাহেব বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নটার জবাব এখনো দেননি। ব্রজদুলালবাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ হলো কী করে?

অ্যাবে বিল হাসলেন। বললেন, শবর জাতির কথা শোনাবার মতো পণ্ডিত তো পাই না। আমি একজন পিতৃপরিচয়হীন অনাথ। মানুষ হয়েছি খ্রিস্টান পাদরীদের দয়ায়। আমার স্ত্রীও তাই। আমার কোন গোত্র নেই—'ফ্যামিলি-নেম' নেই। তাই নাম নিয়েছি : "শবরিয়া" অর্থাৎ শবর-জাতের লোক। এসব কথা তো সবাইকে বলার নয়, বলিও না। আপনি পণ্ডিত, তাই সব কথা আপনাকে বললাম। ব্রজদুলালবাবু এবং তাঁর এক বন্ধু—তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের নৃতত্ত্বের অধ্যাপক, শবরদের সংস্কৃতির বিষয়ে সন্ধান করতে গুনপুরে এসেছিলেন। ওখানে না আছে হোটেল. না ডাকবাংলো। আমি গির্জার অ্যাবটকে বলে ওঁদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম আমাদের চার্চে। অতিথি হিসাবে। ওঁর বন্ধুর তরফে আদিবাসী শবরদের মধ্যে দিন সাত-দশ দোভাষীর কাজও করেছিলাম। এ থেকেই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। মিস্টার রায় বোর্ডিং-লজিং এবং দোভাষীর কাজ করার জন্য আমাকে কিছু পারিশ্রমিক দিতে চান। আমি তা গ্রহণ করিনি। উনি বেশ কিছু টাকা আমাদের অনাথ আশ্রমে দান করে আসেন।—তাই থেকেই বন্ধুত্ব। উনি যখনই ওঁর এই পুরীর প্রাসাদে এসে ওঠেন, তখন সময় থাকতে আমাকে জানান। আমরা দুই বুড়ো-বুড়ি কদিন পুরীতে এসে ভালোমন্দ খেয়ে যাই। এই আর কি!

বাসু জানতে চান, আপনি কি প্রোটেস্টান্ট?

—আজ্ঞে না। আমি রোমান ক্যাথলিক। সোসাইটি অফ যীসাস-এর এক দীন সেবক!

জয়ন্ত পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল। হঠাৎ বলে বসে, সব খ্রিস্টানই তো যীসাস-সেবক. সোসাইটি অব যীসাস-এর সদস্য।

—নো মাই পুওর চাইল্ড। 'সোসাইটি অব যীসাস' একটি সেবাদল প্রতিষ্ঠানের নাম। তার প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন সেন্ট ইগ্‌নেশাস লয়লা। তিনি স্পেন দেশের মানুষ। জার্মানির মার্টিন লুথার—যাঁকে বলা হয় প্রোটেস্টান্ট ধর্মের প্রধান উদগাতা, তাঁর চেয়ে সেন্ট লয়লা ছিলেন

মাত্র আট বছরের ছোট। প্রথম যৌবনে তিনি সৈনিক ছিলেন। যুদ্ধে তাঁর একটি পা কাটা যায়। তারপর তিনি ধর্মজীবনে প্রবেশ করেন। দুটি ক্রাচ সম্বল করে পদব্রজে মাদ্রিদ থেকে রোমে উপস্থিত হন। পোপের আশীর্বাদ নিয়ে তিনি এই 'সোসাইটি অব যীসাস' গঠন করেন। আমাদের মূলমন্ত্র : নিঃস্বার্থভাবে দীন-দরিদ্রের সেবা করা। তাদের ঈশ্বরমুখী করে তোলা।

বাসু জানতে চান, আপনাদের সংসারে আর কে কে আছে?

বৃদ্ধ অমায়িক হেসে বললেন, ওন্‌লি ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স! সারা বিশ্বে ছড়ানো।

কথাটা ভালো লাগল বাসুসাহেবের। জানতে চাইলেন, সন্তানাদি নেই আপনাদের?

অ্যাবে জবাব দিলেন না। ধর্মপত্নীর দিকে ফিরে শবর ভাষায় কী যেন প্রশ্ন করলেন। মিসেস্ শবরিয়াও জবাবে কী যেন বললেন। অ্যাবে বিল ভাষান্তর করে বললেন, একশ' তিন!

জয়ন্ত অবাক হয়ে বলে, তার মানে?

বিল শবরিয়া বললেন, আমাদের অনাথ আশ্রমে বর্তমানে একশ' তিনজন আছে। তাই বলছেন উনি।

বাসু বুঝলেন : উনি সামাজিক অর্থে নিঃসন্তান।

গার্ডেন-পার্টিতে সচরাচর যেমন হয়। কিছু দূরে দূরে এক-একটি জমায়েত। তিন-চার-পাঁচ জনের। প্রত্যেকের হাতেই এক একটা গ্লাস। কেউ ভদ্‌কা, কেউ জিন, কেউ বীয়ার, অধিকাংশই স্কচ। মেয়েরা কেউ কেউ কোকোকোলা, সেভেন-আপ্ বা লিম্‌কাও পান করছে। খিদ্‌মদগারেরা ট্রে হাতে ঘুরছে। ব্রজদুলাল যদিও নিমন্ত্রণকর্তা, তবু বয়সের ভারে তিনি একটি সোফায় বসে পড়েছেন। তাঁর পাশে ডঃ ঘোষাল। ইন্দ্রকুমার হিসেবমতো ওঁদের চেয়ে পনের-বিশ বছরের ছোট, তাই ঘুরে ঘুরে আপ্যায়ন করছে। অশোকও সাহায্য করছে তাকে। সুভদ্রা যদিচ হোস্টেস নয়, তবু ভাবখানা যেন তারই বাড়িতে সবাই নিমন্ত্রণ রাখতে এসেছেন। তার পরনে একটি ময়ূরকণ্ঠী রঙের বেনারসী। কানে এক জোড়া জড়োয়া দুল—দৈর্ঘ্যে ইঞ্চি চারেক। ভা-রি খুশি-খুশি ভাব তার। 'ল্যভ সেট' খাওয়ার কথাটা এতক্ষণে মনে হয় ভুলে গেছে। 'ল্যভ' এমনই জিনিস!

ক্যাপ্টেন পালিত সম্ভবত চার নম্বর ভদ্‌কা গ্লাসের প্রভাবে একখানি চেয়ার টেনে বসে পড়েছেন।

একমাত্র জয়ন্ত কিছু পান করছিল না। মাঝে মাঝে বেয়ারাদের ট্রে থেকে তুলে দু-চার টুকরো ফিশ-ফিঙ্গার অথবা কাবাব মুখগহ্বরে ফেলে দিচ্ছে। উপায় নেই। সুভদ্রার অনুরোধে এই আনন্দ-উৎসবের নানান রঙিন ফটো তোলার দায়িত্ব সে নিয়েছে। ক্যামেরাটা সুভদ্রার—ক্যানন। রিলটাও সে কিনে দিয়েছে। ফলে জয়ন্ত সুরাপানের সুযোগই পাচ্ছে না। মাঝে মাঝেই তার হাতে ক্যামেরা ঝিলিক দিয়ে উঠছে।

একজন খিদ্‌মদগার এগিয়ে এল একটি বড় ট্রেনে সাত-আটটি গ্লাস নিয়ে। ইন্দ্রকুমার একটা গ্লাস উঠিয়ে দিল সুভদ্রার হাতে। সুভদ্রা বললে, আমার কিন্তু এটা সেকেন্ড পেগ্! নেশা-টেশা হয়ে যাবে না তো, ইন্দ্রদা?

ইন্দ্রকুমার বললে, খালি পেটে খেও না। তাহলে কিসসু হবে না।

আর একটি গ্লাস তুলে দিতে গেল মিসেস্ মোহান্তির হাতে। উনি বললেন, কী ওটা?

—'জিন' উইথ সেভেন-আপ্।

—না, না, আমাকে কোক্ দিন।

ইন্দ্র পীড়াপীড়ি করে, সে কিছুতেই হবে না, মাসিমা। আজকের রাতটা একটা স্পেশাল অকেশন। আগেকার গ্লাসটা কী ছিল?

—সিট্রা!

—দেন ইট মাস্ট বি জিন, দিস্ টাইম— নিন বলছি।

মিসেস্ মোহান্তি কচি খুকির মতো সলজ্জে উঠিয়ে নিলেন গ্লাসটা।

ইন্দ্র এবার অনুরাধার দিকে ফিরল, তুমি কী নেবে?

—নো থ্যাংক্স্! আই হ্যাভ হ্যাড এনাফ!

—তা বললে আমরা শুনব কেন?

—শুনবে। যেহেতু আমি কোন পার্টিতে কখখনো থার্ড পেগ্ নিইনি। সরি! সেকেন্ড ইজ মাই লিমিট!

ইন্দ্রকুমার পীড়াপীড়ি করলো না। এগিয়ে গেল খিদ্মদগারের পিছন-পিছন। ট্রেতে তখনো পাঁচ-সাতটা গ্লাস।

ডঃ ঘোষাল উঠিয়ে নিলেন স্কচ। একটু সোডা মিশিয়ে নিলেন। বাসুও নিলেন হুইস্কি অন-রক্স্! খিদ্মদগার এগিয়ে এল খ্রিস্টান যাজকটির কাছে।

—নিন, ফাদার, যেটা ইচ্ছে উঠিয়ে নিন।

অ্যাবে বিল গোটা ছয়েক চিকেন কাবাবের টুকরো তুলে নিলেন। তিনটে দিলেন ধর্মপত্নীকে, তিনটে বাঁ হাতের মুঠোয় রেখে বললেন, থ্যাংক্স্!

—ও কী? ড্রিংকস্ নিন। যেটা ইচ্ছে।

অ্যাবে বিল বললেন, কী জান ভাই? ড্রিংসের স্বাদ সব ভুলেই গেছি। আমাদের ওখানে তো শুধু ধেনো, পচাই আর মহুয়া। ওসব আমার সহ্যই হয় না।

ব্রজদুলাল বললেন, এক পেগ্ নিন। চাঙ্গা লাগবে।

অ্যাবে বিল প্রশ্ন করেন, এটা কী?

ব্রজদুলাল বলেন, হোয়াইট হর্স!

অ্যাবে ঠাট্টা করে বলেন. আপনি আর খাবেন না রায়সাহেব। আপনার দিব্যি নেশা হয়েছে। স্পষ্ট দেখছি হলুদ রঙ—আপনি বলছেন হোয়াইট। আর যেটা হোয়াইট কালার?

ইন্দ্রকুমার বলে, ভদ্কা-উইথ-লাইম!

অ্যাবে বিল সেটাই উঠিয়ে নিলেন।

জয়ন্তর ক্যামেরা ক্রমাগত ঝিলিক মেরে চলেছে।

ইন্দ্রকুমার বলে, তুমি এবার ক্যামেরাটা বন্ধ কর তো জয়ন্ত। টেক অ্যা ড্রিংক। কী নেবে?

জয়ন্ত ক্যামেরাটা খাপে ভরে। এতক্ষণে প্রথম গ্লাসটা তুলে নিয়ে বলে, মেনি হ্যাপি রিটার্নস্, ইন্দ্রদা!

ইন্দ্রকুমার প্রত্যুত্তরে কিছু একটা কথা বলতে যাচ্ছিল। বলা হলো না। তার আগেই হঠাৎ বিষম খেলেন অ্যাবে শবরিয়া। কিন্তু শব্দটা 'খক্খক্' জাতীয় নয়। কেমন যেন অস্বস্তিকর, অশ্রাব্য। সকলেই অ্যাবে বিল-এর দিকে ফিরে তাকায়। সবাই লক্ষ্য করে তিনি বাঁ হাতে প্রায় নিঃশেষিত গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। ডান হাতটা গলায়। একটা বিবমিষার বেগ যেন—না, বমি হলো না। অ্যাবে শবরিয়া হঠাৎ বাঁ হাতটা আকাশের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। কিছু যেন একটা হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইছেন তিনি। বিদ্যুৎচমকে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠেন মিসেস্ শবরিয়া। দুর্বোধ্য মাতৃভাষায় তিনি কী একটা কথা বললেন। অ্যাবে বিল তা শুনতে বা বুঝতে পারলেন কি না বোঝা গেল না। স্ত্রীর আলিঙ্গনে লুটিয়ে পড়লেন।

সুভদ্রা চিৎকার করে ওঠে, কী? কী হয়েছে!

সকলের দৃষ্টি সেদিকে। ডাক্তার ঘোষাল এক লাফে উঠে পড়েন। বৃদ্ধ খ্রিস্টান যাজককে

স্ত্রীর আলিঙ্গনমুক্ত করে একটা কাউচে শুইয়ে দেন। গলার 'বো'-টা খুলে নেন। কোটের বোতামগুলোও। এবার নাড়ি দেখেন তিনি।

ব্রজদুলালের আর ধৈর্য মানছে না। বলেন, কী? কী বুঝছ?

ধমক দিয়ে ওঠেন ডাক্তার ঘোষাল : স্টপ হাউলিং!

প্রায় মিনিট দুয়েক পর ঘোষাল উঠে দাঁড়ালেন।

ব্রজদুলাল আবার একই প্রশ্ন করেন, কী হলো?

—হি ইজ ডেড! আয়াম সরি।

শেষ দুটো শব্দ ওঁর ওষ্ঠাধর উচ্চারণ করলো না। যেন কণ্ঠস্বর হারিয়ে ফেলেছেন ডাক্তার ঘোষাল।

—ডেড! ইম্পসিব্‌ল্!

মিসেস্ মারিয়া শবরিয়া—যিনি মাতৃভাষা ছাড়া বস্তুত আর কোন ভাষাই জানেন না, তিনি আর্তনাদ করে একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন আকাশের দিকে। তীব্র, তীক্ষ্ণ, জান্তব প্রশ্ন! যে ভাষা বুঝতে কারও অসুবিধা হলো না। জবাব দিলে· ·ক্তার ঘোষাল—তাঁর মাথাটা দুদিকে আন্দোলিত করে।

মিসেস্ শবরিয়া—সেই নিঃসন্তান ধর্মযাজকের ধর্মপত্নী—যাঁর সন্তানসংখ্যা মাতা গান্ধারীকেও লজ্জা দেবে—তিনি লুটিয়ে পড়লেন তাঁর স্বামীর বুকের উপর সমুদ্র-গর্জনকে ছাপিয়ে তাঁর জান্তব আর্তনাদ আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

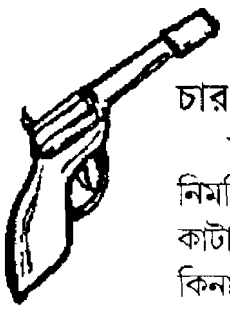

চার

মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর ঘণ্টা-তিনেক কেটে গেছে। রাত এখন দশটা। নিমন্ত্রিতেরা প্রায় সবাই চলে গেছেন। জন্মদিনের কেকটা পড়ে আছে প্যান্ট্রিতে। কাটার কথা কারও মনেও পড়েনি। খাবারের প্লেটে নিমন্ত্রিতরা কিছু তুলে নিলেন কিনা তা কেউ লক্ষ্য করে দেখেনি। সে মেজাজই ছিল না কারও। ব্রজদুলালের সেক্রেটারিটি করিতকর্মা। যাবতীয় ব্যবস্থা সে সুনিপুণভাবে সম্পন্ন করেছে। ডক্টর ঘোষালের পরামর্শে প্রথমেই গাড়ি বার করে ধরে নিয়ে এসেছে একজন স্থানীয় চিকিৎসককে—ডঃ গোবিন্দলাল পণ্ডা। ব্রজদুলাল পুরীতে এসে অসুস্থবোধ করলে এঁকেই ডাকেন। পণ্ডা সব কিছু শুনে, মৃতদেহ পরীক্ষা করে সরকারিভাবে ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন। তারপর স্থানীয় ভাইকারেজে সংবাদ দেওয়া হয়। তারা ভ্যানে করে মৃতদেহ আপাতত অপসারিত করেছে। পুরী-গির্জার ভূগর্ভস্থ মৃত্যুকক্ষে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত শান্তিরাজ্যে অ্যাবেকে রাখা হবে, যতদিন না সমাধির আয়োজন সম্পূর্ণ হয়। মিসেস্ মোহান্তি মূর্ছাতুর বিধবাকে নিজের গাড়িতে করে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেছেন। ডক্টর পণ্ডার ব্যবস্থাপনায় একটি নাইট-নার্স যোগাড় করা গেছে, যে-মেয়েটি 'গোণ্ডী' এবং 'শবরী' ভাষা জানে। ঐ ভাষাজ্ঞানটাই ছিল সবচেয়ে জরুরী। কারণ পুরী শহরে 'শবরী' ভাষা জানা লোক পাওয়া কঠিন—যদিও শবরদের আস্তানা মাত্র দু-তিনশ কি.মি. দূরে। ব্রজদুলালের সেক্রেটারি প্রত্যেকটি অতিথিকে এক-একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিয়েছে। বলেছে, জানি, এ-অবস্থায় খাওয়ার কথা মনে থাকে না। এখানে বসে খেতে পারবেনও না। নিয়ে যান। খেতে ইচ্ছে না করে কাউকে দিয়ে দেবেন। আমরাও তো তাই করব! কাল সকালে!

কথাটা সত্যি। মৃত্যু যেমন নিষ্ঠুর সত্য, তেমনি অবধারিত সত্য : মৃত্যুকে অতিক্রম করে জীবনের দাবি!

প্রথমেই বিদায় নিয়েছেন ক্যাপ্টেন ও মিসেস্ পালিত, দ্বিতলে। তারপর নিজের ডেরায় চলে গেছে জয়ন্ত মহাপাত্র। অনুরাধার প্রচণ্ড মাথা ধরেছিল। সে একটা স্যারিডন ট্যাবলেট খেয়ে ত্রিতলে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। বাসু বাড়িতে ফোন করে কৌশিককে জানিয়েছেন তাঁদের ফিরতে দেরি হতে পারে। রানু যেন চিন্তা না করেন।

যে টেবিলে পানীয় গ্লাসটা রেখে লুটিয়ে পড়েছিলেন অ্যাবে শবরিয়া, ঠিক তার পাশের টেবিলেই এখন বসে কথা বলছিলেন ওঁরা পাঁচজন। ব্রজদুলাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ঐ একই কথা : কী করবেন ব্যারিস্টারসাহেব? যা হোক দুটি খেয়ে নেবেন এখানে বসে? জাস্ট পিত্তিরক্ষা করা?

বাসু কিছু বলার আগে সুজাতা বলে ওঠে, মাপ করবেন রায়কাকু! আমি কিছু খেতে পারব না।

—বুঝেছি! অশোক! তুমি খাবারের প্যাকেটগুলো রেডি রেখো। এত রাত্রে বাসুসাহেব রিক্‌শা করে ফিরবেন না। ওঁদের পৌঁছে দিতে হবে। প্যাকেটগুলোও তুলে দিও।

তারপর সুজাতার দিকে ফিরে বলেন, তোমার অবস্থাটা বুঝতে পারছি, সুজাতা-মা! রাত্রে যদি কিছু মুখে দিতে ইচ্ছে না করে তো ফ্রিজে রেখে দিও। কাল সকালেও যদি রুচি না হয় তো কুকুরের মুখে ধরে দিও! ফেলেই তো দিতে হবে সব!

ইন্দ্রকুমার অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল বাগানে। আলোগুলো অধিকাংশই নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। টুনি বাল্‌বগুলোও। আকাশে শুক্লা দশমীর চাঁদ। হঠাৎ থমকে থেমে পড়ে ইন্দ্রকুমার। বলে, ঘোষালদা, এভাবে চোখের সামনে কোনো জলজ্যান্ত মানুষকে হার্টফেল করে মরে যেতে দেখেছ?

ম্লান হাসলেন ডক্টর ঘোষাল। বললেন, তুমি একটা কথা ভুলে বসে আছ, ইন্দ্র। তুমি অভিনেতা! মৃত্যুর অভিনয় করতেই শুধু শিখেছ! আমি ডাক্তার! মৃত্যু নিয়েই আমার কারবার। জীবন আর মৃত্যু। সারা জীবন ধরে মৃত্যুকে নানাভাবে দেখছি!

ব্রজদুলাল জিজ্ঞাসা করলেন, ডক্টর পণ্ডা মৃত্যুর কারণ হিসাবে কী লিখেছেন?

—'ফেলিওর অব হার্ট কজড বাই আ সাডেন সীজার!' জবাব দিলেন ঘোষাল।

—অর্থাৎ I don't know, নাহং বেদ! আমি জানি না। তবে হ্যাঁ, তোমরা আমাকে 'ফিজ' দিয়ে ডেকে এনেছ সার্টিফিকেট দিতে, তাই জানিয়ে যাচ্ছি : লোকটা মরে গেছে। ব্যস্! এবার তোমরা যা ইচ্ছে করতে পার—করব দিতে পার, পুড়িয়ে ফেলতে পার, টাওয়ার অফ সাইলেন্সে রেখে আসতে পার।

সুজাতা ডক্টর ঘোষালকে বলে, আপনি যা বললেন তাকেই কি আমরা সাদা বাংলায় বলি 'হার্টফেল' করে মারা গেছেন?

ডাঃ ঘোষাল বললে, হ্যাঁ, তাই।

বাসু এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন। পাইপ পর্যন্ত ধরাননি। বসে বসে ভাবছিলেন—ঐ সদ্যমৃত লোকটার কথাই। কী অম্লানবদনে ভদ্রলোক চলে গেলেন—আর বলে গেছেন মৃত্যুর পাঁচ মিনিট আগে যে, তিনি 'জারজ'। কোন অজ্ঞাত পুরুষ-রমণীর কামনার গরলসমুদ্রে অবগাহন করে তিনি দুনিয়াদারী করতে এসেছিলেন এক অবাঞ্ছিত পুরুষ হিসাবে। নিতান্ত ঘটনাচক্রে অথবা যীসাস্-এর কৃপায় জীবনসঙ্গিনী করেছিলেন অনুরূপ এক অবাঞ্ছিতাকে। এবার ডঃ ঘোষালের কথা শুনে কথোপকথনে যোগদান করেন তিনি : মাপ করবেন ডক্টর

ঘোষাল। 'সীজার অব হার্ট'—ফেনামেনানটাকে আপনি কী বলবেন? মৃত্যুর 'কজ', না 'এফেক্ট'?

ইন্দ্রকুমার বিরক্ত হয়ে বললো, বাদ দিন এসব অ্যাকাডেমিক তর্কের কচকচি : তালটা ধপ্ করে পড়লো, না পড়ে ধপ্ করল!

বাসু তৎক্ষণাৎ বলেন, একজ্যাক্টলি! ইন্দ্রকুমার! একটা লোককে গুলি করে মারলেও এক সময় তার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়। দ্যাট অল্সো ইজ ডেথ ডিউ টু সীজার অব হার্ট! তাই নয়?

ডক্টর কুঞ্চিত-ভ্রূভঙ্গে প্রশ্ন করেন, হঠাৎ এ প্রসঙ্গ কেন?

বাসু চাপা গলায় প্রতিপ্রশ্ন করেন, ডাক্তার হিসাবে আপনি নিশ্চিত—নটউইথস্ট্যান্ডিং পণ্ডা'জ ডেথ-সার্টিফিকেট—মৃত্যুটা স্বাভাবিক?

পুরো দশ সেকেন্ড কেউ কোনো কথা বললো না। যে-যার অন্তরের তলায় তলিয়ে গেছে। মৃত্যুদৃশ্যটা মনে মনে আবার দেখছে!

শেষ পর্যন্ত ব্রজদুলাল বলে ওঠেন, না তো কী? খুন? আত্মহত্যা?

ডাঃ ঘোষাল বলেন, দুটোই ইম্পসিব্ল্! কেই বা ওঁকে খুন করতে চাইবে? আর এভাবে উনি আত্মহত্যাই বা করবেন কেন?

ইন্দ্রকুমার বলে, আত্মহত্যা নয়। হতে পারে না। এভাবে জন্মদিনের নেমন্তন্ন খেতে এসে কেউ সবার সামনে বিষপান করে আত্মহত্যা করে না। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে উনি রসিকতা করেছিলেন 'হোয়াইট হর্স' হুইস্কি নিয়ে। কিন্তু কেসটা খুন কিনা এখনই বলা যায় না।

—কেন? অমন নির্বিরোধী, পরোপকারী, নিঃসম্বল মানুষটাকে কে কেন খুন করবে?—জানতে চায় সুজাতা।

ইন্দ্রকুমার শ্রাগ করে। বলে, এখনই বলা যাচ্ছে না। আমরা জানি না। কিন্তু খুঁজলে হয়তো ওঁর শত্রুকে পাওয়া যাবে।

ব্রজদুলাল বললেন, কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ ইন্দ্র। দুদিন আগে আমি নিজেও কল্পনাই করতে পারতাম না যে, ডক্টর শিবশঙ্কর ঘোষালের মতো বিশ্ববন্ধু, পরোপকারী মানুষকে একজন খুন করতে চায়।

ইন্দ্রকুমার রীতিমতো চমকে ওঠে। বলে, মানে? কী বলছ ব্রজদা?

—আস্ক ঘোষাল!

ডক্টর ঘোষাল বললেন, তুমি জান কেসটা। ভুলে গেছ। বহু বছর আগেকার কেস তো! সেই কাল্লু শেখ। মনে নেই?

—তার তো ফাঁসি হয়েছিল!

—ফাঁসি নয়, যাবজ্জীবন।

—সে তো একই কথা!

—না, ইন্দ্র! যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আসামি বেঁচে থাকলে একদিন ছাড়া পায়।

ইন্দ্রকুমার একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে। বলে, সে কি ছাড়া পেয়েছে? তুমি জান?

ঘোষাল মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, এখন ও আলোচনা থাক, ইন্দ্র। পরে বলব। যে-কথা হচ্ছিল—বাসুসাহেব, আপনি কি আশঙ্কা করেন বিল শবরিয়ার মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়?

বাসু পকেট থেকে পাইপ-পাউচ বার করেন এতক্ষণে। বলেন, আমি রায়মশায়ের কথাটা রিপিট করব : 'নাহং বেদ! I don't know! আমি জানি না!'

ইন্দ্রকুমার আবার উঠে দাঁড়ায়। গম্ভীর স্বরে বলে, কথাটা যখন উঠেই পড়ল তখন মন খুলে আমার নিজের কথাটা বলে ফেলি। ওঁর মৃত্যুর হেতু যদি বিষক্রিয়ায় হয়ে থাকে তাহলে আমার একটা দায়িত্ব থেকে যায়। কারণ, ড্রিংসগুলো আমি নিজেই মিশিয়েছিলাম।

ব্রজদুলাল বলেন, বুলশিট! পাগলের মতো কথা বল না, ইন্দ্র। আমরা সবাই দেখেছি বিল নিজে হাতে ট্রে থেকে গ্লাসটা তুলে নিয়েছিল। তুমি তুলে দাওনি। সে হুইস্কি বা রমও নিতে পারত।

ঘোষাল বলেন, যদি বিষপানেই ওঁর মৃত্যু হয়ে থাকে তাহলে আমার ধারণা : এটা আত্মহত্যা! সুইসাইড!

সুজাতা জানতে চায়, কী যুক্তিতে?

—উনি যখন চুমুক দিচ্ছিলেন তখন আমি ওঁর দিকেই তাকিয়েছিলাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে, প্রথম চুমুক দিয়েই ওঁর মুখটা বিকৃত হয়ে উঠেছিল। তা সত্ত্বেও উনি গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখেননি। দ্বিতীয়বার চুমুক দিয়েছিলেন।

ব্রজদুলাল মাথা নেড়ে বললেন, তার অন্য একটা হেতু হতে পারে, ঘোষাল। আমার বন্ধু বিল ছিল খুবই গরিব। তাড়ি, মহুয়া, পচাই হয়তো আগে কখনো খেয়েছে। এখন কিছুই খেত না। হয়তো ও ভদ্‌কা জীবনে কখনো পান করেনি। তাই প্রথম চুমুকে বুঝতে পারেনি—ওর দেহে যেটা হচ্ছে সেটা মাদকতার প্রভাবে নয়, মৃত্যুর সঙ্কেত!

বাসু ইতিমধ্যে পাইপটা ধরিয়েছেন। চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন সকলের কথা। এবার নড়ে-চড়ে বসে বললেন, 'ধপ্ করে তাল পড়লো', না, 'পড়ে ধপ্ করলো' তা জানার একটা বৈজ্ঞানিক রাস্তা কিন্তু এখনো খোলা আছে।

ইন্দ্রকুমার ঝুঁকে পড়ে বললো, পোস্ট-মর্টেম?

—না! মিসেস্ মারিয়া শবরিয়া তাতে রাজি হবেন না। অন্তত খুশি মনে। ওঁরা রোমান ক্যাথলিক। আমি বলছিলাম ঐ গ্লাসটার কথা—

পাশের টেবিলে একটি শূন্য কাচের গ্লাসের দিকে পাইপটা নির্দেশ করলেন উনি।

ব্রজদুলাল বলে ওঠেন, ঠিক কথা! ওতে তো এখনো কিছু তলানি পড়ে আছে দেখা যাচ্ছে। ঘোষাল, তুমি ওটার ফরেনসিক টেস্ট করাও। বিল-এর দেহ তো মৃত্যুকক্ষে রাখা আছে। ইতিমধ্যে ওটা টেস্ট করে পজেটিভ রিপোর্ট পেলে অন্যরকম ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

ডঃ ঘোষাল নিঃশব্দে উঠে গেলেন। হাতে রুমাল জড়িয়ে গ্লাসটা তুলে দেখলেন। বললেন, এনাফ! এক টেব্‌ল্‌স্পুন হবেই। তবে এ-কাজে আমার চেয়ে বাসুসাহেব যোগ্যতর ব্যক্তি। আপনিই এ দায়িত্বটা নিন।

বাসু বললেন, অলরাইট। অশোককে ডাকুন তাহলে।

অশোক অবিলম্বে এসে দাঁড়ালো। বাসু বললেন, রাত সাড়ে দশটা। তা হোক, হস্‌পিটাল এমার্জেন্সি বিভাগে পাবে। একটা স্টেরিলাইজড শিশি যোগাড় করে নিয়ে এস। ইউরিন-টেস্টের জন্য সব 'মেডিকেয়ার স্টোরেই' থাকে। তাতে এই অবশিষ্ট তরল বস্তুটাকে আমাদের সকলের সম্মুখে ঢালতে হবে। তারপর সীল করে আমাকে দিতে হবে। উপরে একটা কাগজ আঠা দিয়ে আটকাতে হবে। তাতে আমাদের ছয়জনের সই থাকবে।

অশোক তৎক্ষণাৎ আবার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। ইন্দ্রকুমার বললে, আপনি কি আশঙ্কা করছেন ওতে বিষ পাওয়া যাবে?

বাসু বললেন, বারবার পরের কথা রিপিট করতে ভালো লাগে না। আয়াম সরি ; আমি জানি না—I don't know! কিন্তু ঐ সঙ্গে আরও একটা কোটেশন না দিলে আমার বক্তব্যটা শেষ হবে না। তুমি মৃত্যুর অভিনয় করতেই শিখেছ! আমি কাউন্সেলার। মৃত্যুর তদন্তেই আমার জীবন কেটেছে! মৃত্যুর ইতিহাস আমি নানান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জেনেছি।

পাঁচ

পরদিন সকাল।

চক্রতীর্থ রোডে পান্থনিবাসের কাছাকাছি এসে বাসুসাহেব রিক্‌শাওয়ালাকে থামতে বললেন। রিক্‌শা থেকে নেমে একটি দোকানের দিকে এগিয়ে গেলেন, যার সামনে বোর্ডে লেখা আছে : আই. এস. ডি., এস. টি. ডি., জেরক্স। দোকানে ঝাড়পোঁছ করছিল একটি ছোকরা।

সে ওড়িয়া ভাষায় বললে, দোকান এখনো খোলেনি। বেলা দশটায় খুলবে। দোকানের মালিকবাবু দশটার সময় আসবেন। আধঘণ্টা পরে।

বাসু হাতঘড়িতে দেখলেন সওয়া-দশটা বাজে।

বাসু জানতে চান, আই. এস. ডি. ?

—আইজ্ঞা ?—সম্মার্জনীহস্ত ছোকরা চাকরটা ঘুরে দাঁড়ালো।

বাসু হাতঘড়িটা দেখিয়ে বললেন, অখন দশটা বাজিকিরি পন্দের মিনিট হই গেলা। আরও আধঘণ্টা পরে পৌনে এগারোটা বাজিবেক! বটে কি না ?

ছোকরা বললে, তো মুই কী করিব ? বাবু কহিল...

—কারেক্ট! য়ু আর হেল্‌পলেস! অ্যাজ আয়াম!

—আইজ্ঞা ?

—টুল-ফুল কিছু আছে ? তাহলে এই বারান্দায় একটা পেতে দাও। বসি। পৌনে এগারোটার সময়েই যে দশটা বাজবে তা তো আর নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না।

ছোকরা নিরুথায় একটা হাতলভাঙা চেয়ার বারান্দায় বার করে দিল। ঝাড়ন দিয়ে মুছেও দিল। বাসু জুত করে বসেই লক্ষ্য করলেন দোকানের সামনে, রাস্তার বাঁ দিকে একটি ফিয়াট গাড়ি থামল। নেমে এল সুভদ্রা : এখানে কী করছেন ?

—শবরীর প্রতীক্ষা। একটা এস. টি. ডি. করব।

—আপনাদের বাড়িতেই তো ফোন আছে!

—তা আছে। কিন্তু এস. টি. ডি-র ব্যবস্থা নেই। তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

—সামনের ঐ 'পুরী ফটোগ্রাফিক স্টোর্সে'। আপনি উঠে আসুন তো। আমাদের বাড়ি চলুন। সেখান থেকে এস. টি. ডি. করবেন।

—না, মা! 'যেথায় চলেছ যাও তুমি ধনি/সময় যখন আসিবে আপনি/যাইব তোমার' ডেরাতে।

—কেন ? আমাদের বাড়ি থেকে এস. টি. ডি. করতে আপত্তি কিসের ?

—একটা ভাউচার চাই। এভিডেন্স। তুমি যাও মা। আমি অপেক্ষা করি।

—ভাউচার চান, না আসলে ফোনটা গোপনে করতে চান ?

—আমি কাকে, কেন ফোন করছি, তুমি জান ?

—জানি না। আন্দাজ করছি। কলকাতায়। জানতে, গ্লাসের তলানিতে বিষের হদিস পাওয়া গেল কি না। তাই নয়?

—ওরে ব্বাবা! তুমি যে মস্ত গোয়েন্দা হয়ে উঠেছ! কি করে আন্দাজ করলে? আমার তো ধারণা ছিল, ব্যাপারটা আমরা গোপনে করছি।

—তাই করছেন। আমাকে যিনি বলেছেন, তিনিও কথাটা গোপন রাখতেই বলেছেন।

—অহেতুক একটা করে দন্তের 'ন' লাগাচ্ছ কেন? ইন্দ্রকে তুমি তো 'তুমি' বলেই কথা বল!

—আপনি কি করে বুঝলেন, ইন্দ্রদা বলেছে?

—'গোয়েন্দা' হিসাবে তোমার মতো আমার নামডাক নেই। কিন্তু তাই বলে 'অন্ধ' হিসাবে বদনামও তো নেই! শোন, আমি এই দোকানেই অপেক্ষা করছি। তুমি ফেরার পথে এখানে একবার দাঁড়িও। আমি ফটোগুলো দেখব। হয়তো দু-একদিনের জন্য নেগেটিভগুলো আমার দরকার হবে।

—কোন্ ফটোর কথা বলছেন আপনি?

—বললাম না, আমি অন্ধ নই? তুমি এক কাজ কর বরং—দোকানদারকে এক কপি কন্ট্যাক্ট প্রিন্ট দিতে বল। যে সিকোয়েন্সে নেগেটিভগুলো আছে তাই বজায় রেখে।

—আপনি আশা করছেন টেলিফোনে পজেটিভ রিপোর্ট পাবেন? হার্টফেল নয়? পয়েজনিং?

—'আশা' নয় সুভদ্রা। 'আশঙ্কা'। না, করছি না। তবু ক্রিমিনাল-লইয়ার হিসাবে এটা আমার প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে: 'যেখানে দেখিবে ছাই/উড়াইয়া দেখ তাই/পাইলে পাইতে পার' গোপন গরল!

—ঠিক আছে, স্যার। আপনি 'গোপন গরল' খুঁজুন। আমি ফেরার পথে খোঁজ করব!

ঠিক তখনই এসে উপস্থিত হলো দোকানদার।

—নমোস্কার, আইজ্ঞা!

বাসু ফোন করলেন ওঁর বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী ফরেনসিক কেমিস্টকে। একবারেই কানেকশন পেলেন। প্রশ্ন করলেন, গুড-মর্নিং ভট্টাচার্যি। আমি পুরী থেকে পি. কে. বাসু বলছি। এখান থেকে অশোক চ্যাটার্জি নামে একজনের হাতে যে স্যাম্পলটা...

কথাটা উনি শেষ করতে পারলেন না। ডক্টর ভট্টাচার্যি বলে ওঠেন, জাস্ট অ্যা মিনিট, স্যার! আমার স্ত্রীর নামটা বলুন?

—কী? তোমার স্ত্রী? ও আই সি! আরে, হ্যাঁ রে জগু, আমি প্রসন্নই বলছি। তোর বউ-এর নাম জয়া, মেয়ের নাম রেখা, নাতির নাম বাবলু। হলো তো?

—হ্যাঁ ভাই, হলো। বুঝতেই তো পারছিস। এটা প্রফেশনাল এথিক্স। তোর হাতের লেখা চিঠি পেয়েছি। ব্যস! কে খুন হলো, কত লাখ টাকার সম্পত্তি, কী কেস, কিছুই জানি না। সিল করা বোতলে পেয়েছিলাম 4.5 ড্রাম তরল পদার্থ, অর্থাৎ প্রায় চারশ ফোঁটা!

—আই নো! তাতে ভদ্‌কা ছিল, লাইম ছিল। আর কি ছিল?

—এইচ-টু-ও!

—জল? কোনোরকম বিষের কিছু ট্রেস পাসনি?

—নিক্স!

—নিক্স? মানে নাথিং?

—আয়াম সরি। তাই। 'ভদ্‌কা' কিনা আদালতে হলপ নিয়ে বলতে পারব না, তবে কোনো 'অ্যালকহল', ভদ্‌কা বা জিন হতে পারে। 'লাইম' নিশ্চিত ছিল। বাকিটা জল।

—আই সি!

—খুব হতাশ হয়ে গেলি মনে হচ্ছে?

—না, নিশ্চিন্ত হলাম। যদিও এটা আমার অ্যাপ্রিহেনশনের বিরুদ্ধে। আমার আশঙ্কা ছিল এটা একটা কেস অব পয়েজনিং। ঠিক আছে! রাখলাম!

টেলিফোনের চার্জ মিটিয়ে বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। মিনিটখানেক একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন সমুদ্রের দিকে। রোদ চড়া হচ্ছে। ছাতা আনতে ভুলেছেন। টুপিও পরেননি। পুরী সমুদ্রতীরে টুপি পরা এক বিড়ম্বনা। সর্বদাই মনে হয় উড়ে যাবে। নজর হলো ফটোগ্রাফিক স্টোর্সের পাশে আকাশী-নীল ফিয়াট গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। বাসু পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে চললেন।

কাউন্টারে দাঁড়িয়ে সুভদ্রা ছবিগুলো দেখছিল। বাসুসাহেবকে দেখতে পেয়ে বললো, টেলিফোনে যোগাযোগ হলো?

—হ্যাঁ, হলো!

—'গোপন গরল' মিলল?

—তোমার কাজ মিটেছে?

—হ্যাঁ! তবে আপনি কি একসেট কন্ট্যাক্ট প্রিন্ট চান—নেগেটিভ যে-সিকোয়েন্সে আছে সেই পর্যায়ক্রমে?

—না, থাক। আর প্রয়োজন হবে না।

—নেগেটিভগুলো নেবেন?

—না, চাই না। চলো তোমাদের বাড়ি যাই।

—আসুন।

ভ্যানিটি ব্যাগে ছবিগুলো ভরে নিয়ে সুভদ্রা বাইরে বেরিয়ে এল। বাসুসাহেবকে বসালো বাঁয়ে। গাড়ি ঘুরিয়ে চক্রতীর্থ রোডে পড়ে বললো, আপনার 'আশা' বা 'আশঙ্কা' যে 'সফল' হয়নি—অর্থাৎ গ্লাসে যে বিষের ট্রেস পাওয়া যায়নি তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কারণ ছবিগুলো আপনি তাকিয়েও দেখলেন না!

বাসুসাহেব কোনো জবাব দিলেন না।

সুভদ্রা আবার বললে, আপনি কি করে ভাবতে পারলেন মেসোমশাই যে, অ্যাবে শবরিয়াকে কেউ বিষপ্রয়োগে হত্যা করতে পারে? ভদ্রলোকের কোনো সম্পত্তি নেই, কোনো শত্রু নেই। রাগের মাথায় হঠাৎ কেউ হয়তো ওঁকে ছুরি মেরে খুন করতে পারে ; কিন্তু রায়কাকুর বাড়িতে পার্টিতে এসে ওঁর পানপাত্রে কে বিষ মেশাতে যাবে? ইট্‌স্ অ্যাবসার্ড!

—ঠিক কথাই। কিন্তু কী জান সুভদ্রা? আমি তো স্বচক্ষে ওঁকে মারা যেতে দেখেছি। খণ্ডমুহূর্তের জন্য আমার মনে হয়েছিল, এটা বিষক্রিয়ার যন্ত্রণা—হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াতেই উনি লুটিয়ে পড়েছিলেন; কিন্তু তার পূর্বে একটা তীব্র বিষের প্রতিক্রিয়া আমি স্পষ্ট লক্ষ্য করেছিলাম!

—এখন তো বুঝছেন সেটা ভ্রান্ত ধারণা?

বাসু জবাব দিলেন না।

সুভদ্রা বললে, কৌশিকদার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে।

—কৌশিকদা! কেন? কৌশিকের কথা উঠছে কোন সূত্রে?

—কৌশিকদার 'কাঁটা-সিরিজ'-এর একটা দুর্দান্ত প্লট এলেবেলে হয়ে গেল। ধরুন, আপনি

যদি পজেটিভ রিপোর্ট পেতেন, তাহলে জয়ন্তের তোলা ফটোগুলো এখন পরপর সাজিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। কৌশিকদা কোনো মাসিক পত্রিকায় গল্পটা ছাপতে দিত। পাঠক-পাঠিকা ভাবতে বসত—এই এগারো জনের মধ্যে কে খুনটা করতে পারে? এগারো জনের ফুলটিম সাস্‌পেক্ট!

—এগারো জন?

—তাই হচ্ছে না হিসেব অনুসারে? আমরা ছিলাম তেরো জন। একজন তো খুন হলেন। মিসেস্ মারিয়া শবরিয়াকেও ছাড় দিতে হয়! বাকি রইলাম আমরা এগারো জন।

—অশোক চ্যাটার্জি বাদ?

—ও! হ্যাঁ! অশোকদার কথা আমার খেয়াল ছিল না। আসুন, মেসোমশাই, আমরা পৌঁছে গেছি।

মিসেস্ গুণবতী মোহান্তি বাইরের বারান্দাতেই একটা ডেকচেয়ারে বসেছিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললেন, আসুন, আসুন, স্যার! আপনার মতো মানুষের পায়ের ধুলো...

বাসু বাধা দিয়ে বললেন, পথে সুভদ্রার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ভাবলাম তোমাদের বাড়িটা ঘুরেই যাই।

—খুব ভালো করেছেন। আসুন।

ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী মোহান্তি বেশ ভালো সম্পত্তিই রেখে গেছেন। প্রকাণ্ড বাড়ি। আসবাবপত্রও খুব দামী। গুণবতী বললেন, ইন্দ্রকুমারের জন্মদিনের পার্টিটা যে এমন করুণভাবে শেষ হবে তা কে ভেবেছিল বলুন?

বাসু জানতে চান, মিসেস্ মারিয়া শবরিয়া কোন ঘরে আছেন?

গুণবতী জানালেন, গুনপুর থেকে ওঁর স্বজনেরা এসে তাঁকে স্বগ্রামে নিয়ে গেছে।

সুভদ্রা জানতে চায়, বলুন মেসোমশাই, কী বানাবো? কফি না চা?

বাসু বললেন, দুটোর একটাও নয়। তুমি মা, আমার জন্যে বরং এক গ্লাস লেবুর সরবত বানিয়ে নিয়ে এস।

—শুধু সরবত?

—এবারের মতো।

সুভদ্রা সরবত বানাতে ভিতরে চলে গেল। বাসু বলেন, ভারি মিষ্টি স্বভাবের মেয়েটি তোমার।

—বাইরে থেকে আপনাদের তাই মনে হয়। আসলে বাপের আদরে সুভোর মাথাটি খাওয়া হয়ে গেছে।

—একথা কেন বলছ? বি. এ. পাস করেছে। শুনেছি, ভালো কুচিপুড়ি নাচ জানে। ড্রাইভিং-এর হাত যে ভালো তা তো স্বচক্ষে এখনি দেখলাম! সুপাত্রে বিয়ে না হবার, জীবনে সুখী না হবার কোনো কারণ তো দেখছি না।

—সুপাত্রের দিকে ওর নজরই নেই। বন্ধুগুলি তো সব বাঁদর। চাল নেই, চুলো নেই—ওর সঙ্গে ছোঁক-ছোঁক করে ঘোরে, শুধু ওর বাপের সম্পত্তির দিকে নজর।

বাসু জানতে চান, জয়ন্ত ছেলেটিকে তোমার কেমন লাগে?

—কী আছে বলুন তার? কোন এক অ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানিতে কাজ করে। কী পায়, মাইনে পায়, না কমিশন, তাও জানি না। নিজের বাড়িঘর নেই, গাড়ি নেই। চাল নেই, চুলো নেই।

—কিন্তু ওর রূপ আছে, যৌবন আছে, সুস্বাস্থ্য আছে। উচ্চাশা আছে। গাড়ি-বাড়ি তো সুভদ্রারই থাকবে।

কথাটা পছন্দ হলো না গুণবতীর। জবাব দিলেন না।

বাসু আন্দাজে একটা টোপ ফেললেন, ইন্দ্রকুমারকে তোমার কেমন লাগে?

—ইন্দ্রকুমার? সে তো সুভোর ডবল বয়সী। সুভোর ছাব্বিশ, ওর ছাপ্পান্ন! আপনারা তেতাল্লিশ বলে চালালেই হলো?

—না, অত হবে না। যা হোক, তোমাদের সমাজে কি ভালো ছেলে পাচ্ছ না?

—পাব না কেন? সুভদ্রার বাবার এক বন্ধু পুরীর নামকরা পাণ্ডা। একটি মাত্র পুত্র তার, বলভদ্র রথ। অগাধ সম্পত্তির মালিক। এগারোটি উনান আছে, তার, বুঝলেন? এক-একটা উনানে যদি দৈনিক হাজার টাকার ভোগ বিক্রি হয় তবে কত হলো? দৈনিক এগারো হাজার। মাসে খরচ-খরচা বাদে তিন লাখ! বুঝেছেন? মাসে তিন লাখ! নেট! ইনকাম ট্যাক্স নেই, সেল্ ট্যাক্স নেই! বছরে নেট ছত্রিশ-লক্ষ তঙ্কা! তিন বৎসরেই কোটিপতি!

বাসু উনানের হিসাবটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। এটুকু বুঝলেন মিসেস্ মোহান্তি হিসেবে খুব দড়। তবে এ বিষয়ে আর কোনো কথা হলো না। সুভদ্রা ফিরে এল ঘরে, সরবতের গ্লাসটা নিয়ে। উৎসব রজনীর রঙিন আলোকচিত্রের বান্ডিলটা বার করে মায়ের হাতে দিল। অগত্যা বাসুকেও দেখতে হলো। উনি বিশেষ করে লক্ষ্য করলেন সেই ছবিটি যখন অ্যাবে শবরিয়া গ্লাসটার দিকে হাত বাড়াচ্ছেন। না, কেউ বিশেষ কোনো একটা গ্লাস 'ফোর্সিং-কার্ড ম্যাজিকে'র মতো ওঁর হাতে গছিয়ে দেয়নি।

একটু পরে রোদ বেড়ে উঠছে বলে উঠে পড়েন বাসু। সুভদ্রা বলে, আসুন মেসোমশাই, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে গাড়ি গ্যারেজ করি।

অগত্যা তাই।

বাড়ির দোরগোড়ায় নামিয়ে গিয়ে বিদায় নিল সুভদ্রা। বললো, সুজাতাদিকে বলবেন, আজ বেলা হয়ে গেছে। আর একদিন আসব। মাসিমাকেও প্রণাম দেবেন।

বাসু ঘরে ঢুকতেই রানী জিজ্ঞাসা করলেন, কী? আমার কথাই ফলল তো? গ্লাসে কিছু ছিল না নিশ্চয়—

বাসু শার্টটা খুলতে খুলতে বললেন, কী করে জানলেন, মিসেস্ শার্লক হোমস্?

—এলিমেন্টারি, মাই ডিয়ারেস্ট ওয়াটসন। গ্লাসে কিছু পাওয়া গেলে তোমার ফিরতে অনেক দেরি হতো। প্রথমে ইন্দ্রকুমার, ব্রজবাবু। তারপর পুলিস, ভাইকারেজ—নানান ঝক্কিঝামেলা সারতে হতো তোমাকে। তাছাড়া শার্টের পকেট থেকে একটা এস. টি. ডি. বুথের টিকিট তুমি ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে ফেলে দিলে। এভিডেন্সটার কোনো দাম নেই।—অর্থাৎ ফোনটা তোমার করা হয়েছে। রেজাল্ট নেগেটিভ। তুমি স্বীকার কর আর নাই কর। শোন, এদিকে সকাল থেকে ছায়া পালিত তোমাকে তিনবার ফোন করেছে। তুমি বেরিয়ে যাবার পরেই একবার। ঘণ্টাখানেক বাদে একবার ; এই তো আধঘণ্টা আগে একবার।

—কী বক্তব্য তার?

—আমাকে বলেনি। সে শুধু জানতে চেয়েছে তুমি আছ কিনা।

—ওরা স্বামী-স্ত্রী তো ব্রজদুলালের গেস্ট? একটা ফোন কর। দেখি ছায়া কী বলতে চায়।

রানী ডায়াল করলেন। ও-প্রান্তে বোধহয় কোনো ভৃত্যশ্রেণীর কেউ ধরল ফোনটা। রানী ছায়া পালিতকে চাইলেন। মিনিট তিনেক পরেই ছায়ার কণ্ঠস্বর শোনা গেল : হ্যালো?

—মিস্টার পি. কে. বাসু ফিরেছেন। নাও কথা বল।

বাসু স্ত্রীর হাত থেকে ফোনটা নিয়ে বললেন, বল ছায়া?

—আমরা আজ কলকাতা ফিরে যাচ্ছি ; শ্রীজগন্নাথ এক্সপ্রেসে। সুজাতাকে আমার কার্ড দিয়েছি। আমার দোকানের ঠিকানাও। একদিন যদি সময় করে আসেন খুব খুশি হব।

—তা তো হবে ; কিন্তু এই কথাটা জানাবার জন্য নিশ্চয় তুমি সকাল থেকে তিন-তিনবার ফোন করনি। আসল কথাটা কী?

—আসল কথাটা তো বলব না, মেসোমশাই। শুনব!

—তাই নাকি? কী বিষয়ে?

—গ্লাসের তলানিতে কী পাওয়া গেল সেই বিষয়ে!

বাসু একটু চমকে উঠলেন। ক্যাপ্টেন পালিত আর ছায়া যখন চলে যায় তখনো মদের গ্লাসের প্রসঙ্গই ওঠেনি। পণ্ডা ডেথ-সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন। ভাইকারেজ থেকে মৃতদেহ বহনের গাড়িটাও তখনো এসে পৌঁছয়নি। তার আগেই ক্যাপ্টেন পালিত রীতিমতো বে-এক্তিয়ার হয়ে গিয়েছিল। সে বোধহয় সে-রাত্রে জানতেই পারেনি যে, পার্টিতে একটা লোক মারা গেছে। ছায়া পালিত প্রথম সুযোগেই স্বামীকে সরিয়ে নিয়ে উপরের ঘরে উঠে যায়। তাহলে সে কেমন করে জানল এই গূঢ় সংবাদ?

বাসু বললেন, তুমি কেমন করে জানলে?

—সেটা কি টেলিফোনে বলা ঠিক হবে, স্যার?

—তা যদি না হয় তাহলে তোমার প্রশ্নের জবাবটাও কি আমার পক্ষে টেলিফোনে বলা ঠিক হবে, ছায়া?

—তা বটে! খুব কি বেলা হয়ে গেছে? আমি একবার আসতে পারি? জাস্ট আধঘণ্টার জন্য? কারণ আজই আমরা ফিরে যাচ্ছি তো। আমি যেটুকু জানতে পেরেছি তা আপনাকে জানিয়ে যাওয়া আমার কর্তব্য এবং আমি যেটা জানতে চাইছি—আপনার আপত্তি না থাকলে—সেটা জেনে যেতে চাই। আসব?

—এস! এমন কিছু বেলা হয়নি। এখন সাড়ে বারোটা।

—তাহলে খবরটা গোপন রাখবেন—আই মিন আমার আসার কথাটা। অবশ্য আপনার বাড়ির চারজন তো জানবেই।

—বাড়িতে আমার পাঁচজন।

—তাই নাকি? পঞ্চম ব্যক্তিটি কে?

—আমাদের কম্বাইন্ড হ্যান্ড, বিশ্বনাথ। বিশে। এস তুমি। আমরা অপেক্ষা করছি।

ফোনটা ক্রাড্‌লে নামিয়ে রাখলেন। রানী বললেন, আবার নতুন করে কী রহস্য ঘনিয়ে তুলছ তোমরা?

—আমরা?

—হ্যাঁ! তুমি আর ছায়া পালিত!

—নতুন রহস্য কেন হবে? তুমি তো এখনো জানই না গ্লাসের তলানিতে কী-কী পাওয়া গেছে। নিজের আন্দাজমতো কল্পনা করে ভুল ধারণা নিয়ে খুশি হয়ে বসে আছ!

—ভুল ধারণা! তাহলে ফরেনসিক রিপোর্ট পজেটিভ? ঐ তলানিতে কিছু পাওয়া গেছে?

—অফ কোর্স! মিসেস্ হোমস্। পাওয়া গেছে! যার খবর ডক্টর ওয়াটসন জানে, মিসেস্ হোমস্ এখনো জানেন না।

—কী? কী ছিল তলানিতে?

—ট্রেসেস্ অব অ্যালকহল, লাইম কর্ডিয়াল আর...

—আর?

—তুমি বিশ্বাসই করতে পারবে না : এইচ-টু-ও!—জল।

—মানে?

—'মানে'টা বোঝা ভা—রি শক্ত!

ছয়

বাসু বললেন, এঁর সঙ্গে তোমার আলাপ নেই...

বাধা দিয়ে ছায়া পালিত বললে, না আছে, মেসোমশাই। আজকেই তিন-তিনবার টেলিফোনে কথা বলেছি মাসিমার সঙ্গে। তাছাড়া কৌশিকবাবুর কাঁটা সিরিজের কল্যাণে মিসেস্ রানু বাসু একজন পরিচিত মহিলা—অন্তত গোয়েন্দা গল্পের পাঠক-পাঠিকার কাছে।

—তাহলে তো তুমি জানই যে, উনি আমার একান্ত সচিব। আমাকে যা বলতে পার, তা ওঁর সামনে বলায় কোনো অসুবিধা নেই।

মিসেস্ পালিত জানতে চায়, কৌশিকবাবু আর সুজাতা...

—তারা আজ টুরিস্ট বাসে কোনারক দেখতে গেছে। ফিরতে সন্ধে...তুমি বরং শুরু কর—কী যেন বলতে এসেছ?

ছায়া বললে, আমি জানি, আপনি খুব 'মেথডিক্যাল'। তাই প্রথমেই বলি : আমি দুটি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে এসেছি। একটা হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা। সেটা বর্ণনা করে আপনার কাছে কিছু লিগ্যাল-অ্যাডভাইস্ নেব। দ্বিতীয়টা অ্যাবে শবরিয়ার মৃত্যু সংক্রান্ত। আমরা প্রথমে কোন প্রসঙ্গটা আলোচনা করব?

—দ্বিতীয়টা। তুমি প্রথমেই ব্যাখ্যা করে বোঝাও—টেলিফোনে তখন কেন জানতে চেয়েছিলে 'গ্লাসের তলানিতে কিছু পাওয়া গেল?' গ্লাসের তলানি নিয়ে যে একটা পরীক্ষা করা হচ্ছে এ-কথা তোমাকে কে বলেছে?

—কেউ বলেনি, মেসোমশাই। এটা আমার অনুমান। মানে 'ডিডাকশন'! আপনি সম্ভবত সকালবেলা কলকাতায় একজন ফরেনসিক এক্সপার্টকে টেলিফোন করে এ বিষয়ে জানতে চেয়েছেন। তিনি কী উত্তর দিয়েছেন তা জানি না।

—সেটাই বা কী করে জানলে?

—তাহলে প্রথম থেকে বলি। মেথডিক্যালি! অ্যাবে শবরিয়া ভদ্‌কা পান করে মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ার সময়ে আপনার মনে যে প্রশ্নটি জেগেছিল, আমার মনেও ঠিক একই কারণে, একই প্রশ্ন জেগেছিল।

—প্রশ্নটা কী? আর 'একই কারণে' বলতে?

—প্রশ্নটা তো 'মৃত্যুর কারণ'—হার্ট-অ্যাটাক, না বিষপ্রয়োগ? প্রশ্নটা মনে উদয় হয়েছিল একাধিক হেতুতে। প্রথম কথা, অ্যাবে শবরিয়ার গলায় ঐ অদ্ভুত শব্দটা হতেই আমরা সবাই তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল উনি যেটা পান করেছেন তার জন্যই ওঁর কষ্ট হচ্ছে। হার্ট-অ্যাটাক হলে রোগী অনিবার্যভাবে, প্রতিবর্তী প্রেরণায়, ডানহাতে তার বুকের বাঁ দিকটা চেপে ধরে—কারণ যন্ত্রণাটা হয় তার হৃদপিণ্ডে। অ্যাবে শবরিয়া তা করেননি। তিনি তাঁর গলায় হাত দিয়েছিলেন—অর্থাৎ কণ্ঠনালীটা তাঁর জ্বলে যাচ্ছিল।

বাসু বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, ওয়ান্ডারফুল! এদিকটা কিন্তু আমিও ভেবে দেখিনি। তারপর?

তৎক্ষণাৎ আমার মনে হলো : বিষক্রিয়ায় যদি মৃত্যু হয়ে থাকে তাহলে ওঁর গ্লাসটা একটা মারাত্মক এভিডেন্স! ততক্ষণে সবাই ওঁকে ঘিরে ধরেছে। আমি ওঁকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। একটু পরে—দশ থেকে পনের সেকেন্ড পরে—ডক্টর ঘোষাল সবাইকে সরিয়ে অ্যাবে শবরিয়ার দেহটার দায়িত্ব নিলেন। ভিড়টা ফাঁকা করে দিলেন। তখনই আমার নজরে পড়ল, অ্যাবে শবরিয়ার গ্লাসটা টেবিলে রাখা আছে। ঐ টেবিলে তখন একটাই কাচের গ্লাস ছিল। ফলে চিনতে কোন অসুবিধা হলো না। আমি নজর করে দেখলাম, গ্লাসের তলায় আধ-চামচ মতো তলানি আছে। অ্যাবাউট এ টেবিলস্পুনফুল।

—কনগ্র্যাচুলেসন্স, ছায়া, ফর য়োর স্প্লেনডিড অবজার্ভেশন। তোমাকে বলি, গ্লাসে 4.5 ড্রাম তরল পদার্থ ছিল—অর্থাৎ বড় চামচের এক চামচ। বলে যাও!

—আমি আপনার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। আমার মনে হলো, বিষপ্রয়োগের সম্ভাবনার কথাটা আপনিও নিশ্চয় ভাবছেন। তারপর ডক্টর পণ্ডা এলেন। তিনি যখন অ্যাবে শবরিয়ার দেহটা পরীক্ষা করছেন তখন লক্ষ্য করে দেখলাম, আপনি উঠে গিয়ে হেড-ওয়েটারকে কী যেন বললেন।

—কারেক্ট। কী বলেছিলাম আমি?

—তা হলপ নিয়ে আদালতে দাঁড়িয়ে বলতে পারব না ; কিন্তু যুক্তিপরম্পরায় অনায়াসে ডিডিয়ুস করা যায়। কারণ আপনার কথা শুনে হেড-বেয়ারা সম্মতিসূচক গ্রীবা সঞ্চালন করলো। আমি আরও লক্ষ্য করে দেখলাম—বেয়ারা তিনটি টেবিল থেকে ভুক্তাবশিষ্ট প্লেট ও গ্লাস উঠিয়ে নিয়ে গেল; কিন্তু যে টেবিলে আপনি, মিস্টার রায় আর অ্যাবে শবরিয়া বসেছিলেন সেই টেবিলটা সাফা করলো না। আমার বুঝতে অসুবিধা হলো না—ঐ বিশেষ গ্লাসটার প্রতি শুধু আমার নয়, আপনারও নজর আছে। ইতিমধ্যে আমার স্বামী একেবারে বে-এক্তিয়ার হয়ে পড়েছিলেন। তাই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে একজন বেয়ারার সাহায্যে তাঁকে নিয়ে দ্বিতলে উঠে গেলাম। আমি নিশ্চিত জানতাম যে, আপনি ঐ গ্লাসের তলানি সম্বন্ধে যথাকর্তব্য করবেন। পরদিন সকালে আমার কর্তার ঘুম ভাঙলো দশটার পর, কিন্তু সকালেই আমি খবর পেলাম মিস্টার অশোক চ্যাটার্জি কলকাতা চলে গেছেন—কী একটা জরুরি কাজে! পরের দিনটা আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি—নানা কারণে। সকলেই নানা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আজ সকালে আপনাকে ফোন করেছিলাম। মাসিমা বললেন আপনি বেরিয়েছেন। বেলা দশটা নাগাদ আমি নিজেও বেরিয়ে পড়লাম। চক্রতীর্থ রোডে হঠাৎ নজর হলো, আপনি একটি এস. টি. ডি. বুথের সামনে একা বসে আছেন। আমি সেদিকে অগ্রসর হবার আগেই একটি ফিয়াট গাড়ি এসে দাঁড়াল। আমি সামনের একটা চায়ের দোকানে বসে সবকিছু নজর করতে থাকি। আপনি বেরিয়ে যাবার পর আমি ঐ দোকানে যাই। দোকানদারকে বলি, 'বাবা একটু আগে ফোন করে চলে যাবার সময় পেমেন্টের টিকিটটা নিয়ে গেছেন, না এখানেই ফেলে রেখে গেছেন মনে করতে পারছেন না। কাইন্ডলি একটু খুঁজে দেখবেন?' লোকটা বললো, 'খুঁজে দেখার কিছু নেই। আমার স্পষ্ট মনে আছে প্যান্টের বাঁ-পকেটে সেটা নিয়েছিলেন উনি।' আমি বললাম, 'সেটা তাহলে পড়ে গেছে রাস্তায়। যে নম্বরে ফোন করেছিলেন সে নম্বরটাও ওঁর মনে পড়ছে না। কাইন্ডলি একটু দেখে বলবেন?' লোকটা দশ সেকেন্ড আমার দিকে নির্বাক তাকিয়ে থাকল। তারপর বললো, 'আপনার বাবাকে দোকানে আসতে বলবেন। আপনাকে আমি তা জানাতে পারি না।' আমি বললাম, 'কেন? বাবাই তো

আমাকে পাঠালেন!' লোকটা বললো, 'সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই, ম্যাডাম, কিন্তু এটার নিয়ম নেই।'

বাসু দম্পতি হেসে ওঠেন। মিসেস্ বাসু বলেন, তুমি খুবই চালাক। লোকটা কিন্তু তোমার উপর টেক্কা দিয়েছে।

বাসু বলেন, তা নাও হতে পারে। এটা হয়তো ওর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। তাই মিন প্রফেশনাল এথিক্সটা। সে যাই হোক, তাহলে তুমি কী করে জানলে কলকাতায় আমি কাকে ফোন করেছিলাম?

—আজ্ঞে না। সেটা জানি না। ডিডিয়ুস করেছি। আন্দাজ করছি। এক নম্বর : পরদিন ভোরেই অশোকবাবুর কলকাতা যাওয়ায়। দু নম্বর : পরদিনই আপনি কলকাতায় এস. টি ডি. করায়।

বাসু এতক্ষণে স্বীকার করলেন, হ্যাঁ, ছায়া ; তুমি ঠিকই ডিডিয়ুস করেছ। আমরা ঐ গ্লাসের তলানিটা কলকাতায় পাঠিয়ে ছিলাম ফরেনসিক টেস্ট করাতে। রেজাল্ট ইজ নেগেটিভ। বিষের কোনো ট্রেসই পাওয়া যায়নি।

ছায়া স্পষ্টতই হতাশ হলো।

বাসু বললেন, এবার কি আমরা প্রথম প্রসঙ্গটায় আসব? তোমার ব্যক্তিগত সমস্যাটায়?

—না, মেসোমশাই। আমার মনে হয়, যেটা আমি বলতে এসেছিলাম তা পুরোপুরি বলেই ফেলি—ঐ অ্যাবে শবরিয়ার মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনাটাকে ঘিরে। যদিও বিষের ট্রেস না পাওয়া যাওয়ায় এসব কথা বাহুল্য আলোচনা। তা হোক, আপনি যখন তদন্ত করছেন, তখন সব কিছুই আপনার জানা থাকা দরকার। কাজে লাগুক বা না লাগুক।

—বল তাহলে?

ছায়া জানালো আর একটি ঘটনার কথা। পার্টির আগের রাত্রের ঘটনা। ওরা দ্বিতলে পর পর পাঁচখানি ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করেছিল। প্রথমটায় ব্রজদুলাল একা, দ্বিতীয়ে ডাক্তার ঘোষাল, তিন নম্বরে ইন্দ্রকুমারও একা, চতুর্থে ক্যাপ্টেন ও মিসেস পালিত, পঞ্চমে অ্যাবে এবং মিসেস্ শবরিয়া। অনুরাধা ছিল ত্রিতলে। প্রতিটি ঘরেই আছে অ্যাটাচড বাথ। সে রাত্রেও, অর্থাৎ শুক্রবার রাত্রেও ক্যাপ্টেন পালিত মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করে এবং মধ্যরাত্রে ঘরে বমি করে ফেলে। ঘরে কার্পেট নেই ; কিন্তু ময়লাটা তো সাফা করতে হবে? ছায়া দেখল, বাথরুমে কোনো ঝাঁটা নেই। ওর মনে পড়ল তিনতলায় ওঠার বাঁকের মুখে একটি ল্যাট্রিন আছে—সাধারণ ব্যবহারের জন্য। ও দেখতে চাইল সেখানে কোনো ব্রাশ বা ঝাঁটা পাওয়া যায় কি না। তাহলে চুপিসাড়ে রাতারাতি ঘরটা সাফা করে দিতে পারবে। রাত তখন সাড়ে বারোটা। নিঃশব্দে দরজা খুলে ও করিডোরে বার হয়ে আসে। দু-পা চলতে গিয়েই নজরে পড়ে সামনে বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে দুজন কথা বলছেন। আরও নজরে পড়ে পাশের ল্যাট্রিনটা বন্ধ, আলো জ্বলছে। ঐ ল্যাট্রিনের দরজায় একটা ছোট্ট কাচের নির্দেশক। ভিতরে কেউ থাকলে, আলো জ্বললে, সেখানে লেখা ফুটে ওঠে : এনগেজ্‌ড।

ছায়া পিলাস্টারের আড়ালে অন্ধকারে অপেক্ষা করলো। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মধ্যরাত্রে আলাপরত ব্যক্তিদ্বয়ের দু-একটা ছুটকো কথা ও শুনতে পেল। চোখে না দেখলেও কণ্ঠস্বরে বুঝতে পারে, ডক্টর ঘোষাল আর ইন্দ্রকুমার। ও একটু অবাক হলো। এঁরা দুজনেই একক শয্যাবিশিষ্ট ঘরে আছেন। তাহলে বারান্দায় বার হয়ে এসে কথা বলছেন কেন? হঠাৎ একটা কথায় চমকে উঠল ছায়া। ইন্দ্রকুমার বলছে, 'আমাকে আর নীতিকথা শোনাতে আসিস না রে, শিবু। তোর বৃন্দাবনলীলার কথা কি আমি জানি না মনে করিস?'

ছায়া সবচেয়ে বেশি অবাক হলো ভাষাটায়। ইন্দ্রকুমার সর্বসমক্ষে ডক্টর ঘোষালকে 'ঘোষালদা' বা 'শিবুদা' বলে কথা বলে। 'তুই-তোকারি' করে না।

বাসু বললেন, আমি শুনেছি ওরা বাল্যবন্ধু। একই গ্রামের ছেলে। সহপাঠী। হয়তো আড়ালে দু-জনেই তুই তোকারি করে। সভ্যসমাজে করে না—ইন্দ্রকুমারের ঐ নায়কোচিত বয়সটার খাতিরে। যা হোক, তারপর কী হলো?

ছায়া বললে, ডক্টর ঘোষাল চাপা গলায় ধমক দিলেন। সম্ভবত বলেছিলেন 'ডোন্ট বি ভালগার ইন্দ্র' বা ঐ জাতীয় কিছু। যাহোক ঠিক সেই সময়েই ওদিককার ল্যাট্রিনের দরজাটা খুলে যায়, আর অ্যাবে শবরিয়া বার হয়ে আসেন। তিনি ওদের দুজনকে ওখানে দেখে যেন আঁৎকে ওঠেন! কিন্তু কিছু বলার আগেই ইন্দ্রকুমার তাঁকে ধমক দেয়, 'একি! আপনি এখানে কী করছেন?' অ্যাবে শবরিয়া বলেন, 'কী বলছেন মশাই? দেখতেই তো পেলেন, আমি ল্যাট্রিনে গেছিলাম।' ইন্দ্র আবার ধমক দেয়, 'কেন? আপনার ঘরেই তো অ্যাটাচ্ড বাথ ডাবলু সি আছে! তাহলে?' অ্যাবে ইংরেজিতে বলেন, 'আপনি কি আমার কৈফিয়ৎ চাইছেন? কেন আমি ঐ টয়লেট গেছি?'

ইন্দ্র চাপা গর্জন করে ওঠে, 'নো স্যার! আমি জানতে চাই কেন আপনি আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনছিলেন!' অ্যাবে শবরিয়া একথার জবার দেন না। ডাক্তার ঘোষালের দিকে ফিরে বলেন, 'ওয়েল ডক্টর! আপনারা যদি মধ্যরাত্রে কোনো কিছু গোপন বিষয়ে আলোচনা করতে চান তো এই পাবলিক প্লেসে কেন? দু-দুটো ফাঁকা ঘর তো আপনাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে।' ডক্টর ঘোষাল বোধহয় বন্ধুর হয়ে মাপ চাইতে এগিয়ে গেলেন। ছায়া নিঃশব্দে নিজের ঘরে ঢুকে যায়। মিনিট পনের পরে উঁকি মেরে দেখে করিডোর নির্জন। তখন সে দ্বিতীয়বার যায় সম্মার্জনী সন্ধানে।

বাসু বললেন, ঠিক আছে, ছায়া। তোমার মনে হয়েছে, তুমি যেটুকু জেনেছ তা আমাকে জানানো তোমার কর্তব্য। তুমি তা জানিয়েছ। গ্লাসের তলানিতে যদি বিষের হদিস পাওয়া যেত, তাহলে হয়তো তোমার ঐ কথাগুলোকে অন্যমাত্রায় বিচার করার প্রয়োজন হতো। আপাতত ঘটনাটা নিরর্থক। এবার তাহলে তোমার দ্বিতীয় প্রসঙ্গে আসা যায়। কী তোমার সমস্যা, যার জন্য তুমি আমার পরামর্শ চাইছ?

ছায়া একটু ইতস্তত করে বললো, কিছু মনে করবেন না, মেসোমশাই। প্রথমেই আমি জেনে নিতে চাই—এই লিগ্যাল অ্যাডভাইস নিতে আমার কী পরিমাণ খরচ হবে!

বাসু হাসলেন। বললেন, আমি এখানে বেড়াতে এসেছি, ছায়া। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার—আমার পরামর্শ নিতে তোমাকে কোনো খরচ করতে হবে না। তুমি কি তোমাদের 'ডিভোর্স' সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাইছ? সেক্ষেত্রে প্রথমেই বলে রাখি, এসব কেস আমি সচরাচর করি না। তবে তোমার সঙ্গে ভালো আইনজ্ঞ ব্যক্তির যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারব। অথবা কেসটা জটিল মনে করলে হয়তো নিজেই কেসটা নিতে পারি। ইন্‌সিডেন্টাল খরচটুকুই লাগবে তোমার। মেসোমশাইকে ফিজ দিতে হবে না।

ছায়া বললে, আমি মুখ খোলার আগেই তো আপনি বুল্‌স্-আই হিট্ করে বসে আছেন। আজ্ঞে হাঁা, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমি 'নটরঙ্গে' ড্রেস-ডিজাইন করে এবং বুটিকের দোকান থেকে যা রোজগার করি তাতে আমার স্বচ্ছন্দে চলে যাবার কথা। যায়ও। আমি ভাড়া বাড়িতে থাকি। সেল্‌ফ-ড্রিভন গাড়ি চালাই। আমাদের কোনো সন্তানাদি নেই। কিন্তু জগৎ এত বেশি মদ খায় যে, মাসের শেষে টানাটানি পড়ে যায়। সোশ্যালি আমি কারও

সঙ্গে মিশতে পারি না। বন্ধুবান্ধবকে সন্ধেবেলা নিমন্ত্রণ করতে পারি না। ওকে একলা রেখে সন্ধের পর কোথাও বের হতেও ভয় হয়!

বাসু জানতে চান, ক্যাপ্টেন পালিত কি কখনো ভায়োলেন্ট হয়ে ওঠে? হাত চালায়!

—নো, নেভার! ও মদ খায় ফ্রাস্ট্রেশন থেকে। সেজন্য ওকে আমি করুণা করি। সেজন্যই বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা এতদিন ভাবিনি। ওকে...ইয়েস, আমি ভালোবাসি,...যদিও সে ভালোবাসার উৎসমূলে নিছক করুণাই! কিন্তু ও এখন সংশোধনের বাইরে। অনিবার্যভাবে চলেছে 'লিভার সিরোসিসের' দিকে। আমি কী করব? আমি কী করতে পারি? ও কারও কথা শুনবে না। মদ্যপানের পরিমাণ কমাবে না। এভাবে যদি আরও দশ-পনের বছর বেঁচে থাকে তাহলে আমি তো নিঃশেষ...

হঠাৎ মুখে আঁচল চাপা দিল ছায়া।

বাসু ওকে কিছুটা সামলে নেবার সময় দিতে পকেট থেকে পাইপ-পাউচ বার করলেন। বাইরের বারান্দায় উঠে গেলেন। মিনিট-পাঁচেক পরে পাইপ টানতে টানতে ফিরে এসে বসলেন তাঁর সোফাটায়। বললেন, একটা কথা আগে বল ছায়া, তোমাদের কোনো সন্তানাদি হয়নি কেন? অনিচ্ছাটা কার? তোমার না ক্যাপ্টেনের?

—দুজনের একজনেরও নয়!

—আই সি। তা শারীরিক গণ্ডগোলটা কার?

—আমার নয়।

—ক্যাপ্টেন কি ডাক্তার দেখিয়েছে?

জবাব দিতে একটু দেরি হলো ছায়ার। কীভাবে এ প্রশ্নের জবাব দেবে যেন বুঝে উঠতে পারছে না। বাসু বললেন, ডাক্তার আর উকিলের কাছে কিছু গোপন করতে নেই, ছায়া। তুমি কি বলতে চাও ও চিকিৎসার বাইরে?

গ্রীবা সঞ্চালনে ছায়া স্বীকার করলো।

বাসু একবার রানু আর একবার ছায়ার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। কী একটা কথা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। রানু স্বামীর দিকে ফিরে বললেন, তোমার অনুমতি পেলে আমি ওকে একটা প্রশ্ন করতাম—

—অফ কোর্স! বাই অল মিন্‌স্! আস্ক হার! আমরা একটা সত্য খুঁজে বেড়াচ্ছি। বাস্তব অবস্থাটা।

রানু বললেন, ছায়া, তুমি আমাকে এই কথাটার জবাব দাও শুধু—ক্যাপ্টেন পালিত কি শুধু পিতা হবার জন্যেই অনুপযুক্ত, নাকি স্বামী হবার পক্ষেও?

ছায়া রানুর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল। বললো, আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন মাসিমা। আমি ওকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম—অনাথ আশ্রম থেকে একটি শিশু নিয়ে এসে তাকে দত্তক নিই! জগৎ তাতে রাজি হয়নি।

বাসু ঝুঁকে পড়ে জানতে চাইলেন, কেন?

ছায়া শ্রাগ করলো।

রানু প্রশ্ন করেন, কিন্তু বিয়ের আগে কি ও বুঝতে পারেনি যে, ও স্বামী হবার অনুপযুক্ত? একটি পূর্ণযৌবনা রমণীকে ও তৃপ্তি দিতে পারবে না?

ছায়া ঝুঁকে পড়ে রানুর হাতটা তুলে নিয়ে নিম্নস্বরে বললো, আপনারা যাই বলুন, সেই জন্যেই ওকে অত ভালোবেসে ফেলেছি, মাসিমা। ও যখন আমাকে বিয়ে করতে আসে তখন

ওর বয়স সাতাশ। এতটা বয়সেও ওর প্রাকবিবাহ জীবনে কোনো যৌন-অভিজ্ঞতা হয়নি। লোকটা এতই অবিশ্বাস্য রকমের সরল!

বাসু বলেন, দ্যাটস্ ইম্‌পসিবল্! সাতাশ বছরের একজন শিক্ষিত ছেলে 'বিয়ে' শব্দটার জীববিজ্ঞানসম্মত অর্থ জানে না?

—তা তো বলিনি আমি! ও ছিল হান্ড্রেড পার্সেন্ট সৎ! প্রাকবিবাহ জীবনে ওর কোনো যৌন-অভিজ্ঞতা ঘটেনি। এটাই বলেছি। আই নো—এটা বাস্তবে অবিশ্বাস্য—তবু এটাই ঘটনা। আমাকে বিয়ে করার পর সে ঐ নিদারুণ সত্যটা বুঝতে পারে ; স্বামী হিসাবে ও নিঃস্ব। শুধু সন্তান নয়, স্ত্রীর জৈবিক মর্যাদাটুকুও ও মিটিয়ে দিতে পারবে না। কী নিদারুণ ট্র্যাজেডি বুঝে দেখুন, মাসিমা! ওই নিষ্ঠুর বাস্তব সত্যটা সে প্রণিধান করলো সাতাশ বছর বয়সে—বিবাহ করার পর! সে কতখানি অবিশ্বাস্য রকমের সৎ যৌনজীবন যাপন করেছে প্রাকবিবাহ জীবনে, ভেবে আমি ওকে করুণা করতে শুরু করি। চিকিৎসা করাই—কিছু হয় না। আমি ওকে প্রস্তাব দিই : এস, মনে করা যাক আমরা সন্ন্যাস নিয়েছি। আমরা একটি অনাথকে দত্তক নিই। আগেই বলেছি, ও রাজি হয়নি। মদের মাত্রা বাড়িয়ে গেছে। চাকরি খুইয়েছে। আমি ওকে সান্ত্বনা দিই—ও শান্ত হতে পারে না। দত্তক ও নেবে না। মদ্যপানের মাত্রা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। বাস্তবে ও আত্মহত্যা করছে। বিষপানের বদলে মদ্যপানে। লোকটা শিশুর মতো সরল।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় ছায়া পালিত। একটু উত্তেজিত হয়ে চাপা গলায় বলে, আয়াম সরি। আয়াম এক্সট্রিমলি সরি, মেসোমশাই! প্লিজ এক্সকিউজ মি ফর ওয়েস্টিং য়োর ভ্যালুয়েবল্ টাইম। না! ভুল বলেছিলাম! আমি ডিভোর্স চাই না। যে-কটা দিন বাঁচবে ওর ইচ্ছামতো স্লো-পয়েজিনিং-এর যোগান আমি দিয়ে যাব। সরি স্যার। আমি চলি।

ঝড়ের বেগে ও এগিয়ে যায় নির্গমন দ্বারের দিকে।

বাসু রানুর দিকে ফিরে শুধু বললেন, 'কত অজানারে জানাইলে তুমি...'

বিকেল চারটে নাগাদ টেলিফোন করলেন ব্রজদুলাল।

—গুড আফটারনুন, ব্যারিস্টারসাহেব! আমি ব্রজ বলছি। একটু আগে কলকাতা থেকে অশোক এস. টি. ডি. করেছিল। ও কাল সকালে ফিরে আসছে। আপনি যে ডাঃ ভট্টাচার্যির কেমিস্ট শপে ওকে পাঠিয়েছিলেন সেখান থেকে ও রিপোর্ট পেয়েছে। সেটা নিয়েই আসছে। আপনি বোধহয় রিপোর্ট ইতিমধ্যে পেয়ে গেছেন, তাই না?

বাসু বললেন, হ্যাঁ, সকালবেলা টেলিফোনে আমি জেনেছি। আশঙ্কাজনক কোনোকিছুই ঐ গ্লাসের তলানিতে পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ অ্যাবে শবরিয়ার হার্টফেলই হয়েছে।

—আগামী রবিবার পনের তারিখ গুনপুরে বিলকে সমাধিস্থ করা হবে। আমি এখানকার ভাইকারেজের সঙ্গে কথা বলে সেই রকম ব্যবস্থাই করেছি। গুনপুর চার্চ-এর অ্যাবটও এসেছিলেন পুরীতে। আমরা ঐদিন একটা গাড়ি নিয়ে গুনপুর যাচ্ছি ফিউনারালে উপস্থিত থাকতে। আপনি কি আসতে পারবেন?

—আজ্ঞে না। বুঝতেই তো পারছেন আমার অবস্থা। মিসেস্ বাসুকে নিয়েও যাওয়া যাবে না, রেখেও যেতে পারব না। তবে গাড়িতে জায়গা হলে সুজাতা বা কৌশিক একজন কেউ যেতে পারে।

—গাড়িতে জায়গা হবে না কেন? আমি তো বড় ভ্যানটা নিয়ে যাব। ক্যাপ্টেন পালিত

আর ছায়া তো আজ ফিরে যাচ্ছে, ডক্টর ঘোষালও আজই চলে যাচ্ছেন। রাত দশটার গাড়িতে। ইন্দ্রও অতদিন থাকবে না বলছে...

—ঠিক আছে। আমি সুজাতার সঙ্গে কথা বলে আপনাকে জানাব।

—অলরাইট, স্যার। একটু লাইনটা ধরুন, ঘোষাল আপনার সঙ্গে কথা বলবে।

ডক্টর ঘোষাল বললেন, রাত দশটার গাড়িতে উনি কলকাতামুখো রওনা দেবেন। তার আগে—বাসুসাহেব সময় দিতে পারলে—উনি এখানে এসে বিদায় নিয়ে যেতে পারেন।

বাসু বললেন, বাই আল মিনস্। য়ু আর ওয়েলকাম।

প্রায় আধঘণ্টা পরে ডক্টর ঘোষাল এলেন। একাই। নানান সৌজন্যমূলক কথাবার্তা হলো। বাসুকে উনি আমন্ত্রণ জানালেন ওঁর চুঁচুড়ার মানসিক হাসপাতাল পরিদর্শন করে যেতে।

রানু বললেন, এত তাড়াহুড়ো করে ফিরে যাচ্ছেন কেন? এসেই তো পড়লেন এক দুঃখজনক ঘটনার আবর্তে। সেটার জের মিটতে না মিটতেই...

বাধা দিয়ে ঘোষাল বললেন, তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হচ্ছে দুটি বিশেষ জরুরি হেতুতে। বস্তুত প্রসঙ্গটা আমি নিজেই তুলতাম—বাসুসাহেবের অ্যাডভাইস নিতে।

বাসু বলেন, কী ব্যাপার? বলুন শুনি।

—সকালবেলা আমাদের ওখানে দু-দুটো বাইরের কল আসে। প্রথমটা অশোকের, অশোক চ্যাটার্জির। ঐ ফরেনসিক রিপোর্ট—গ্লাসে ভদ্‌কা, লাইম কর্ডিয়াল আর জল ছাড়া কিছু পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্রে যাকে 'রজ্জুতে সর্পভ্রম' বলে, আমাদের তাই হয়েছিল। দ্বিতীয় ফোনটা করে আমার স্যানাটোরিয়ামের সিনিয়ার মেট্রন অ্যাগি ডুরান্ট। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলা। এই নার্সটি আমার স্যানাটোরিয়ামে আছেন নাহোক বিশ বছর। যেমন সৎ, সাহসী তেমনি দৃঢ়চেতা, বিশ্বাসী...

বাসু বাধা দিয়ে বলেন, এক্সকিউজ মি ডক্টর, অ্যাগি বোধহয় 'অ্যাগনেস্' শব্দের ডাকনাম। 'অ্যাগনেস্' একটা গ্রিক শব্দ, অর্থ : পবিত্র। আর 'ডুরান্ট' সারনেমটা এসেছে প্রাচীন ফরাসী ভাষা থেকে। অর্থ : enduring. উনি সেদিক থেকে সার্থকনামা।

মিসেস্ বাসু চাপা ধমক দেন, অহেতুক কথার মধ্যে বাধা দাও কেন বল তো? বলুন, ডক্টর ঘোষাল।

—হ্যাঁ, যা বলছিলাম। অ্যাগি দু-দুটো খবর দিল। যে জন্য আমাকে তাড়াতাড়ি, আজই, ফিরে যেতে হচ্ছে। আমার একটি পেশেন্ট—ইন ফ্যাক্ট, তার কথা আপনাদের বিস্তারিত বলেছি. কুন্তী দোসাদ—তার অবস্থা হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়েছে। সে বোধহয় আমাকে খুঁজছে। কথা বলতে পারে না তো...

বাসু জানতে চান, দ্বিতীয় খবরটা কী?

মিসেস্ বাসু বোধহয় কুন্তী দোসাদ সম্বন্ধে আরও কিছু শুনতে চান ডক্টর ঘোষালের কাছ থেকে। কিন্তু এবার আর কর্তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন না।

ঘোষাল বললেন, দ্বিতীয় খবরটা অ্যালার্মিং। অন্তত চিফ মেট্রনের ধারণায়। একটা বেগানা লোক—তার ভাষা মস্তান টাইপের—টেলিফোন করে আমার খোঁজ করছে। জানতে চাইছে আমি কোথায়. ডাক্তার শালা কবে ফিরবে এটসেট্রা। অ্যাগির ধারণা : লোকটা সেই কাল্লু শেখ. অথবা তার কোনো চ্যালা-চামুণ্ডা। অ্যাগি জানে, কাল্লু ছাড়া পেয়েছে।

রানু বলেন. সেজন্য আপনি তাড়াহুড়া করে ফিরে যাচ্ছেন?

—খালটা আমিই কেটেছি মিসেস্ বাসু! সেই খাল বেয়ে যদি কুমির উজিয়ে আসে আর আমার চিফ মেট্রন ভয় পায়, তাহলে আমাকে ছুটে যেতে হবে বইকি।

বাসু জানতে চান, ঐ লোকটা ক বার ফোন করেছিল?

—একবারই। অ্যাগির ধরণা সে 'লোকাল কল' করেনি। সম্ভবত চিনসুরার বাইরে থেকে কল করেছে। কিন্তু তার ভাষা আর ঔদ্ধত্য থেকে ওর মনে হয়েছে—

বাসু জানতে চান, আপনার কোনো ফায়ার-আর্মস্ আছে? পিস্তল জাতীয়?

—না। কোনোদিন প্রয়োজন হবে বলে মনে করিনি।

—আপনার নার্সিংহোমে দারোয়ান নেই? তার কোনো ফায়ার-আর্মস্ নেই?

—দারোয়ান আছে। কিন্তু স্যানাটোরিয়ামে 'ক্যাশ' তো তেমন কিছু থাকে না। তাই বন্দুকধারী দারোয়ানের দরকার হবে ভাবিনি।

—আপনি কি দেহরক্ষী জাতীয় কোনো লোককে নিয়োগ করতে চান? আমার সঙ্গে আই. জি. ক্রাইম, বার্ডওয়ান রেঞ্জ-এর জানাশোনা আছে। আমি বিশ্বস্ত লোকের ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

—সেই কথা আলোচনা করতেই আসা। অ্যাগির কথায় এখনি সেটা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আগে নিজের জায়গায় ফিরে যাই। পরিস্থিতিটা নিজে সমঝে নিই। তারপর প্রয়োজন হলে আপনার সাহায্য নেব।

—শিওর! নির্দ্বিধায়। আমার ফোন নাম্বার তো জানেনই। আই মিন এই বাড়ির। আমি এখানে মাসখানেক থাকব। পূজার পর, ইনফ্যাক্ট কালীপুজার বোমা-পটকার বাৎসরিক আনন্দোৎসবের অত্যাচার শেষ হলে কলকাতা ফিরব। প্রয়োজন হলে আমাকে জানাবেন। আমি এখান থেকেই আই. জি. ক্রাইমের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে ব্যবস্থাদি করে দেব।

—থ্যাঙ্কু স্যার!

বাসু জিজ্ঞাসা করেন, ব্রজদুলালের সঙ্গে আপনার কত দিনের আলাপ?

—তা বছর পাঁচেক হবে। ইন্দ্রর একটা নাটকের রজত জয়ন্তী হলো। সে সময় থিয়েটার দেখতে গিয়ে ব্রজদুলালের সঙ্গে প্রথম আলাপ। কেন বলুন তো?

বাসু সে কথার জবাব না দিয়ে বলেন, আর ইন্দ্রকুমারের সঙ্গে?

ঘোষাল বলেন, জনান্তিকে জানাই—আমরা একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়তাম। আমরা সহপাঠী। কিন্তু কথাটা জানাজানি হলে 'তেতাল্লিশ বছরের' নায়ক ইন্দ্রকুমার বিব্রত হবে। যেহেতু আমি পঞ্চাশোর্ধ্ব!

বাসু ও রানু হেসে ওঠেন। বাসু বলেন, কোন স্কুলে পড়তেন আপনারা দুজন? কলকাতায়?

—না। ধানবাদে। চিড়াগোড়া বয়েজ হাই স্কুলে। আমার বাবা ছিলেন ধানবাদের একজন ডাক্তার। আর ইন্দ্রের বাবা ওখানকার অ্যাসিস্টেন্ট স্টেশন মাস্টার। উনিশশো একষট্টিতে আমরা দুজনেই একসঙ্গে ম্যাট্রিক পাস করি। আমি ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পাই। ও থার্ড ডিভিশনে পাস করে। ইন্দ্র ঐ বয়েসেই পাড়ার থিয়েটারে নাম করেছিল। একটা যাত্রাদলের সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে পালায়। প্রায় পাঁচ বছর পরে আমার সঙ্গে দেখা। আমি সে বছরই চুঁচুড়ায় স্যানাটোরিয়ামটা খুলে সবে বসেছি। কিন্তু এসব কথা প্রকাশ হলে ইন্দ্র লজ্জা পাবে। সর্বসমক্ষে সে আমাকে 'শিবুদা' কিংবা 'ঘোষালদা' বলে ডাকে।

—আর আড়ালে 'তুই-তোকারি' করে। তাই না?

ঘোষাল জবাব দিলেন না। হাসলেন।

বাসু হঠাৎ প্রশ্ন করে বসেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, ডক্টর ঘোষাল। গত শুক্রবার রাত একটার সময় আপনি আর ইন্দ্রকুমার যখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন তখন ল্যাট্রিন

থেকে অ্যাবে শবরিয়া হঠাৎ বের হয়ে আসেন, তাই না? শবরিয়ার মৃত্যুর পূর্ব রাত্রির কথা বলছি আমি! ঘটনাটা নিশ্চয় মনে আছে আপনার? তখন ইন্দ্রকুমার অ্যাবে শবরিয়াকে হঠাৎ চার্জ করে : আপনি আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনছিলেন কেন? মনে আছে নিশ্চয়? কী কথা আলোচনা করছিলেন আপনারা দুজন? কেন ইন্দ্রকুমারের মনে হলো, অ্যাবে শবরিয়া তা আড়ি পেতে শুনছিলেন! তার ঠিক আগেই ইন্দ্র 'বৃন্দাবনলীলা' প্রসঙ্গে কিছু বলেছিল। অ্যাম আই কারেক্ট? আপনি যদি আমার সাহায্য চান, তাহলে আনুপূর্বিক ঘটনা আমাকে দয়া করে জানাবেন? আমার জানা থাকা দরকার।

ডক্টর ঘোষাল যেন বজ্রাহত হয়ে গেলেন। কোন অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাবলে বাসুসাহেব সেই মধ্যরাত্রির জনান্তিক ঘটনাটা—যার দুজন সাক্ষীর একজন মৃত, দ্বিতীয় জন নিশ্চয় স্বীকার করবে না—তা ঐ বৃদ্ধ জেনেছেন, তা বুঝে উঠতে পারেন না। দীর্ঘ মিনিট খানেক তিনি নির্বাক তাকিয়ে থাকলেন বাসুসাহেবের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, আমাকে মার্জনা করবেন, বাসুসাহেব। আমি শুনেছি, আদালতে আপনি অনেকবার অনেক ভেলকি দেখিয়েছেন। আদালতের বাইরেও যে তা দেখাতে পারেন তা এইমাত্র জানতে পারলাম। কিন্তু আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন তা আমার নিজের গোপন তথ্য নয়। অন্য কারও। তার কাছে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, কথাটা আমি গোপন রাখবো। আমাকে মার্জনা করবেন। এজন্য যদি আমাকে সাহায্য করতে অস্বীকৃত হন, তাহলে আমি নাচার!

বাসু বললেন, ভেলকির প্রসঙ্গ থাক। নিজেকে কোনো বিপদের সম্মুখীন মনে করলে আমার সাহায্য চাইবেন প্লিজ! আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত!

রাত তখন সাড়ে নয়টা। বাসুসাহেব বসেছিলেন দক্ষিণের বারান্দায়। সস্ত্রীক। দুজনে দুটি ডেক-চেয়ার টেনে নিয়ে। আকাশে দ্বাদশীর চাঁদ। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে পুরীর সমুদ্রসৈকত। ঢেউয়ের মাথায়-মাথায় রূপালি হাতছানি। দু-একটা গাঙচিল সেই একপ্রহর রাতেও জলের কিনারে-কিনারে খাদ্যসন্ধান করে ফিরছে। রিক্‌শার সারি তখনো যাতায়াত করছে সামনের রাস্তা দিয়ে। বিশু ভিতর থেকে এসে জানতে চাইল, টেবিল লাগাবো কি?

বাসু বললেন, তোর দাদাবাবু-দিদিমণি তো এখনো ফেরেনি কোনারক দেখে।

বিশু নীরব রইল। রানু বললেন, আর আধঘণ্টা দেখি। রাত এমন কিছু বেশি হয়নি।

কথা বলতে বলতেই ওরা দুজন ফিরে এল। রিক্‌শায় চেপে। যাত্রীবাহী বাস স্ট্যান্ডে এসে সব যাত্রীদের নামিয়ে দেয়। সেখান থেকে যে-যার হোটেলে ফেরে।

বাসু জানতে চাইলেন, কেমন বেড়ালে?

কৌশিক বললে, ভালোয়-মন্দয়।

—কেন 'মন্দটা' আবার কী হলো?

কৌশিক জবাব দেবার আগেই রানু বলেন, আচ্ছা তুমি কেমন মানুষ গো? তুমি তো জানতে চাইতে পারতে 'ভালো'টা কী হলো? সব সময়েই 'মন্দ'টা কী জানতে চাওয়া তোমার একটা বাতিকে দাঁড়িয়ে গেছে!

বাসু আত্মপক্ষ সমর্থন করেন, আহা-হা! তা কেন? স্বামী-স্ত্রীতে সারাদিন আউটিং করে ফিরল—এখানে তো আদ্যন্ত ভালোই হবার কথা। এর মধ্যে 'মন্দ' কী করে ঢুকল এটাই তো জানতে চাইব।

সুজাতা ওঁদের ঝগড়া থামিয়ে দিয়ে বলে, মাইনর একটা অ্যাক্‌সিডেন্ট। 'বাঘ গুহা' দেখে নামবার সময় পা-মচ্‌কে পড়ে গিয়ে—

—না, না, আমাদের দুজনের মধ্যে কারও নয়; আমাদের এক সহযাত্রিণীর—

কৌশিক বলে, 'আমাদের এক সহযাত্রিণী' না বলে বরং স্পষ্ট করে বল : 'আপনাদের একজন পরিচিত মহিলা'।

—পরিচিত মহিলা! কে? কার কথা বলছ?

সুজাতা কৌশিককে বলে, তুমি ততক্ষণ গল্পটা বলতে থাক, আমি শাড়িটা পাল্টে গায়ে দু-ঘটি জল ঢেলে আসি। ঘামে গা প্যাচ প্যাচ করছে।

রানু বলেন, গিজারটা চালু করাই আছে। একেবারে ঠাণ্ডা জলে গা ধুয়ো না যেন—নতুন জায়গা, চেঞ্জ-অব-সিজনের সময়...

সুজাতা ঘাড় নেড়ে ভিতরে চলে যায়। কৌশিক জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে ঘটনাটার বর্ণনা দেয়।

সকালবেলা বাসটা ছেড়েছিল মেরিন ড্রাইভে, পুরী হোটেলের সামনে থেকে। কৌশিক আর সুজাতা বাসে উঠে দেখে সামনের একটি সিট দখল করে বসে আছে অনুরাধা। ওদের দেখেই সে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে : যাক বাবা! একেবারে একা-একা যেতে হবে না। কথা বলার লোক পাব!

কৌশিক-সুজাতা বসল ঠিক পিছনের সিটে। সুজাতা বললো, কেন? আর কেউ যেতে রাজি হলো না?

—সবাইকে অনুরোধ করিনি। দু-একজনকে বলেছিলাম, কিন্তু মনে হলো ঐ বৃদ্ধের—কী যেন নাম—আকস্মিক মৃত্যুতে ওঁরা এখনো আচ্ছন্ন। আমার বেড়াতে যাবার প্রস্তাবটা ওঁরা যেন ভালো চোখে দেখছেন না।

সুজাতা দেখে, অনুরাধা জানলার ধারে বসেছে। পাশের সিটটা ফাঁকা। ও জানতে চায়—দু নম্বর সিটটা কার?

অনুরাধা বললো, খোদায় মালুম! আমার জানার কী দরকার? প্রভু জগন্নাথের কৃপায় তার গায়ে ঘামের গন্ধ না থাকলেই হলো।

সুজাতা বললো, তেমন-তেমন বুঝলে আমি তোমার পাশের সিটে চলে যাব, বদ্-বু-ওয়ালা লোকটিকে আমার কর্তার পাশে বসিয়ে দেব।

অনুরাধা খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে।

বাসটা ছাড়ার সময়-সময় একটা চমক!

টাইট চোস্ত্ আর ঢিলে পাঞ্জাবি গায়ে সানগ্লাস চোখে আর ক্যামেরা কাঁধে আবির্ভূত হলেন নটকেশরী ইন্দ্রকুমার! সিটের নম্বর খুঁজতে খুঁজতে আসছিলেন তিনি। কী আশ্চর্য! দেখা গেল: অনুরাধার পাশের ফাঁকা সিটটাই অজান্তে বুক করেছেন তিনি।

কৌশিক সুজাতার কানে-কানে বলে, একেই ইংরেজিতে বলে 'কোয়েসিডেন্স' ; বাংলায় 'কাকতালীয় ঘটনা'। ঘটনাচক্রে দুজনে আলাদা-আলাদা...

সুজাতা চাপা ধমক দেয় : থাম! যা বোঝ না, তা নিয়ে বক না। একে ইংরেজিতে বলে : 'গিমিক', আর সাদা বাংলায় : ন্যাকামি!

কৌশিক বলে, আই সি!

সুজাতার রাগ তখনো যায়নি। বলে, তা তো দেখবেই। গোয়েন্দা কিনা! চোকে খোঁচা দিয়ে কেউ যখন দেখাচ্ছে তখন তো দেখতেই হবে! অ্যাতো লুকোছাপার কী আছে তা ওরাই জানে!

বাসের দু-একজন যাত্রী-যাত্রিণী ঐ ফিল্মস্টার ইন্দ্রকুমার আর অনুরাধাকে চিনে ফেলল। তাদের কেউ-কেউ ওদের অটোগ্রাফও নিল। সুজাতা-কৌশিক নিজেদের গুটিয়ে নিল।

BanglaBook.org

দুর্ঘটনাটা ঘটল উদয়গিরি-খণ্ডগিরিতে পৌঁছে। উদয়গিরি হস্তিগুম্ফা থেকে ব্যাঘ্রগুম্ফায় যেতে কয়েকটি পাথরের ধাপ পার হতে হয়। অনুরাধার পায়ে ছিল কিঞ্চিৎ হাইহিল জুতো—এমন ভ্রমণের সময় ঐ জাতীয় জুতো কেন পরেছে তা সেই জানে—অনুরাধা পা মুচড়ে পড়ে যায়। প্রথমটা বোঝা যায়নি ; কিন্তু পরে ওর পায়ে যন্ত্রণা হতে থাকে। ইন্দ্রকুমার ওকে নিয়ে একটা ফ্লাইং ট্যাক্সি ধরে ভুবনেশ্বরের দিকে ফিরে যায়। হাসপাতালে দেখাতে। তারপর আর তারা বাসে ফিরে আসেনি। কোনার্কে যায়নি।

বাসু বললেন, ব্রজদুলালের বাড়িতে একটা ফোন কর তো রানু।

ততক্ষণে জামা-কাপড় পাল্টে সুজাতা এসে গেছে। সে বসেছিল টেলিফোন যন্ত্রটার কাছাকাছি। তুলে ডায়াল করতে শুরু করে। কৌশিক বলে, বিশু, তুই টেবিল লাগা, আমি মুখ-হাত ধুয়ে এখুনি এসে যাব।

ব্রজদুলালকে পাওয়া গেল। তিনি জানালেন, হ্যাঁ, ইন্দ্রকুমার ভুবনেশ্বর থেকে ফোন করেছিল। অনুরাধার পা-টা এক্সরে করা হয়েছে। হাড়-টাড় কিছু ভাঙেনি—লিগামেন্টে একটা টান ধরেছে। কাল বিকালের মধ্যেই ওকে ছেড়ে দেবে হাসপাতাল থেকে। ইন্দ্রকুমার বাধ্য হয়ে একটা হোটেলে উঠেছে। কাল বিকাল নাগাদ ওরা ফিরে আসবে।

খাবার টেবিলে সুজাতা বললে, অনুরাধা অ্যাকটিং করে জবর!

রানু বলেন, তুমি ওর অভিনয় দেখেছ? কোথায়? মানে কোন নাটকে?

—না, মামী, আমি স্টেজ-অ্যাকটিং-এর কথা বলছি না। ব্র্যাঘ্রগুম্ফায় ওর পতন ও মূর্ছার কথাটা বলছি।

—মূর্ছা?

—না, পুরোপুরি মূর্ছা নয়। তেতাল্লিশ বছরের নায়ক যদি ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিতে পারত, তাহলে অনু নির্ঘাৎ নিশ্চিন্ত হয়ে মূর্ছা যেত ; কিন্তু বাহান্ন বছরের বৃদ্ধ ওর মাজা জড়িয়ে নিয়ে নামিয়ে নিয়ে এল কি না, তাই পুরোপুরি মূর্ছা যাবার সুযোগ অনু পেল না!

কৌশিক বলে, তোমরা...মেয়েরা না...

রানু বলেন, কী? বাক্যটা শেষ কর? মেয়েরা কী?

কৌশিক বাক্যটা শেষ করে : আয়াম সরি, মামী! আপনার দৃষ্টি দেখে বাক্যটা আমার 'হরে গেছে'!

সাত

প্রায় তিন সপ্তাহ পরের কথা। ডক্টর ঘোষাল মারা গিয়েছিলেন অক্টোবরের আটাশ তারিখ। এই সংবাদটা ওঁরা পেলেন মাসের শেষদিকে—ত্রিশে অক্টোবর। সংবাদপত্রের পাঁচ নম্বর পৃষ্ঠায় মফঃস্বল-বার্তা বিভাগে। তা তো হতেই পারে। সংবাদপত্রের বৃকোদর ভাগ দখল করে বসে আছেন রাজনীতি ব্যবসায়ীরা। নির্বাচন জয় করে—তা সে যে-কোনো পদ্ধতির মাধ্যমেই হোক না কেন,—জনগণের মস্তকে পনস-বিদীর্ণ করে কীভাবে লুটেপুটে খাচ্ছেন তার বর্ণনা দিতেই কাগজের আধাআধি অবয়ব ঢাকা পড়ে যায়। তার উপর আছে খেলা, টি. ভি., সিনেমা, যাত্রা এবং বিজ্ঞাপন। মফঃস্বলে—কী ঘটল-না-ঘটল জানাবার অবকাশ কোথায়? সংবাদটা প্রথম নজরে পড়ে রানু দেবীর। তিনিই বাসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আজ কাগজে দেখেছ? ডাক্তার ঘোষাল হার্টফেল করে মারা গেছেন!

রীতিমতো চম্‌কে উঠেছিলেন বাসু : ডক্টর ঘোষাল? মানে চুঁচুড়ার শিবশঙ্কর ঘোষাল?

—হ্যাঁ, এই দেখ না, পাঁচ নম্বর পাতায়।

বাসু সংবাদপত্রটা ওঁর হাত থেকে গ্রহণ করে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন। ডঃ ঘোষাল মারা গেছেন শনিবার আটাশে অক্টোবর। সেদিন তিনি কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। নৈশভোজের টেবিলে নিমন্ত্রিতদের উপস্থিতিতেই তাঁর একটা ম্যাসিভ হার্ট-অ্যাটাক হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময় পাওয়া যায়নি। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন একজন চিকিৎসক। তিনিই জানালেন—প্রবীণ চিকিৎসক ডঃ ঘোষাল নিঃশব্দে চলে গেছেন।

এর পর চার-পাঁচ পংক্তিতে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে এম. বি. বি. এস. ও পরে এম. ডি. পাস করেন। কিছুদিন পার্শীবাগান লেনে 'ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি'-তে গবেষণা করে 'অ্যাবনর্মাল সাইকোলজি' বিষয়ে পি. এইচ. ডিও করেন। পরে চুঁচুড়ায় একটি মানসিক নার্সিংহোম গঠনই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

রানু বললেন, কার যে কখন ডাক আসবে কেউ জানে না।

বাসু বললেন, তা তো বটেই। কিন্তু কোয়েন্সিডেন্সটা লক্ষ্য করেছ? নৈশভোজের টেবিল, একাধিক নিমন্ত্রিতের উপস্থিতি, 'ম্যাসিভ হার্ট-অ্যাটাক'। কোনো কিছু পান করতে করতে মারা যাননি তো?

রানু বলেন, তোমার সব উদ্ভট চিন্তা।

একটু দূরে বসে ইংরেজি সংবাদপত্র দেখছিল কৌশিক। সে বলে, না মামী! মামুর চিন্তার মধ্যে অসামঞ্জস্য কিছু নেই। ইংরেজি কাগজে লিখেছে, 'While drinking from a glass of liquor..' [মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে]

বাসুসাহেবের হাত ইতিমধ্যে পকেটে চলে গেছে—পাইপ-পাউচের সন্ধানে। বললেন, ব্রজদুলালকে ধর তো ফোনে।

ধরা গেল না। ব্রজদুলাল দিন সাতেক আগে সেই যে হাজারিবাগ চলে গেছেন, তারপর থেকে তাঁর আর কোনো খবর নেই। অ্যাবে শবরিয়াকে সমাধিস্থ করে ব্রজদুলাল তাঁর হাজারিবাগের বাড়িতে চলে যান। বাসুকে বলেছিলেন যে, শ্যামবাজারের 'থিয়েটার-হল'টা বর্তমানে এয়ার-কন্ডিশনিং করা হচ্ছে। কাজটা শেষ হতে মাসখানেক লাগবে। ফলে পুরো মাসটাই ছুটি। সামনের মাস নাগাদ নতুন বই মঞ্চস্থ হবে।

ইন্দ্রকুমার কলকাতায় পৌঁছে একটা খবর দিয়েছিল। ফোনে বলেছিল যে, সে নাকি দিন পনেরর জন্য ঘাটশিলায় বেড়াতে যাচ্ছে। বাসু অতঃপর ফোন করলেন মিসেস্ মোহান্তির পুরীর ডেরায়। সেখানেও কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভবপর হলো না। মা-মেয়ে দিন সাতেক আগে কলকাতা গেছেন। কৌশিক বলে. মিসেস্ পালিতকে ফোন করব মামু, কলকাতায়?

বাসু বললেন, পণ্ডশ্রম! পালিত দম্পতির সঙ্গে ডক্টর ঘোষালের আলাপ এই পুরীতেই। খবরের কাগজে যদি নজরে না পড়ে থাকে তাহলে ছায়া এ খবরটা হয়তো জানেই না। আর ক্যাপ্টেন পালিত হয়তো মনেই করতে পারবে না যে, কোনো এক ডক্টর ঘোষালের সঙ্গে তার পুরীতে আলাপ হয়েছিল।

রানু বললেন, ঘাটশিলার উপর দিয়ে যে নদীটা বয়ে গেছে তার নামটা যেন কী? ঋত্বিক ঘটকের একটা ফিল্মও আছে ঐ নামে—

সুজাতা বলে, 'সুবর্ণরেখা'!

রানু বলেন, ঠিক! 'সুবর্ণরেখা!' আমার বেশ মনে আছে ইন্দ্রকুমার ফোনে বলেছিল ঐ

'সুবর্ণরেখা' হোটেলেই সে উঠবে। নতুন হয়েছে হোটেলটা। শুনেছি সুখ্যাতিও হয়েছে। ফোন নিশ্চয় আছে—

কৌশিক উঠে দাঁড়াল। বললো, আমি একটু খোঁজ নিয়ে আসি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ থেকে। ফোন নিশ্চয় আছে। আমার ফিরতে দেরি হলে আপনারা খেয়ে নেবেন।

সুজাতা বলে, এই 'ওয়াইল্ড গুজ চেজ'-এর কোনো অর্থ হয়? এখানে আমাদের ক্লায়েন্ট কে? একগাদা এস. টি. ডি-র দাম মেটাবে কে?

বাসু এতক্ষণে পাইপটা ধরিয়েছেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন : আমি! আমিই বিল মেটাবো। আমিই সুকৌশলীর ক্লায়েন্ট! আই মাস্ট হ্যাভ এ স্যাটিসফ্যাকটরি এক্সপ্ল্যানেশন।

সুজাতা একটু থমকে যায়। তবু বলে, রাগ করবেন না মামু! কিন্তু কিসের ব্যাখ্যা চাইছেন আপনি? এরকম ঘটনা কি ঘটে না পৃথিবীতে? দুটি মানুষ—দুজনেই বৃদ্ধ—পাঁচজনের সঙ্গে ডিনার খেতে খেতে 'ম্যাসিভ হার্ট-অ্যাটাক'-এ মারা যেতে পারে না? তিন সপ্তাহ আগে-পিছে। না হয় দুজনেই সেসময় মদ্যপান করছিল। এটা কি এতই বিরল ঘটনা?

—না! কিন্তু আমি কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দি চাই—

—কী বিষয়ে?

—আমি জানতে চাই ম্যাসিভ হার্ট-অ্যাটাক যখন হয় তখন ডাক্তার ঘোষালের হাত দুটি কোথায় ছিল! বুকের বাঁ-দিকে, না গলায়? আমি জানতে চাই মৃত্যুসময়ে ওঁর মুখে যে অভিব্যক্তি...

কথাটা তাঁর শেষ হলো না। হঠাৎ ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠল টেলিফোন। বাসু যেন এটারই প্রতীক্ষায় বসেছিলেন এতক্ষণ। ব্যাঘ্রঝম্পনে টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বললেন, পি. কে. বাসু! বলুন?

—আমি ব্রজ। ব্রজদুলাল!

—ইয়েস! আর একটু জোরে বলুন। কোথা থেকে বলছেন? হাজারিবাগ?

—না। কলকাতা! ডঃ ঘোষালের খবরটা পেয়েছেন?

—হ্যাঁ। স্যাড কেস!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যাড তো বটেই। তার চেয়েও বড় কথা মোস্ট মিস্টিরিয়াস! হার্ট-অ্যাটাক নয়, বাসুসাহেব! দিস্ টাইম ইট ইজ পয়েজনিং! বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে ঘোষালের।

—কী করে জানলেন?

—পোস্টমর্টেম থেকে। আপনি কি আসতে পারবেন?

—অফ কোর্স! বাই টুমরো। কালকের সন্ধ্যার মধ্যে পৌঁছে ফোন করব আপনাকে। অবশ্য যদি প্লেনের টিকিট পাই, আর....

—শুনুন স্যার! আমার মারুতি-ভ্যানটা পুরীতেই আছে। আমি অশোককে টেলিফোনে ইন্সট্রাকসন্স দিয়ে দিচ্ছি। মিসেস্ বোস শুয়ে শুয়েই আসতে পারবেন। হুইল-চেয়ারটাও পিছনে নিয়ে নিতে পারবেন। কাম বাই রোড! অশোক সব ব্যবস্থা করবে।

বাসু বলেন, ইন্দ্রকে কি করে একটা খবর দেওয়া যায়? ও আছে ঘাটশিলায়, 'সুবর্ণরেখা' হোটেলে।

—না, স্যার! ইন্দ্র বসে আছে আমার সামনে। খবরের কাগজে নিউজটা দেখেই ও ঘাটশিলা থেকে চলে এসেছে।

—অল রাইট। আমি আসছি।

আট

পয়লা নভেম্বর। সন্ধে তখনো হয়নি, সূর্য পশ্চিমাকাশে। যদিও গাধূলিতে ঢাকা পড়েছেন দৈনন্দিন বিদায়কামী সূর্যদেব। আজ্ঞে না, পাঠক-পাঠিকা! —ওটা প্রেসের অনবধানতার বর্ণাশুদ্ধি নয়। লেখকের মূল রচনায় 'গাধূলি'ই লেখা হয়েছে। এই বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে প্রাক্তন সূতানুটি-গোবিন্দপুর গ্রামে প্রাকসন্ধ্যা-লগ্নে গোষ্ঠভূমি থেকে গাভীরা প্রত্যাবর্তন করে না। গোবেচারী কেরানির দল দিনগতর পাপস্খালনান্তে বাদুড়ের অনুকরণে 'বাস'-এর হাতল ধরে ঝুলতে ঝুলতে নিজ-নিজ গোয়ালে ফিরে আসে। সেই বাসের টায়ার থেকে যে ধূলি পশ্চিমাকাশকে আবৃত করে—'গাড়ির ধূলি'—তাকেই বলে 'গাধূলি'। এখনও কথাটা অভিধানে ওঠেনি ; তবে মুখে মুখে চালু হচ্ছে। অভিধানে অচিরে এই নয়া শব্দটি সংযোজিত হবে।

সেই 'গাধূলি'-লগ্নে গাড়িখানা এসে পৌঁছলো বাসুসাহেবের নিউ আলিপুরের ডেরায়। প্রথমেই নামানো হলো রানুদেবীকে হুইল-চেয়ারে বসিয়ে। রাস্তা থেকে পোতায় ওঠার জন্য ঢালু 'র‍্যাম্প' বানানোই আছে। হুইল-চেয়ার অনায়াসে উঠে এল বারান্দায়। অশোক, কৌশিক আর বিশু হাতে হাতে মালপত্র সব নামিয়ে ফেলল। বাসু তাঁর অ্যাটাচিকেসটা হাতে নিয়ে নেমে এসে একটা ডেক- চেয়ার দখল করে বসলেন।

অশোক হাত-পায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললে, এবার তাহলে অনুমতি দিন, স্যার—আমি সল্টেলেকের দিকে রওনা দিই?

বাসুসাহেব কিছু বলার আগেই প্রতিবাদ করে ওঠেন রানু : তা কী হয়? ধুলোয় তোমার সর্বাঙ্গ ভরে গেছে। সেই খড়্গপুর থেকে একটানা ড্রাইভ করে আসছ। তোমার সুটকেসটা নিয়ে এদিকে এস দিকিন। একটা শাওয়ার-বাথ নাও; জামা-প্যান্ট বদলে ফ্রেশ হয়ে নাও। এট্টু চা-টা খাও। তারপর সল্টলেকে ব্রজদুলালবাবুর বাড়িতে চলে যেও। আমরা ফোন করে জানিয়ে দিচ্ছি।

অশোককে নিয়ে গেল কৌশিক ওদের উইং-এ, বাথরুমের দিকে। বাসুসাহেব ঢুকলেন ড্রইংরুমে, ব্রজদুলালকে একটা দূরভাষণবার্তায় তাঁদের নিরাপদ যাত্রা-সমাপ্তির কথা জানাতে। রানু সুজাতাকে ডেকে বললেন, দেখ তো সুজাতা, সামনে ঐ অপর্ণার দোকানে এখন কী পাওয়া যাবে? স্ন্যাক্স্ জাতীয়। অশোক স্নান করে এলে, আমরাও সবাই হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে একটু চা-কফি খাব। বিশু শুধু চা আর কফি বানাবে—খাবারটা সাপ্লাই করবে অপর্ণা।

বাসু বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, আবার চা-কফির হাঙ্গামা করার কী দরকার? অশোককে ভালো ব্রান্ডি খাওয়াব। এতটা ড্রাইভ করে এসেছে...

রানু ধমকে ওঠেন, না! সে তুমি একাই বসে বসে গিলো। ওকে আবার এতটা পথ ড্রাইভ করে সল্টলেক ফিরতে হবে—সে খেয়াল আছে?

বাসু কেশবিরল মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলেন, আরে আমি কি ওকে তিন-চার পেগ খেতে দিতাম?

রানুর ধমকের 'টোন'টা অপরিবর্তিত : ক্রমাগত টিকটিক না করে ব্রজবাবুকে একটা টেলিফোন কর দিকিন।

বাসুসাহেব নিষ্কথায় ফিরে যান ড্রইংরুমে।

সুজাতা রাস্তাটা পার হয়ে অপর্ণার দোকানে ঢোকে।

—আসুন সুজাতাদি। এইমাত্র পুরী থেকে ফিরলেন দেখলাম। সব ভালো তো?

—হ্যাঁ, আমরা ভালোই আছি, মুন্নার কী খবর?

—বাড়িতে মায়ের কাছে আছে। ভালোই।

অপর্ণা এ পাড়ারই মেয়ে। বাসুসাহেবের একমাত্র কন্যা—যে মোটর দুর্ঘটনায় মারা যায়—তার সহপাঠিনী ছিল। তাই বাসুসাহেব ও রানীদেবী ওকে খুব ভালোবাসেন। বেচারি অপর্ণা—মাত্র তিন বছর বিবাহিত-জীবনান্তে ঐ মুন্নাকে নিয়ে বিধবা হয়েছে। বাসুসাহেবের বাড়ির বিপরীতে একটি মণিহারী দোকান খুলেছিল—নাম দিয়েছে "রকমারী"। ইদানীং তার এক-কোণায় একটা 'ফাস্ট-ফুডের' কাউন্টার খুলেছে। ওরই মতো আর এক হতভাগিনী—কল্যাণী দত্ত—আসে সন্ধেবেলায় অথবা ছুটির দিনে। 'ফাস্ট-ফুড' -এর দোকানটা দুজনে মিলে চালায়—চাওমিঙ, মোগলাই পরোটা, ঘুগনি, কষা মাংস। ছুটির দিনে ফিশ ফ্রাই, ফ্রায়েড রাইস্, চিলি-চিকেন। অপর্ণা সূর্যমুখীর রিফাইন্ড তেল কুকিং মিডিয়াম হিসাবে ব্যবহার করে। বিশুদ্ধতা আর পরিচ্ছন্নতার দিকে তার কড়া নজর। রানু প্রায়ই ওখান থেকে নৈশ আহার সংগ্রহ করেন—বিশেষ সুকৌশলীর কাজের চাপে যখন সুজাতাকে ছুটোছুটি করতে হয়। বিশের কাজের চাপ বাড়ে।

ব্রজদুলালকে টেলিফোনে ধরা গেল।

—আপনারা তাহলে নিরাপদে এসে পৌঁছেছেন দেখছি। কতক্ষণ হলো?

—এই মিনিট দশেক!

—অশোককে ভ্যানটা দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন?

—না। ও একটা ওয়াশ নিচ্ছে। চা-টা খেয়ে ফিরবে। আপনি বরং একটা ট্যাক্সি নিয়ে এখনি চলে আসুন। ব্যাপারটা বিস্তারিত শোনা যাক।

ব্রজ প্রতিবাদ করেন, আজ থাক না, স্যার? সমস্ত দিন জার্নি করে এসেছেন। আমরা বরং কাল সকালে যাব।

—না, তা হয় না। এখন প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। আমি রাত্রেই বিস্তারিত শুনতে চাই। ইন্দ্রকুমার তো শ্যামপুকুরে থাকে, ওকেও উঠিয়ে নিয়ে আসুন। ওকে একটা ফোন করুন প্রথমে।

ব্রজদুলাল বলেন, না স্যার, ইন্দ্র এখন আমার এখানেই আছে। ও ভীষণ মুষড়ে পড়েছে। দিনরাত চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। নাওয়া-খাওয়াও করতে চাইছে না। ঘোষাল তো আসলে ওর বাল্যবন্ধু ছিল। দুজনে ছিল প্রাণের বন্ধু।

বাসু প্রচণ্ড ধমকে ওঠেন, ও নিজেকে কী ভাবছে? অ্যাকিলিসের রোলে অভিনয় করছে? 'পেট্রোক্লাস ইজ ডেড! অ্যাকিলিস্ শুড ডাই অ্যাজওয়েল?'

ধমকটা ব্রজদুলালের মাথার ছয় ইঞ্চি উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। তিনি শুধু বললেন, আজ্ঞে?

এ প্রান্তে বাসুর পাশেই বসেছিলেন রানী, তাঁর হুইল-চেয়ারে। জোর করে স্বামীর হাত থেকে টেলিফোনটা ছিনিয়ে নিয়ে তার 'কথামুখে' বললেন, ব্রজদুলালবাবু, আমি মিসেস্ বাসু বলছি। উনি যা বললেন তাই করুন, প্লিজ। ইন্দ্রবাবুকে জোর করে তুলে সঙ্গে নিয়ে আসুন। একটা ট্যাক্সি নিয়ে। আজ রাত্রেই প্রাথমিক কথাবার্তাগুলো সেরে ফেলা দরকার। যাতে কাল সকাল থেকেই পরিকল্পনামাফিক কাজ শুরু করা যায়। ইতিমধ্যেই যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো বটেই। ঘোষাল মারা গেছে শনিবার আটাশে, আর আজ পয়লা বুধবার! চার-চারটে দিন! ঠিক আছে, আমরা ট্যাক্সি নিয়েই আসছি। অশোক ভ্যানটা চালিয়ে আমাদের ফেরত নিয়ে আসবে।

—আপনারা দুজন কি এখানেই যা হোক দুটি খেয়ে নিয়ে ফিরতে চান? তাহলে সেই মতো ব্যবস্থা করি। ফর্মালিটির কিছু নেই।

—না, না মিসেস্ বাসু। আমার এখানে রান্নাবান্না করার লোক আছে। সে আমাদের নৈশাহার বানিয়েই রেখেছে বোধহয়। ওসব হাঙ্গামা করবেন না। তাহলে ঐ কথাই রইল ; আমরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আসছি। বাইপাস দিয়ে গেলেও পাক্কা এক ঘণ্টা লাগবে!

—তা লাগবে। আসুন আপনারা।

টেলিফোনটা ক্র্যাডেলে নামিয়ে রেখে কর্তার দিকে ফিরে বললেন, আচ্ছা তোমার কি মাথা খারাপ? ব্রজবাবুকে হোমারের 'ঈলিয়াড' শোনাচ্ছ? হোমার তো আমাদের কাছেই গ্রিক, ব্রজবাবুর কাছে বোধহয় 'মার্শিয়ান' ভাষা!

বাসু সে কথার জবাব দিলেন না। বললেন, ঠিক আছে। ঠিক আছে। বস তোমরা, আমি মুখে-হাতে একটু জল দিয়ে আসি। বিশে কি চায়ের জল বসিয়েছে?...

কথা বলতে বলতে তিনি ভিতর দিকে চলে যান। বস্তুত পালিয়ে যান। বোধকরি তিনি প্রণিধান করেছেন টেলিফোনে যে ক্লাসিক্যাল ধমকটি দিয়েছেন, সাদা সংস্কৃতে তাকে বলে : 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্'!

কৌশিক ইতিমধ্যে অশোককে বাথরুমটা দেখিয়ে দিয়ে ড্রইংরুমে ফিরে এসেছে। সুজাতাও এসে বসেছে বাইরের দিক থেকে অপর্ণার দোকানে খাবারের অর্ডার দেওয়া সেরে। সুজাতাই বলে, বাসুমামু ওটা তখন কী বললেন মামিমা? তুমি বুঝতে পেরেছ?

—না বোঝার কী আছে? হোমারের 'ঈলিয়াড' যে পড়েছে, সেই বুঝবে!

কৌশিক বলে, আমাদের বি. ই. কলেজে হোমার পড়তে হয় না। ব্যাপারটা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলুন না মামী?

—সংক্ষেপে? মহাকাব্যের কি পকেট এডিশন হয়?

—গোটা 'মহাভারত' তো শুনতে চাইছি না। ঐ 'পেট্রোক্লাস'টা কে? আর এক্ষেত্রে তার প্রসঙ্গ এলই বা কেন? আই মিন, বাসুমামু হঠাৎ ও-কথা বললেন কেন?

রানু হেসে ফেলেন। বলেন, তুমি তিনটে প্রশ্ন করেছ কৌশিক। 'পেট্রোক্লাস'কে ও কেন, তৃতীয়ত তোমার মামু হঠাৎ ওকথা কেন বললেন। তাই না? আমি তোমার তিন নম্বর প্রশ্নের জবাবটা প্রথমে দেব। যেহেতু সেটা 'ম্যাথমেটিকাল'—অঙ্কশাস্ত্র অনুসারে বোধগম্য। তোমাদের শিবপুর বি. ই. কলেজে হোমার পড়ানো হোক না হোক, অঙ্ক নিশ্চয় শেখানো হয়। তোমাদের মামুর বর্তমান বয়সটা কত জান? 'সেভেন্টিওয়ান + (প্লাস) & সেভেন্টি থ্রি - (মাইনাস)'। ঐ বিশেষ বয়সে কিছু বায়ুবৃদ্ধি ঘটে থাকে। তা না হলে ব্রজদুলালকে উনি কিছুতেই হোমার শোনাতেন না।

কৌশিক বলে, বুঝলাম। এবার গল্পের ধরতাইটা?

রানু বুঝিয়ে বলতে থাকেন :

অ্যাকিলিস্ ছিলেন রাজপুত্র। মীরমিডনরাজ পেলিয়ুস-এর আদরের পুত্র। তার মা ছিলেন সামুদ্রিক দেবী থেটিস। জন্মমাত্র অ্যাকিলিসের মা তাকে স্টীক্স-নদীর পুণ্যোদকে গোড়ালি ধরে চুবিয়ে নেয়—ফলে অ্যাকিলিসের সর্বাঙ্গে (গোড়ালিটুকু বাদে, যেখানে মা তাকে ধরেছিল)

অভেদ্য হয়ে গিয়েছিল—তীর বা বর্শার ফলায় তা বিদ্ধ করা যেত না। সে যাই হোক এই অ্যাকিলিসের প্রাণের বাল্যবন্ধু ছিল পেট্রোক্লাস। অ্যাকিলিস্ মীরমিডনরাজের পঞ্চাশটি অর্ণবপোত নিয়ে বারে বারে ট্রয় অভিযানে গিয়ে প্রখ্যাত বীরের আখ্যা পেয়েছে। ট্রয়-যুদ্ধের সময় অনেক গ্রিক সামন্ত রাজন্যবর্গ একত্রে ট্রয় অবরোধ করতে যান। সেই সময় প্রতিপত্তিশালী সামন্তরাজ অ্যাগামেম্‌নন অ্যাকিলিসের সুন্দরী প্রিয় ক্রীতদাসীটিকে প্রায় জোর করে তুলে নিয়ে যায়।

প্রতিবাদে অ্যাকিলিস্ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে অস্বীকার করে। তার অনুপস্থিতিকালে ট্রোজান বীর হেক্টর পেট্রোক্লাসকে যুদ্ধে নিহত করে। সেই দুঃসংবাদ শুনে অ্যাকিলিস্ স্থির করে সে আত্মহত্যা করবে।

রানু হেসে বলেন, ব্রজদুলালকে ঐ উদ্ধৃতিটাই শোনাচ্ছিলেন তোমাদের মামু : "পেট্রোক্লাসহীন এই দুনিয়ায় অ্যাকিলিস্ বেঁচে থাকতে চায় না। মৃত্যুই তার কাম্য।"

সুজাতা জানতে চায়, তারপর কী হলো?

—বাকি মহাভারতটা? গ্রিক শিবিরের সবাই অ্যাকিলিস্‌কে বোঝাতে থাকে যে বন্ধুর মৃত্যুতে হা-হুতাশ করা বীরের ধর্ম নয়। তার একমাত্র কর্তব্য বন্ধুকে যে বধ করেছে সেই হেক্টরকে ছিন্নমুণ্ড করা। শেষ পর্যন্ত অ্যাকিলিস্ তার দুর্মনস্যতাকে কাটিয়ে বীরের মতো উঠে দাঁড়ায়। পরদিন দ্বৈরথ সমরে সে নিহত করলো বিপক্ষের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হেক্টরকে।

বাসুসাহেব এই সময়ে ফিরে এলেন। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলেন, মহাকাব্য শেষ হলো?

রানু বলেন, তা তো হলো, কিন্তু তুমি কোন বুদ্ধিতে ব্রজদুলালকে হোমার শোনাতে গেলে?

বাসু বলেন : পেশেন্স ম্যাডাম, পেশেন্স! রহু ধৈর্যং! আর ছয়টা মাস!

—কেন? ছয় মাস পরে কী হবে?

—আমার ঐ ক্রিটিকাল এজটা পার হয়ে যাবে। আমি তিয়াত্তরে পৌঁছে যাব।

সবাই হেসে ওঠে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ওঁরা দুজন এসে গেলেন। ব্রজদুলালের সাজপোশাক, রকম-সকম একই ধরনের। কিন্তু ইন্দ্রকুমারকে যেন চেনাই যায় না। বেশবাসের পারিপাট্যই ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এখন যেন সে ঝোড়ো-কাক! চোখের কোলে স্পষ্টতই কালির প্রলেপ। চুলে কলপ দেওয়া নেই—ফলে রাতারাতি সে পক্বকেশ বৃদ্ধ! ঘোষলের মৃত্যুতে সে যে এতবড় আঘাত পাবে তা যেন আন্দাজ করে উঠতে পারেননি বাসু। দুজনে আসন গ্রহণ করলে বাসুসাহেব ব্রজদুলালকে প্রশ্ন করেন, আপনি তখন টেলিফোনে বলেছিলেন 'বিষক্রিয়া'! তথ্যটা কে জানিয়েছে?

—চিনসুরার অটোপ্সি-সার্জেন। শবব্যবচ্ছেদ করে।

—আহা, সে তো বটেই। আমি জানতে চাইছি—কেসটা যে হার্ট-ফেলিওর নয়, বিষক্রিয়ায় মৃত্যু—এটা মনে হলো কার?

—প্রথম সাজেস্ট করেছিল মিসেস্ পালিত। ফাইনাল ডিসিশন নেন ডক্টর দাশ—অমরেশ দাশ—ঐ নার্সিংহোমের সিনিয়ার-মোস্ট ডাক্তার—ঘোষালের ডান হাত।

বাসু জানতে চান, ছায়া পালিত ছিল নিমন্ত্রিতদের মধ্যে?

—তাই তো শুনছি।

—আই সি। ডিনার-পার্টির উপলক্ষটা কী? আপনার নিমন্ত্রণ ছিল না?

—উপলক্ষ তেমন কিছু নয়। আর আমি তো ছিলাম হাজারিবাগে। আমার নিমন্ত্রণ হবে কেমন করে?

—খবরটা পেলেন কোথায়? কাগজে?

—না। দাঁড়ান, গুছিয়ে বলি :

অ্যাবে শবরিয়াকে কবরস্থ করার পরেই ব্রজদুলাল তাঁর হাজারিবাগের বাড়িতে চলে যান। তাঁর গাড়িটা পুরীতেই পড়ে থাকে। উনি ট্রেনে গিয়েছিলেন, দিন সাত-দশ কাটিয়ে আসতে। কথা ছিল পুরীতেই ফিরে আসবেন ; আর তারপর সেখান থেকে বাই রোড কলকাতায়। হাজারিবাগে পৌঁছনোর পর একরাত্রে ব্রজদুলাল বিশ্রী একটা দুঃস্বপ্ন দেখলেন। ঘোষাল-বর্ণিত কাল্লু মিঞা ছুরি উঁচিয়ে তাঁকে মারতে আসছে। ব্রজদুলাল একটা উবড়ো-খাবড়া জমির আল ধরে ছুটতে ছুটতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। আর তৎক্ষণাৎ কাল্লু ওঁকে যেন ছুরি মারতে গেল। প্রাণভয়ে ব্রজদুলাল স্বপ্নের মধ্যেই চিৎকার করে উঠলেন, তাকিয়ে দ্যাখ্, কাল্লু! আমি ডাক্তার ঘোষাল নই। কাল্লু বললো: বাঁচ গিয়া শালাহ্!

কাল্লুর মুখখানা তখন ঠিক আমজাদের মতো দেখাচ্ছিল। 'শোলে' ছায়াছবির আমজাদ।

ঠিক তখনই ঘুমটা ভেঙে গেল ব্রজবাবুর। ওঁর মনটা খারাপ হয়ে গেল! যদিও স্বপ্ন, তবু ওঁর মনে হলো বন্ধু ঘোষাল ডাক্তারের প্রতি উনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। বাকি রাত আর ঘুম হলো না। ভোরবেলা কালীপদ যখন বেড-টি দিতে এল তখন উনি টেলিফোন করলেন চুঁচুড়ায়। দুঃস্বপ্নের কথা খুলে বলে ক্ষমা চাইলেন। ঘোষাল তো হেসেই বাঁচেন না। বলেন, রাতে আর একটু 'লাইট-ফুড' খেও, বদহজম হচ্ছে তোমার।

ব্রজদুলাল তখন টেলিফোনে জানতে চান, 'আর কোনো মিস্টিরিয়াস ফোন এসেছিল?' ঘোষাল জানালেন, 'না, আসেনি।' আরও একটা ভালো খবর দিলেন : রিলায়েব্‌ল্ সোর্স থেকে ঘোষাল একজন বডি-গার্ড পেয়েছেন। কম্বাইন্ড হ্যান্ডের ছদ্মবেশে, অর্থাৎ চাকর সেজে লোকটা ওঁর বাড়িতে আছে। সুতরাং ভয়ের আর কিছু নেই। ব্রজদুলাল বলেছিলেন, 'তাহলে কদিন হাজারিবাগে কাটিয়ে যাও না কেন? ঐ দেহরক্ষীকে সঙ্গে নিয়েই এস।' জবাবে ডক্টর ঘোষাল বলেন, 'ভেবে দেখি। নার্সিংহোমের একটা ব্যবস্থা করে উঠতে পারলে যাব দুজনে। দেহরক্ষী ছোকরা বেশ চট্‌পটে। তোমার পছন্দ হবে।'

বাসু জানতে চান, এটা কত তারিখের কথা?

—শুক্রবার, সাতাশে। মানে ওর মৃত্যুর পূর্বদিন সকালে।

—তারপর? মৃত্যুর খবর পেলেন কী করে?

—ঐ টেলিফোনেই। রবিবার সকালে। আমার এখানকার ফোন নাম্বার লেখা ছিল ওর টেলিফোন প্যাডে। ফোন করেছিলেন মিস্ অ্যাগি ডুরান্ট। ওর নার্সিংহোমের চিফ মেট্রন। আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ দীর্ঘদিনের। দুঃসংবাদটা উনিই জানালেন। পূর্বরাত্রে ডিনার-টেবিলে—ওঁর চোখের সামনেই—ডক্টর ঘোষালের দেহান্ত হয়েছে। আমি রবিবারেই রাত্রের ট্রেনে ফিরে এলাম কলকাতায়।

বাসু এবার ইন্দ্রকুমারের দিকে ফিরে জানতে চান, আর তুমি? তুমি কখন খবর পেলে?

ইন্দ্রকুমার অন্যমনস্কভাবে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। এঁদের কথাবার্তা শুনছিল বলে মনে হয় না। চমকে উঠে বললে, উঁ? আমাকে কিছু বললেন?

—হ্যাঁ! ডক্টর ঘোষালের মৃত্যু-সংবাদ তুমি কী করে পেলে? খবরের কাগজে?

—আজ্ঞে না। আমিও ঐ রবিবারে ঘোষালকে একটা ফোন করেছিলাম। ধরল অ্যাগি। ও

আমাকে চিনতই। দীর্ঘদিনের আলাপ অ্যাগির সঙ্গে। কারণ শিবুর ঐ মেন্টাল-হোম প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগ থেকেই ওখানে আমার যাতায়াত ছিল। অ্যাগিও আছে সেই প্রথম যুগ থেকেই। টেলিফোনটা অ্যাগিই তুলেছিল। আমি বললাম ঘোষালদাকে একটু দিন তো...ও...ও... কথাটা শেষ করতে পারল না ইন্দ্রকুমার। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল।

বাসু বোধহয় একটু বিব্রত হলেন। বিরক্তও। বললেন, লুক হিয়ার ইন্দ্র! উই আর অল সরি ফর য়ু। ডক্টর ঘোষাল আমাদের পরিচিত একজন সজ্জন, তাঁর মৃত্যুতে আমরা সবাই কমবেশি আঘাত পেয়েছি। কিন্তু তিনি তোমার কাছে ছিলেন 'শিবু'—সহপাঠী, বাল্যবন্ধু! হি ওয়াজ য়োর পেট্রোক্লাস...

বলেই হকচকিয়ে থেমে যান। রানু কথার খেইটা তুলে নিয়ে বলেন, এভাবে ভেঙে পড়লে তো চলবে না। আপনি মনকে শক্ত করুন। যে সমাজবিরোধীটা বিষ দিয়ে আপনার বন্ধুকে হত্যা করেছে... সেই যে, কী-যেন নাম লোকটার...

কৌশিক অধোবদনে অস্ফুটে বলে, হেক্টর!

বাসু প্রায় ধমকে ওঠেন, না! কাল্লু! কাল্লু মিঞা!

রানু কৌশিককে চোখ দিয়ে ইশারা করে বাক্যটা শেষ করেন, সেই কাল্লুকে ফাঁসিকাঠ থেকে না ঝোলানো পর্যন্ত তো শোকে বিহ্বল হবার অধিকার আপনার নেই।

ব্রজদুলাল বলেন, এই কথাটাই আমি দুদিন ধরে বোঝাবার চেষ্টা করছি।

বাসু প্রসঙ্গটা ঘোরাতে চান : ডিনারে কে কে ছিল?

ব্রজদুলাল বলেন, ঠিক জানি না। নার্সিংহোমের তিন-চার জন, যাঁদের নাম আমি জানি না। আর ডক্টর ঘোষালের কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবী এসেছিলেন যাঁদের অ্যাগি বা ডক্টর দাশ চেনেন না। তবে ক্যাপ্টেন পালিত আর ছায়া ছিল এ খবর পেয়েছি।

—আপনারা দুজনে চুঁচুড়া গিয়েছিলেন নিশ্চয়। কবে?

ব্রজদুলাল বলেন, না, ইন্দ্র যায়নি। ও তখনো সামলে উঠতে পারেনি। আমি গিয়েছিলাম আমাদের থিয়েটার কোম্পানির ম্যানেজারকে নিয়ে। একটা 'রেন্ট-এ-কার' ভাড়া নিয়ে। বিশেষ কিছুই জানতে পারিনি। হয় কেউ কিছু জানে না অথবা জেনেও না-জানার ভান করছে।

—সদর থানা কী বলছে?

ব্রজদুলাল বললেন, থানার ও. সি. লোকটা স্বভাবতই দুর্মুখ না পয়সা খেতে চায়, বুঝে উঠতেই পারলাম না। সে কোনো সাহায্যই করলো না।

—'বিষপ্রয়োগে হত্যা' এটা তো স্বীকার করলো?

—আজ্ঞে না। তাহলে বলি, শুনুন :

ব্রজদুলালের মতে সদর থানার ও. সি. গণেশচন্দ্র সাহা একটি পোড়-খাওয়া পাঁড় ঘুঘু। কার্ড পেয়েই ডেকে পাঠালেন। অতি আপ্যায়ন করে বসালেন ভিজিটার্স চেয়ারে। বললেন, বলুন স্যার, কীভাবে আপনাদের সেবা করতে পারি? জনগণের সেবা করতেই তো আছি আমরা!

ব্রজদুলাল মুখ খোলার আগেই পুনরায় বলেন, আপনি তো স্যার ঐ 'নটরঙ্গ' থিয়েটার হলের মালিক? তাই না? কী নাটক হচ্ছে এখন? এখান থেকে গিয়ে থিয়েটার দেখে ফিরে আসা তো প্রায় অসম্ভব। তবে আমার শ্বশুরবাড়ি শ্যামবাজারেই। থিয়েটার দেখে রাতটা কলকাতায় থেকে আসা যায়।

ব্রজদুলাল সিগ্রেটের কার্টন বাড়িয়ে ধরে বললেন, কার্ডে আমার টেলিফোন নাম্বার লেখা আছে। ফোন করে দেবেন—টিকিট নিয়ে গেটে লোক থাকবে।

—গেলে একা যাব না কিন্তু। শ্বশুরবাড়ির ব্যাপার...

—তা তো বটেই। কখানা টিকিট চাই সেটাও বলে দেবেন। এবার কি কাজের কথায় আসব?

গণেশচন্দ্র ইতিমধ্যে সিগ্রেটটা ধরিয়েছেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, কাজ তো আছেই মশাই—চৌপর দিন শুধু কাজ আর কাজ...

হঠাৎ বেজে উঠলো টেলিফোনটা।

—আঃ!—একটা বিরক্তি প্রকাশ করে ফোনটা তুলে কানে লাগালেন। ও-প্রান্ত থেকে কে কী জানতে চাইলো বোঝা গেল না। গণেশ বললেন, সরি! রঙ নাম্বার। না, না, না! এটা সদর থানা নয়।

বলেই বাঁ-হাতে কানেকশনটা কেটে দিয়ে টেলিফোনটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বললেন, এরা নিশ্বাস ফেলতে দেয় না মশাই। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম... আপনার থ্যাটার হলে এখন কী পালা চলছে?

—রেনোভেশন।

—রেভেলিউশন? কিসের বিপ্লব?

—আজ্ঞে না, ভাঙা-চোরার কাজ। থিয়েটার এখন বন্ধ আছে। কাজের কথায় আসতে পারি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন না। কী ব্যাপার?

—মমতাময়ী মেন্টাল-হোমের ডক্টর শিবশঙ্কর ঘোষাল আমার বিশেষ বন্ধু। গত শনিবার তিনি মারা গেছেন। পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা কি পাওয়া গেছে?

গণেশচন্দ্র বার দুই-তিন সিগ্রেটে টান দিয়ে জানতে চাইলেন, ডক্টর ঘোষালের ওয়ারিশ কে? কোনো ব্লাড-রিলেশন চুঁচুড়ায় নেই?

ব্রজদুলাল বললেন, যতদূর জানি ওঁর কোনো ব্লাড-রিলেশন চুঁচুড়ায় নেই। উনি কনফার্মড ব্যাচিলার। ভাই-ভাইপোরা কে-কে আছে জানি না। তবে এখানে নেই।

—আই সি!

নীরবে গণেশচন্দ্র সিগ্রেট টেনে চলেন। ব্রজদুলাল পুনরায় একই প্রশ্ন পেশ করতে যান : পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা?

—হ্যাঁ পাওয়া গেছে। যথাস্থানে সেটা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—'বিষ'-এর কোনো ট্রেস কি পাওয়া গেছে?

—সরি, স্যার। সে-কথা তো আপনাকে বলা যাবে না। হয় ডাক্তার ঘোষালের কোনো ব্লাড-রিলেশন আসবেন। অথবা তাঁর ওয়ারিশের ওকালতনামা নিয়ে...

ব্রজদুলাল বাধা দিয়ে বলেন, আমরা তো স্যার লিখিত রিপোর্ট চাইছি না। জাস্ট আপনার মৌখিক কথা।

ঠিক সেই সময় শাসকদলের কোনো হোমড়া-চোমড়া এসে ঘরে ঢোকেন। গণেশ উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন। আসুন, আসুন স্যার।

আগন্তুক ব্রজদুলাল ও তাঁর ম্যানেজারকে দেখিয়ে জানতে চান, এঁদের সঙ্গে আপনার কাজ মিটেছে?

ও. সি. ব্রজদুলালের দিকে ফিরে বললেন, আপনারা দুজন যদি কাইন্ডলি একটু ঐ বারান্দার বেঞ্চে গিয়ে বসেন, তাহলে স্যারের সঙ্গে জরুরি কথাটা সেরে নিতাম।

—অফ কোর্স!—উঠে দাঁড়ালেন ওঁরা দুজন।

গণেশচন্দ্র একজন সেপাইকে হুকুম দিলেন। এঁদের দু-কাপ চা-বিস্কুট দাও। কলকাতা থেকে অনেকটা পথ এসেছেন। শেষে যেন থানার বদনাম করে না যান!

ব্রজদুলাল অবশ্য চা-বিস্কুট না খেয়েই ফিরে এসেছিলেন।

বাসু বললেন, বুঝলাম। দ্য স্লেট ইজ ক্লিন ইয়েট! কাজের কাজ শুরুই হয়নি। আপনারা বোধহয় কোনো এফ. আই. আর.-ও লজ করে আসেননি?

—কী লিখব F.I.R.-এ? কেসটা যে 'পয়েজনিং' তাও তো জানি না!

বাসু পকেট থেকে পাইপ-পাউচ বার করলেন। ধরাতে ধরাতে সুজাতাকে বললেন, ডি. আই. জি. বার্ডওয়ান রেঞ্জকে ধর তো। প্রথমে অফিসে, না পেলে রেসিডেন্সে। নাম্বারটা আমার টেলিফোন বইতে আছে 'পি'-তে, মানে 'পুলিস'-এন্ট্রিতে।

এসব কাজ সচরাচর রানুদেবীর। তবে আজ তিনি সারাদিন জার্নি করেছেন, তাই সুজাতাকে বলা। সুজাতা বই ঘেঁটে দেখল ডি. আই. জি. বার্ডওয়ানের অফিসটা চুঁচুড়ায়। ফোন করে জানল : সাহেব বাড়িতে চলে গেছেন।

সুজাতা এবার রেসিডেন্স-নাম্বারটা ডায়াল করলো।

রিঙিং টোন...মহিলাকণ্ঠে : হ্যালো? দিস্ ইস্ রেসিডেন্স অব ডি. আই. জি. বার্ডওয়ান রেঞ্জ।

সুজাতা সাদা বাংলায় বললো, গুড ঈভনিং, ডি. আই. জিকে কাইন্ডলি লাইনটা দেবেন? পি. কে. বাসু বার-অ্যাট-ল একটু কথা বলতে চান...

ও-প্রান্ত থেকে মহিলাকণ্ঠে একটু রূঢ় জবাব শোনা গেল : সরি। উনি এখন রেস্ট নিচ্ছেন। কাল সকালে ফোন করবেন...

সুজাতা কিছু বলার আগেই লাইনটা কেটে দিল।

বাসু জানতে চান : কী হলো?

—মহিলাকণ্ঠ। মিসেস্ না রিসেপশনিস্ট বুঝতে পারলাম না। বললেন, ডি. আই. জি. রেস্ট নিচ্ছেন। কাল সকালে ফোন করতে বললো!

—ও! দাও ফোনটা আর নাম্বারটা।

রানু জানতে চান, আমি দেখব?

—না! আমিই দেখছি। তুমি আজ ক্লান্ত!

অনেকগুলি নাম্বার ডায়াল করার পর রিঙিং টোন শোনা গেল। একটু পরেই মহিলাকণ্ঠে : গুড ঈভনিং! দিস্ ইজ ডি. আই. জি. বার্ডওয়ানস্ রেসিডেন্স!

—বাচ্চু আছে? থাকলে তাকে দাও, না থাকলে একটা মেসেজ লিখে নাও!

মেয়েটি চোস্ত ইংরেজিতে বললে, আপনি বোধহয় ভুল নাম্বার ডায়াল করেছেন। সরি!

বাসু তৎক্ষণাৎ ইংরেজিতে বলেন—ও টেলিফোন নামিয়ে রাখার আগেই—বুঝতে পারছি তুমি সোমা রায়চৌধুরী নও—কারণ সে জানে তার কর্তা ডি. আই. জি. সাহেবের ডাক নাম 'বাচ্চু'। তাহলে তুমি কে বট, মা? রিসেপশনিস্ট?

মেয়েটা থতমত খেয়ে বললে, আপনি কে?

—তুমি আমায় চিনবে না, মা,—বাচ্চু বা সোমা থাকলে ফোনটা তাদের দাও। বল, প্রসন্নকাকু ফোন করছে।

মেয়েটি জবাব দিল না। টেলিফোনে কিছু জলতরঙ্গের শব্দ। তারপর ভারী কণ্ঠে কে যেন বললে, ইয়াস? হুম ড়্যা য়ু ওয়ান্ট?

—বাচ্চু? হ্যালো! দিস্ ইজ প্রসন্নকাকু। পি. কে. বাসু অব ক্যালকাটা বার।

—হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো! কাকু? বলুন, কী করতে পারি আমি আপনার জন্য?

—কাল যে-কোনো সময় দশ মিনিট পেশেন্ট হিয়ারিং।

—কাল? কাল তো আমি সারাদিনই... ওয়েল সকাল সাড়ে আটটা... উড্ দ্যাট বি টু আর্লি?

—নট দ্য লিস্ট। সকাল সাড়ে আট, ঠিক হ্যায়, কিন্তু কোথায়?

—আমার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাবেন। খেতে খেতে দশ মিনিট কেটে যাবে। কথা বলাও ফুরোবে।

—আমি রাজি। কিন্তু একটা শর্ত আছে।

—বলুন?

—টাইম আর ভেনু স্থির করেছ তুমি। মেনুটা স্থির করব আমি : নো এগ্, নো বাটার, নো বেকন! মায় নো টোস্ট!

—তাহলে আপনি খাবেন কী?

—পাকা পেঁপে, কলা, শশা, ফুটি, আঙুর, ডালিম—এর মধ্যে যে-কোনো তিনটে। একটা বিস্কুট—ক্রিমছাড়া—আর র-কফি এক্কাপ!

—অল রাইট, স্যার! অ্যাজ য়ু প্লিজ। আপ রুচি খানা!

—সোমা কি চিনসুরায়?

—হ্যাঁ! তবে এখন বাড়িতে নেই।

—তা না থাকুক। কাল সাড়ে-আটটায় যেন সে বাড়িতে থাকে। টু অ্যাটেন্ড মাই ট্রোজান ব্রেকফাস্ট! ও. কে?

—শিওর!

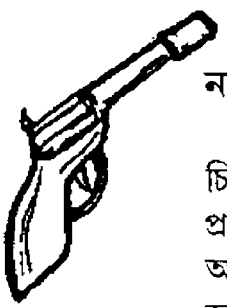

নয়

পরদিন সকাল আটটা পঁচিশে ব্রজদুলালের ভ্যানটা প্রবেশ করলো চিনসুরায়, ডি. আই. জি. বার্ডওয়ান রেঞ্জ-এর বাংলোর হাতায়। বিনা প্রতিবাদে নয়। আর্মড গার্ড গেটেই রুখে দিল গাড়িটা। বাসুসাহেব নিজের আইডেন্টিটি-কার্ডটা দেখালেন। প্রহরী স্বীকার করলো—তার উপর নির্দেশ আছে, ঐ নামের আগন্তুককে ভিতরে যেতে দিতে।

সঙ্গে ব্রজদুলাল, অশোক ও ইন্দ্রকুমারও এসেছেন। ওঁরা রওনা হয়েছেন অতি প্রত্যূষে, যাতে সাড়ে আট-এর আগেই অকুস্থলে উপনীত হতে পারেন। প্রাতরাশ কারও হয়নি। ব্রজদুলাল বাসুসাহেবকে বললেন, আপনি স্যার, ভিতরে যান। আমরা ততক্ষণ সামনের ঐ মিষ্টির দোকানটায় বসে সকালবেলাকার 'নাস্তা'টা সেরে আসি। আমাদের উপস্থিতিতে ডি. আই. জি.-সাহেব হয়তো তাঁর প্রসন্নকাকুর সঙ্গে খোলামনে কথাবার্তা বলতে সঙ্কোচ করবেন।

বাসু বললেন, হ্যাঁ, প্রস্তাবটা ভালো! আপনারা নাস্তা সেরে ঐ ফাঁকা জায়গায় গাড়ি পার্ক করবেন, গাছের ছায়ার তলায়।

ব্রজদুলাল বললেন, আপনার নাস্তার নিমন্ত্রণ তো ডি. আই. জি.-সাহেবের বাড়িতেই। দেখুন, আপনার বরাতে ছয়জন ফেরারী আসামীর মধ্যে চুঁচুড়ার বাজার থেকে ডি. আই. জি.-র আর্দালি কোন তিনজনকে গ্রেপ্তার করে।

বাসু চলতে শুরু করেছিলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, ঠিক বুঝলাম না তো! ছয়জন ফেরারী আসামী! কে তারা?

—পাকা পেঁপে, কলা, শশা, ফুটি, আঙুর, ডালিম—এদের মধ্যে মাত্র তিনজনই না হবে বিস্কুট আর র-কফির সঙ্গী!

বাসু স্মিত হেসে বললেন, ও আই সি! আচ্ছা, আসুন আপনারা। 'বাই নাইন' আমি বেরিয়ে আসব।

কলবেল বাজাতে হলো না। ডি. আই. জি.-র ঘরণী সোমা রায় বাগানে মালিকে দিয়ে গাছের 'কলম' বানাচ্ছিল। বাসুর গাড়ি কম্পাউন্ডের ভিতর ঢুকতে দেখেই সে এগিয়ে আসে। তার পরনে একটা হাউস-কোট। সে পদস্পর্শ করে বাসুসাহেবকে প্রণাম করে বললো, কাকিমা কেমন আছেন?

বাসু আশীর্বাদ করতে ওর খোঁপায় একটা হাত রাখলেন। বললেন, বাঃ! তুমি তো আচ্ছা ভাইঝি! আগে জিজ্ঞেস কর 'কাকু, কেমন আছেন?' তার পর না কাকিমার প্রসঙ্গ?

—না, কাকু! আপনি যে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত 'জনি-ওয়াকার' থাকবেন তা আমরা সবাই জানি। ভয়টা কাকিমাকে নিয়ে।

বাসু হাসলেন। হাসিটা ম্লান। বললেন, তোমার জ্ঞানটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল কেন, সোমা? তুমি জান না : তোমার কাকিমাও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত 'জেনী-হুইলচেয়ারাসীনা'ই থাকবেন?

সোমা লজ্জা পায়। বলে, উঁই আর আল সরি ফর হার, কাকু!

—য়ু অল আর রঙ দেয়ার! 'ওয়াকার' আর 'হুইলচেয়ারার' উঁই বোথ্ আর স্টিল গোয়িং স্ট্রং। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাই যাবও। বাচ্চু কোথায়?

—আসুন, ভিতরে আসুন।

বাচ্চু বা ডি. আই. জি. বার্ডওয়ান রেঞ্জ ধড়াচূড়া পরে তৈরি। নয়টার সময় ওঁর দেহরক্ষী আর গাড়ি এসে যাবে। ধড়াচূড়া-পরা অবস্থাতেই প্রসন্নকাকুকে প্রণাম করে বললেন, ওফ্। কদ্দিন পরে দেখা হলো, কাকু?

—তা তো হিসাব রাখিনি। বোধহয় তোমার বাবার শ্রাদ্ধবাসরে শেষ দেখা হয়েছে তোমার সঙ্গে। সেটা বছর পনের হবে ; তাই না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রায় তাই। তা শুনুন, দুপুরে এখানে দুটি খেয়েই যান না। আমি বেলা দেড়টার মধ্যে ফিরে আসব। অ্যাদ্দিন পরে দেখা, একটু জিন-লাইম তো খাবেন, অথবা বিয়ার।

—লোভ দেখাচ্ছ?

—লোভ আর কাকে দেখাব, কাকু? আপনি তো একদম বদলে গেছেন। কলা-পেঁপে-আপেল সহযোগে ব্রেকফাস্ট করছেন বাসুকাকু। আমি তো ভাবতেই পারি না।

বাসু আঁৎকে ওঠেন : কলা-পেঁপে-আপেল? ব্রেকফাস্টে ভদ্রলোক খায়?

ততক্ষণে ডি. আই. জি.-সাহেবের খিদ্‌মদ্‌গার টেবিল সাজিয়ে ফেলেছে। একদিকে টোস্ট-মাখন, ডব্‌ল্ ডিমের পোচ, পরিজ, বিপরীত দিকে একটা বড় প্লেটে নানান কাটা ফল—পেঁপে-কলা-শশা-আঙুর-আপেল...

বাসু তড়িঘড়ি তাঁর ভাইপোকে গোঁতা মেরে সরিয়ে দিয়ে টোস্ট-মাখন-পাড়ার চেয়ারে বসে পড়েন। ডব্‌ল্-ডিমের পোচের প্লেটটা টেনে নিয়ে সোমাকে প্রশ্ন করেন, বাচ্চু বুঝি আজকাল সকালবেলা ফল-টল খায়? ভালো, খুব ভালো! চল্লিশ বছর পার হলেই খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে সংযম করা উচিত।

সানি-সাইড-আপ একটি পোচ টোস্টের উপর বসিয়ে বাঁ-হাতে সেটা তুলে নিয়ে বলেন, কি হলো বাচ্চু? বস। তোমার দেরি হয়ে যাবে যে।

সোমা আর তার স্বামী দুজনেই রীতিমতো বিব্রত। ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারে না। শেষে সোমাই প্রশ্নটা পেশ করে : মানে? আপনি ফল খাবেন না? কলা-শশা-পেঁপে...

বাসু টোস্টে কামড় দিয়ে বলেন, কেন? ফল খেতে যাব কোন দুঃখে? আমি কি বাচ্চুর মতো সদ্য-চল্লিশোর্ধ্ব?

ডি. আই. জি. ওঁর বিপরীতে বসে পড়েছেন প্রশ্ন করেন, তাহলে কাল রাত্রে ও-কথা বললেন কেন?

—সে তো অতীতের কথা। গতকাল। স্থান-কাল-পাত্র সব বদলে গেল না?

সোমা বলে, ব্যাপারটা কিন্তু আমার বোধগম্য হলো না, কাকু।

—এখনো তোমার সময় হয়নি/যেথায় চলেছ যাও তুমি ধনি/সময় যখন আসিবে তখনি/বুঝিবে গো সোমা, বুঝিবে। যাও। আপাতত আরও খান-দুই টোস্ট আর ডব্‌ল্ ডিমের পোচ বানিয়ে নিয়ে এস দিকিন—

সোমাকে এসব বানাতে হয় না। সে পাচিকাকে চোখের ইঙ্গিত করে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। বললো, ওসব বাজে কথা বাদ দিন! বলুন, কাল কেন বলেছিলেন, নো এগ, নো বাটার, নো বেকন, নো টোস্ট? বলেননি একথা?

—আই কনফেস! বলেছিলাম! কারণটা বোঝবার মতো বয়স এখনো তোমার হয়নি। বাচ্চুর বয়স যখন বাহাত্তর হবে, আর তুমি পাকাচুলে সিঁদুর পরে টেলিফোনের পাশে ঠায় বসে পাহারায় থাকবে, তখন বাচ্চুও টেলিফোনে ঐ কথাই বলবে!

দুজনেই হো হো করে হেসে ওঠে।

সোমা বলে, ঠিক আছে। আমি এক্ষুণি কাকিমাকে টেলিফোন করে সব কথা বলে দিচ্ছি।

—ইট্‌স্ য়োর প্রিভিলেজ। সদর দরজাটা তোমার বাড়ির। প্রসন্নকাকুর নাকের সামনে দরজাটা বন্ধ করে দিতে চাইলে আমি কী করতে পারি?

প্রাতরাশান্তে ওঁরা দুজনে গিয়ে বসলেন ডি. আই. জি.-সাহেবের খাশ কামরায়। ডি. আই. জি. বলেন, এবার বলুন, কাকু, প্রয়োজনটা কী?

বাসু আদ্যোপান্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেন। পুরী ভ্রমণ, অ্যাবে বিল শবরিয়ার সন্দেহজনক মৃত্যু। তার মদের গ্লাসে পানাবিশিষ্ট তরল পদার্থে কোনো বিষের চিহ্নমাত্র না পাওয়া। পরে এটাকে 'হার্ট-ফেল' বলে ধরে নিয়ে অ্যাবে শবরিয়াকে ওড়িশায় সুদূর গুনপুর গ্রামে সমাধিস্থ করা। চিনসুরার প্রখ্যাত মনের ডাক্তার ঘোষালসাহেবের মৃত্যুর সঙ্গে সেই ঘটনাটির একটা বিচিত্র সাদৃশ্য আছে। দুজনেই বহু প্রত্যক্ষদর্শীর সম্মুখে নৈশ-ডিনারে মদ্যপান করতে করতে হার্ট-অ্যাটাকে মারা গেছেন।

বিকাশ রায়চৌধুরী, ওরফে 'বাচ্চু' বললেন, হ্যাঁ, কেসটার কথা আমি শুনেছি; মানে অ্যাবে শবরিয়ার কেস নয়, ডক্টর ঘোষালের রহস্যজনক মৃত্যুর কথা। ডক্টর ঘোষালের ডিনার পার্টিতে ঘটনাচক্রে উপস্থিত ছিলেন এক পালিত দম্পতি। তার ভিতর মিসেস্ পালিতই প্রথম ইঙ্গিত করেন যে, এটি হার্ট-ফেলের বদলে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হলেও হতে পারে। ওঁরা লোকাল থানায় ফোন করেন। ঐ মেন্টাল স্যানাটোরিয়ামের মেট্রন এবং ডাক্তার অমরেশ দাশের অনুরোধে আমরা ডক্টর ঘোষালের দেহটা পোস্টমর্টেম করাই।

বাসু বললেন, হ্যাঁ, এ পর্যন্ত শুনেছি। রেজাল্ট কী হয়েছে?

—মোস্ট মিস্টিরিয়াস্! ওঁর স্টম্যাকে একটা পয়জনাস কম্পাউন্ডের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে—নিকোটিনের একটা ডেরিভেটিভ—যে বিষ সাধারণ পরীক্ষায় ধরা না-ও পড়তে পারে; অথচ যার বিষক্রিয়া প্রায় পটাশিয়াম সায়ানাইডের মতো তীব্র। রসায়ন বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞেস করে তিনটি তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি যা রীতিমতো রহস্যময়। প্রথম কথা, নিকোটিনের এই ডেরিভেটিভ জলে বা অ্যালকোহলে দ্রবণীয় ; দ্বিতীয়ত, চার-পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যেই হৃদপিণ্ডের রক্ত জমাট বাঁধিয়ে মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে; এবং তৃতীয়ত, এই কেমিক্যাল-কম্পাউন্ডটি ভারতে তৈরি বা বিক্রি হয় না। কারণ স্পেশালিস্ট ব্যতিরেকে কারও কোনো প্রয়োজনেও লাগে না। অর্থাৎ এটিকে বিদেশ থেকে স্মাগল্ করে আনা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এমন দুর্লভ বিষপ্রয়োগে কেন হত্যা করার চেষ্টা হবে এক্ষেত্রে? ডক্টর ঘোষাল কিছু ভাওয়ালের অথবা পাকুড়ের রাজকুমার নন যে বিষ সংগ্রহে কয়েক শত বা সহস্র মুদ্রা ব্যয় করতে আততায়ী কুণ্ঠিত হবে না!

বাসু বললেন, তার চেয়েও বড় কথা অমন একটি দুর্মূল্য এবং দুর্লভ বিষ দিয়ে অ্যাবে শবরিয়ার মতো একটি অজাতশত্রু-তথা-কপর্দকহীনকে কেন হত্যা করা হবে?

বিকাশ বাধা দিয়ে বললেন, ওটা আপনার 'ওয়াইল্ড গুজ চেজ'। অ্যাবে শবরিয়াকে যে আদৌ বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে এমন প্রমাণ নেই।

—না নেই। প্রমাণ নেই। কিন্তু বিচিত্র ঘটনা পরম্পরায় সম্ভাবনাটাকে উড়িয়ে দেওয়াও যাচ্ছে না। হ্যাঁ, ভালো কথা, যে গ্লাস থেকে ডক্টর ঘোষাল পান করেছিলেন তার তলানিটা কি পরীক্ষা করা হয়েছে?

ডি. আই. জি. বলে ওঠেন, সেটাই এ সমস্যার মোস্ট মিস্টিরিয়াস্ এপিসোড। তলানিতে কোনো বিষাক্ত ইনগ্রিডিয়েন্ট আদৌ পাওয়া যায়নি।

বাসু বলেন, এটা কেমন করে সম্ভব? নাম্বার ওয়ান : প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন ঐ পাত্র থেকে পান করতে করতে তিনি লুটিয়ে পড়েন—মারা যান। নাম্বার টু : অটোপ্সি সার্জেন বলছেন তীব্র বিষক্রিয়ার মৃত্যু। নাম্বার থ্রি : পানপাত্রের তলানিতে বিষের চিহ্নমাত্র নেই!

ডি. আই. জি. বললেন, মৃত্যুটা অবিসংবাদিত সত্য, অটোপ্সি সার্জেনের রিপোর্ট নির্ভুল; সুতরাং বুঝতে হবে : যে-গ্লাসের তলানি সংগ্রহ করা হয়েছিল সেটা ভুল করে সংগ্রহ করা! সেটা অন্য একটি গ্লাস।

—আর য়ু শিওর 'ভুল করে সংগ্রহ করা'?

—তাছাড়া কী?

—মার্ডারার সেটা কায়দা করে বদলে দিয়েও থাকতে পারে।

—তা পারে। যদি সে অকুস্থলে উপস্থিত থেকে থাকে। সে যাই হোক, আপনি আমার কাছে ঠিক কী কী চাইছেন?

বাসু বললেন, নাম্বার ওয়ান : এই কেসটাতে আমাকে সাহায্য করবার জন্য পুলিসের একজন ইন্টেলিজেন্ট অফিসার—সার্জেন্ট র‍্যাঙ্কের হলেই চলবে। তবে তার আর কোনো কাজ থাকবে না। নাম্বার টু : অটোপ্সি সার্জেনের রিপোর্টের একটা জেরক্স কপি।

বিকাশ বললেন, লুক হিয়ার, কাকু। এ-কাজটা এখন আর ঠিক আমার এক্তিয়ারে থাকছে না। ডি. সি. ডি. ডি.-র আন্ডারে চলে যাচ্ছে। মানে ডেপুটি কমিশনার, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট। তাঁর অফিস কলকাতায়।

—জানি। কিন্তু বর্তমানে ডি. সি. ডি. ডি.-র পোস্টে কে আছেন?

—মিস্টার বকুল বিশ্বাস। চেনেন?

—বকুল বিশ্বাস! মানে সেই যিনি শিলিগুড়িতে জেলা-সর্বাধিকারী না কাকে যেন, সিমেন্ট চুরির দায়ে গ্রেপ্তার করেছিলেন?

—এ-কথায় কী জবাব দেব, কাকু? আপনি যদি জানতে চান 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর? মানে কি সেই দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকটি যিনি বীরভূমের কী একটা স্কুলে পড়াতেন?' তাহলে তার জবাব কী হবে?

বাসু অট্টহাস্য করে ওঠেন! বলেন, দ্যাটস্ এ স্প্লেন্ডিড রেইলারি। অর্থাৎ বকুল বিশ্বাসের নানান কীর্তির তুলনায় ঐ ঘটনাটা অকিঞ্চিৎকর। না, বকুলবাবুর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ আলাপ নেই। করে নেব। তুমি তাহলে আমার সঙ্গে এখানকার এস. পি.-র আলাপ করিয়ে দাও। তাঁর কাছ থেকে আমি পুলিস-ইন্‌ভেস্টিগেশনে কতটুকু জানা গেছে তা সংগ্রহ করে নিতে পারব।

—ঠিক আছে। কিন্তু এস. পি. নয়। ডি. এস. পি.। তিনটি হেতুতে। প্রথম কথা : এস. পি. বর্তমানে অন্য একটি কাজে প্রচণ্ড ব্যস্ত। দ্বিতীয় কথা : ডি. এস. পি. যুগলকিশোর সেনরায় ছিল ডক্টর ঘোষালের একজন গুণগ্রাহী। যুগলের স্ত্রী প্রায় উন্মাদ হতে বসেছিল ; ডক্টর ঘোষালের চিকিৎসাতেই সে ভালো হয়ে গেছে। তৃতীয় কথা: আমি জানি, যুগল আর তার স্ত্রী গোয়েন্দা গল্পের পোকা। আপনার কাঁটা-সিরিজের সবকয়টা গল্প আছে ওদের সংকলনে। ওরা দুজনেই আপনার ফ্যান। ওকে ফোন করব?

—কর। বল, আমি আধঘণ্টার মধ্যেই ওঁর রেসিডেন্সে আসছি। ঐ সঙ্গে তোমাদের সদর থানার ও. সি.-কেও ধর—গণেশ সাহা। তাকে বল, যুগল সেনরায়ের বাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করতে। আমার নাম বা পরিচয় তাকে দেওয়ার দরকার নেই।

বিকাশ টেলিফোন রিসিভারটা তুলে নিলেন।

বিকাশচন্দ্র একটি সরকারি গাড়িতে তাঁর কাকুকে ডি. এস. পি. যুগল সেনরায়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। যুগল খুশি হলেন পি. কে. বাসু তাঁর বাড়িতে আসছেন শুনে। তিনি সস্ত্রীক বাসু-সাহেবের ফ্যান। বাসু ব্রজদুলালকে নির্দেশ দিলেন ভ্যান গাড়িটা নিয়ে মানসিক হাসপাতালে চলে যেতে এবং অ্যাগি বা অন্যান্য কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে সেই রাত্রের ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সংগ্রহ করতে। ইন্দ্রকুমার এখন স্বাভাবিক হয়েছে। সেও বললো, ঠিক আছে, স্যার।

যুগলও স্বীকার করলেন যে, মদ্যপাত্রের তলানিতে যে তরল পদার্থ পাওয়া গেছে তাতে বিষের চিহ্নমাত্র না পাওয়া একটা রহস্যজনক ঘটনা। তবে সর্বজনসমক্ষে আততায়ী বা তার এজেন্ট হাতসাফাই করে গ্লাসটা বদলে দিয়েছে এটা বিশ্বাস করতে চাইলেন না। যে পুলিস সাব-ইন্সপেক্টর মৃত্যুর খবর পেয়ে তদন্ত করতে যায়, তার উচিত ছিল সবকয়টি পানপাত্রই সংগ্রহ করে আনা। হয়তো যে গ্লাসটা ও তুলে এনেছে, ঠিক তার পাশেই ছিল ডক্টর ঘোষালের বিষাক্ত পানপাত্রটা।

বাসু জানতে চাইলেন, মৃত্যুসময়ে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের জবানবন্দি পুলিস নিশ্চয় সংগ্রহ করেছে। সেই জবানবন্দির এককপি জেরক্স আমার এখনি চাই। সম্ভবপর হলে দু-একজন প্রত্যক্ষদর্শীকে আমি আজই জেরা করতে চাই।

কথা হচ্ছিল ডি. এস. পি-সাহেবের বৈঠকখানায়। মিসেস্ পম্পা সেনরায় বসেছিল সেই আলোচনার আসরে। বাসুসাহেব ওর কর্তার উপরওয়ালার বাড়িতে ব্রেকফাস্ট সেরে এসেছেন, এখন এককাপ কফিও খাবেন না শুনে বেচারি মর্মাহত। বাসু তাকে আশ্বস্ত করেছেন—চুঁচুড়ায়

তাঁকে সম্ভবত বার কয়েক আসতে হবে। এর পরের বার উনি পম্পার নিজের হাতে তৈরি রান্না পরখ করে যাবেন, বাজারের মিষ্টি নয়—আর ওর বুক-র‍্যাকে কৌশিকের লেখা সবগুলি কাঁটা-সিরিজের বইতে আশীর্বাদী-স্বাক্ষর দিয়ে যাবেন। তা, এই অবকাশে পম্পা বলে ওঠে, আমি একটা কথা বলব, মামু?

—মামু?

—বাঃ! সুজাতাদি তো আপনাকে 'মামু'ই ডাকে।

—ও ইয়েস! তা কী বলবে বল?

—আপনি আমার জবানবন্দিও নিতে পারেন। কারণ সে রাত্রে আমাদের দুজনেরই নিমন্ত্রণ ছিল—ও যেতে পারল না, মস্তানপার্টির বোমাবাজিতে একজন খুন হয়ে যাওয়ায়। আমি গেছিলাম। ডাক্তার ঘোষাল আমার সামনেই মারা যান।

একজন প্রত্যক্ষদর্শীকে হাতের কাছে পেয়ে বাসু উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। যথারীতি তাঁর হাত পকেটে প্রবেশ করে—পাইপ-পাউচের সন্ধানে। বলেন, তবে তো সুবিধেই হলো। তুমি গুছিয়ে সব কথা বল তো মা, কী উপলক্ষে ঐ ডিনার পার্টি, কে কে উপস্থিত ছিল—মানে তোমার পরিচিত। আর ঠিক কীভাবে মৃত্যুটা ঘনিয়ে এল। প্রথমে তুমি মনকে সংযত কর, একাগ্র কর, তারপর সেই অতীত মুহূর্তটিকে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা কর। আমাদের উপস্থিতির কথা ভুলে যাবার চেষ্টা কর—ধ্যান করার সময় সাধকেরা যেমন করে। তারপর তোমার স্মৃতিচারণকে বাঙ্ময় করে তোলো। সবটা শুনে আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করব। এখন তোমার স্মৃতিচারণে আমি বা যুগল বাধা দেব না।

তারপর যুগলকিশোরকে বললেন, তুমি তোমার কোনো খিদ্‌মদ্‌গারকে বলে দাও—এখন যেন কেউ ঘরে না আসে—কোনোভাবেই পম্পাকে ডিস্‌টার্ব না করে।

পম্পা বোধহয় কখনো কল্পনাই করেনি যে, 'কাঁটা-সিরিজের' একটি চরিত্রে তাকে, নিজেকে, অভিনয় করতে হবে, তার নাম কোনো বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় ছাপা হবে—হাজার হাজার পাঠক-পাঠিকা পম্পা সেনরায়ের নামটা জানতে পারবে। আচ্ছা, কৌশিকদা কি পম্পার বর্ণনা দিতে একটু যত্ন নেবে? লিখবে কি যে, তার বয়স পঁয়ত্রিশ হলেও তাকে দেখায় সাতাশ-আটাশের কাছাকাছি? সে তন্বী, হ্যাঁ শ্যামাই—তবে 'মধ্যক্ষামা' ; বোঝা যায় না যে, সে দু-দুটি সন্তানের জননী—ওর মাথার চুল...

—কী হলো, এবার শুরু কর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বলি :

কী উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করেছিলেন ডাক্তারসাহেব তা পম্পা জানে না। ডাক্তার ঘোষালকে সে দশ-বারো বছর ধরে চেনে। বস্তুত সে ছিল ওঁর পেশেন্ট। সপ্তাহে দু-দিন ওঁর চেম্বারে পম্পাকে যেতে হতো—

হঠাৎ বর্ণনা থামিয়ে বাসুসাহেবকে প্রশ্ন করে, একটা কথা মামু! কৌশিকদা কি এই কাহিনীটা কোনো 'কাঁটা-সিরিজে' লিখবে?

বাসু ইতিমধ্যে পাইপ ধরিয়েছেন। বলেন, তা তো বলতে পারব না, মা। দু-দুটো ঘটনাই যদি 'হার্ট-ফেলিওর' কেস হয় তবে কৌশিক নিশ্চয় পণ্ডশ্রম করবে না। কিন্তু যদি একটাও—মোস্ট প্রব্যাবলি ডক্টর ঘোষালের কেসটা—যদি খুন হয়, আর আমরা আততায়ীকে চিহ্নিত করতে পারি, তাহলে ও এ নিয়ে একটা গল্পো লিখতে পারে। কিন্তু সে প্রশ্ন হঠাৎ তোমার মনে এখন জাগল কেন?

—না, মানে তাহলে কৌশিকদাকে বলবেন, হয় আমার নাম-পরিচয় বদলে দিতে, না হলে কী মেন্টাল-কেসে আমার সঙ্গে ডাক্তার ঘোষালের পরিচয় তার উল্লেখ না করতে। আমি যুগলের সামনেই আপনাকে সব কথা অকপটে বলে যেতে চাই।

—বেশ, তাই হবে। বল?

যুগল আর পম্পার বিয়ে হয়েছে প্রায় বিশ বছর আগে। তখন পম্পার বয়স পনের, যুগলের বাইশ। কিন্তু পাঁচ-সাত বছরের ভিতরেও ওদের সংসারে তৃতীয় ভাগীদার এল না। ওরা দুজনেই শিক্ষিত। গাইনো ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়। ডাক্তার দুজনকেই পরীক্ষা করে দেখলেন—আশ্চর্য! দৈহিক ত্রুটি কারও নেই। যে-কোনো মিলনই ফলপ্রসূ হতে পারে; কিন্তু হচ্ছে না। ওরা সাইকিয়াট্রিস্টের শরণাপন্ন হয় এবার—ডক্টর ঘোষালের সঙ্গে দেখা করে। ঘোষাল কিছুদিন পরীক্ষা করে বললেন : পম্পা ভুগছে 'ফিয়ার-সাইকোসিস্'-এ। মিলন মুহূর্তে ওর মনে হয়—এবারের মিলনও বোধহয় সার্থক হবে না, ফলপ্রসূ হবে না। মানসিক দুশ্চিন্তা শরীরে প্রতিফলিত হয়—হরমোনের সাময়িক হেরফের হয়। মিলন সার্থক হয় না। ডাক্তারসাহেব এবং অ্যাগি ডুরান্ট ওকে নানান পরামর্শ দেন—সেসব বিস্তারিত বাসুসাহেবের না শুনলেও চলবে, আর বলতেও ওর ভীষণ লজ্জা করবে...

বাসু বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, থাম না, মা! প্রথম কথা : সে-সব কথা বর্তমান 'কেস'-এ ইর্‌রেলিভ্যান্ট। দ্বিতীয় কথা : মানসিক-চিকিৎসার ঐসব ব্যাপার আমার মোটামুটি জানা। ফলে বুঝতে পারছি : ডাক্তার ঘোষাল বিজ্ঞানের আশীর্বাদে তোমাকে মাতৃত্বের অধিকারিণী করে তোলেন। তোমার কটি বাচ্চা? তারা কোথায়?

—দুটি। বড়টি ছেলে, ছোটটি মেয়ে। দুজনেই স্কুলে।

—ঠিক আছে। কী সূত্রে তুমি ডাক্তার ঘোষালের সঙ্গে পরিচিত তা বোঝা গেল। তাই তোমাদের দুজনের নিমন্ত্রণ হয়েছিল।

এই সময় যুগলকিশোর বাধা দিয়ে বলে ওঠে, এক্সকিউজ মি, স্যার, ফর মাই ইন্টারাপশন! আরও একটা ব্যাপারে ডক্টর ঘোষাল বহুদিন পরে আমাকে হঠাৎ সেদিন ফোন করেছিলেন।

বাসু বললেন, আই প্রিজ্যুম 'কাল্লু'র ব্যাপারে। তাই না?

—আশ্চর্য! আপনি কী করে জানলেন?

—জানি না তো! জানলে আর 'আই প্রিজ্যুম' বলব কেন? আন্দাজ করছি। তা কাল্লু মিঞার কিস্‌সা পরে শুনব। আগে পম্পার জবানবন্দিটা শেষ হোক।

ডাক্তার ঘোষালের নিজস্ব বাড়িটি দ্বিতল। তিনি একা মানুষ। একটি সর্বক্ষণের কম্বাইন্ড-হ্যান্ড আছে। নন্দু। সে ছোকরাই হাট-বাজার করে, রান্না করে, ফাই-ফরমাশ খাটে, ঝাঁট-পাট দেয়, বিছানা বানায়। এ-ছাড়া একজন স্থানীয়া পরিচারিকা আছে। সে সকালে আসে, ঘরগুলো মুছে দেয়, কাপড় কাচে, বাসন মাজে। ও-বেলায় সে আসে না। তৃতীয়ত আছে আরও একজন—ডাক্তারবাবুর ফিয়াট গাড়ির ড্রাইভার শৈলেশ মান্না। সে হাসপাতালের স্টাফ—কিন্তু প্রয়োজনে বাড়ির কাজও করে। ইলেকট্রিক বা টেলিফোনের বিল জমা দেওয়া, রেশন তোলা, পোস্টাপিসে যাওয়া, অথবা বাইরের ফাই-ফরমাশ খাটা। এই তো সংসারের তিনটি মানুষ। দ্বিতলে ডাক্তারবাবুর শয়নকক্ষ। একতলায় রান্না-খাবার ঘর, বৈঠকখানা আর মেজানাইন ঘরে থকে শৈলেশ। নন্দু শোয় সিঁড়ি-ঘরের চিলেকোঠায়।

ঘোষালসাহেবের বাড়ির পিছনে বেশ বড় একটি বাঁধানো চাতাল। তার চারপাশে কিছু অযত্নের ফুলের গাছ—গাঁদা, সন্ধ্যামণি, দণ্ডকলস। দু-একটি বড় গাছও—গন্ধরাজ, শিউলি,

কলকে ফুল। একটি কলমের আমগাছও আছে। অগ্রহায়ণ মাস। আকাশ নির্মেঘ। ডাক্তারবাবু পিছনের ঐ উন্মুক্ত উদ্যানেই গার্ডেন-পার্টির ব্যবস্থা করেছিলেন। নিমন্ত্রিত মাত্র জনা দশ-বারো।

যুগল বাধা দিয়ে বললো, না। একজ্যাক্টলি নয় জন!

বাসু বললেন, তুমি ওকে বাধা দিও না, প্লিজ! এভাবে বাধা পেলে ও সেই চরম মুহূর্তটাকে স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। নিমন্ত্রিত নয় কি বারো সে সংশোধন তোমার মাধ্যমে পরে করে নেব। আপাতত ওটা জনা দশ-বারো থাক না!

এই সময়েই খিদ্‌মদ্‌গারটি এসে জানাল, মাফ কিজিয়ে সাব। থানা সে বড়বাবু আয়ে হেঁ। মিলনে চাহতে হেঁ।

যুগল কিছু বলার আগেই বাসু প্রশ্ন করেন, ও কি সদর থানার ও. সি. গণেশ সাহার কথা বলছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—শোন। ভদ্রলোককে ডাক। কিন্তু আমি তাঁর সামনে এসব আলোচনা করতে চাই না। ভদ্রলোককে বাইরের রোয়াকে বসিয়ে রেখ। যেন চলে না যায়।

যুগলকিশোর একটু অবাক হলেন। তাঁর সেপাইটিকে বললেন, ও. সি. সা'ব কো আনে বোল!

একটু পরেই ও. সি. এলেন। ধড়াচূড়া পরা। কায়দা মাফিক ডি. এস. পি.-কে স্যালুট করে বললেন, ডি. আই. জি.-সাব আমাকে টেলিফোনে নির্দেশ দিলেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে। কী ব্যাপার, স্যার?

যুগল ইতস্তত করে বললেন, ডক্টর ঘোষালের কেসটার কোনো নতুন খবর আছে?

গণেশ একদৃষ্টে বাসুর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বাসু তাকিয়ে ছিলেন তাঁর পাইপটার দিকে। বাসুসাহেবকে যাচাই করতে করতেই গণেশ জবাব দিলেন, আজ্ঞে না। নতুন কোনো ডেভলপমেন্ট হয়নি।

যুগল পুনরায় জানতে চায় : বহরমপুর সেন্ট্রাল জেল কোনো মেসেজ পাঠায় নি?

—আজ্ঞে, আমি তো হাতে পাইনি। ঠিক জানি না।

—ও আচ্ছা। আপনি একটু বাইরে অপেক্ষা করুন। চলে যাবেন না। কথা আছে।

এতক্ষণে গণেশের মুণ্ডটা দিক পরিবর্তন করে। তিনি জানতে চান, বাইরে অপেক্ষা করব? 'বাইরে' মানে? কোথায়? বাইরের রোয়াকে? ওখানে তো রোদ।

যুগল সামলে নেয় পরিস্থিতিটা। বলে, আপনি জিপে এসেছেন তো? তাতেই বসুন। এ ভদ্রলোকের কেসটা শেষ করেই আপনাকে ডাকব।

গণেশের মুণ্ড আবার পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ঘুরল। পুনরায় বাসুসাহেবকে দেখে নিয়ে প্রশ্ন করেন, উনি কি সেই ডাক্তার ঘোষালের ব্যাপারেই এসেছেন, স্যার?

যুগলকিশোরকে জবাব দেবার সুযোগ না দিয়ে বাসু চটজলদি বলে ওঠেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার! সদর থানাতে লোক পাঠিয়েছিলাম জানতে—পোস্টমর্টেম রিপোর্টে বিষের উল্লেখ আছে কি না। আনফরচুনেটলি তারা রিপোর্টটা সংগ্রহ করতে পারেনি। তাই আমি এসেছিলাম বাচ্চুর কাছ থেকে জানতে, কেসটা 'পয়েজনিং'-এর কি না—

গণেশচন্দ্র অস্ফুটে বললেন : বাচ্চু! বাচ্চু কে?

সমাধান দাখিল করলেন যুগলকিশোর : ডি. আই. জি.-সাহেবের ডাকনাম 'বাচ্চু'; জানেন না?

গণেশের গলকণ্ঠটা বার দুই ওঠানামা করলো।

বাসু যুগলকে বলেন, মার্ডার-কেস-এর এফ. আই. আর. লজ করতেই তিন-চার দিন দেরি হয়ে গেল। জাস্ট তোমার সদর থানার নন-কোয়াপারেটিভ অ্যাটিচ্যুডে! আসামী ধরা পড়লে আদালতে এ প্রশ্ন উঠবেই : কেন এত দেরি হলো এফ. আই. আর. লজ করতে। আই ডোন্ট নো, তোমার সদর থানার ও. সি. মার্ডারারের কাছ থেকে ঘুষ-ফুস্ খেয়ে বসে আছে কি না, নাহলে শুধু মৌখিক প্রশ্নের...

যুগল বাধা দিয়ে বাসুসাহেবকে বলে, ইনিই স্যার, আমাদের সদর থানার ও. সি. শ্রীগণেশচন্দ্র সাহা।

গণেশ থতমত খেয়ে একটা নমস্কার ঠুকে দিলেন। বাসুসাহেব তার প্রতি-সম্ভাষণে পাইপটাকে একটু উঁচু করে ধরলেন—তাকেই যদি তোমরা 'নমস্কার' বল, তবে 'প্রতি-নমস্কার' করলেন। গণেশ আমতা আমতা করে ডি. এস. পি. -র কাছে জানতে চান, ওঁকে তো ঠিক, স্যার...

—উনি কলকাতা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের এক্স-প্রেসিডেন্ট পি. কে. বাসু বার-অ্যাট-ল।

গণেশ পুনরায় যুক্তকরে—এবার বেশ একটু ঘাড় নিচু করে—নমস্কার করলেন। সেটা বাসু-সাহেব দেখতেই পেলেন না। কারণ তিনি ততক্ষণে পম্পার দিকে ফিরেছেন। পম্পাকে বলছেন, তুমি এক কাজ কর মা, তোমার কোনো চাকর-টাকরকে বল বাইরে এক-পেয়ালা চা আর বিস্কুট পাঠিয়ে দিতে। উনি অতদূর থানা থেকে এসেছেন, শেষে তোমার গৃহস্থলীর নিন্দে করে না যান।

পম্পা আর যুগল কিছুই বুঝল না। দুজনে অবাক হলো।

মাথা হেঁটে করে গণেশচন্দ্র বাইরে গিয়ে বসলেন।

যুগল এগিয়ে এসে বললো, ব্যাপার কী স্যার?

বাসু বললেন, পরে বুঝিয়ে বলব। থাক ও বাইরে জিপে বসে। আধঘণ্টাখানেক পরে আমি যখন চলে যাব, তখন ওকে ডেকে জানিয়ে দিও যে, গণেশকে আলোচনায় প্রয়োজন হয়নি। হ্যাঁ, যে কথা হচ্ছিলো...

দশ

ডি. এস. পি.-সাহেবের কাছ থেকে অনেক তথ্যই সংগ্রহ করা গেল। অটোপ্সি সার্জেন-এর রিপোর্ট এবং ঘটনার রাত্রে প্রত্যক্ষদর্শীদের কয়েকজনের জবানবন্দি। যুগল সব কিছুই জেরক্স করিয়ে এনে দিলেন। নিমন্ত্রিত ছিলেন নয়জন। এছাড়া ভৃত্য বা সেবকশ্রেণীর কয়েকজন। ইনভেস্টিগেটিং অফিসার চন্দন নন্দী বেশ গুছিয়ে রিপোর্ট লিখেছে। প্রথমে নিমন্ত্রিত ও সেবকশ্রেণীর চোদ্দজনের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

1. মিস্ অ্যাগনেস্ ডুরান্ট, মানসিক চিকিৎসালয়ের প্রধানা মেট্রন।
2. ডঃ অমরেশ দাশ, এম. ডি.—ডক্টর ঘোষালের দক্ষিণ হস্ত।
3. মিসেস্ ছায়া পালিত, ড্রেস-ডিজাইনার।
4. ক্যাপ্টেন পালিত, ঐ স্বামী, প্রাক্তন পাইলট। এখন অবসরপ্রাপ্ত।
5. অনুরাধা বসু—অভিনেত্রী।

6. গুণবতী মোহান্তি, ওড়িয়া ; জনৈক ওড়িশা-রাষ্ট্রমন্ত্রীর বিধবা।
7. সুভদ্রা মোহান্তি, ঐ কন্যা। চলচ্চিত্রে ও মঞ্চে অভিনয় করে।
8. জয়ন্ত মহাপাত্র—সুভদ্রার সহপাঠী ও বন্ধু। সম্ভবত পাণিপ্রার্থী।
9. পম্পা সেনরায়, মিসেস্, ডি. এস. পি.।

এই নয়জন নিমন্ত্রিত উপস্থিত ছিলেন। দুজন নিমন্ত্রিত আসেননি। এঁরা ছাড়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল আরও পাঁচজন সেবকশ্রেণীর নরনারী।

10. নন্দু দাস—গৃহভৃত্য। প্রায় সাত বছর চাকরি করছে।
11. শৈলেশ মান্না—ড্রাইভার। ডাক্তারবাবুর মেজানাইন ঘরে থাকে। সাত বছর চাকরি।
12. রুক্মিনী—ঠিকে ঝি। সচরাচর সন্ধের সময় চলে যায়। খাওয়া-দাওয়া ছিল বলে ডাক্তারবাবু যেতে দেননি। আহারাদি করে যাবার কথা।
13. শম্ভু শীল—স্থানীয় ক্যাটারার। সঙ্গে চার-পাঁচজন কর্মী, তাদের নাম লেখা হয়নি।
14. হারাধন দাশ—ডাক্তারবাবুর সদ্য-নিযুক্ত কম্বাইন্ড-হ্যান্ড। মাত্র ছয়-সাত দিন পূর্বে কাজে লেগেছে।

এই পর্যন্ত পাঠ করে বাসু থামলেন। বললেন, এই হারাধন দাশটিকে তুমিই সরবরাহ করেছিলেন নিশ্চয়?

যুগলকিশোর অবাক হয়ে বললেন, আমি! কী বলছেন? বরং ডি. আই. জি. যখন বললেন, আপনি এ কেসে ইন্টারেস্টেড, আমি তো তৎক্ষণাৎ ধরে নিয়েছি যে, হারাধন আপনার প্রেরিত দেহরক্ষী।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বাসু। বলেন, এ রকম ধরণা করার মানে?

—সেকথা আগেই বলতে যাচ্ছিলাম, পম্পার জবানবন্দির মাঝখানে। আপনি বাধ দেওয়ায় বলা হয়নি। দিনকতক আগে, পুরী থেকে ফিরে এসেই ডাক্তার ঘোষাল আমার সঙ্গে বাড়িতে দেখা করেন। 'কাল্লু'র কেসটা আমাকে সবিস্তারে বলেন। উনি যখন পুরীতে ছিলেন তখন কাল্লু নাকি মিস্ ডুরান্টের কাছে ওঁর তল্লাশ করে। ডাক্তারবাবু আমাকে অনুরোধ করেছিলেন পুলিস-বিভাগে তদন্ত করে খোঁজ নিয়ে দেখতে, কাল্লু কবে ছাড়া পেয়েছে। আমি বলেছিলাম, খোঁজ নিয়ে দেখব। উপরন্তু বলেছিলাম, উনি যদি 'ইন্‌সিকিওর্ড ফিল' করেন তাহলে একটি দেহরক্ষীর ব্যবস্থা করে দিতে পারি। উনি আমার উপকার করেছেন বলেই নয়—শহরের উনি একজন পরোপকারী মানী সজ্জন। সকালবেলা সপ্তাহে তিন দিন তিনি স্থানীয় মানসিক ভারসাম্যহীনদের দেখতেন, চিকিৎসা করতেন—বিনা দক্ষিণায়। কিন্তু উনি রাজি হলেন না।

বাসু জানতে চান, কেন রাজি হলেন না, তা কিছু বলেছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বলেছিলেন, ডাক্তারবাবু ইতিমধ্যেই একজন দেহরক্ষীকে পেয়ে গেছেন। অত্যন্ত কম্পিটেন্ট এবং যার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের অতীত। আমি জানতে চেয়েছিলাম, কে আপনাকে দিয়েছেন অমন একটি বিশ্বাসযোগ্য কর্মদক্ষ দেহরক্ষী? পুলিস-বিভাগের কেউ, না মিলিটারি? উনি হেসে বলেছিলেন, 'সে বিষয়ে তুমি চিন্তা কর না, যুগল! এ একেবারে ঈশ্বরদত্ত সম্পদ।' তাই আপনি ঘোষালের কেস সম্বন্ধে খোঁজ নিচ্ছেন জেনেই আমি ধরে নিলাম যে, ঐ হারাধনকে আপনিই পাঠিয়েছেন।

বাসুর পাইপটা নিভে গিয়েছিল। ধরাতে ধরাতে বললেন, কী আশ্চর্য! কী অপরিসীম

আশ্চর্য! কারণ আমি পুরীতে ঘোষালকে বলেছিলাম, সে যদি চায় তাহলে একজন বিশ্বাসী ও কর্মদক্ষ দেহরক্ষীর বন্দোবস্ত আমি করে দিতে পারি। সে চিনসুরায় এসে আমাকে ফোন করে জানিয়েছিল যে তেমন একজন লোক সে স্থানীয় আরক্ষা বিভাগ থেকেই পেয়ে গেছে। সে যাই হোক, কিন্তু সেই হারাধন দাশের জবানবন্দি তো এই বান্ডিলে নেই!

—না, নেই। কারণ আমরা তদন্ত করতে যাওয়ার আগেই সেই কর্মদক্ষ ও বিশ্বাসী দেহরক্ষীটি ফেরার হয়ে গেছে!

—ফেরার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ঘটনার রাত্রেই! মৃতদেহ অপসারিত হবার আগেই।

বাসু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনলেন।

—হারাধন দ্বিতলে একটা খাটিয়া পেতে রাত্রে ঘুমতো, ডাক্তারসাহেবের শয়নকক্ষের সংলগ্ন বারান্দায়। ও এসেছিল একটা ছোট টিনের সুটকেস নিয়ে। সেটা নিয়ে যায়নি। দ্বিতলেই ডাক্তারবাবুর খাটের নিচে পড়ে আছে। তাতে কিছু শার্ট-প্যান্ট, একটা ডট-পেন, হাত-আয়না, চিরুনি, কিছু না-লেখা পোস্টকার্ড, টুথব্রাশ আর দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম। আমাদের থানায় জমা আছে। যদি দেখতে চান, দেখতে পারেন।

—হ্যাঁ, তা তো দেখবই। কিন্তু এই বিশ্বস্ত ফেরারী দেহরক্ষীকে খুঁজে বার করার কী চেষ্টা তোমরা করেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ঘটনাচক্রে কিছু ভালো 'ক্লু' পাওয়া গেছে। নিতান্ত গডস্ গ্রেস। ব্যাপারটা হয়েছিল কি, মিসেস্ পালিত একটা ফ্ল্যাশ-গানওয়ালা ক্যামেরা নিয়ে এসেছিলেন। অনেকগুলি ছবি তোলেন। কেন যে তিনি ক্যামেরা নিয়ে আসেন তা তিনিই জানেন। মোট কথা, তার তিন-চারটি 'শট'-এ ঐ হারাধনের সামনের দৃশ্য এবং 'প্রোফাইল' পাওয়া গেছে—গ্রুপের মধ্যে। তা থেকে আমরা পোস্টকার্ড-সাইজ এনলার্জ করেছি। এই দেখুন।

বাসুসাহেবের মনে হলো, লোকটার বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশ। মাথায় টাকা-টাকা ঘন কালো চুল। ঝোলা গোঁফ ছিল। উচ্চতা মাঝারি। রোগাও নয়, মোটাও নয়। খুব সাধারণ চেহারা। ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলে খুঁজে বার করা মুশকিল।

বাসু বললেন, লোকটার আইডেন্টিটি জানা যায়নি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। জানা গেছে। ওর ডাক নাম 'পচা', ভালো নাম পঞ্চানন ঘড়াই। ও একজন কুখ্যাত অ্যান্টিসোস্যাল। বার তিন-চার জেল খেটেছে। একটা খুনের মামলায় পুলিস থেকে ওকে ধরবার জন্য ফটো ছাপিয়ে পুরস্কার ঘোষণাও করা হয়। পচা ধরা পড়ে। ওর নির্ঘাৎ ফাঁসি হয়ে যেত; কিন্তু ওর দলের লোক ওকে পুলিসের হেপাজত থেকে উদ্ধার করে। লোকটার অপারেশন-এরিয়া ছিল বহরমপুর। এ তল্লাটের কেউ তাকে চিনত না। সে যে কী করে ডাক্তারসাহেবের দেহরক্ষীর চাকরি পেল এটা এ কেসের সবচেয়ে বড় রহস্য।

বাসু বললেন, তুমি তখন ও. সি. সদরকে বহরমপুর জেলের কথা জিজ্ঞেস করছিলে। সেটা কি এই 'পচা'র সন্ধানে?

—না, মামু। পচা বহরমপুর জেলে নেই। সে দীর্ঘদিন ফেরার। আমি খোঁজ নিচ্ছিলাম কাল্লুর। আপনি বোধহয় জানেন 'কাল্লু' ছিল চিনসুরার সমাজবিরোধী। বছর চোদ্দ আগে তার যাবজ্জীবন হয়। আমি তখন এখানে ছিলাম না। ওকে দেখিনি। ডাক্তারবাবু কাল্লুর খোঁজ করায় সন্ধান নিয়ে জেনেছি এই চোদ্দ বছরে সে বহুবার জেল থেকে জেলে বদলি হয়েছে। বছর দুই আগে ছিল খড়্গপুরে। তারপর সেখানে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কলকাতায় আনা হয়। টিউবারকুলেসিস্! ওকে বহরমপুরে পাঠানো হয়। তারপরের খবর এখনো পাইনি।

বাসু বললেন, জেলের ভিতর কোনো যাবজ্জীবন আসামীর যদি টিউবারকুলেসিস্ হয় তবে মুক্তি পাওয়ার চেয়ে তার মৃত্যু হওয়াই স্বাভাবিক। কোনোক্রমে মুক্তি পেলেও সে তৎক্ষণাৎ মস্তানগিরি শুরু করবে এটা প্রায় অপ্রত্যাশিত। আমার মনে হয়, কাল্লুর নাম নিয়ে কেউ ঘোষালকে ভয় দেখাচ্ছিল।

—কী উদ্দেশ্যে?

—অব্‌ভিয়াসলি ব্ল্যাক-মেইলিং। ঠিক আছে, তুমি যে-পথে চলছ সে-পথেই চল। কাল্লু আর পচাইয়ের লেটেস্ট সংবাদ কিছু পেলে আমাকে জানিও। আপাতত তুমি আমাকে শ্রীমান হারাধন দাশের কিছু ফটো—যা মিসেস্ পালিত তুলেছে এবং শ্রীমান পচাই ঘড়াই, যে জেল থেকে পালিয়েছিল, তার ফটো দিতে পার?

—পারি। আপনি চার কপি নিয়ে যান। দুজনেরই ফ্রন্ট ভিয়ু এবং প্রোফাইল।

যুগলকিশোর ছবিগুলো এনে দিলেন।

বাসুসাহেব পকেট থেকে ম্যাগানিফাইং গ্লাস বার করলেন। টেবিল-ল্যাম্পের আলো জ্বেলে পরীক্ষা করে দেখে বললেন, য়ু আর রাইট। হারাধন দাশ আর পচাই ঘড়াই অভিন্ন ব্যক্তি! আশ্চর্য! এমন একটা অ্যান্টিসোস্যালকে কে রেকমেন্ড করলো ঘোষাল ডাক্তারকে?

যুগলকিশোর বললেন, সেটা জানতে পারলে, বিষপ্রয়োগের আসামীকে ধরা কঠিন হবে না।

বাসু বললেন, আর একটা কাজ তোমাদের করতে হবে। আই. জি. ক্রাইমকে তোমরা ফর্মালি লেখ ওড়িশা গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করতে : গুনপুর রোমান-ক্যাথলিক চার্চে অ্যাবে শবরিয়ার মৃতদেহটা 'এক্সহিউম' করতে। আমি কলকাতায় গিয়েই তাঁর সঙ্গে দেখা করব। অনুরোধও করব ; কিন্তু ডিপার্টমেন্টাল অনুরোধটা থাকলে কেসটা জোরদার হবে।

বাসু এরপর জবানবন্দিগুলি পড়তে শুরু করলেন। চন্দন মাঝে মাঝে নিজস্ব মন্তব্য থার্ড-ব্র্যাকেটে লিখে গেছে। এগুলি আদালতে পেশ করার জন্য নয়, পুলিস-বিভাগের তদন্তের কাজে লাগবে। উনি শুরু করলেন মিস্ অ্যাগনেস ডুরান্টকে দিয়ে।

(1) মিস্ অ্যাগনেস্ ডুরান্ট [(42) : মানসিক হাসপাতালের মেট্রন। এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন প্রায় চব্বিশ বছর। ডঃ ঘোষালের খুবই কাছের লোক। হাসপাতাল যে ট্রাস্ট বোর্ড-এর পরিচালনাধীন, তার সচিব। ট্রেইন্ড নার্স। ডিভোর্সি। তাঁর মতে : বাগানে চারটি টেবিল পাতা ছিল নিমন্ত্রিতের জন্য এবং একটা লম্বাটে টেবিলে ক্যাটারার প্যান্ট্রি বানিয়েছিল খাবার পরিবেশনের জন্য। পৃথক একটি টেবিলে ছিল ড্রিংক্স্-এর আয়োজন। সেখানে ছিল নানান জাতের মদের বোতল, গ্লাস, সোডা, সফ্‌ট্ ড্রিংস। গৃহস্বামী স্বয়ং ড্রিংক্স্ তৈরি করছিলেন। নন্দু, শৈলেশ ও হারাধন ট্রে-নিয়ে সরবরাহ করছিল। ক্যাটারিং এজেন্টের লোকজনদের ঐ টেবিলে যেতে বারণ করা ছিল। তারা শুধু খাবার সরবরাহই করছিল।

সন্ধে সাড়ে সাতটা থেকেই নিমন্ত্রিতেরা আসতে থাকেন। ড্রিংক্স্ তখনই শুরু হয়। ঠিক আটটায় ডিনার শুরু হয়। বাগানে চারটি টেবিলে ছিল ষোলোটি চেয়ার। নিমন্ত্রিত মাত্র জনা-দশেক। ফলে, ঠিক পংক্তি ভোজনের নিয়মে সবাই বসে খাচ্ছিলেন না। প্লেটটা বাঁ-হাতে নিয়ে প্রায় সকলেই ঘুরে ঘুরে বুফে নিয়মে খাচ্ছিলেন। কেউ কেউ তখনো প্লেট হাতেই তোলেননি,—ড্রিংক্স্ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন...

তদন্তকারী অফিসার : 'তখনো' বলতে কী মিন করছেন?

—সওয়া আটটা বা সাড়ে আটটা। যখন ডক্টর ঘোষাল তাঁর ভদ্‌কা-উইথ-সিট্রার পাত্রে প্রথম সিপ্ দেন।

—ওটা যে ভদ্‌কা-উইথ-সিট্রা তা আপনি জানলেন কী করে?

—না। আদালতে হলফ নিয়ে ও-কথা বলতে পারব না। এটা আমার অনুমান মাত্র। ঘোষাল 'জিন' স্ট্যান্ড করতে পারতেন না, জিন খেলেই ওঁর হেঁচকি উঠত। আর হুইস্কি বা রম যে নয় তা পানীয়টার রঙ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। তাছাড়া আমি জানতাম, ঘোষাল ভদ্‌কা খুব পছন্দ করে। ওর ফ্রিজে সচরাচর ভদ্‌কাই থাকে। আমি জানি।

—আই সি। তরপর?

—ট্রে-টা ছিল হারাধনের হাতে। তাতে নানান পানীয় ছিল। অন্তত তিন-চারটি গ্লাস ছিল। হুইস্কি, রম, রেড-ওয়াইন, ভদ্‌কা। ঘোষাল তা-থেকে নিজেই ভদ্‌কাটা উঠিয়ে নেয়।

—আর য়ু শিওর? কেউ তাঁর হাতে গ্লাসটা তুলে দেয়নি?

—ইয়েস, আয়াম। কারণ সে-সময় আমি ওর দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। ঘোষাল তিন-চারটি গ্লাসের ভিতর যে কোনো একটি তুলে নিতে পারত। কোনো 'ফোর্সিং-কার্ড'-এর ম্যাজিক যে এর পিছনে ছিল না এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

—আই সি। বলে যান।

অ্যাগির বর্ণনা মোতাবেক, ঐ টেবিলে তখন ছিলেন চারজন। ঘোষালের ডাইনে অনুরাধা, বাঁয়ে সুভদ্রা. বিপরীতে তিনি নিজে। ঠিক পাশের টেবিলে ছিলেন মিসেস্ ছায়া পালিত. ডক্টর অমরেশ দাশ, ক্যাপ্টেন পালিত আর মিসেস্ পম্পা সেনরায়। আর সকলে কে কোথায় বসেছিলেন ওঁর খেয়াল নেই। ডাক্তার ঘোষালের বাঁ-হাতে ধরা ছিল একটা আধখাওয়া ফিশ-ফিঙ্গার। উনি কথা বলতে বলতে হারাধনের হাতে-ধরা ট্রে থেকে একটা গ্লাস তুলে নিলেন—সাদা রঙ পানীয়টার। হারাধন পাশের টেবিলে চলে গেল। ঘোষাল ফিশ-ফিঙ্গারের বাকিটুকু মুখে পুরে দিলেন। এই সময় সুভদ্রা একটা জোক্‌স্ শোনাচ্ছিল। ঘোষাল অন্যমনস্কভাবে তাঁর ডান-হাতে ধরা গ্লাসে একটা চুমুক দিলেন। দিয়েই উঠে দাঁড়ালেন। মিস্ অ্যাগি তখনো বুঝে উঠতে পারেননি কেন উনি উঠে দাঁড়ালেন। ঘোষাল আরও এক সিপ্ মুখে টেনে নিলেন। মুখটা বিকৃত করলেন, তারপরেই হঠাৎ ঠক্ করে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বললেন, 'এক্সকিউজ মি...' উনি টেবিল ছেড়ে কোথাও যেন যেতে চাইছিলেন—কিন্তু পারলেন না। মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন!

স্বভাবত সবাই ছুটে এল। ডক্টর দাশ সবাইকে সরিয়ে দিয়ে ঘোষালের মাথাটা কোলে তুলে নিলেন। মিনিট দুই নাড়িটা দেখলেন। তারপর চিবুকের নিচে গলায় নাড়ির স্পন্দন পাওয়া যায় কিনা দেখলেন। বিহ্বলভাবে অ্যাগির দিকে ফিরে ইংরেজিতে বললেন, তুমি দেখ তো!

অ্যাগির কাছে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। তবু ঘাসের উপর হাঁটু গেড়ে বসে তিনি ঘোষালের নাড়ি দেখলেন। ঘোষাল নয়, ডক্টর ঘোষালের মৃতদেহ! মুহূর্ত মধ্যে হার্টফেল করে ডক্টর ঘোষাল মারা গেছেন!

তদন্তকারী অফিসার : আর য়ু শিওর ম্যাডাম? 'হার্টফেল' করে?

—সে সময় আমার তাই মনে হয়েছিল।

—এখন কী মনে হয়?

—লুক হিয়ার, অফিসার। আমি প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে জবানবন্দি দিচ্ছি। আমার অনুমান সেই প্রত্যক্ষদর্শন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কবিযুক্ত!

—ইয়েস ম্যাডাম! আয়াম সরি! আপনি ঠিক বলেছেন। তারপর?

—তারপর যেমন হয়, একটা প্যান্ডিমোনিয়াম্! চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। সকলেই মর্মাহত। খাওয়া-দাওয়া বস্তুত হলোই না। আমি ক্যাটারারকে বললাম, তার চিন্তার কিছু নেই, বিল আমি মেটাব। এই সময় হঠাৎ মিসেস্ ছায়া পালিত আমাকে বলে, তার আশঙ্কা কেসটা হার্ট-ফেলিওয়ের নয়—বিষক্রিয়ায় হবার সম্ভাবনা আছে। পুরীতে বিল শবরিয়ার মৃত্যুর কথাও সে সংক্ষেপে জানায়। ডক্টর দাশ সদর থানায় ফোন করেন। পুলিস আসে। মিসেস্ পম্পা সেনরায় তাঁর স্বামীকেও পৃথকভাবে ফোন করেন। ডি. এস. পি.-ও এসে যান। ডক্টর ঘোষালের মৃতদেহটি শবব্যবচ্ছেদের জন্য পুলিসের হাতে দেওয়া হয়।

তদন্তকারী অফিসার : যে গ্লাস থেকে ডক্টর ঘোষাল পান করছিলেন সেটা নির্বাচন করে দিলেন কে?

—মিসেস্ ছায়া পালিত।

[এ ছাড়া মিস্ অ্যাগি ডুরান্ট আরও কিছু বলেন, যা এই মৃত্যুর সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। আমার মনে হলো মিস্ ডুরান্ট-এর সঙ্গে ডক্টর ঘোষালের খুব নিকট সম্পর্ক ছিল। একজন অবিবাহিত, অপরজন ডিভোর্সি! জবানবন্দিতেও মিস্ অ্যাগি ঘোষাল প্রসঙ্গে কখনো 'আপনি' কখনো 'তুমি' বলেছেন। 'ঘোষাল ভদ্‌কা খেতে ভালোবাসতো'—not 'ডক্টর ঘোষাল ভদ্‌কা খেতে ভালোবাসতেন'। এ আমার অনুমান মাত্র। দ্বিতীয়ত পরে জানা গেছে, ডক্টর ঘোষাল তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি ঐ ট্রাস্টিকেই দিয়ে গেছেন, যার সেক্রেটারি এই অ্যাগি ডুরান্ট।]

(2) মিসেস্ ছায়া পালিত : [(?) কলকাতায় একটি ব্যুটিকের দোকান আছে, গোলপার্কের কাছাকাছি। এছাড়া একটি পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে ড্রেস-ডিজাইনার। স্বামী প্রাক্তন পাইলট। নিঃসন্তানা। ডক্টর ঘোষালের সঙ্গে আলাপ ঐ রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে। ঐ পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের মালিক এবং প্রধান অভিনেতা ডক্টর ঘোষালের বন্ধুস্থানীয়। সেই সূত্রেই ঘনিষ্ঠতা।]

প্রশ্ন : ডাক্তার ঘোষালের বাড়িতে সেদিন সন্ধের নৈশ-পার্টির হেতুটা কী ছিল? আই মিন, কী উপলক্ষে নিমন্ত্রণ?

ছায়া পালিত : তা বলতে পারব না। উনি এখান থেকে কলকাতায় আমাকে ফোন করেছিলেন। আমাদের দুজনকে রাত্রে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

প্রশ্ন : আপনারা কি ট্রেনে এসেছিলেন?

ছায়া : না। গাড়ি ড্রাইভ করে। তবে সে রাত্রে ফিরতে পারিনি, অনেক রাত হয়ে যাওয়ায়। মিস্ অ্যাগি ডুরান্টের বাড়িতে রাতটা কাটিয়ে পরদিন ফিরে গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : আপনি ক্যামেরা এনেছিলেন কেন?

ছায়া : কোনো উৎসব-রজনীর স্মৃতি ক্যামেরায় বন্দী করার বিরুদ্ধে পিনাল কোডে কোনো নিষেধ আছে বলে শুনিনি। তাই।

প্রশ্ন : আপনি বাঁকা জবাব দিচ্ছেন কেন? আমার জিজ্ঞাস্য ক্যামেরা আনার কি বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য ছিল? কেউ কি সাজেস্ট করেছিল ক্যামেরায় স্পুল ভরে আনতে?

ছায়া : আপনার দুটি প্রশ্নের একই উত্তর : না।

প্রশ্ন : আপনিই কি প্রথম সাজেস্ট করেছিলেন যে, এটা হার্ট-ফেলিওরের কেস নয়, বিষপ্রয়োগে হত্যা?

ছায়া : লুক হিয়ার, অফিসার। আপনার প্রশ্নের ধরনে মনে হচ্ছে আপনি আমাকে এ কেসে জড়িয়ে ফেলতে চাইছেন। আমি আপনার কোনো প্রশ্নের জবাব দেব না, যতক্ষণ না আমার স্বার্থ দেখতে একজন সলিসিটারকে আনতে পারি।

প্রশ্ন : কী আশ্চর্য! আমি তো আপনাকে গ্রেপ্তার করতে চাইছি না। আমার প্রশ্নের ধরনে কী দোষ হলো?

ছায়া : প্রথমত আপনার প্রশ্নটিকে আইনের ভাষায় বলে 'লিডিং কোশ্চেন' ; দ্বিতীয়ত, আমিই প্রথম সাজেস্ট করেছিলাম কিংবা আমার আগেরও কেউ করেছিল তা আমার জানার কথা নয়। তৃতীয় কথা আমি বলিনি 'এটা হর্ট-ফেলিওর নয়, বিষপ্রয়োগে হত্যা।' আমি ডক্টর দাশকে বলেছিলাম, 'ঠিক এই জাতীয় একটা অ্যাবনর্মাল মৃত্যু' আমি একমাসের মধ্যে দু-বার দেখলাম।

প্রশ্ন : 'বিষপ্রয়োগ হত্যা'র কথা আপনি বলেননি?

ছায়া : আমি আপনার কোনো প্রশ্নের জবাব দেব না।

[সাক্ষী হোস্টাইল। কিছু কথা উনি গোপন করতে চান তা স্পষ্টই বোঝা যায়।]

বাসুসাহেব জবানবন্দির বান্ডিলটা অ্যাটাচি কেসে তুলে রাখতে রাখতে বলেন, অহেতুক তোমার সময় নষ্ট করব না। বাড়ি গিয়ে এগুলো পড়ব। তুমি বরং সংক্ষেপে আমাকে বল, ঐ হারাধনের কথা কে, কী বলেছে! সে কবে প্রথম এল, একা না কেউ নিয়ে এল, কত মাইনে পেত, কী কাজ করত, ঘোষাল তার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করত, ইত্যাদি সংবাদ—কে কী বলেছে?

যুগলকিশোর বিভিন্ন সাক্ষীর কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যের চুম্বকসার দাখিল করলেন। এই তথ্যগুলি দিয়েছে নন্দু, ঠিকে ঝি এবং শৈলেশ মান্না। কিছুটা অ্যাগি ডুরান্ট।

হারাধন দিন পাঁচ-সাত কাজ করেছে। কে তাকে পাঠিয়েছে, কত মাহিনা, কী শর্ত তা কেউ কিছু জানে না। সে শৈলেশের সঙ্গে খেতে বসত না, আবার ঘোষালের সঙ্গেও নয়। একাই আহারে বসত। কাজ-কর্ম কিছুই করত না। তিন-চারদিন পরে নন্দু একদিন তার মালিককে আড়ালে জিজ্ঞেস করেছিল, 'ঐ হারাধনবাবু আর কদ্দিন থাকবেন?' ঘোষাল জবাবে বলেছিলেন, 'ও তো তোর কোনো ক্ষতি করছে না। তোর সে খোঁজে কী দরকার?'

বস্তুত হারাধনকে যে ঘোষালসাহেব দেহরক্ষী হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন, এ তথ্যটা প্রকাশ করেননি। তবে শৈলেশ মান্নার পাশে একদিন যখন হারাধন গাড়িতে বসছে—ডাক্তারবাবু ছিলেন পিছনের সিটে—তখন মান্নার সঙ্গে হারাধনের একটা ধাক্কা লেগে যায়—অসাবধানে। শৈলেশ মান্নার মনে হয় : হারাধনের পাশ-পকেটে একটা রিভলভার আছে। এ সন্দেহের কথা সে ফিরে এসেই ডাক্তারবাবুকে গোপনে জানিয়েছিল। ডাক্তারবাবু বলেন, 'জানি! তুমি কথাটা যেন আর কারও কাছে বল না।' শৈলেশ কিন্তু সে আদেশ মানেনি। কাল্লু মিঞার ব্যাপারটা সে জানত। ডাক্তারবাবু যখন পুরীতে গিয়েছিলেন তখন কাল্লু যে হুমকি দেয়, তাও জানত। তাই গোপনে সে এ খবরটা জানিয়ে দেয় মিস্ ডুরান্টকে—নিশ্চিতভাবে জেনে যে, তিনি ডাক্তারবাবুর হিতাকাঙ্ক্ষিনী।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে বাসুসাহেব বেরিয়ে এলেন বাইরে। ও. সি. সদরের জিপটা দাঁড়িয়ে আছে। গণেশচন্দ্র বসে আছেন ড্রাইভারের পাশে। বাসু তাঁকে দেখেও দেখলেন না। গেট খুলে বেরিয়ে এসে একটা রিক্‌শা ধরলেন। রওনা দিলেন 'মমতাময়ী মেন্টাল হোম'-এ।

গণেশচন্দ্র তাঁর 'বস'-এর বৈঠকখানার দিকে এগিয়ে গেলেন।

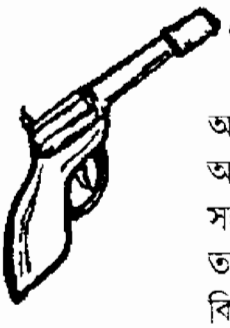

এগারো

মধ্যাহ্ন-আহারের ব্যবস্থা করেছিলেন অ্যাগি ডুরান্ট। বলেছিলেন, আপনারা সঙ্কোচ করবেন না। ইট্‌স্ জাস্ট 'ওয়ার্কিং লাঞ্চ'! ঘোষাল ছিল আমার 'বস' এবং নিকটতম বন্ধু। প্রায় শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ কালের সহযোগী। তার এ জাতীয় মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমি মর্মাহত। কিন্তু আপনারাও তার বন্ধু,—এসেছেন ঘোষালের মৃত্যুরহস্যের তদন্ত করতে। ফলে, আমি কিছু খাবার আনাই। এখানেই সবাই খেতে খেতে কথাবার্তা বলা যাবে।

মধ্যাহ্ন-আহারের অবকাশে বাসুসাহেব জানতে পারলেন এই মানসিক চিকিৎসালয়টি পরিচালনায় দায়িত্বে আছে একটি 'ট্রাস্ট বডি'। তার সচিব হচ্ছেন অ্যাগনেস্ আর প্রেসিডেন্ট ছিলেন ডক্টর ঘোষাল। ভাইস প্রেসিডেন্ট-কাম-ট্রেজারার হচ্ছেন ডক্টর দাশ। এছাড়া শহরের আরও কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি আছেন সভ্য হিসাবে। এক্স-অফিশিও বা পদাধিকারবলে স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ এবং ডি. এস. পি. বার্ডওয়ান রেঞ্জ ঐ সভার সদস্য। আরও জানা গেল, ডক্টর ঘোষালের একটি উইল উদ্ধার করা গেছে। উনি ওঁর স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি ঐ ট্রাস্ট বোর্ডকে দান করে গেছেন।

বাসু জিজ্ঞেস করলেন, ডক্টর ঘোষালের সঙ্গে হারাধন সংক্রান্ত কোনো কথা হয়নি তোমার?

—হয়েছিল। ও আমাকে বলেছিল, যতদিন না 'কাল্লু'র কোনো হদিস পাওয়া যায় ততদিন ওকে সাবধানে থাকতে হবে। ও একজন দেহরক্ষীকে 'কম্বাইন্ড-হ্যান্ড' হিসাবে নিয়োগ করেছে। সে যে দেহরক্ষী এটা জানাজানি হয়ে গেলে 'কাল্লু' অথবা 'কাল্লু'র পরিচয়ে যে হুমকি দিচ্ছে সে সাবধান হয়ে যাবে। তাই হারাধন দাশের প্রকৃত পরিচয়টা কাউকে জানানো হয়নি।

ইন্দ্রকুমার জানতে চায়, শুধু আপনি জানতেন?

—না, আমাদের ড্রাইভার মান্নাও জানত। তার সঙ্গে ঐ হারাধনের একবার একটা ধাক্কা লেগে যায়। মান্না বুঝতে পারে যে, হারাধনের পকেটে রিভলভার থাকে। সেটা সে তার মনিবকে জানায়।

ইন্দ্রকুমার পুনরায় প্রশ্ন করে, ঐ লোকটাকে কে রেকমেন্ড করেছিল তা ডাক্তার ঘোষাল বলেননি?

—না! অন্য সবাইকে সে কী বলেছিল তা জানি না। আমাকে বলেছিল,

'দ্যাটস্ এ টপ সিক্রেট! তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার : লোকটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট নির্ভরযোগ্য, সৎ এবং আমার হিতাকাঙ্ক্ষী!'

ইন্দ্রকুমার বলে, শিবুটা চিরকালই ছিল গোঁয়ারগোবিন্দ আর নিতান্ত গর্দভ!

মিস্ অ্যাগি প্রতিবাদ করে ওঠেন : প্লিজ, স্যার! আপনার জিহ্বাকে সংযত করুন। একজন পরলোকগত ব্যক্তির প্রতি ঐ সম্মান নাই বা দেখালেন। ঘোষাল যদি মূর্খামি করে থাকে, সেজন্য দামও দিয়ে গেছে। আপনি-আমি সেজন্য সেই মৃত-আত্মাকে খিস্তি করব কেন?

ইন্দ্র বলে, আয়াম সরি।

বাসু পাদপূরণ করেন : য়ু অট টু বি! যাহোক ও প্রসঙ্গ থাক। আমরা অন্য কিছু নিয়ে আলোচনা করি বরং।

boiRboi.net

বারো

চিনসুরা থেকে ফেরার পথে ওঁরা হাওড়া ব্রিজের জ্যাম এড়িয়ে বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে এলেন। গাড়ি চালাচ্ছিল অশোক। ব্রজদুলালের কাছে সে জানতে চাইল, প্রথমে বাসুসাহেবকে নামিয়ে দেব তো?

জবাব দিলেন বাসু। বললেন, না। তুমি একবার গোলপার্কের দিকে চল তো অশোক। এখনো ছায়া পালিতের বুটিকের দোকানটা খোলা আছে। দেখা যাক, তাকে ধরতে পারা যায় কি না।

ইন্দ্র বলে, কেন? বিশেষ করে ছায়ার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন কেন?

—মেয়েটা শার্প ইন্টেলিজেন্ট। তাছাড়া জবানবন্দিতে সে তো বস্তুত কিছুই স্বীকার করেনি।

ইন্দ্র আবার জানতে চায়, করেনি? কী বলেছে সে?

বাসু বললেন, পুলিস অফিসারের প্রশ্নের ধরন দেখে ছায়ার মনে হয়েছিল যে, তাকে খুনের মামলায় জড়াবার চেষ্টা হচ্ছে। তাই সে কোনোরকম জবানবন্দি দিতে অস্বীকার করে।

ব্রজদুলাল জানতে চান, আপনার কি মনে হয় ছায়া কিছু ক্লু দিতে পারবে?

—জানি না। চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

নির্দেশমতো অশোক গোলপার্কের দিকে চলল। বাসু তাঁর অ্যাচাটি-কেস খুলে দোকানের ঠিকানাটা জানালেন। ছায়া পালিত পুরীতেই তার দোকানের একটা কার্ড ওঁকে দিয়েছিল।

বুটিকের দোকানটা ছোট। কাউন্টারে বসেছিল একটি মেয়ে। ওঁরা তিনজনে দোকানে প্রবেশ করলে মেয়েটি বলে, বলুন স্যার? কী দেখাব?

বাসু বললেন, না মা। কিছু দেখাতে হবে না। আমরা ছায়াকে খুঁজছি। মিসেস্ ছায়া পালিত। সে কি দোকানে নেই?

মেয়েটি সরাসরি জবাব না দিয়ে বললে, আপনারা?

বাসু তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন : দর্শনার্থী। ছায়া পালিতের। সে যদি না থাকে তাহলে সে-কথাই বলে দাও, আমাদের নামঠিকুজি নিয়ে কী করবে?

মেয়েটির ভ্রূকুঞ্চন হলো। বললো, না, ছায়াদি দোকানে নেই। কাছেই আছেন। আপনাদের পরিচয় পেলে তাঁকে খবর পাঠাতে পারি। তাই জানতে চাইছি।

বাসু ওয়ালেট থেকে একটি কার্ড বার করে ওকে দিলেন।

মেয়েটি একজন ছোকরা কর্মচারীর হাতে কার্ডটা ধরিয়ে দিল। তাকিয়েও দেখলো না। বললো, বলাই, এই কার্ডটা দিদিকে দিয়ে আয়। বলিস, ওঁরা নিচে অপেক্ষা করছেন।

দোকানের পাশেই একটা সিঁড়ি। দশ-বারোটা ধাপ। মেজানাইন-ফ্লোরে যাবার রাস্তা। বলাই সেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।

অশোক গোলপার্কে জুৎসই জায়গায় গাড়িটা পার্ক করতে পারছিল না। তাই ওঁদের নামিয়ে দিয়ে সাদার্ন অ্যাভিন্যুর দিকে চলে যায়। সে গাড়িতেই বসে আছে। দোকানে এসেছিলেন ওঁরা তিনজন।

একটু পরে মেজানাইন-ফ্লোর থেকে ছায়া নেমে এল। সাদরে আহ্বান করলো, আসুন, আসুন, আসুন। উপরে উঠে আসুন।

ওঁরা তিনজনে সিঁড়ি বেয়ে দেড়-তলার ঘরটায় উঠে আসেন।

ছায়া জানতে চায়, সুজাতাদিকেও নিয়ে এলেন না কেন?

বাসু জবাবে বললেন, আমরা ঠিক সৌজন্য-সাক্ষাতে আসিনি ছায়া, খদ্দের হিসাবেও নয়। কয়েকটা কথা জানতে এসেছি।

—বেশ তো, আসুন। চা-কফি কিছু আনতে দেব?

বাসু বললেন, নো, থ্যাংকস্।

দোতলার ঐ ঘরটি ছায়ার ওয়ার্কিং-স্পেস্। ঘরে একটা টেবিলে বোর্ড-টি পাতা। ও সেখানে নকশা ছকে। নাটকের সেট ডিজাইন করে। ঘরে পিসবোর্ড, রঙ, আঠা, কাঁটি, ছুরি, ফেবিকল ইত্যাদি ছড়ানো। একটা বেঞ্চি পাতা আছে। ওঁরা তিনজনে ঠাসাঠাসি হয়ে বসলেন।

ছায়া জানতে চায়, কী ব্যাপার?

বাসু বললেন, আমরা চুঁচুড়া থেকে সোজা আসছি। ডক্টর ঘোষালের কেসটা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

—হ্যাঁ, বলুন। আমার চোখের সামনেই তো দুর্ঘটনাটা ঘটলো।

বাসু বললেন, জানি। পুলিস তোমার স্টেটমেন্ট নিয়েছে। তাও পড়েছি। দেখলাম, তুমি বিশেষ কিছুই বলনি, কারণ তোমার আশঙ্কা হয়েছিল পুলিস তোমাকে ফাঁসাতে চাইছে। তাই নয়?

—ইয়েস, স্যার! আই অ্যাডমিট।

—তাহলে আমাদের কাছে খুলে বল, তুমি কতটুকু জানো? কী বুঝেছ? আমি বরং একে একে প্রশ্ন করি তুমি জবাব দিয়ে যাও। প্রথম প্রশ্ন : ডক্টর ঘোষাল পার্টি দিয়েছিল কেন? উপলক্ষটা কী?

—তা তো জানি না, মেসোমশাই। আমাকে উনি টেলিফোন করেছিলেন ঘটনার আগের দিন—শুক্রবার—সকালে। আমাদের দুজনকে পরদিন শনিবার রাত্রে ওর চিনসুরার বাড়িতে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেন। কী উপলক্ষে তা জানাননি। আমি জানতে চেয়েছিলাম কিন্তু উনি কিছুতেই কারণটা বলেননি। আমি টেলিফোনেই ওঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম। আমরা দুজন—স্বামী-স্ত্রী। আমার অনুমান, এটা জন্মদিনের পার্টি ; কিন্তু ডক্টর ঘোষাল সেটা স্বীকার করতে চাইছিলেন না—কারণ উনি বোধহয় চাননি যে, ওঁর এই বৃদ্ধ বয়সে লোকে বার্থ-ডে প্রেজেন্টেশন নিয়ে যায়। সে যাই হোক, আমি একটা বড় ফুলের ব্যুকে নিয়ে গিয়েছিলাম। জন্মদিন না হলেও ফুলের তোড়া যেকোনো অকেশনেই উপহার দেওয়া চলে।

বাসু বললে, আই সি।

ইন্দ্রকুমার জানতে চায়, আপনারা দুজন কটা নাগাদ গিয়ে পৌঁছন?

—আমরা বের হয়েছিলাম যথেষ্ট সময় হাতে নিয়ে—ভায়া হাওড়া ব্রিজ। দুর্ভাগ্যবশত বারটা ছিল 'শনি'। ফলে প্রচণ্ড জ্যামে পড়ে যাই। আমরা ট্রেনে যাইনি। গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম। যখন পৌঁছই তখন সন্ধে পার হয়ে গেছে। ওঁরা বাগানে বসে ড্রিংকস্ পান শুরু করেছেন। ডিনার তখনো সার্ভ করা শুরু হয়নি।

ব্রজদুলাল জানতে চান, তোমার পরিচিত কে কে ছিল?

ছায়া স্বীকার করে, অনেকেই ছিলেন। নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে। যেমন মিসেস্ মোহান্তি. মিস্ মোহান্তি, জয়ন্ত, অনুরাধা। এঁরা যে আসছেন তা আমার জানাই ছিল না। আরও জনাতিনেক ছিলেন আমার অপরিচিত।

বাসু কী-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই ইন্দ্রকুমার বলে, আপনি ফুলের তোড়াটা ডক্টর ঘোষালকে দেবার পর তিনি কী করলেন?

—কী আবার করবেন? আমাকে 'থ্যাঙ্কু' বলে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখলেন।

—নিজেই?

—আমার ঠিক মনে পড়ছে না। বোধহয় তাঁর চাকর বা ড্রাইভারকে তোড়াটা দিলেন। সে একটা ফুলদানি নিয়ে এসে ফুলের ব্যুকেটা টেবিলে সাজিয়ে রাখল।

ইন্দ্রকুমার পুনরায় জানতে চায়, চাকর না ড্রাইভার?

ছায়া বলে, ঠিক মনে নেই। বাট ইজ দ্যাট রেলিভ্যান্ট? আই মিন, তার কি কোনো পারম্পর্য আছে?

বাসু ইন্দ্রকুমারকে ধমক দেন, তুমি থাম দিকিন। আমাকে জিজ্ঞেস করতে দাও। বল ছায়া, তোমার কি মনে আছে ডক্টর ঘোযাল ট্রে থেকে ড্রিংকস্‌টা নিজেই উঠিয়ে নেন, না কেউ তাঁর হাতে তুলে দেয়?

—নো স্যার। আমি জানি না। লক্ষ্য করিনি।

—সেদিন তুমি কি অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেছিলে? এনিথিং আনুজুয়াল? কারও কোনো বিচিত্র ব্যবহার? কোনো রহস্যময় ঘটনা? বা সান্ধ্যপার্টিতে কোনো অপ্রত্যাশিত কিছু?

ছায়া অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললো, না স্যার। মনে করতে পারছি না।

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন বাসু। বললেন, থ্যাংস! ধন্যবাদ! চলি।

—চা-কফি আজ কিছুই খাবেন না!

—আগেই বলেছি, আবার বলি : আমরা ঠিক সৌজন্য-সাক্ষাতে আসিনি! থ্যাঙ্কু অল দ্য সেম!

অশোক ওঁকে নিউ আলিপুরের বাড়িতে যখন নামিয়ে দিল, রাত তখন সাড়ে সাত। ইন্দ্রকুমার আর ব্রজদুলাল দুজনেই জানালেন যে, ওঁরা ক্লান্ত, চা-কফি বা ড্রিংক্স্‌ নেবেন না। বাড়ি ফিরতে চান। অগত্যা ওঁদের বিদায় দিয়ে বাসুসাহেব উঠে এলেন ওঁর বাইরের বারান্দায়।

সেখানে প্রতীক্ষা করছিলেন মিসেস্‌ বাসু, তাঁর সাবেক হুইল-চেয়ারে। বাসুসাহেব প্রবেশ করা মাত্র বললেন, ইতিমধ্যে ছায়া দু-দুবার ফোন করেছে। ছায়া পালিত। বলেছে, তুমি বাড়িতে ফিরে এলেই যেন তাকে রিং ব্যাক কর।

বাসু জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে বললেন, আমি সেটাই প্রত্যাশা করছিলাম। ধর দিকিন ছায়াকে।

রানু তাঁর অভ্যস্ত আঙুলে ছায়াকে ধরলেন, তার দোকানেই। ছায়া সাড়া দিতেই টেলিফোনটা বাসুসাহেবের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, কথা বল। ছায়া।

বাসুর একপায়ে জুতো। সেই অবস্থাতেই বললেন, বল ছায়া? তুমি নাকি দুবার আমাকে ফোনে খুঁজছিলে। কই, আমরা যখন তোমার সঙ্গে কথা বললাম তখন তো কিছু বলনি?

—আজ্ঞে না। আপনারা এখান থেকে চলে যাবার পরেই আমি দু-দুবার ফোন করেছি। মাসিমা বললেন, আপনি তখনো পৌঁছননি।

—বুঝলাম। ইন ফ্যাক্ট, আমি আন্দাজ করেছিলাম ওদের সামনে তুমি খোলা মনে কথা বলতে পারছিলে না। তাই না?

—একজ্যাক্টলি! আমি জনান্তিকে আপনাকে কিছু জরুরি কথা জানাতে চাই। আমার অনেক-অনেক কথা বলার আছে।

—বুঝলাম। কিন্তু, তুমি কি ওদের সম্বন্ধে কিছু আন্দাজ করছ? ওদের দুজনের মধ্যে কাউকে কি সন্দেহ করেছ?

—আই ডোন্ট নো, মেসোমশাই! কিন্তু এটা তো মানবেন যে, বাস্তব ঘটনাটা অত্যন্ত মিস্টিরিয়াস্। অ্যাবে বিল শবরিয়া—আমি জানি, তাঁর মৃত্যু যে বিষক্রিয়ায় হয়েছে তার কোনো প্রমাণ নেই—কিন্তু ঘোষালসাহেবের মৃত্যুর সঙ্গে তার একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে! সেবার আমরা ছিলাম তের জন, এবার নয় জন। দুটোই যদি হত্যাকাণ্ড হয়, দুটোই যদি একই হাতের কাজ হয়, তাহলে আমাদের একটা H. C. F-এর অঙ্ক কষতে হবে। হায়েস্ট-কমন-ফ্যাকটর! কে-কে দুবারই উপস্থিত ছিল!

—কিন্তু ব্রজদুলাল বা ইন্দ্রকুমার তো দ্বিতীয় ঘটনায় উপস্থিত ছিল না!

—আই নো। কিন্তু সাবধান হতে কী দোষ? ওঁদের এজেন্ট থাকতে পারে, ওঁরা দুজনেই দীর্ঘদিন ধরে ডক্টর ঘোষালকে চেনেন। সে যাই হোক, আমার যেটুকু বলার আছে, তা আপনাকে জনান্তিকে জানাতে চাই। এখুনি। আপনার কি এখন সময় হবে? তাহলে এখনি আমি আপনার নিউ আলিপুরের বাড়িতে যেতে চাই। আমার—অনেক অনেক কিছু বলার আছে।

—বাই অল মিন্স্। য়ু আর ওয়েলকাম। এস। কিন্তু একটা কথা—ক্যাপ্টেন পালিত কেমন আছে? সন্ধের পর তুমি..আই মিন সে কার কাছে থাকবে?

—থ্যাঙ্কু মেসোমশাই—আপনি ওর অসহায়ত্বের কথাটা মনে রেখেছেন। সে ব্যবস্থা করেই যাব। আধঘণ্টার মধ্যেই আসছি আমি। আমি কিন্তু আপনার মতো শুধু মুখে ফিরে আসব না। কফি খাব, মাসিমাকে বলে রাখবেন।

তাই এল। আধঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই। রাত আটটা। কৌশিক আর সুজাতা তখনো ফেরেনি। বিশুই গেল অপর্ণার দোকান থেকে ফিশ-ফিঙ্গার অর্ডার দিতে।

বাসু ওকে চেম্বারে নিয়ে গিয়ে বসালেন। বললেন, এবার বল, কী তোমার বক্তব্য? কী লক্ষ্য করেছিলে তুমি? প্রথম থেকে গুছিয়ে নিয়ে বল। ডক্টর ঘোষালের টেলিফোন করা থেকে।

ছায়া জানালো দুর্ঘটনার পূর্বদিন, শুক্রবার সকালে, ডক্টর ঘোষাল ওকে টেলিফোনে বললেন, আগমীকাল সন্ধের আমার চুঁচুড়ার বাড়িতে, বাগানে আমি একটা পার্টি থ্রো করেছি। তোমার পরিচিত অনেকেই আসছেন। তোমাদের দুজনকে আসতে হবেই। এত দেরিতে জানাচ্ছি বলে রিফিউজ কর না, প্লিজ!

ছায়া বলেছিল, না, না, রিফিউজ করব কেন? কিন্তু অকেশনটা কী? মানে গার্ডেন পার্টির উপলক্ষটা কী?

—সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য। এলে বলব!

ছায়া রসিকতা করে বলেছিল, তাই কি হয়, ডাক্তারসাহেব? গিয়ে যদি শুনি : আপনি কাউকে বিয়ে করছেন! তখন অপ্রস্তুত হয়ে যাব না? বৌদির জন্য একটা ফুলের তোড়া অন্তত...

ডাক্তার ঘোষাল বলেছিলেন, ফাজলামো হচ্ছে?

—না স্যার। কারণটা না জানালে আমি কিন্তু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করছি না।

—অলরাইট। অলরাইট! সেক্ষেত্রে কনফিডেনশিয়ালি তোমাকেই শুধু বলছি। আমি একটা ম্যাজিক দেখাব। ইন ফ্যাক্ট, আমি একজনের সঙ্গে বাজি ধরেছি—ম্যাজিকটা কেউ বুঝতে পারবে না। সে বলেছে, আমি ধরা পড়ে যাব। দেখা যাক কে হারে, কে জেতে!

—কার সঙ্গে বাজি ধরেছেন?

—সেটা এখনি বলা যাবে না। মোটকথা, পার্টিতে নৈশাহার আর ড্রিংক্‌স্ ছাড়াও থাকবে একটা 'মজারু'।

ছায়া শেষ কথাটা টেলিফোনে শুনে বুঝে উঠতে পারেনি। জানতে চায়,—কী? কী থাকবে?

—কালকে 'রাতে দেখবে একটা মজারু'। 'হুষবরল' পড়নি?

বাসু ওকে মাঝপথে থামিয়ে বললেন, 'কিউরিয়সার অ্যান্ড কিউরিয়সার!' কার সঙ্গে বাজি ধরেছিল ডাক্তার? হোয়াট ওয়াজ দ্য ফান?

ছায়া বলে, তা জানি না, মেসোমশাই। কিন্তু ওঁর ঐ কথাটা আমি সারাক্ষণ ভুলতে পারিনি। আমি সর্বক্ষণ আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়কে সজাগ রেখেছিলাম—কারণ আমার মনে হয়েছিল, আগন্তুকদের বোকা বানানোর একটা ষড়যন্ত্র হয়েছে। ম্যাজিকটার কলাকৌশল আমাকে ধরতেই হবে। আমার আরও মনে হয়েছিল: ম্যাজিকটা আমাদের জানিয়ে-শুনিয়ে দেখানো হবে না—'এবার আমি একটা ম্যাজিক দেখাচ্ছি' একথা ডাক্তারবাবু আদৌ বলবেন না। হঠাৎ বেমক্কা বিস্ময়কর কোনো একটা কিছু সবাই দেখতে পেয়ে বোকা হবে।

এই সময় হুইল চেয়ারে পাক মেরে রানু প্রবেশ করলেন ঘরে। মুখেও বললেন, 'সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন!'

ওঁর পিছন-পিছন এল বিশে। সঙ্গে দু-কাপ কফি আর ফিশ-ফিঙ্গারের প্লেট. টমেটো সস্ ইত্যাদি।

ছায়া বলে, দু-কাপ কেন, মাসিমা? আপনি কফি নেবেন না?

রানু বলেন, নেব। উনি নেবেন না। এ সময় কফি খেলে ওঁর ঘুম চড়ে যায়।

বাসু বললেন, ঠিক কথা। অ্যাই, অ্যাই বিশে! পালাচ্ছিস কেন? ফ্রিজ খুলে বরফের ট্রেটা নিয়ে আয়।

নিজে তিনি উঠে গেলেন ক্যাবিনেট থেকে শিভাস-রিগ্যাল, সোডার বোতল আর পানপাত্রটা নিয়ে আসতে।

রানু বললেন, বেশি গিলে মর না যেন?

—না, না মরব কেন? ষাট-বালাই! তুমি তো জানই—আমার মাপকরা মাত্রা—'দু-অ্যান্ড-আ মিনি হাফ'!

ছায়ার দিকে ফিরে বললেন, নাও, শুরু কর?

—আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন সবাই বাগানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসেছে। আমাদের দেখতে পেয়েই ডাক্তারসাহেব সানন্দে বলে ওঠেন : এই তো! ওরা দুজনও এসে গেছে!—ওয়েলকাম, ওয়েলকাম ক্যাপ্টেন পালিত।

ছায়া সেলোফেনে মোড়ানো বিরাট ফুলের তোড়াটা বাড়িয়ে ধরে বললে, কই? বৌদি কোথায়? কার হাতে দেব?

ডাক্তারসাহেব অট্টহাস্য করে ওঠেন। একজন মেমসাহেবকে বলেন, অ্যাগি! নাও এটা সাজিয়ে রাখ।

যাঁকে বললেন হয় তিনি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান অথবা মেমসাহেব—পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স—দেখতে খাঁটি মেম, উঠে এসে ছায়াকে সাদা বাংলায় বললেন, আমার নাম অ্যাগি ডুরান্ট. আমি এই মেন্টাল হস্‌পিটালের ট্রাস্ট-বোর্ডের সেক্রেটারি। ফুলের তোড়াটার দায়িত্ব আমিই নিতাম: কিন্তু এটা তুমি মিসেস্ ঘোষালের জন্য এনেছ ভাই, ফলে আমি তো ওটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না!

ডাক্তারসাহেব হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বললেন, অলরাইট! ব্যবস্থা যা করার ত আমিই করছি। ইট্‌স্ আ ব্যাচিলারস্ চোর (chore)।

এই কথা বলে ফুলের তোড়াটা তিনি ছায়ার হাত থেকে নিলেন ; ও-পাশে ফিরে বললেন, হারু, আমার বেডরুমে টেবিলে একটা চীনামাটির বড় ফুলদানি আছে, নিয়ে আয় তো!

একটা মাঝবয়সী লোক, গায়ে ফতুয়া, উস্কোখুস্কো চুল, ঝোলা গোঁফ, ঘাড় নেড়ে বললে, আজ্ঞে আচ্ছা!

ছায়া তাকে এক নজর দেখেছিল মাত্র ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ তার মনে হয় : এ লোকটাকে সে কোথাও দেখেছে! হয় লোকটাকে, অথবা তার ফটো! যাইহোক লোকটা ফুলদানি নিয়ে আবার যখন ফিরে এল তখন ছায়া তাকে ভালো করে লক্ষ্য করলো। হ্যাঁ, এ লোকটাকে সে আগে কোথাও দেখেছে। ঐ টাকা-টাকা উস্কোখুস্কো চুল, ঐ ঝোলা-গোঁফ—এ মুখটা ওর চেনা।

লোকটা ফুলের তোড়াটা ফুলদানিতে সাজিয়ে টেবিলে রাখল। তারপর চলে গেল ড্রিংক্‌স্ টেবিলের দিকে। ট্রে-তে করে ড্রিংক্‌স্ সার্ভ করতে থাকে। ছায়া লক্ষ্য করলো—বাগানে অনেকগুলি চেয়ার ইতস্তত ছড়ানো। দু-প্রান্তে টেবিলক্লথে ঢাকা দুটি টেবিল। একটায় স্পিরিট ল্যাম্পে খাবার গরম রাখা হচ্ছে। তার ওপাশে তিন-চারজন য়ুনিফর্ম-পরা ক্যাটারারের লোক। ডিনার-সার্ভ করার অর্ডারের প্রতীক্ষা করছে। অবশ্য স্ন্যাক্‌স্ তারাই সরবরাহ করছে। সচরাচর যেমন হয়। নিমন্ত্রিতেরা বাগানে ইতস্তত ঘোরাফেরা করছেন। ছোট-ছোট গ্রুপে আড্ডা জমাচ্ছেন। গুণবতী মোহান্তি আর তাঁর মেয়ে সুভদ্রা ঘটনাচক্রে ঐ সময় কলকাতার বাড়িতে ছিলেন। সল্টলেকের বাড়িতে। কীর্তিমান প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী শিঙে ফোঁকার আগেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কিছু মাথা গোঁজার সাত-আটতলা ভদ্রাসন নির্মাণ করে গেছেন। স্বনামে নয়—বোম্বাই আর দিল্লির মোকাম গুণবতী মোহান্তির। কলকতা, বাঙ্গালোর আর পুরীর প্রাসাদ তিনটি কন্যা সুভদ্রার নামে। রাষ্ট্রমন্ত্রী জীবিতকালে ছিলেন : অনিকেত। স্ত্রী-কন্যা তাদের বাড়িতে ঢুকতে না দিলে আক্ষরিক অর্থে পথে বসতে হতো তাঁকে। ওঁরা মা-মেয়ে কলকাতা থেকে মারুতি-সুজুকি ভ্যানটা নিয়ে এসেছেন। অনুরাধা আর জয়ন্ত এসেছে লোকাল ট্রেনে। তাদের ফেরার তাগাদা ছিল। তবে মিসেস্ মোহান্তি তাদের আশ্বাস দিয়ে রেখেছেন, ওরা ফেরার ট্রেন না পেলে ওদের কলকাতায় পৌঁছে দেবেন। ছায়াকে পেয়ে অনুরাধা জনান্তিকে জানালো—লাস্ট ট্রেন মিস্ করলে আমি কিন্তু আপনাদের গাড়িতে ফিরব মিসেস্ পালিত।

হেতুটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি ছায়ার। সেই হারিত-জাড়িত-লারিত/অমিতা-জমিতা-তমিতার হিডিয়াস্ হেক্সাগনের আধখানা। অনুরাধা চাইছে ইন্দ্রকুমারকে এবং ইন্দ্রকুমার চাইছে অর্ধেক রাজত্ব সমেত উৎকলী রাজকন্যাকে। ফলে অনুরাধা সুভদ্রার ওবলিগেশন নেবে না।

ঘোষাল সুযোগমতো ছায়াকে জনান্তিকে পকড়াও করলেন।—তুমি একটু ক্যাপ্টেনের দিকে নজর রেখ, ছায়া। বে-এক্তিয়ার হয়ে গেলে তুমিই অপ্রস্তুতে পড়বে। অবশ্য ইচ্ছে করলে রাতটা তোমরা দুজন আমার বাড়িতেও কাটিয়ে যেতে পার। কাল তো রোববার। দোকান বন্ধ।

ছায়া বলেছিল, আপনি ব্যস্ত হবেন না, ডক্টর ঘোষাল। জগৎ তিন পেগের বেশি ড্রিংক্‌স্ নেবে না। আর তিন পেগে ওর কিস্‌সু হয় না!

—তিন পেগ? মাত্র তিন পেগ! কেন গো?

—ও আজকাল তিন পেগের বেশি খায় না।

এখানে ছায়ার জবানবন্দি থামিয়ে দিয়ে বাসুসাহেব বলে ওঠেন, বল কি হে ছায়া! ক্যাপ্টেনের এই হাল? অমৃতে অরুচি? কেন গো?

ছায়া জবাব দেবার আগেই রানু বলে ওঠেন, তোমার নিজের কিন্তু দু-পেগ অমৃত-সেবন শেষ হয়ে গেছে।

বাসুসাহেব সামলে নিয়ে বলেন, ইয়েস! আই রিমেম্বার। বাকি আছে বরাদ্দমতো জাস্ট 'আ-মিনি-হাফ'!

বলতে বলতেই ঢাললেন পুরো এক পেগ!

ছায়া বললো, জগতের প্রসঙ্গে পরে আসব, মেসোমশাই। আপাতত শনিবার সন্ধের ঘটনাটা শেষ করি—

—কর!

ঐ জনান্তিকতার সুযোগে ছায়া ডক্টর ঘোষালকে প্রশ্ন করেছিল, ঐ হারু লোকটা কে?

—হারু? মানে?

—ঐ যাকে আপনি 'হারু' বলে তখন ডাকলেন। যে লোকটা ফুলদানি নিয়ে এল? ঐ তো ট্রে-তে করে ডিংক্স্ সাজিয়ে সার্ভ করছে?

ডাক্তার ঘোষাল বললেন, ও! হারাধন? ও আমার কম্বাইন্ড-হ্যান্ড। কেন বল তো? ওর বিষয়ে হঠাৎ তোমার কৌতূহল হলো কেন?

ছায়া স্বীকার করলো না যে, লোকটাকে তার চেনা-চেনা লাগছে। কোথাও সে ওকে দেখেছে। ঐ লোকটাকে, অথবা তার ফটোগ্রাফ। খেলার এই পর্যায়ে, এই জিলে, সে রঙের গোলামটাকে পেড়ে লিড দিতে রাজি হলো না। দেখা যাক—'মজারু' খেলাটা কোনদিকে মোড় নেয়। ছায়ার চিন্তাটা তখন ঐ রকম। ও এবার জানতে চাইল, ডাক্তারসাহেবের বাড়িতে 'টয়লেট'টা কোথায়? ঘোষাল একটি চাকরকে ডেকে বললেন, নন্দু, এই দিদিমণিকে আমার দোতলার বেডরুমের সংলগ্ন বাথরুমটা দেখিয়ে দে।

নন্দু বললে, আসেন দিদি, আমার লগে লগে।

ওর পিছন-পিছন যেতে যেতে ছায়া জিজ্ঞেস করলো, তুমি বুঝি এবাড়িতেই কাজ-টাজ কর, নন্দু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, দিদি। তা প্রায় সাত বছর। আমি রান্নাবান্না করি। ডাক্তারবাবুর বেবাক্ কাজ করে দি—

—আর ঐ হারাধন? সে কী করে?

নন্দু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, জানি না তো, দিদি। ডাক্তারবাবুরে জিগাইবেন।

ছায়া রীতিমতো অবাক হয়ে যায়। এটাই কি তাহলে 'মজারু'? ডাক্তারবাবু যার পরিচয় দিচ্ছেন 'কম্বাইন্ড-হ্যান্ড' বলে, তাঁর সত্যিকারের কম্বাইন্ড-হ্যান্ড বলছে—সে লোকটা কী করে তা ও জানে না। এর মানেটা কী? মজারু?

ছায়া আবার জানতে চায়, ঐ হারাধন কতদিন এখানে কাজ করছে?

—কাজ? আজ্ঞে না, কাজ তো ও কিছু করে না, দিদি। আছে গত মঙ্গলবার থিকা। ...ঐ...ঐটে বাথরুম। অ্যাইডে সুইজ। আপনে ভিৎরি যান, আমি বাতি জ্বেলে দেবনে।

ছায়া বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখল ভ্রাম্যমাণ আগন্তুকেরা বিভিন্ন টেবিলে ঘনিয়ে বসছেন। ছায়া তার ক্যামেরা বার করে তিন-চারটি শট নিল। ঐ 'হারাধন' লোকটার মধ্যে 'মজারু'-র সন্ধান পেয়ে কায়দা করে ফ্ল্যাশবাল্‌বে এমন ফটো তুললো যাতে হারাধনের ফ্রন্ট ও সাইড ভিয়ু স্পষ্ট পাওয়া যায়।

ইতিমধ্যে সবাই বসেছেন। ডাক্তারসাহেব যে টেবিলে বসেছিলেন সেই টেবিলে ছিলেন আরও তিনজন নিমন্ত্রিত : ঘোষালের ডাইনে অনুরাধা বসু, বাঁয়ে সুভদ্রা মহান্তি। ঘোষালের বিপরীতে ঐ ভদ্রমহিলা, অ্যাগি ডুরান্ট। তাঁর পাশের টেবিলে বসেছিলেন ক্যাপ্টেন পালিত। তাঁর হাতে হুইস্কির গ্লাস—'হুইস্কি অন রক্স্'। ক্যাপ্টেনের পাশের চেয়ারে এখানকার মানসিক হাসপাতালের একজন ডাক্তার—তাঁর সঙ্গে ছায়ার আলাপ হয়নি। আরও একজন ভদ্রমহিলা বসেছিলেন—স্থানীয় একজন পুলিস অফিসারের স্ত্রী। টয়লেট থেকে ফিরে আসার পর তিনিই ছায়াকে ডাকলেন, আসুন, দিদি। এই চেয়ারটায় বসুন।

ছায়া তাঁর পাশের চেয়ারটায় বসল। উনি বললেন, আমার নাম পম্পা সেনরায়। আমি ডক্টর ঘোষালের একজন এক্স-পেশেন্ট।

তাঁর ওপাশ থেকে ডাক্তারবাবুটি বললেন, তা-ছাড়াও ওঁর আর একটি পরিচয় আছে। উনি : প্রতীক্ষারতা নায়িকা।

ছায়া চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলে, মানে?

—কোনার্ক-খাজুরাহে দেখেননি? প্রতীক্ষারতা নায়িকামূর্তি?

—তা দেখেছি। কিন্তু উনি কেন তা হতে যাবেন?

ডাক্তারবাবু বললেন, ব্যাখ্যা দাখিল করব। তার আগে নিজের পরিচয়টা দিই। আমার নাম অমরেশ দাশ। ডক্টর ঘোষালের কোলিগ। এই মানসিক হাসপাতালেই আছি। ...না, না, আপনাকে পরিচয় দিতে হবে না, মিসেস্ পালিত। আমরা আপনার পরিচয় জানি। ...যে কথা বলছিলাম, মিসেস্ পম্পা সেনরায়ের আরও একটি পরিচয় আছে। উনি এখানকার ডি. এস. পি. মিস্টার যুগলকিশোর সেনরায়ের বেটার হাফ। ওঁদের দুজনেরই সায়মাশে নিমন্ত্রণ ছিল, কিন্তু স্থানীয় মস্তানদের মধ্যে দলাদলিতে বোমাবাজি হওয়ায় ডি. এস. পি-সাহেব আটকা পড়েছেন। তাই পম্পা দেবী সেই অজন্তা গুহার 'প্রতীক্ষারতা কৃষ্ণা রাজকুমারী'তে রূপান্তরিতা। কিন্তু আপনি তো কোনো ড্রিংক্স্ নেননি এখনো। অ্যাই...ব্যয়?

নেপথ্যের দিকে হাত বাড়িয়ে উনি যে ভঙ্গিতে 'ব্যয়' বলে হাঁকাড় পাড়লেন, তাতে ছায়ার মনে হলো ওঁর থার্ড পেগ ইতিমধ্যেই নিঃশেষিত।

এগিয়ে এল সেই লোকটি।

টাকা-টাকা চুল, ঝোলা গোঁফ, ফতুয়া গায়ে।

তার হাতে একটি ট্রে। তাতে নানান পানীয়।

ছায়া যে কখনো পান করেনি তা নয়, কিন্তু ওর খেয়াল ছিল—গাড়ি ড্রাইভ করে কলকাতায় ফিরতে হবে। জগৎ এক সপ্তাহ হলো তিন পেগের বেশি পান করছে না ; কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞা যে আজকের এই উৎসব রজনীতেও রক্ষিত হবে তার গ্যারান্টি নেই। সে, ঐ লোকটা—কী যেন নাম?—হ্যাঁ, হারাধনকে বললে, এর মধ্যে সফ্ট্-ড্রিংস্ কোনটা? গোল্ড স্পট, সিট্রা, কোকোকোলা জাতীয় যা হয় একটা দাও—যাতে অ্যালকহল নেই।

হারাধন একটা গ্লাস ওর হাতে তুলে দিল। বললো : পেপ্সি! ছায়ার মনে হলো, লোকটার টনসিলের দোষ আছে। কণ্ঠস্বর কেমন ফ্যাসফ্যাসে। মাত্র দুটি শব্দ সে উচ্চারিত হতে শুনেছে। ইতিপূর্বে 'আজ্ঞে আচ্ছা' আর এবার 'পেপ্সি'। মনে হলো হারাধন খুব মিতভাষী!

ডক্টর দাশ প্রতিবাদ করেন, এটা কেমন হলো মিসেস্ পালিত? হার্ড ড্রিংস না নিতে চান তো একটা জিন-উইথ-লাইম তো নেবেন?

ছায়া বললে, সরি, ডক্টর। আমাকে ড্রাইভ করে কলকাতা ফিরতে হবে। আমি দ্বিচারিণী হতে রাজি নই। আইদার ড্রিংক্স্ অর স্টিয়ারিং—নট বোথ!

সুভদ্রা পাশের টেবিলে তখন কী একটা জোক্‌স্‌ শোনাচ্ছিল। ঠিক পাশের সিটে বসেছিলেন ডক্টর ঘোষাল। তাঁর বাঁ-হাতে ধরা ছিল একটা আধখাওয়া ফিশ-ফিঙ্গার। এই সময় হারাধন ট্রে-হাতে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ছায়ার স্পষ্ট মনে আছে তার হাতে যে ট্রে-টা ছিল, তাতে তখন চার-পাঁচটা গ্লাস—হুইস্কি, রম, রেড-ওয়াইন, ভদ্‌কা—

বাধা দিয়ে বাসু প্রশ্ন করেন, তুমি দেখেই চিনতে পারলে? কোনটা কী?

ছায়া হাসল। বললো, মেসোমশাই! আমি অ্যালকহলিকের ঘরণী। আমার স্বামীর জীবনের লক্ষ্য : সিরোসিস্‌ অব্‌ লিভারের তীর্থে উপনীত হওয়া! আমি ড্রিংক্‌স্‌ চিনব না? রঙেই তো বোঝা যায়—হুইস্কি, রম, রেড-ওয়াইন আর ভদ্‌কার পার্থক্য। ওখানে জিন থাকলে ভদ্‌কার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলতে পারতাম, অথবা ব্র্যান্ডি থাকলে হুইস্কির সঙ্গে...

বাসু বলেন, আয়াম সরি। ঠিক আছে। বলে যাও...

—হারাধন দুটো টেবিলের মাঝখানে দাঁড়ানোতে ওদিকটা আমারও দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল। তবে ডাক্তার ঘোষাল একটি গ্লাস তুলে নিতেই হারাধন তাঁর ওপাশে চলে গেল। ইতিমধ্যে সুভদ্রার জোক্‌স্‌টা শেষ হয়েছে। আমি তাকিয়েছিলাম ডাক্তারসাহেবের দিকে। দেখলাম, তাঁর হাতে-ধরা গ্লাসটার পানীয় সাদা রঙের। অর্থাৎ তিনি ভদ্‌কা উইথ লাইম কডিয়াল নিয়েছেন। সুভদ্রার জোকটা শেষ হতেই সবাই হেসে উঠলো। ঘোষাল ফিশ-ফিঙ্গারের বাকি টুকরোটা মুখে পুরে দিলেন। তারপর তাঁর ডান-হাতে ধরা পানীয়টায় একটা চুমুক দিলেন। আর তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন। মুখটা বিকৃত হয়ে গেল তাঁর। তারপরেই গ্লাসটা টেবিলে ঠক্‌ করে নামিয়ে রাখলেন। মুখে বললেন, 'এক্সকিউজ মি'...

ছায়ার মনে হলো ওঁর একটা বিবমিষার বেগ এসেছে। তাই দ্রুত টেবিল ছেড়ে আড়ালে আসতে চাইছিলেন। পারলেন না। প্রথম পদক্ষেপের পরেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন।

ন্যাচারালি একটা সোরগোল উঠল। সবাই এদিকে ছুটে এল। ছায়ার দৃষ্টির আড়ালে পড়ে গেলেন ডক্টর ঘোষাল।

বাসুসাহেব নিজের হাতের গ্লাসটা তুলে দেখিয়ে ছায়াকে প্রশ্ন করেন, আর গ্লাসটা? ঘোষালের হাতের গ্লাসটা?

ছায়া বললে, আয়াম সরি, মেসোমশাই, আমি জানি না। আমি চোখ মেলে দেখিনি...

—কী আশ্চর্য! প্রথমবার তো দেখেছিলে? বিল শবরিয়ার কেসে?

—তা দেখেছিলাম। কী জানেন, মেসোমশাই, সেবার আমার প্রথম প্রতিক্রিয়ায় মন বলেছিল—'এটা হার্ট-অ্যাটাক নয়, হত্যা—বিষপ্রয়োগে হত্যা!' তাই আমি সজাগ দৃষ্টি মেলে সব কিছু লক্ষ্য করেছিলাম।

—আর এবার?

—আয়াম সরি টু অ্যাডমিট, স্যার! এবার আমার ভুল হয়ে গেল। হিমালয়ান্তিক ভ্রান্তি। আমার মনে হলো, এটা ডক্টর ঘোষালের একটা 'ফিল্‌থি জোক'! উনি অ্যাবে শবরিয়ার মৃত্যু-অভিনয় করে আমাদের একটা 'মজারু' দেখাচ্ছেন। আমি মর্মান্তিকভাবে আহত হয়েছিলাম—এ কী চ্যাঙরামি! ডঃ ঘোষাল একজন বয়স্ক, প্রতিষ্ঠিত মানুষ! একজন আদিবাসী যাজকের মৃত্যু-মুহূর্তের যন্ত্রণার অভিনয় করে উনি আমাদের 'মজারু' দেখাচ্ছেন!!

—তারপর?

—মিনিট পাঁচেক আমি ঐ চিন্তাতেই বিভোর ছিলাম। প্রতি মুহূর্তেই আশা করছিলাম অভদ্র অভিনয়ে ক্ষান্তি দিয়ে ঘোষাল হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াবেন। তা তিনি দাঁড়ালেন না।

ইতিমধ্যে কী হয়েছে, কে কী করেছে আমি জানি না। তারপর জগৎ আমার হাতটা টেনে নিয়ে বললো, কী ভাবছ? আশ্চর্য কোয়েন্সিডেন্স! নয়?

—কী কোয়েন্সিডেন্স?

—দু-দুটো মৃত্যু! একই ভাবে।

তখনই আমি বুঝতে পারলাম—ঘোষালসাহেবের ঐ পতন ও মৃত্যুটা অভিনয় নয়, বাস্তব ঘটনা। আমি মর্মাহত হয়ে গেলাম। হয়তো তবু আমার বিশ্বাস হতো না, হলো অ্যাগি ডুরান্টের দিকে তাকিয়ে। তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। আমার পাশের চেয়ারের সেই পম্পা—অজন্তার প্রথম গুহা-বিহারের প্রতীক্ষারতা কৃষ্ণা রাজকন্যা? সে হয়ে গেছে ষোড়শ বিহারের 'মরণাহতা জনপদকল্যাণী The Dying Princess!' এলিয়ে পড়েছে চেয়ারেই।

সম্বিত ফিরে পেয়েই—বিশ্বাস করবেন না—আমার মনে প্রথম প্রশ্ন জাগল : ঐ লোকটা কোথায়? হারু? হারাধন? ডক্টর ঘোষালের দীর্ঘদিনের কম্বাইন্ড-হ্যান্ড?—যে গত সপ্তাহে কাজে বহাল হয়েছে? চারিদিকে তাকিয়ে আমি তাকে খুঁজে পেলাম না। এটা কেমন কথা? নন্দু আর ওঁর ড্রাইভার—কী যেন নাম, বাড়ির ঠিকে ঝি সবাই মৃতদেহ ঘিরে আছে। নিমন্ত্রিত সকলেই উপস্থিত। শুধু সে-লোকটা নেই! কেন? কেন? কেন?

একজন ক্যাটারারকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, হারুকে দেখেছ? লোকটা প্রতিপ্রশ্ন করে, হারু কে?

—হারু। হারাধন। ঐ যে লোকটা এতক্ষণ ড্রিংক্স্ সার্ভ করছিল। ফতুয়া পরা, বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বয়স। মাথায় টাকা-টাকা চুল, ঝোলা গোঁফ...

ও-পাশ থেকে আর একজন ক্যাটারারের লোক বললে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি, দিদি। হারাধনদা। সে তো ট্রেটা নামিয়ে রেখে কোথায় যেন চলে গেল!

ছায়া জানতে চাইল, কোথায়?

—তা কেমন করে জানব, দিদি?

ক্যাপ্টেন পালিত জানতে চায়, সে লোকটাকে তোমার কী দরকার?

—এ রকম মর্মান্তিক অবস্থায় বাড়ির লোক ওভাবে লুকিয়ে থাকবে কেন?

ক্যাপ্টেন পালিত বলে ওঠে : তাতে তোমার কী মাথাব্যথা?

ছায়ার এতক্ষণে খেয়াল হয় : তার বাঁ-হাতে দীর্ঘ সময় ধরে আছে একটা কাচের গ্লাস। তাতে একটা সফ্ট্ ড্রিংক : পেপ্সি বা ঐ জাতীয় কিছু। সে পরখ করে দেখেনি এখনো। এবার সে সাবধানে পানীয়টা মাঠে ঢেলে ফেলে দেয়। ডিনার প্লেটের পাশে থাক-দেওয়া পেপার ন্যাপকিন খানকয় তুলে নেয়। সাবধানে মুড়িয়ে ওর হাতব্যাগে কাচের গ্লাসটা ভরে ফেলে।

বাসু বললেন, গুড! কোথায় সে গ্লাসটা?

হাতব্যাগ খুলে ছায়া টিসু-কাগজে মোড়া সেই কাচের গ্লাসটা বার করে টেবিলে নামিয়ে রাখল। ঐ সঙ্গে একটা হাফ-ফুলস্ক্যাপ মাপের কার্টিজ কাগজ। তাতে পাঁচ দু-গুনে দশটা আঙুলের টিপ ছাপ। রাবার স্ট্যাম্প-প্যাডের কালো কালিতে তোলা।

ছায়া বললে, এই দশটা হচ্ছে আমার দশ-আঙুলের ছাপ। গ্লাসটা কখন কোন হাতে ধরেছি মনে নেই। ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টকে বলবেন, এই দশটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছাড়া ঐ গ্লাসে যদি আর কোনো লেটেস্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যায়, তবে তা হারাধন দাশের। ও নিজে হাতে গ্লাসটা ধরে আমার হাতে তুলে দিয়েছিল। আমার যতদূর মনে আছে : ডান হাতে।

বাসু বললেন, তুমি খুব বুদ্ধিমতীর মতো কাজ করেছ, ছায়া। গ্লাসটা দাও, আমি খুব যত্ন

করে তুলে রেখে দিচ্ছি। তবে 'হারাধন দাস' লোকটার আইডেন্টিটি গোপন নেই। আমরা জানি : সে কে!

—আপনারা জানেন? জানেন লোকটা কে?

বাসু নিঃশব্দে তাঁর অ্যাটাচি-কেস থেকে খান-চারেক পোস্টকার্ড সাইজ ফটোগ্রাফ বার করে তাঁর গ্লাসটপ টেবিলে রাখলেন—একই লোকের। দুখানি—দুখানি—সম্মুখ দৃশ্য ; দুখানি পার্শ্বচিত্র বা প্রোফাইল।

বললেন, তুমি মিলিয়ে দেখে নাও, ছায়া।

ছায়া সাবধানী মেয়ে। তাড়াহুড়া করলো না। চারখানি ছবি টেবিল-ল্যাম্পের কাছে নিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলো। বাসুসাহেব নিঃশব্দে ওঁর অ্যাটাচি-কেস থেকে একটা বড় ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস বার করে দিলেন। ছায়াও সেটা বিনা বাক্যব্যয়ে হাত বাড়িয়ে নিল। অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে দেখে বললে : হ্যাঁ, একই লোক, কিন্তু কে লোকটা?

—একটা অতি পরিচিত অ্যান্টিসোস্যাল। ওর অপারেশনের এলাকা ছিল মুর্শিদাবাদ জেলা। খুনের কেসে ধরা পড়ে। হয়তো ফাঁসিই হয়ে যেত ; কিন্তু ওর দলের লোক পুলিস ভ্যান থেকে ওকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সেই থেকে লোকটা ফেরার। ওর ছবি ছাপিয়ে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। হয়তো তুমি তা দেখেছ—ঠিক মনে করতে পারছ না—তাই প্রথম দর্শনেই তোমার মনে হয়েছিল একে আগে কোথাও দেখেছ। ও একজন পাক্কা অ্যান্টিসোস্যাল—বর্তমানে ফেরার। ওর নাম : পঞ্চানন ঘড়াই। ডাক নাম: পচাই।

ছায়া অনেকক্ষণ ধরে হজম করলো তথ্যগুলো। তারপর জানতে চাইলো এমন একজন সামাজবিরোধীকে ডাক্তার ঘোষাল তাঁর বাড়িতে ঠাঁই দিয়েছিলেন কেন?

—সেটাই এ রহস্যের বুল্‌স্‌-আই—কেন্দ্রীয় সমস্যা!

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো ছায়ার। বললো, তাহলে এই গ্লাসটার, আই মিন ফিঙ্গারপ্রিন্টের কোনো প্রয়োজন নেই?

—তা তো আমি বলিনি, ছায়া। তুমি ওটা দাও। আমি সযত্নে প্রিজার্ভ করব।

—কিন্তু লোকটার আইডেন্টিটি তো জানা গেছে?

—তোমার-আমার কাছে। আদালতের কাছে নয়। পঞ্চানন যদি কোনোদিন ধরা পড়ে তাহলে সে তো স্বীকারই করবে না যে 'হারাধন দাস'-এর ছদ্মবেশে সে চিনসুরায় কোনো ডাক্তারবাবুর বাড়িতে আদৌ চাকরি করেছে—

—কিন্তু এই ফটোগ্রাফগুলো?

—ওগুলো যে তুমি সেই শনিবারে ডিনার পার্টিতে তুলেছ তার কী প্রমাণ? ওর উকিল বলবে, ধর্মাবতার! এ চারখানাই পঞ্চাননের ফটোগ্রাফ। পুলিসের তোলা। যখন সে হাজতবাস করেছে।

—তাহলে তো কাচের গ্লাসের ফিঙ্গারপ্রিন্টের ক্ষেত্রেও সে বলতে পারে সেগুলো পঞ্চানন ঘড়াই-এর, হারাধনের নয়।

—না। পারে না। কাচের গ্লাসে দেখ, ক্যাটারারের নামের মনোগ্রাম এচিং করা আছে। ক্যাটারার আদালতে হলফ নিয়ে বলবে যে, এ গ্লাস তাদের। ঐ গ্লাসে হাজতবাসকালে পঞ্চানন ঘড়াই-এর আঙুলের ছাপ পড়তে পারে না। ডাক্তার ঘোষালের তথাকথিত কম্বাইন্ড-হ্যান্ড 'হারাধন দাসে'র আঙুলের ছাপই পড়েছে। থ্যাংকস্‌ ছায়া, ফর য়োর কন্ট্রিব্যুশন।

ছায়া বলে, তাহলে উঠি?

—আর একটু বস। একটা ব্যাপারের ব্যাখ্যা দাওনি এখনো। ক্যাপ্টেন জগৎ পালিত কেন এখন তিন পেগের বেশি অমৃতপানে আগ্রহী নয়।

ছায়ার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। বললো, ওর একটা বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। আমার একজন সহপাঠিনী, কলেজের বান্ধবী একটা 'অরফানেজ'-এ কাজ করে। পিতৃমাতৃহীন অনাথদের প্রতিষ্ঠান। ও আমাদের দুজনকে ওদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করে। পথে কুড়িয়ে পাওয়া বা বাপ-মা পরিত্যক্ত বাচ্চাদের একটা নাচ-গান উৎসবের আয়োজন। সেখানে ঐ পরিত্যক্ত অবমানিত মানবশিশুগুলিকে দেখে জগতের মনে দারুণ একটা আঘাত লাগে। সে ফিরে এসে নিজে থেকেই আমাকে বলে, 'কাম্ অন্ ছায়া! আমরা ঐ অনাথ আশ্রম থেকে একটি মেয়েকে নিয়ে এসে অ্যাডপ্ট করি। তাকে দত্তক নিই। তাকে কন্যাত্বে বরণ করে নিই।'

—আমি অবাক হয়ে বলি, সে-কথা তো অনেক আগেই আমি বলেছিলাম, তখন তুমিই তো রাজি হওনি—

ও বললে, আই অ্যাডমিট। আজ হচ্ছি! বাস্তব সমস্যাটা সেদিন ঠিক বুঝতে পারিনি, আজ পারছি। বিশ্বনিয়ন্তা বলে যদি কোনো ভদ্রলোক থাকেন, তাহলে তিনি আমাকে এক অস্ত্রে মেরেছেন—ঐ বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলিকে অন্য অস্ত্রে অন্যভাবে মেরেছেন। গড-অর-নো-গড—আমরা কি পরস্পরের সমস্যার পরিপূরক সমাধান দাখিল করে ঐ পরম করুণাময় গড-ভদ্রলোককে বলতে পারি না—উই কেয়ার টু হুটস্ ফর য়োর অ্যাপাথি?

—কী বলব, মেসোমশাই, আমি জগতের মধ্যে একটা নতুন মানুষকে আবিষ্কার করলাম। ও নাস্তিক ছিলই, এখনো তাই আছে। কিন্তু ও নিজের পথে জীবনের সমস্যাটার সমাধানটা খুঁজছে। আজ মনে হচ্ছে ও শচীশের জ্যেঠামশায়ের মতো আইডিয়াল নাস্তিক। 'চার অধ্যায়ের' শচীশের কথা বলছি! তাই ও ঈশ্বরকে শত্রুভাবে ভজনা করতে চায়।

বাসুসাহেব বললেন, তুমি কি বললে?

—আমি বললুম, আমি রাজি! অনাথ আশ্রম থেকে অনাথা একটি মেয়েই নিয়ে আসব। অনাথ আশ্রমের ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশি দুর্ভাগিনী। ছেলেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে অধিকাংশই উপার্জনশীল হয়ে ওঠে। মেয়েরা যায় 'রেড লাইট' এলাকায়। তুমি-আমি যৌথ প্রচেষ্টায় যদি একটি মেয়েকেও সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তাতে আমাদেরই সান্ত্বনা, আমাদেরই জীবনের সার্থকতা। কিন্তু জগৎ, তার আগে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। তোমাকে মদ্যপান ত্যাগ করতে হবে। পারবে?

জগৎ বললো, রাতারাতি? আমার শরীর প্রতিবাদ করবে না তো? ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করব?

তাই করেছিলাম আমরা। ডাক্তারবাবু বলেন, প্রথম এক মাস ও তিন পেগের বেশি খাবে না। পরের মাসে দু পেগ। তার পরের মাসে এক পেগ। তারপর ছেড়ে দেবে। জগৎ রাজি হয়েছে। এখন তার তিন পেগের জমানা চলছে!

রানু জানতে চাইলেন, ডাক্তারবাবুর নাম-ঠিকানাটা আমাকে জানাবে ছায়া? আমি তাঁকে একটু কনসাল্ট...

বাসু বাধা দিয়ে বললেন, এ-সব ছেঁদো-কথার কোনো মানে হয়? শিভাস-রিগ্যালের বোতলটা টেনে নিলেন তিনি!

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসেছেন চারজন। বাসুসাহেব আজকাল প্রাতরাশে

টোস্ট-মাখন-ডিম ইত্যাদি আদৌ খান না। পেঁপে-কলা-শশা-আপেল-আঙুরের একটা হচপচ শেষ করে একপিস ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুটের সঙ্গে র-কফি পান করেন। বাকি তিনজনে টোস্ট-অমলেট-চা। রানু দেবীর কড়া ব্যবস্থাপনা।

রানু বললেন, আমার তো মনে হচ্ছে তোমার হাতে এবার যে কেসটা এসেছে সেটাই তোমার গোটা কেরিয়ারে মোস্ট মিস্টিরিয়াস কেস! আমরা তো ভেবেচিন্তে কোনো কিনারাই করতে পারছি না।

টোস্টে একটা কামড় দিয়ে সুজাতা বললে, তা ঠিক।

বাসু নির্বাক। পেঁপে চিবোচ্ছেন। কৌশিক বললো, মামু কিছু বলছেন না যে? আপনার কমেন্টস্?

—কী বলব? পাগলের প্রলাপের উপর কমেন্টস্ করা চলে?

রানু রুখে ওঠেন, পাগলের প্রলাপ! কেন? কী ভুল বলেছি আমি?

—প্রথম কথা, আমার হাতে কোনো 'কেস' নেই। আইনজীবীর কাছে 'কেস' শব্দটি 'ক্লায়েন্ট' শব্দের সঙ্গে বাগর্থের মতো সম্পৃক্ত! ক্লায়েন্ট আসবে, নাম-ঠিকানা বাৎলাবে, সমস্যাটার কথা বলবে, রিটেইনার দিয়ে রসিদ নেবে, তখনই না পয়দা হবে 'কেস'! এখানে আমার মক্কেল কে?

সুজাতাও রুখে ওঠে: এই কথা? বেশ! দিন তো মামিমা, একটা একশো টাকার রসিদ। টাকাটা সুকৌশলী দেবে। আপনার ক্লায়েন্ট : 'সুকৌশলী'। হলো তো? এবার?

বাসু বিনা বাক্যব্যয়ে পেঁপের পর্বতে ফর্কের কোদাল চালাতে থাকেন।

কৌশিক সহধর্মিণীকে মদত দিতে এগিয়ে আসে, আপনার বোধহয় মনে নেই, মামু—আমি একসময় এস.টি.ডি. ফোন করতে চাওয়ায় সুজাতা বলেছিল : 'দিস্ ইজ ওয়াইল্ড গুজ চেজ! আমাদের ক্লায়েন্ট কই?' তখন আপনিই তাকে এক ধমকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—এ-কেসে সুকৌশলীর ক্লায়েন্ট ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু! বলেননি?

বাসু ঢোক গিলে সামলে নেন নিজেকে। বলেন, অল রাইট! আমরা পরস্পরকে এনগেজ করেছি। সুকৌশলী আমাকে, আমি সুকৌশলীকে। আমরা মিউচুয়ালি পরস্পরের এজেন্ট। কিন্তু কী জান কৌশিক? সমাধানের আগে সব কেসকেই মনে হয় এটাই সবচেয়ে মিস্টিরিয়াস!

—আপনি এ কেসে কোনো সমাধানের সঙ্কেত পাচ্ছেন?

—পাচ্ছি। সঙ্কেত পাচ্ছি, ইঙ্গিত পাচ্ছি—কিন্তু চূড়ান্ত সমাধানে আসতে পাচ্ছি না। কারণ যথেষ্ট পরিমাণে ডাটা এখনো হাতে আসেনি!

—কী জাতীয় 'ডাটা'?

—সবচেয়ে বড় 'ডাটা' হচ্ছে : অ্যাবে বিল শবরিয়ার মৃত্যুর প্রকৃত হেতুটা কী? হার্ট-ফেলিওর না বিষপ্রয়োগ? যদি সেটা 'হার্ট-ফেলিওর'-এর কেস হয়, তাহলে আমার পক্ষে ঘোষালের মৃত্যু-রহস্য সমাধান অনেক সহজ হয়ে পড়ে। কিন্তু দুটো কেসই যদি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়—দুটো যদি একই হাতের সূক্ষ্ম কাজ হয় তাহলে ছায়া পালিতের ভাষায় আমাদের সামনে প্রথমেই উপস্থাপিত হবে একটা গ.সা.গু.-র অঙ্ক।

—গ.সা.গু? তার মানে?—জানতে চায় সুজাতা।

—গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক। দুটি পার্টিতেই উপস্থিত ছিল কে, কে? তাদের মধ্যেই কেউ বিশেষ পানীয় পাত্রে বিষ মেশাচ্ছে! বাইরের লোকের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

রানু বললেন, হ্যাঁ; সে-হিসাবটা আমি কষে রেখেছি। দু-দুটি ডিনার পার্টিতে শারীরিক

উপস্থিতি একুশ জনের। প্রথম পার্টিতে ছিল তেরজন। তার ভিতর একজন ভিক্‌টিম। ফলে বারোজন। দ্বিতীয় পার্টিতে ছিল ভিক্‌টিম বাদে নয়জন। প্রথম পার্টির ঠাকুর-চাকর-সার্ভারদের হিসাবের বাইরে রাখছি যেহেতু দ্বিতীয় পার্টিতে তারা কেউ ছিল না। দ্বিতীয় পার্টির ক্যাটারারদেরও একই কারণে বাদ দিচ্ছি। এই একুশ জনের মধ্যে কমন ফ্যাকটর—যাঁরা দুটো পার্টিতেই উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সংখ্যা: ছয়! তাঁরা হলেন : ক্যাপ্টেন পালিত, মিসেস্ ছায়া পালিত, মিসেস্ মোহন্তি, মিস্ মোহান্তি, অনুরাধা আর জয়ন্ত। মাত্র দুজন পুরুষ, বাকি চারজন মহিলা!

বাসু বললেন, অঙ্কে ভুল হয়নি। কিন্তু সমাধান?

—সমাধান বাৎলাবার দায় তো তোমার! কোনো মহিলার পক্ষে ড্রিংক্‌সের সঙ্গে বিষ মেশানো অসম্ভব! ছায়া, অনুরাধা, সুভদ্রা বা মিসেস্ মোহান্তি ড্রিংক্‌স্ টেবিলের ধারে-কাছে যাননি। আর পুরুষ দুজন? একজন তো ক্যাপ্টেন পালিত। সর্বদা অমৃতসেবনে বিভোর। দ্বিতীয় জন জয়ন্ত। প্রথম বার সে ছিল ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত। ড্রিংক্‌স্ টেবিলের ধার-কাছে আসেনি। এবারও নাকি তাই। তাহলে?

বাসু বললেন, সে কথাই তো বলছি আমি। দুটোই যদি বিষপ্রয়োগে হত্যার কেস হয় তাহলে আমরা বিশ বাঁও জলের নিচে। এ কেস সল্‌ভ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। আর যদি ভুবনেশ্বর থেকে রিপোর্ট আসে যে, গুনপুরের সিমেটারিতে বিল শবরিয়ার দেহ 'এক্সহিউয়ুম' করে প্রমাণ করা গেছে যে, বিষপ্রয়োগে তাঁকে হত্যা করা হয়নি, তাহলে আমাদের সমস্যাটা আর 'ক্যোঅড্রাটিক ইকোয়েশন' থাকবে না। আই মিন দ্বিঘাতী সহ-সমীকরণ থাকবে না। x এবং y নয়, শুধু x-কে খুঁজব আমরা। সেক্ষেত্রে অঙ্কটা অনেক সরল হয়ে যাবে।

কৌশিক জানতে চায়, ধরুন তর্কের খাতিরে এক্ষুণি জানা গেল যে বিল শবরিয়ার মৃত্যুটা বিষক্রিয়ায় হয়নি, তাহলে আপনি কি আন্দাজ করতে পারছেন কে হতে পারে ডক্টর ঘোষালের হত্যাকারী?

বাসু র-কফিতে চুমুক দিলেন।

রানু বললেন, তখন কিন্তু সন্দেহের তালিকায় মাত্র ছয়জন নেই, আছেন নয়জন।

সুজাতা বলে, নয় কেন মামী? নয় প্লাস হারাধন—দশ।

রানু বললেন, হারাধন তো প্রফেশনাল কিলার! তাকে তো নিশ্চয় কেউ নিয়োগ করেছে। ঐ দুর্লভ এবং দুর্মূল্য নিকোটিন ডেরিভেটিভটা সরবরাহ করেছে। ভদ্‌কার পাত্রে মিশিয়ে ভিকটিমের হাতে তুলে ধরতে এনগেজ করেছে।

কৌশিক বলে, কিন্তু মিস্ অ্যাগি ডুরান্ট তাঁর স্টেটমেন্টে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন—গ্লাসটা ডক্টর ঘোষাল নিজেই তুলে নেন। কেউ 'ফোর্সিং-কার্ডের' ম্যাজিক দেখায়নি।

সুজাতা যোগ দেয়, আই রিমেম্বার। উনি বলেছিলেন, ট্রেতে চারটি পানীয় ছিল তখন—রম, হুইস্কি, ভদ্‌কা আর রেড-ওয়াইন। ডক্টর ঘোষাল তা থেকে নিজেই একটা উঠিয়ে নেন। ভদ্‌কা। অ্যাকসিডেন্টালি সেটাই ছিল বিষমিশ্রিত।

বাসু এতক্ষণে কথা বলেন, তুমি কী করে জানলে?

—কী?

—হুইস্কি-রম-রেডওয়াইনেও একই বিষ, একই পরিমাণে ছিল, কি ছিল না? সে চারটি গ্লাসের পানীয়কে কি পরীক্ষা করানো হয়েছে?

কৌশিককে স্বীকার করতে হলো, তা বটে।

রানু বললেন, আরও একটা কাকতালীয় কোয়েন্সিডেন্সের দিকে তোমাদের নজর পড়েছে কি না জানি না।

সুজাতা প্রশ্ন করে, কী কোয়েন্সিডেন্সের কথা বলছেন মামিমা?

—পুরীতে বিল শবরিয়া যে ড্রিংক্‌স্‌টা পান করেছিলেন সেটাও ছিল 'ভদ্‌কা'!

বাসু কোনো কথা বললেন না। তাঁর কফিপান শেষ হয়েছিল। হাত বাড়িয়ে টেলিফোন রিসিভারটা তুলে নিয়ে কী একটা নাম্বার ডায়াল করতে থাকেন। একটু পরেই টেলিফোনে জানতে চান, ব্রজদুলালবাবু?...হ্যাঁ, আমি বাসু বলছি। আজ আপনার কী প্রোগ্রাম?...ইন্দ্র কোথায়?...বুঝলাম! কী নাটক?...আচ্ছা। তা আপনি একবার আমার এখানে আসতে পারেন? ইন্দ্র যেমন রিহার্সাল দিচ্ছে দিক। আপনি একাই আসুন।...ইয়েস, আমি অপেক্ষা করব!

রানু জানতে চান, নটরঙ্গ নতুন নাটক নামাচ্ছে মনে হলো। কী নাটক?

বাসু বললেন, নতুন নাটক। একটা উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন ব্রজদুলাল নিজেই। উপন্যাসটার নাম—নাটকেরও ঐ নামই থাকবে—হচ্ছে : 'প্রবঞ্চক'।

কৌশিক জানতে চায় : ডাচ শিল্পী ভাঁ মীগেরের জীবনী নিয়ে লেখা নাটক?

বাসু বলেন, কি জানি! তবে গল্পে নায়িকার চরিত্রটা খুব জুতের নয়, নায়কের কন্যার ইম্পর্টেন্ট রোল। তাই অনুরাধা এ নাটকে পার্ট করছে না। সুভদ্রা করবে ইন্দ্রকুমারের মেয়ের রোল। ওদের রিহার্সাল চলছে।

রানু জানতে চান, মনে হলো তুমি ব্রজদুলালবাবু চলে আসতে বললে?

—হ্যাঁ, উনি আসছেন। এখনি।

—তোমরা কি বিয়র বা জিন নিয়ে বসবে?

—পাগল! অ্যাত সকালে? আমরা কি পাঁড় মাতাল?

রানু বললেন, না হলেই ভালো।

তেরো

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এসে পড়লেন ব্রজদুলাল। অশোক ওঁকে নামিয়ে দিয়ে কী-একটা কাজ সেরে আসতে গেল। ব্রজদুলালকে ভিজিটার্স চেয়ারে বসিয়ে বাসু বললেন, আপনার নতুন নাটকের রিহার্সাল তো শুরু হয়ে গেল বললেন। ন্যাচারালি আপনারা সবাই ক্রমশ নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। তাই এবার খোলাখুলি আলোচনার সময় এসেছে। ঘোষাল ডাক্তারের মৃত্যুটার বিষয়ে আমরা কী অ্যাটিচ্যুড নেব।

ব্রজদুলাল দশ সেকেন্ড নির্বাক তাকিয়ে থাকলেন বাসুসাহেবের মুখের দিকে। তারপর বললেন, আপনি সাদা-বাংলাই বলেছেন, বাসুসাহেব, কিন্তু আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি।

বাসু একটু ইতস্তত করে বললেন, বন্ধুকৃত্য হিসাবে আমাদের যা করার ছিল তা আমরা করেছি। পুলিসকে জানিয়েছি, তারা আততায়ীকে খুঁজছে। এরপরেও কি আমাদের আর কোনো কর্তব্য বাকি রইল? ঘোষালের স্ত্রী-পুত্র-পরিজন কেউ আছে কিনা আমরা জানি না। দূরসম্পর্কের কোনো ওয়ারিশ থাকলেও সে খোঁজ নিতে আসবে না। কারণ ঘোষাল তার

যাবতীয় পার্থিব সম্পত্তি—স্থাবর অস্থাবর—ঐ আরোগ্যনিকেতন ট্রাস্টকে দিয়ে গেছে। সুতরাং আমরা এক্ষেত্রে কি আরও অগ্রসর হব? খরচপাতি করব?

ব্রজদুলাল সোজা হয়ে উঠে বসলেন, ও! এই কথা! বুঝেছি! দেখুন, বাসুসাহেব। আমিও ঘোষালের মতো কনফার্মড ব্যাচিলার। আমিও উইল করে থিয়েটার বোর্ডকে আমার সবকিছু দিয়ে রেখেছি! আমারও স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নেই। এবং দূরসম্পর্কের কোনো ওয়ারিশ আমার খোঁজ নিতে আসবে না, বেমক্কা যদি আমি খুন হয়ে যাই। কিন্তু মানুষের আত্মা বলে যদি কিছু থাকে, তবে আমার আত্মা কিছুতেই বৈকুণ্ঠলোকে যেতে রাজি হবে না, যদি না আমার হত্যাকারী ফাঁসিতে ঝোলে। বুঝেছেন? আমি কি আপনাকে একটা অগ্রিম রিটেইনার দিয়ে রাখব? আমার নিজের খুনটার তদন্তের ব্যাপারে?

বাসু ও কথার জবাব দিলেন না। পকেট থেকে পাইপ ও পাউচ বার করে বলেন, আপনি চান যে, আমি এবং সুকৌশলী ইনভেস্টিগেশনটা চালিয়ে যাই? প্রয়োজনমতো খরচপাতি করি? এই তো?

—অফ কোর্স! ঘোষাল আমার বন্ধু। হয়তো ইন্দ্রের সঙ্গে তার যেমন বাল্যবন্ধুত্বের নিবিড় সম্পর্ক ছিল, আমার সঙ্গে তা ছিল না। তাকে বছর সাত-আট ধরে চিনি। কিন্তু তাই বলে ব্যস্ততার অজুহাতে অথবা অর্থ সঞ্চয়ের অজুহাতে আমি পিছু হটতেও রাজি নই বাসুসাহেব। পুলিস এসব কেস-এ কিছু করবে না। ব্রড ডে-লাইটে পুলিসের ডি.সি. বিনোদ মেহতা খুন হয়ে গেলেন, পূর্তমন্ত্রী হেমন্ত বসু খুন হয়ে গেলেন—পুলিস আততায়ীকে খুঁজে পেল? এক্ষেত্রে ঘোষাল ডাক্তারের মৃত্যুর কিনারা পুলিস কিছুতেই করতে পারবে না, আপনি যদি না ক্রমাগত খোঁচাতে থাকেন। বলুন স্যার, কী রিটেইনার দেব?

ইতিমধ্যে পকেট থেকে চেক বইটা বার করে ব্রজদুলাল টেবিলের উপর পেতেছেন।

বাসু বলেন, তার আগে বলুন, আমি কতদূর খরচ করতে পারি? সুকৌশলীর এক্সপেন্স সমেত?

—আপাতত ধরুন : দশ হাজার।

—আপাতত মানে?

—খরচ তো আপনি করতে শুরুই করে দিয়েছেন। হাজার দশেক পর্যন্ত খরচ করার পর আমরা থামব। একবার পিছন ফিরে দেখব—কিছুটা অগ্রসর হওয়া গেছে, নাকি ঐ আমড়াতলার মোড়েই ক্রমাগত ঘুরপাক খেয়ে মরছি। তখন পরিস্থিতি বুঝে আরও দশ-পনের হাজার খরচ করতে আমি রাজি হতে পারি। যদি আমাদের মনে হয়, আততায়ী দুজনকে আমরা ফাঁসিকাঠ থেকে ঝোলাতে পারব।

বাসু বললেন, দুটো কথা বলব, ব্রজদুলালবাবু। ফাঁসিকাঠ থেকে ঝোলানোর দায়িত্ব আইনজীবীর নয়। সে অপরাধীকে চিহ্নিত করতে পারে, আসামীর অপরাধ প্রমাণ করে দিতে পারে, গিল্টি ভার্ডিক্ট-এর বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না। ফাঁসি দেবার মালিক মহামান্য আদালত। দ্বিতীয় কথা, আপনি আততায়ী 'দুজন' বলছেন। ঐ ধারণাটা একেবারে ভুলে যান। দু-দুটো সম্ভাবনা। এক: বিল শবরিয়া হার্ট-ফেল করে মারা গেছেন—সেক্ষেত্রে আততায়ী একজন, যে ঘোষালকে খুন করেছে। সম্ভাবনা নম্বর দুই : বিল শবরিয়াকে কেউ হত্যা করেছে। সেক্ষেত্রেও আততায়ী কিন্তু মাত্র একজন, যে জোড়া খুন করেছে। তাই নয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই বটে। তা...ইয়ে...রিটেইনার কত দেব?

—আপাতত আমাকে হাজার, সুকৌশলীকে পাঁচশ। এক সপ্তাহ পরে আমরা রিপোর্ট দেব।

—এগ্রিড!

ব্রজদুলাল দুখানি চেক কেটে বাসুসাহেবের হাতে দিলেন। বাসু বেল বাজিয়ে চেক দুটি যথাস্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করলেন বিশের মারফৎ। বললেন, রসিদ দুটো নিয়ে আসিস। এখনি।

বাসু বললেন, প্রথমত তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া নেওয়া যাক যে, বিল শবরিয়াকে কেউ বিষপ্রয়োগে হত্যা করেনি। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে : ডক্টর ঘোষালকে কে মারতে চাইবে? এবং কোন লাভের আশায় মারতে চাইবে? কারণ এটা প্রমাণিত যে, ঘোষাল বিষপ্রয়োগে নিহত।

—ধরুন কাল্লু। অথবা যে রাজনৈতিক দল কাল্লুকে পোষা গুণ্ডা হিসাবে রেখেছে সেই রাজনৈতিক দলের মস্তানরা।

বাসু বললেন, যুক্তিটা দাঁড়ায় না। যতদূর জানা যায়, কাল্লু বছরখানেক আগে বহরমপুর জেল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায়। তখন সে ছিল মৃত্যুশয্যায়। টিউবারকুলেসিস্। সে দু-পায় খাড়া হয়ে উঠে প্রতিশোধ নিতে আসবে এটা ছেলেভুলনো গল্প। আর রাজনৈতিক দল? তাদের স্বার্থ কী? রাজনৈতিক দাদারা কাল্লুর মতো গুণ্ডাকে ততক্ষণই পাত্তা দেয় যতক্ষণ সে দু-পায়ে খাড়া! নির্জীব হয়ে শুয়ে পড়লে স্টাম্পে পরিণত সিগ্রেটের মতো অ্যাশট্রেতে গুঁজে দেয়।

—তাহলে কে?

—প্রশ্ন সেটাই। ওঁর মৃত্যুতে কে লাভবান হলো?

—হাসপাতালের ট্রাস্ট বডি। কিন্তু সে কারণে কেউ অমন একজন দেবতুল্য মানুষকে খুন করে না।

—ঠিক কথা। আপনি বলেছেন, ঘোষালকে বছর সাত-আট ধরে চেনেন। ওর 'আরোগ্যনিকেতন'-এ আপনি ডোনেট করেন? বার্ষিক দান?

—হ্যাঁ, করি। প্রথম-প্রথম বছরে দু-হাজার করে দিতাম। লাস্ট ইয়ার থেকে পাঁচ হাজার করে দিচ্ছি।

—কেন? বাড়িয়ে দিলেন কেন?

—তিনটি কারণে। এক: বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা গাঢ়তর হওয়ায়। দুই: ওদের প্রতিষ্ঠানের কাজ দেখে মুগ্ধ হয়ে। তিন: আমার নিজের উপার্জন বৃদ্ধি পাওয়ায়। নিশ্চয় জানেন: ঘোষালের হাসপাতালে দান করলে ইনকামট্যাক্সে এইট্টি-এইট জি সেকশন থেকে ছাড় পাওয়া যায়।

—আই সি! ইন্দ্রও কি কিছু দিত?

—হ্যাঁ, দিত। ওর সঙ্গে ঘোষালের গভীর বন্ধুত্ব তো বহুদিনের। ও প্রথম যুগ থেকেই বন্ধুকে সাহায্য করত। বৎসরান্তে ফেব্রুয়ারি মাসে—রোজগার বুঝে নিয়ে, মানে ইনকামট্যাক্স ফর্ম তৈরি করার সময় একটা করে চেক পাঠাতো।

—কত টাকার?

—ঠিক জানি না। মনে হয় এক-এক বছর এক-এক রকম অ্যাকাউন্টের চেক। কারণ ওর উপার্জন তো খুব এদিক-ওদিক করে। যাত্রায় গেলে একরকম, না গেলে আর একরকম। সিনেমায় পার্ট পেলেও বেশি রোজগার। না পেলে বাৎসরিক উপার্জনটা কমে যায়।

এই সময় অশোক চ্যাটার্জি কাজ সেরে ফিরে এল। ব্রজদুলালকে বললো, আপনাদের কথাবার্তা শেষ হয়েছে? নাকি আমি আবার একটু ঘুরে আসব?

বাসু বললেন, না, আমার যেটুকু জানার ছিল জেনে নিয়েছি।

অশোক আর ব্রজদুলাল ফিরে গেলেন।

বাসু ঘড়িতে দেখলেন সাড়ে নয়টা বাজে। ফোন করলেন ও-পাশের উইং-এ। সুকৌশলীতে। ধরল কৌশিক। বাসু জানতে চাইলেন, ব্যস্ত?

—আজ্ঞে না। এই রি-ইনফোর্সড কংক্রিট ঢালাই ছাদের বাড়িতে কি মানুষ ব্যস্ত থাকার অবকাশ পায়? আপনাদের আমলে কেমন সুন্দর কড়ি-বরগার ছাদ ছিল—মানুষ সময় কাটানোর সুযোগ পেত।

—জাঠামো না করে গাড়িটা বার কর। এট্টু বেরুব।

—কদ্দুর?

—দুপুরে বাইরেই খাব। চিনসুরা অ্যান্ড ব্যাক্।

—সুজাতাকেও নিয়ে নেব?

—নিলে ভালোই হতো ; কিন্তু তোমাদের মামী...

—আই নো, আই নো। সুজাতা বরং থাক। আমরা দুজনেই ঘুরে আসি।

প্রথমেই বাসুসাহেবের নির্দেশে গাড়ি চালিয়ে কৌশিক তাঁকে নিয়ে এল ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে—নির্মলচন্দ্র স্ট্রিটে। এখানে গালুডি ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্সে অবস্থিত 'সুবর্ণরেখা' হোটেলের রিজার্ভেশন করা যায়। গাড়িটা ফ্রি-পার্কিং জোনে পার্ক করে দুজনে গুটি গুটি উঠে এলেন অফিসে। একতলাতেই অফিসঘর। ছোট্ট অফিস। একজন কর্মচারী বসেছিল কাউন্টারে। বাসু জানতে চাইলেন : হ্যাঁগো, গিরিডির 'সুবর্ণরেখা' হোটেলের রিজার্ভেশন এখানে করা হয়?

ছেলেটি বৃদ্ধের মূর্খামিতে মুখ লুকিয়ে হাসল। তারপর কৌশিকের দিকে নজর পড়ায় সামলে নিয়ে বললো, গিরিডি নয় দাদু, গালুডি। ঘাটশিলার কাছাকাছি।

বাসু বললেন, তবে বাপু, আমরা ভুল জায়গায় এসেছি। চল হে কৌশিক।

ছেলেটি আবার বলে, কিন্তু আপনি 'সুবর্ণরেখা হোটেল' বললেন না?

বাসু চলতে শুরু করেছিলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, 'সুবর্ণরেখা হোটেল'। গিরিডিতে। কাছেই ফুলডুংড়ি পাহাড়! ওখান থেকে টাটায় যাবার বাসও পাওয়া যায়—শুনেছি খুব ভালো হোটেল—

—তাহলে তো আপনি ঠিক জায়গাতেই এসেছেন, দাদু। এখান থেকেই 'সুবর্ণরেখা হোটেল'-এ রিজার্ভেশন পাওয়া যাবে।

—সেটা গিরিডিতে নয়?

—আজ্ঞে না। গালুডিতে।

বৃদ্ধ বললেন, কী জানি, বাপু। তুমি সব গুলিয়ে দিলে। যাব গিরিডির সুবর্ণরেখায়, তুমি বলছ গালুডি।

ছেলেটি বৃদ্ধকে ছেড়ে এবার কৌশিককে পাকড়াও করলো। খানকতক ছাপানো লিটেরেচার ধরিয়ে দিল। কৌশিক তার উপর চোখ বুলিয়ে বললে, মামু। ও ঠিকই বলছে। গিরিডি নয়, গালুডি। 'সুবর্ণরেখা হোটেল' গালুডিতেই। বুঝলেন?

—এটাই সেই জায়গা যেখানে ইন্দ্র গেছিল?—বৃদ্ধ জানতে চান, তাঁর ভাগ্নের কাছে।

ভাগ্নে বলে, তাই তো মনে হচ্ছে। ইন্দ্রদা ফুলডুংরির কথা বলেছিল, বিভূতিভূষণের বাড়ির

কথা বলেছিল, বুরুডি-লেক-এর কথাও গল্প করেছিল। এই দেখুন, এদের বইতে সবকয়টা নাম ছাপা আছে।

ছেলেটি কৌশিককে বললে, মাপ করবেন স্যার, 'ইন্দ্রদা' বলতে কি আপনি ফিল্‌ম্‌-আর্টিস্ট 'ইন্দ্রকুমার'-এর কথা বলছেন?

কৌশিক জবাবে বলে, হ্যাঁ, তুমি চেন তাঁকে?

—কী যে বলেন, স্যার! ইন্দ্রকুমারকে কে না চেনে? এই তো উনি 'সুবর্ণরেখায়' সাতদিন কাটিয়ে এলেন।

বাসু বললেন, হ্যাঁ, তার কাছে শুনেই তো এসেছি। তাহলে ঠিক জায়গাতেই পৌঁছেছি মনে হচ্ছে। তা তুমি খাতা দেখে বলতে পার, ইন্দ্র কত তারিখ থেকে কত তারিখ 'সুবর্ণরেখা'য় ছিল?

ছেলেটি হাসল। বললো, যাচাই করে নিতে চান? ঠিক আছে। বসুন। আমি রেজিস্ট্রার দেখে বলছি।

ওঁদের অপেক্ষা করতে বলে ছেলেটি রেজিস্ট্রি খাতা খুলে দেখে নিয়ে বললো, ইন্দ্রকুমার সুবর্ণরেখায় ছিলেন টোয়েন্টিথার্ড অক্টোবর থেকে টোয়েন্টিনাইন্থ অক্টোবর, রবিবার পর্যন্ত। উনত্রিশ তারিখ সন্ধ্যায় চেক-আউট করে বেরিয়ে আসেন। বিশ্বাস না হয় তো ওঁকে টেলিফোন করে দেখতে পারেন।

বাসু বললেন, না, না। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠছে না। তাছাড়া ইন্দ্র এখন কলকাতার বাইরে। তুমি বলছ এই যথেষ্ট। তা কালপরশুর মধ্যে একটা ডব্‌ল্‌ বেড ঘর পাওয়া যাবে?

—কোন ফ্লোরে?

—ইন্দ্র কোন ফ্লোরে ছিল?

—তা তো এখান থেকে বলা যাবে না, দাদু।

—ঠিক আছে। তুমি দোতলায় বা তিনতলায় একটা ঘর বুক করে দাও। সম্ভব হলে কাল থেকেই।

—কোন ট্রেনে যাবেন?

—ইস্পাতে।

ছেলেটি খাতাখানা বাড়িয়ে ধরে বললে, কার নামে ঘর বুক করা হবে?

—মিস্টার অ্যান্ড মিসেস্‌ কৌশিক মিত্র.

কৌশিক তার মামুর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, আপনি যাবেন না?

—পাগল! তোমরা দুজনে ঘুরে এস প্রথমে। যদি মনে কর আমার ভালো লাগবে তাহলে নাহয় আমিও পরে যাব।

অফিস থেকে বেরিয়ে এসে কৌশিক জানতে চাইল, এটা কী হলো, মামু? অহেতুক আমরা দুজন গালুডি যাব কেন?

—ইন্দ্রকুমারের অ্যালেবাইটা চেক করতে!

—ইন্দ্রদা? সেই তো সবচেয়ে শক্‌ড!

—আই নো। সে দারুণ অভিনেতাও বটে!

—কিন্তু ছেলেটি তো বললো, ইন্দ্রকুমার রবিবার টোয়েন্টিনাইন্থ সন্ধ্যাবেলায় চেক-আউট করেছে। ঘটনা ঘটেছে শনিবার, সন্ধ্যায়।

—সত্যি তাই করেছে কি না, তা তুমিও জান না, আমিও জানি না। ও ছোকরাও জানে না। এটুকু এস্‌ট্যাবলিস্‌ড্‌ হলো যে রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সে হোটেল চার্জ দিয়েছে।

—গালুডির 'সুবর্ণরেখা হোটেল'-এ পৌঁছে আমরা কী করব?

—ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং! ইন্দ্রকুমার যদি ছদ্মবেশ ধারণ না করে থাকে তাহলে অনেকেই তাকে চিনবে। আই মিন, হোটেলের অফিস স্টাফ। তোমাদের প্রধান কাজ হবে পরীক্ষা করে দেখা—তেইশ থেকে উনত্রিশ—এই সাতদিনের মধ্যে সে গালুডির ঐ সুবর্ণরেখা হোটেল ছেড়ে কলকাতায় এসেছিল কিনা। ম্যানেজমেন্ট কী বলে, স্টাফ কী বলে, বেল-বয় কী বলে, ওয়াশারম্যান কী বলে! বোর্ডাররা নিশ্চয় বদলে গেছে।

—কিন্তু মামু, ইন্দ্রবাবুকে সন্দেহ করার বিশেষ কোনও কারণ আছে কি? ঘোষাল ডাক্তারের মৃত্যুতে তিনি তো কোনোভাবেই লাভবান হবেন না।

—আই নো, আই নো! কিন্তু 'নেতি-নেতি' করে তো অগ্রসর হতে হবে আমাকে। ঘোষালের মৃত্যুতে সবচেয়ে বড় আঘাত পেয়েছে ইন্দ্রকুমার—এটা আমরা সবাই দেখেছি। কিন্তু আমরা এখন নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতায় একটা সমাধান করতে বসেছি। অঙ্কের হিসেব। লজিকের অঙ্ক। সেখানে সেন্টিমেন্টের ঠাঁই নেই। ব্রজদুলাল যে হাজারিবাগে ছিল ঐ ঘটনার দিন—শনিবার আটাশে—তা ইতিমধ্যে যাচাই করে নিয়েছি। আমি ম্যাথমেটিকালি অগ্রসর হতে চাই কৌশিক। নৈর্ব্যক্তিকভাবে। ব্রজদুলাল ইজ নেগেটিভ। আমি চাই একইভাবে ইন্দ্রকুমারকে সন্দেহ তালিকার বাইরে রাখতে। মানে, একেবারে যুক্তিনির্ভর অঙ্কশাস্ত্র মতে। তোমরা দুজন আটচল্লিশ ঘণ্টা 'সুবর্ণরেখা' হোটেলে স্বামীস্ত্রীতে কাটিয়ে এস। ফিরে এসে প্রমাণ দিও যে, ইন্দ্রকুমারের অ্যালেবাঈটা পাক্কা। ঘটনার দিন সে চিনসুরার অনেক দূরে ছিল—ঘাটশিলায়। আমি ব্রজদুলালের পর ইন্দ্রকুমারকে বাতিল করে ডাক্তার অমরেশ দাশ, অ্যাগি ডুরান্ট, বা অন্য সবাইকে যাচাই করতে শুরু করব।

কৌশিক বললো, বুঝলাম। ঠিক আছে। আপনি যা বলছেন তাই আমরা করব, দুজনে মিলে। কিন্তু তার আগেই বলে রাখছি—আপনি লিখে রাখতে পারেন—ইন্দ্রকুমার এ ষড়যন্ত্রের ত্রিসীমানায় নেই। কারণ তার কোনও মোটিভ আমরা কল্পনা করতে পারছি না। তার কারণ—এ মৃত্যুতে সেই সবচেয়ে বেশি আহত। তার কারণ : এ দুনিয়ায় ডক্টর ঘোষালের দীর্ঘদিনের বাল্যবন্ধু বলতে ঐ একজনই আছেন।

বাসু বললেন, ঠিক কথাই। আই এগ্রি। হান্ড্রেড পার্সেন্ট। তবে কী জান কৌশিক, একে বলে রুটিন চেক। ট্রেনের এয়ার-কন্ডিশন্ড কম্পার্টমেন্টে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে চিনতে পারলে টিকিট-চেকার যেমন নমস্কার করে বলে, ভালো আছেন, স্যার? আপনার টিকিটটা?—ইটস্ জাস্ট আ রুটিন চেক! এ পার্ট অব্ দি সিস্টেম। ডি. এম.-ও অফেন্স নেন না। টিকিটটা বাড়িয়ে ধরেন। টি. টি.সি. সেটা পাঞ্চ করে দেয়। সশ্রদ্ধ নমস্কার করে পরবর্তী প্যাসেঞ্জারের দিকে এগিয়ে যায়। আমি তেমনি চাইছি ইন্দ্রকুমারকে একটি নমস্কার করে পরবর্তী প্যাসেঞ্জারের অ্যালেবাঈটা চেক করতে।

চিনসুরাতে কোনো লাভ হলো না। সমাধানের দিকে এক চুলও অগ্রসর হওয়া গেল না। চুঁচুড়া যাবার পথের কোনও পরিবর্তন হয়নি—সেই লরি-অ্যাম্বাসাডার-গোগাড়ির ভিড়ে রাস্তা জ্যাম। শুধু দু-চাকার সওয়ার এ-ফাঁক ও-ফাঁক দিয়ে ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তাতে জটিল জ্যাম জটিলতর হচ্ছে। সেই ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের মরণপণ ট্রেন ধরা, সেই ওভারব্রিজে ওঠার পরিশ্রম এড়িয়ে ভীরু পদাতিকের এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে রেললাইন পার হওয়ার চেষ্টা। আগেকার জমানায় ডেলি-পাষণ্ডদের দৌড়ঝাঁপ শেষ হলে চুঁচুড়া শহরটা দুপুরে একটু ঝিমোতো—ঘুঘুর ডাকে, ফেরিওয়ালার হাঁকে, অথবা তৈলতৃষিত গোযানের

চাকার আর্তনাদে। সে জমানা অতিক্রান্ত। গো-গাড়ি শহরে ঢুকতে ভয় পায়। সারা দিন রাস্তায় শুধু মানুষ আর মানুষ। ঘুঘু হয়তো ডাকে; কিন্তু ঘুঘুনী তা আদৌ শুনতে পায় না—চোপর দিন এই মানুষজন্তুর হুহুঙ্কারে।

বাসুসাহেবকে নিয়ে কৌশিক তিন জায়গাতেই হানা দিল। ঘোষালসাহেবের আরোগ্যনিকেতনে, বাড়ি, আর যুগলকিশোরের ডেরায়। কা-কস্য পরিবেদনা!

প্রথমেই ওঁরা এলেন মানসিক চিকিৎসালয়ে।

অ্যাগি ডুরান্ড সামলেছেন। কিন্তু এখনো বিষাদের প্রতিমা। ওঁদের আপ্যায়ন করে বসালেন। মেন্টাল হসপিট্যাল বাড়িটা দ্বিতল। অ্যাগি থাকেন তিনতলার একটি চিলেকোঠার ঘরে। একা মানুষ। ঐটুকু স্থানই যথেষ্ট। সঙ্গে অ্যাটাচড্-বাথ। ওঁর অফিসঘর নিচে। রান্না-বান্নার হাঙ্গামা নেই। পেশেন্টদের জন্য রান্না করতেই হয়। নার্সরাই ওঁর ঘরে খাবার পৌঁছে দেয়।

অ্যাগি বললেন, আপনাদের দু-জনের জন্যও লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে দিই? কী খাবেন বলুন? ভাত, হাতে-গড়া রুটি, না লোফ?

বাসু বললেন, না। আমরা দুজন যুগলকিশোরের বাড়িতে মধ্যাহ্ন আহার করব। সেই মতো কথা দেওয়া আছে। অবশ্য পম্পার যদি না আজ কোনও অসুবিধা থাকে। প্রথমেই ওকে টেলিফোনে ধর তো।

অ্যাগি তাঁর ঘর থেকে যুগলকিশোরের বাড়িতে রিং করলেন। ধরল পম্পা। অ্যাগি রিসিভারটা বাড়িয়ে ধরলেন বাসু সাহেবের দিকে।

বাসু টেলিফোনের কথামুখে বললেন, পম্পামা, আমি মামু বলছি, মানে পি. কে. বাসু। তোমার বাড়িতে আমরা দুজন আজ মধ্যাহ্ন ভোজন করলে তোমার কি অসুবিধা হবে? আই মিন, আমার অল্টারনেটিভ নিমন্ত্রণ আছে। তোমাকে বিব্রত না করলে আমাকে অনাহারে থাকতে হবে না। তবে কালকেই তোমাকে কথা দিয়ে গিয়েছিলাম তো? তাই জানতে চাইছি।

পম্পা বললো, আজই হতে পারে। তবে খুবই সাদামাটা লাঞ্চ।

—সেটাই আমার মন-পসন্দ্। তোমার প্রাত্যহিক বাজার নিশ্চয় হয়ে গেছে। আজ কিসের আয়োজন? নিরামিষ, মাছ না মাংস?

—আজ আমাদের ইলিশ মাছ এসেছে।

—লা গ্র্যান্ডি! সর্ষেবাটা বানাতে পার? মাছ-পাতুরি?

—দুটো আলাদা বস্তু, মামু। কোনটা খাবেন বলুন? সর্ষেবাটা, না মাছ-পাতুরি?

—গুড গড। ও দুটো আলাদা নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। শুনুন! পাতুরি ভাপে রান্না হবে। প্রথমে তেল-সর্ষে দিয়ে...

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। যা হয় কর। অ্যারাউন্ড দেড়টা। ঠিক আছে?

পম্পার সম্মতি নিয়ে টেলিফোনটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে বললেন, ডাক্তার ঘোষালের বাড়িতেও নিশ্চয় ফোন আছে। তুমি নন্দু আর শৈলেশ মান্নাকে খবর দিয়ে দাও—আমরা দুজন সাড়ে বারোটা নাগাদ ঘোষালের বাড়িতে যাব। ওরা দুজন যেন বাড়িতে থাকে।

এরপর তিনি অ্যাগির কাছে ঘোষাল সম্বন্ধে পূর্ব ইতিহাস সংগ্রহ করতে বসলেন। কৌশিক মাঝে মাঝে—সাল, তারিখ ইত্যাদি নোট নিচ্ছিল। বাসু দু-চোখ বুজে পাইপ টানতে টানতে শুধু শুনেই গেলেন।

অ্যাগ্নেস এই মানসিক আরোগ্যালয়ে প্রথম যখন যোগদান করে তখনো তার বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি। সেটা সত্তর সাল। তার মাত্র একবছর আগে ডক্টর ঘোষাল একটা ছোট

ভাড়া বাড়িতে মানসিক চিকিৎসালয়টা খুলেছেন। মাত্র তিনখানি ঘর। একটা ডাক্তারের চেম্বার, একটা ডাক্তারবাবুর শয়নকক্ষ। তৃতীয় একখানি ঘর পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য। ধীরে ধীরে তিল তিল করে এই আরোগ্যনিকেতনটি বর্ধিত হয়েছে। নতুন বাড়িতে উঠে এসেছে। শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি সাহায্য এসেছে। একটি বিদেশী সংস্থা একবার এককালীন মোটা দান দিয়েছিল। এখন ছেলেদের এবং মেয়েদের পৃথক ওয়ার্ড। আরোগ্যনিকেতেনের নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্স আছে। নার্সদের জন্য পৃথক আবাসিক বন্দোবস্ত পর্যন্ত আছে।

বাসুসাহেব মাঝখানে কৌশিককে একবার থানায় পাঠিয়ে দিলেন। জেনে আসতে—কাল্লু অথবা পচাইয়ের বিষয়ে কোনও সংবাদ সদর থানা জেনেছে কিনা। বাস্তবে তিনি এই অছিলায় কৌশিককে সরিয়ে দিয়ে অ্যাগিকে কিছু অন্তরঙ্গ প্রশ্ন করতে চাইলেন। বললেন, তুমি বুদ্ধিমতী এবং সাইকিআট্রিস্ট! নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে, এই রহস্যের কিনারা করতে হলে ডাক্তার ঘোষালের জীবনের সব কিছু ইতিহাসই আমার জানা থাকা দরকার। সে ছিল কনফার্মড্ ব্যাচিলার। তার যৌনজীবন বা মানসিক দুর্বলতার বিষয়ে তুমি কি আমাকে কিছু তথ্য সরবরাহ করে সাহায্য করতে পার?

অ্যাগ্‌নেস হাসল। ফাইলের কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে করতে নতনেত্রে বললো, যে প্রশ্নটা করতে আপনি সঙ্কোচবোধ করছেন, আমি তার সরাসরি জবাব দেব, মিস্টার বাসু!....ইয়েস, আমি তাকে ভালোবাসতাম। ইন ফ্যাক্ট... আমার ডিভোর্সের পর আমি প্রত্যাশা করেছিলাম যে, ও আমাকে প্রপোস করবে। ...তা সে করিনি।

বাসুও মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে বললেন, থ্যাংকস্ অ্যাগি, ফর য়োর ক্যান্ডিড কনফেশন! কিন্তু তার হেতুটা কী? আই মিন তোমার কী আন্দাজ? সে স্বভাবতই বিবাহিত জীবন এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল? নাকি, তার জীবনের একেবারে গোড়ার দিকে এমন কোনো ঘটনা ঘটেছে যেজন্য সে বিবাহ করতে রাজি ছিল না? অথবা...

—না! তিনটের একটাও নয়!

—আমি তো তিনটি সম্ভাবনার কথা বলিনি?

—বলেছেন। তৃতীয়টার ইঙ্গিত দিয়ে থেমেছেন ; কিন্তু বুঝতে আমার অসুবিধা হয়নি। আজ্ঞে না—এ-কথা সত্য নয় যে, ডাক্তার আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়নি, অথবা আমাকে ভালোবাসতে পারেনি, অথবা আমাকে বিয়ে করলে সে খুশি হতো না!

—দেন হোয়াই? তাহলে তোমাদের বিবাহটা হয়নি কেন?

অ্যাগি তার ত্রিতলের ঘরের জানলার ভিতর দিয়ে সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশের একট চতুষ্কোণের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখলো। ওখানে বহুদূর আকাশে একটা সূর্যসাক্ষী চিল ক্রমাগত পাক খাচ্ছে। ধীরে ধীরে ও বললে, ডাক্তার 'অ্যাবনর্মাল সাইকলজি'র উপর গবেষণা করেছিল—ঐ বিষয়েই সে থিসিস্ দিয়ে ডক্টরেট করে। অথচ ঘোষাল নিজেই ছিল একজন অ্যাবনর্মাল সাইকলজিক্যাল পেশেন্ট।

—কী রকম? কী তার অ্যবনর্ম্যালিটি?

—বলছি। কিন্তু তার আগেই কীভাবে এই অ্যাবনর্ম্যালিটি ওর জীবনকে অধিকার করলো, সেই ঘটনাটা বলি। ডাক্তার নিজেই আমাকে বলেছিল। সমস্যাটা কী, তার মূল কোথায়, কীভাবে তাকে সমূলে উৎপাটিত করা সম্ভব তা ওর অজানা ছিল না ; কিন্তু সব জেনে বুঝেও সে নিজেকে সারাতে পারেনি। সে অসুস্থতাটাকেই উপভোগ করে গেছে।

—ওর সেই অভিজ্ঞতাটা কী?

—শিবশঙ্কর ছিল মায়ের একমাত্র সন্তান। ছেলেবেলা থেকেই পড়াশুনায় চৌকস। বাপ-মায়ের নয়নের মণি। ওর জন্ম কিন্তু ওর বাবামায়ের বিবাহিত জীবনের শেষাশেষি। ও যখন জন্মায় তখন ওর মায়ের বয়স পঁয়তাল্লিশ। খুব সুন্দরী, আর খুব ফর্সা ছিলেন তিনি। বাবার বয়স তখন বাহান্ন। ওর জন্মের পর ওর মা দীর্ঘদিন সূতিকার জ্বরে ভুগেছিলেন। বছর তিনেক শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। ঐ সময় মিস্টার ঘোষাল—শিবশঙ্করের বাবা, একটি দুগ্ধবতী অল্পবয়সী ধাত্রীকে নিয়োগ করতে বাধ্য হন। মেয়েটির শিশুসন্তান মারা গেছে। তার বুকে প্রচুর দুধ। অন্যদিকে ওর মায়ের বুকে দুধ ছিল না। এই দুগ্ধবতী অল্পবয়সী ধাত্রীকে নিয়ে আসা হয় ঐ নার্সিংহোম থেকে। যেখানে শিবশঙ্করের জন্ম হয়েছিল। মেয়েটি কালো, কুদর্শনা, স্বামীত্যক্তা, কিন্তু যৌবনবতী!...শিবশঙ্কর এসব প্রত্যক্ষজ্ঞানে জানতো না—জানার কথাও নয়। জেনেছে বড় হয়ে তার পিসির কাছে। ওর চার বছর বয়স হবার সময় ওর মা আত্মহত্যা করেন। হেতুটা সহজেই অনুমেয়।...ছেলেবেলায় ও বিমাতাকেই মা বলে জানত। তারপর বছর তিনেক বয়সে সে বুঝতে পারে ঐ অত্যন্ত ফর্সা, অত্যন্ত সুন্দরী এবং অত্যন্ত রুগ্না মহিলাটি ওর আসল মা! এরপর ওর মাতৃবিয়োগের পর যখন ওর বাবা সেই ধাত্রীটিকেই বিবাহ করলেন তখন ওর পিসিমা ওকে তাঁর নিজের সংসারে নিয়ে যান। ওর বাবার বয়স তখন সাতান্ন, বিমাতার ত্রিশ, আর ওর নিজের বয়স পাঁচ। ও পিসির কাছেই মানুষ। বাবার বিরুদ্ধে তার একটা হিমালয়াস্তিক অভিমান ছিল।

বাসু জানতে চান, এই ঘটনা ডাক্তার ঘোষালের জীবনে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে?

—ওর একটা অবসেশন হয়েছিল—দৃঢ়মূল প্রত্যয় গড়ে উঠেছিল যে, নরনারীর প্রেম তথা যৌনজীবন একমুখী না হলেই ঘৃণার্হ!

—য়ু মিন, যেহেতু তুমি ডিভোর্সি...

—ও নো, নো, নো! আমার দিক থেকে নয়। ঘোষাল বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মানুষ। ডিভোর্সি স্ত্রীলোক নতুন কোনও পুরুষকে তো বিবাহ করতেই পারে। বাধাটা ছিল, তার নিজের দিক থেকে..

—আই ডোন্ট ফলো! ওর দিক থেকে মানে?

—আমাদের হাসপাতালে কুন্তী দোসাদ নামে একটি পেশেন্ট আছে, আপনি তার কথা জানেন। ঘোষাল পুরী থেকে ফিরে এসে আমাকে গল্প করেছিল যে, কুন্তীর কেসটা আপনাদের সে সবিস্তারে বর্ণনা করেছে, তাই নয়?

বাসু স্বীকার করলেন।

অ্যাগি বলেন, আপনার নিশ্চয় মনে আছে যে, কুন্তী মাঝে মাঝে ভায়োলেন্ট হয়ে উঠতো—জাস্ট ফর 'সেক্স্যুয়াল আর্জেস্' অ্যান্ড...

—হ্যাঁ, মনে আছে। তোমাদের হাসপাতালের একজন ওয়ার্ডবয়—কী যেন নাম? হ্যাঁ, শম্ভু বসাক—কুন্তী দোসাদের উন্মাদনাকে প্রশমিত করার দায়িত্ব নেয়। তুমি আর ডক্টর ঘোষাল ওর রুদ্ধদ্বার কেবিনের বাইরে দাঁড়িয়ে...

—ও হেল! আপনি আমাদের দুজনের সে যন্ত্রণাটা কল্পনা করতে পারবেন না, মিস্টার বাসু। আমরা দুজন—মধ্যবয়সী পুরুষ ও রমণী—একজন ব্যাচিলার, একজন ডিভোর্সি—প্রায়ান্ধকার করিডোরে পাহারা দিচ্ছি! যাতে ঘরের ভিতর...ঐ স্কাউন্ড্রেল শম্ভুটা... ওকটা উন্মাদিনীকে প্রশমিত করতে পারে।

—আই আন্ডারস্ট্যান্ড! তারপর?

—দু-মাস এভাবে কুন্তীকে শান্ত করানো হলো। তারপর আমি বলতে বাধ্য হলাম—এ-

কাজটা ঠিক হচ্ছে না, ডক্টর। শম্ভু একটা অশিক্ষিত লোফার! সে হয়তো পাঁচজনকে গল্প করে বেড়াবে। তাতে আমাদের এস্ট্যাবলিশমেন্টের বদনাম হয়ে যাবে! তুমি আর আমি এই ব্যভিচারটাকে মর‍্যালি, ফিজিক্যালি সাপোর্ট করছি...

আবার বাধা দিয়ে বাসুসাহেব বলেন, হ্যাঁ, সেসব কথা ঘোষাল আমাদের বলেছিল। আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে। তারপরেই তো কাল্লু মিঞার আবির্ভাব। ডাক্তার বাধ্য হয়ে পুলিসে ধরিয়ে দিল কাল্লুকে।

—শুধু কাল্লু নয়, শম্ভুকেও পুলিসে চালান দিল। সেও ছিল কাল্লুর মস্তান পার্টিতে।

—তারপর?

—তারপরই দেখা দিল ঘোষালের জীবনের আসল সমস্যাটা। কাল্লু অ্যারেস্ট হবার মাসখানেক পরে। কুন্তীর পিরিয়ডিক্যাল সাইক্‌ল্ পার হবার পর, জৈবিক নিয়মে যখন তার উন্মাদনা বৃদ্ধি পেল। উই ওয়্যার হেল্‌প্‌লেস। অ্যাট লিস্ট, আই ওয়াজ।

—বুঝলাম! তখন শম্ভুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হলো ঘোষালকে।

—ইয়েস! বাধ্য হয়েই। উপায়ান্তরবিহীন হয়েই। ঐ ওষুধটা চাই পাগলী মেয়েটির। কিন্তু নতুন কোনও পুরুষকে আমরা সাহস করে দায়িত্বটা দিতে পারিনি। আমি এ ব্যাপারটাকে খুব সাধারণভাবে—একটা মেডিকেল কম্প্রোমাইজ হিসাবে, বায়োলজিক্যাল সল্যুশন হিসাবে নিতে পেরেছিলাম। ঘোষাল পারেনি। একটা প্রচণ্ড অবসাদবোধে, অপরাধবোধে, সে নিজেকে জর্জরিত করতে থাকে।

—কী আশ্চর্য! ঘোষাল যদি এটাকে খোলামনে নিতে না পেরে থাকে তাহলে শম্ভু বসাক ছাড়া কি সারা দুনিয়ায় রিলায়েব্‌ল্ লোক পাওয়া গেল না?

—আপনি সমস্যাটা ঠিক বুঝতে পারছেন না, মিস্টার বাসু। ঘোষালের ব্যক্তিসত্তা ঐ সময় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। 'স্‌প্লিট পার্সোনালিটি'। ওর মনের একটা অংশ এটাকে পরিহার করতে চাইছে, ঘৃণার্হ মনে করছে, ন্যক্কারজনক ভাবছে—অথচ মনের আর একটা অংশ এতে আনন্দ পাচ্ছে! একটি উন্মাদিনী—প্রেমোন্মাদ নারীকে শান্ত করতে সক্ষম হওয়ায় পুরুষোচিত অহঙ্কারে তৃপ্ত হচ্ছে। সচেতন শিক্ষিত মনে নয়—আদিম স্যাভেজ সংস্কারবশে। নিজের পিতার বিরুদ্ধে ওর যে আশৈশব বৈরিতা ছিল তার যেন তির্যক বৈরী নির্যাতনের সান্ত্বনা পাচ্ছে। আদিম আরণ্যক মানুষ যেমন যৌবরাজ্যে উপনীত হবার পর পিতৃহন্তা হয়ে তৃপ্তি পেত। আবার এদিকে অদেখা-অচেনা মায়ের প্রতি আর অবচেতন মনে যে মমতা, যে ভালোবাসা, যে সহানুভূতি সঞ্চিত হয়েছিল সেটা সে আমার উপর আরোপ করতে চেয়েছিল। আমি তার কাছে মাতৃরূপা হয়ে উঠলাম ক্রমে। হয়তো আমার গায়ের রঙটা ওকে সেই অবসেশন এনে দেয়, জানি না। আমি বুঝতে পারছি না আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারছি কি না। ও আমাকে যথেষ্ট ভালোবাসতো! ওর বাবাই কি বাসতেন না তাঁর সুন্দরী স্ত্রীকে? আবার ওর বাবা যেমন সেই কালো-কুরূপা-যৌবনবতী ধাত্রীটিকে ফিরিয়ে দিতে পারেননি—যখন তার বুকের দুধ শিশুর আর প্রয়োজন ছিল না , ঠিক তেমনি...ও হেল্!

বাসু ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আমি বুঝছি, অ্যাগি। তোমার এমনিতেই এখন মনটা খারাপ—দীর্ঘদিনের কম্পানিয়ন, বন্ধু, তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে...

—ইয়েস স্যার! মাই 'উইনসাম ম্যারো' ('Winsome Marrow')। আর আমার মাথায় একটা জগদ্দল বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গেছে। আজীবন একটা ক্যারিয়াটিড-এর (caryatid) মতো তা আমাকে বইতে হবে।

বাসু বললেন, এ প্রসঙ্গে আমরা এবং এখানেই থামি, অ্যাগি। আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে

তোমার প্রতি, কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি, ঘোষালের জীবনের এই গোপন অধ্যায়টার সঙ্গে আমার তদন্ত সম্পর্কবিমুক্ত। বাই-দ্য-ওয়ে—ঘোষালের যৌনজীবনের এই জটিলতার বিষয়ে তুমি ছাড়া এই আরোগ্যনিকেতনে আর কেউ কি কিছু জানত? ফর এক্‌জাম্‌প্‌ল্‌ ডক্টর দাশ?

—নো স্যার। আর কেউ কিছু জানত না। আন্দাজও করেনি। কুন্তী জানত, জানে—কিন্তু সে তো আমাদের হিসাবের বাইরে।

—ডাক্তার ঘোষালের মৃত্যুতে তার কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে?

—ইয়েস, মিস্টার বাসু! হয়েছে! বিস্ময়করভাবে হয়েছে। আমি সাইকলজি নিয়ে এম. এ. করেছি—বিষয়টা ভালোভাবে জানি বলে এতদিন আমার একটা গর্ব ছিল। নিজের মুখেই বলছি—ডোন্ট থিংক আয়াম ব্র্যাগিং—বি. এ. অনার্স এবং এম. এ. দুবারই আমি ফার্স্ট-ক্লাস ফার্স্ট হই। কখনো কারও কাছে হারিনি। এই বুড়ি বয়সে হেরে গেলাম। ঐ একটা আনপড় গাঁয়ের মেয়ে, কুন্তী দোসাদের কাছে।

বাসু প্রশ্ন করলেন না। প্রশ্নবোধক দৃষ্টি মেলে শুধু তাকিয়ে রইলেন অ্যাগির মুখের দিকে। তাঁর পাইপে টোব্যাকো ফুরিয়েছে। আগুন নেই। ঠোঁট থেকে অহেতুক ঝুলছে পাইপটা। উনি নির্বাক শুধু তাকিয়েই রইলেন।

অ্যাগি বলে চলেন, আমি যখন কিশোরী তখন আমার বাবার একটা পোষা অ্যাল্‌সেশিয়ান ছিল। রোজ সকালে ড্যাডি তাকে নিয়ে বেড়াতে যেতেন। যদিও তাকে খেতে দিত বাড়ির চাকরটা, তবু বাবাকেই 'মাস্টার' বলে মানত। তারপর বাবার স্ট্রোক হলো। নার্সিংহোমে গেলেন। কুকুরটার প্রাতর্ভ্রমণ দু-দিন বন্ধ রইলো ; তৃতীয় দিনে—যে চাকরটা ওকে রোজ খাবার দিত তাকে মা বললেন স্যাগীকে বেড়িয়ে নিয়ে আসতে। কিন্তু স্যাগীই রাজি হোল না। এ পর্যন্ত বোঝা যায়। জীবমাত্রেই অভ্যাসের দাস। যার হাতে রোজ বিকালে মাংসভাত খাচ্ছে, তার সঙ্গে সে প্রাতর্ভ্রমণে যেতে গররাজি! এটুকু বোধগম্য! কিন্তু পরের চ্যাপটারটার কোনও এক্সপ্ল্যানেশন নেই। তিন সপ্তাহ নার্সিংহোমে ভুগে বাবা মারা গেলেন। তাঁর ডেডবডি বাড়িতে আনা হলো। স্যাগী তাঁর মৃতদেহ দেখেনি। কফিনের ভিতর কী আছে তা তার জানার কথা নয়, কিন্তু কী অপরিসীম আশ্চর্য মিস্টার বাসু, পরদিন থেকে স্যাগী ঐ চাকরটার হাত থেকে খাবার খেতে রাজি হলো না। দু-দিন অনাহারে পড়ে থাকল। তখন আমাদের নিজেদের সংসারে যে অবস্থা চলছে—তাতে কুকুরকে খাদ্য নিয়ে পীড়াপীড়ি করার মতো মানসিকতা কারও ছিল না। আমার নয়, দিদির নয়, মায়ের নয়। চাকরটা নিজের বুদ্ধি খরচ করে বাবার এক বন্ধু—পশুচিকিৎসক তিনি—তাঁকে ডেকে নিয়ে এল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। স্যাগী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ : অনশনে সে প্রাণ দেবে...

অ্যাগি থামলেন। বাসু পকেট থেকে পাউচ আর দেশলাই বার করলেন। জানতে চাইলেন: অ্যান্ড আল্‌টিমেটলি?

স্যাগী অনশন ভঙ্গ করলো। আমার মায়ের অনুরোধে। অথচ সে কিন্তু মায়ের খুব 'পেট' ছিল না। মা তাকে মাঝে মাঝে ডগ-বিস্কুট দিত, বা গলায় হাত বুলাতো। এই পর্যন্ত। অনশনের চতুর্থ দিনে সেই বিধবা ভদ্রমহিলাটি এসে যখন স্যাগীকে জড়িয়ে ধরলেন তখন অদ্ভুত একটা একটানা কাতর স্বরে স্যাগী তার মনোবেদনার কথা ব্যক্ত করলো। এই চার দিন সে ডাকেনি, খায়নি, ওর কেনেলের বাইরে আসেনি পর্যন্ত। অথচ মায়ের সহানুভূতিতে...

বাসু বললেন, কুন্তী দোসাদের ক্ষেত্রে ও ঘটনাটা একই রকম ঘটেছিল বলতে চাও?

—একজ্যাক্টলি! ওর বুঝতে পারার কথা নয় যে, ডাক্তার ঘোষাল মারা গেছেন। ও তাঁর মৃতদেহ দেখেনি। মৃতদেহ আরোগ্যনিকেতনে আনাই হয়নি। আমি বারণ করেছিলাম। ওসব

ট্র্যাফিক-জ্যাম করা আড়ম্বর আমার ভালোই লাগেনি। আরোগ্যনিকেতনের কর্মীরা তো শ্মশানে যাবেই। আর এই পাগল-পাগলীগুলো তো এ বাড়ির জানলা-দরজা পিলার-পিলস্টারের মতো ফ্যালফ্যাল করে শুধু তাকিয়েই থাকবে। বাট...আ স্ট্রেঞ্জ থিং হ্যাপেন্ড! পরদিন থেকে কুন্তী দোসাদ তার খাবার খেতে অস্বীকার করলো। যে নার্সটি ওকে খাবার দেয়, যে প্লেট থেকে খাওয়ায়, যে সময়ে খাওয়ায়, কিছুই পরিবর্তন করা হয়নি...কিন্তু ও খেল না। রবি-সোম-মঙ্গল। তিন-তিনটি দিন! উড য়ু বিলিভ ব্যারিস্টার বাসু—আমাকে ওরা জানায়নি। ফোর্থ ডেতে—পরশুদিন আমি সব কথা শুনে ওকে দেখতে গেলাম। কুন্তী নির্জীব হয়ে গেছে! পাষাণ হয়ে গেছে। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কেঁদে ফেললাম। ও কিন্তু কাঁদল না। ও কাঁদতে জানে না। বাট সে আমার অনুরোধে, আমার হাত থেকে চতুর্থ দিনে আহার্য গ্রহণ করলো। ওর যা 'আই-কিউ' তা ঐ অ্যালসেশিয়ান কুকুরটার চেয়ে বেশি না কম, তা আমি জানি না—আমার সঙ্গে ডাক্তার ঘোষালের কী সম্পর্ক....ওয়েল। কিন্তু মনঃস্তত্ত্ববিজ্ঞানে যার ব্যাখ্যা নেই তাই বাস্তবে ঘটে গেল। ও বুঝে নিল, আমার দুঃখের পরিমাণটা—ঠিক যেমন স্যাগী বুঝতে পেরেছিল আমার মায়ের অপরিসীম ক্ষতির কথা। আরও অবাককরা কাণ্ড, ডাক্তার ঘোষাল দু-চার দিনের জন্য চিনসুরার বাইরে গেলে ও ছটফট করত, ওকে ট্র্যাঙ্কুলাইজার দিয়ে ঘুম পাড়াতে হতো। এবার হলো না। মৃত্যু কী—তা নিশ্চয় ও বুদ্ধি দিয়ে, বোধ দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারে না—তবু মনোবিজ্ঞান যে তত্ত্ব জানে না, ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারে না, সেই না-পারার কোনও অজ্ঞাত রহস্যে ও শান্ত মনে ডাক্তার ঘোষালের অনুপস্থিতিটা মেনে নিল। এবার ইনজেকশন দিয়ে ওকে ঘুম পাড়াতে হয়নি। ও আচ্ছন্নের মতো শয্যায় শুয়ে আছে। কখনো জেগে কখনো নিদ্রিত!

এই সময় এসে উপস্থিত হলেন ডঃ দাশ। দরজায় নক করে ঘরে ঢুকে বসলেন। বললেন, এ কী কাণ্ড হয়ে গেল, স্যার?

বাসু বললেন, দিস্ ইজ লাইফ! উপায় কি?

—আমরা কী ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

বাসু বলেন, লুক হিয়ার ডক্টর দাশ! আমাদের কর্তব্য বিভিন্ন, আমাদের কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন। আমার কাজ: খুঁজে বার করা এই জঘন্য হত্যার পিছনে কী ষড়যন্ত্র ছিল। কে ঘোষালকে মেরেছে, কার প্ররোচনায় মেরেছে। আপনাদের ক্ষেত্র ভিন্নতর—আপনাদের কাজ: দেখা, ডক্টর ঘোষালের অবর্তমানে তাঁর গড়ে-তোলা মানবিকতার এই মহান প্রাসাদটা যেন ধূলায় না লুটিয়ে পড়ে। সারাটা জীবন দিয়ে সে একটা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে—এ তল্লাটে একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যেখানে মানসিক ভারসাম্যহীনেরা মানুষের সহানুভূতি পায়। আপনাদের কাজ সেই প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিয়ে রাখা, আরও শক্তিমান করে তোলা—ভবিষ্যতের দরদী মানুষের হাতে তুলে দেওয়া। অফ কোর্স, আমার প্রচেষ্টায় আপনারা সাহায্য করবেন, আপনাদের প্রচেষ্টাতে আমিও যথাসাধ্য সাহায্য করব। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য এবং কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন।

ডক্টর দাশ বললেন, আই ফলো, স্যার!

—আপনি কি ডাক্তার ঘোষালের মৃত্যু সংক্রান্ত কোনও ঘটনা, কোনও ক্লু জানাতে পারেন—যা আমরা জানি না।

ডক্টর দাশ মাথাটা দুদিকে নেড়ে বললেন, আয়াম সরি! নো স্যার।

—ঐ হারাধন দাস লোকটার সম্বন্ধে আপনার কি ঘোষালের সঙ্গে কোনও কথা হয়েছিল?

—হ্যাঁ, হয়েছিল। কিন্তু তাতে আপনার সমস্যাটা সমাধানের দিকে এক পা-ও এগিয়ে যাবে

না। লোকটাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল—এ লোকটা কে? একে কেন চেনা-চেনা লাগছে? আমি শিবুদার কাছে জানতে চেয়েছিলাম। উনি বললেন, 'কেন হে? ওকে তো আমাদের আরোগ্যনিকেতনে চাকরি দেওয়া হয়নি, যে, প্রশ্ন উঠবে কেন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে লোক নেওয়া হলো না। ও হচ্ছে আমাদের পার্সোনাল স্টাফ—কম্বাইন্ড-হ্যান্ড!' আমি আরও জানতে চেয়েছিলাম, 'কেন? নন্দু কি ছুটি নিয়ে দেশে যেতে চাইছে?' উনি আমাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেন। বলেন, 'কাজের কথা বল ডক্টর দাশ। উই হ্যাভ এনাফ ওয়ার্ক টু

বাসু অ্যাগির দিকে ফিরে বললেন, তোমার অনেকটা সময় নষ্ট করেছি। ধন্যবাদ আমি জানাব না—কারণ উই আর অল ওয়ার্কিং ফর আওয়ার বিলাভেড ডিপার্টেড ফ্রেন্ড! আচ্ছা চলি। চল, ডাক্তার দাশ। আমরা তোমার অফিসে গিয়ে বসি।

অফিসে বসে বাসুসাহেব ট্রাস্ট-বডির আইনের বিষয় নানান প্রশ্নে জেনে নিলেন। ট্রাস্ট-ডীড্-এর একটি Xerox কপি পড়লেন। আসলটা ব্যাঙ্ক ভল্টে রাখা আছে। উনি গত বছরের আয়-ব্যয়ের ব্যালেন্স-শীটটাও দেখতে চাইলেন। অ্যাগি ড্রান্ট বোর্ড-এর সচিব, ডক্টর দাশ ট্রেজারার। দুজনের কারও আপত্তি হলো না। বাসু চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, আপনাদের ডোনার্স লেজারটা একটু দেখব।

অ্যাগি বললেন, একটা কথা ব্যারিস্টারসাহেব। ঘোষাল আপনার বন্ধু ছিল। তাই খবর পেয়েই আপনি ছুটে এসেছিলেন। সেটা ছিল আপনার বন্ধুকৃত্য। কিন্তু এখন আপনি যে খরচ করছেন—আপনার ক্যাশ ও সময়—তার দাম আমাদের, আই মিন এই ট্রাস্ট বোর্ডের, মিটিয়ে দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে আপনি কী বলেন?

বাসু বললেন, ডক্টর ঘোষালের মৃত্যু-রহস্যের কিনারা করবার জন্য আমাকে ইতিমধ্যেই ব্রজদুলালবাবু এনগেজ করেছেন। আমি বেসিক্যালি ডিফেন্স ল-ইয়ার। খুনী পাকড়াও করা আমার কাজ নয়। সেটা গোয়েন্দাদের কাজ। ব্রজবাবু বাস্তবে 'সুকৌশলী' গোয়েন্দা সংস্থাকেই নিয়োগ করেছেন—আমি তাদের অ্যাডভাইসার মাত্র। সে যাই হোক, একই খুনের কেসে আমি তো দুজন ক্লায়েন্ট নিতে পারি না। ফলে ও প্রসঙ্গ থাক। আমাকে বরং তোমাদের ডোনার্স লেজারটা একটু দেখাও—কে কত টাকা, কোন বছরে দিয়েছেন।

ডক্টর দাশ বেল বাজিয়ে অ্যাকাউন্টেন্ট ভদ্রলোককে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে 'ডোনার্স লেজার'টা নিয়ে আসতে বললেন।

ভদ্রলোক মধ্যবয়সী। টিপিক্যাল করণিক। জানতে চাইলেন, কোন বছরেরটা, স্যার?

জবাব দিলেন বাসু, আপনারা কি ওটা বছর-বছর বদলান? যাঁরা স্বেচ্ছায় দান করেন, বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে অনুদান দেন? যাঁরা দান করেন, তাঁদের তো আপনারা I. T. Sec. 88G-মোতাবেক সার্টিফিকেটও দেন, তাই না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার!

—তাহলে দানকারীদের নাম-ঠিকানা নিশ্চয় একটা খাতায় লেখা থাকে, তাকেই আমি 'ডোনার্স লেজার' বলছি। সেটা তো বছর বছর বদলাবার কথা নয়। এখানে বদলায় কি?

—আজ্ঞে না, স্যার। তবে আমাদের প্রতিষ্ঠান তো অনেক দিনের। প্রথমদিকের খাতাটা স্টোরে রাখা আছে। খুঁজে বার করতে অনেক সময় লাগবে। কারেন্ট-লেজারটা দশ-বারো বছরের পুরনো। 1984 থেকে 1996 পর্যন্ত। তাই জানতে চাইছি 'কারেন্ট' খাতাতেই কাজ হবে, না গুদামে পুরনো খাতা খুঁজতে লোক পাঠাব?

বাসুই জবাব দিলেন, না, না, পুরনো খাতার দরকার নেই। আপনি হাল-আমলের খাতাখানাই পাঠিয়ে দিন।

কেরানি ভদ্রলোক প্রস্থান করার পরে ডক্টর দাশ জানতে চাইলেন, ওটা দেখে কী লাভ হবে বাসুসাহেব?

বাসু বললেন, এ পর্যন্ত আমাদের হাতে যে পরিমাণ তথ্য এসেছে তাতে আশঙ্কা হচ্ছে ডক্টর ঘোষালের মৃত্যুর জন্য দায়ী একজন প্রফেশনাল কিলার : পঞ্চানন ঘড়াই। লোকটা ফেরার। পুলিস তাকে খুঁজছে। হয়তো সুকৌশলীও তাকে খুঁজছে। কিন্তু একথা তো নিশ্চিত—কেউ একজন অর্থমূল্যে ঐ প্রফেশনাল কিলারকে নিয়োগ করেছিল! সে কিন্তু বাইরের লোক নয়, ঘরের লোক। ধরা পড়লে—যদি আদৌ ধরা পড়ে, তাহলে আমরা সবাই তাকে চিনতে পারব। এজন্য আমি জানতে চাই : ঘোষালের এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি কার কেমন সহানুভূতি ছিল। গত পাঁচ-দশ বছরের ভিতর কে কত টাকা দান করেছেন।

একটু পরেই করণিক ভদ্রলোক ফিরে এলেন।

বাসু পাতা উল্টে দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, আমি অনেকগুলি পরিচিত নাম দেখতে পাচ্ছি—যাঁরা ডক্টর ঘোষালের মৃত্যুসময়ে উপস্থিত ছিলেন, অথবা তাঁর সম্প্রতিক পুরী ভ্রমণকালে যাঁরা তাঁর কাছে-পিঠে ছিলেন। গত আট-দশ বছরে এঁদের মধ্যে কে কত টাকা দিয়েছেন তার একটা তালিকা আমার চাই। ইয়ার ওয়াইজ। প্রোফর্মাটা এইরকম হবে। আমি প্রোফর্মা আর নামগুলো ছকে দিচ্ছি।

নাম... 1986..'87..'88..'89..'90..'91..'92..'93..'94..

নামগুলি পর্যায়ক্রমে: অ্যাগনেস্ ডুরান্ট, ডঃ অমরেশ দাশ, যুগলকিশোর সেনরায়, ব্রজদুলাল রায়, ইন্দ্রকুমার, মিসেস্ গুণবতী মোহান্তি, মিস্ সুভদ্রা মোহান্তি, মিসেস্ ছায়া পালিত—মোট আটজন।

ডক্টর দাশ বললেন, ঠিক আছে স্যার, এটা আমি তৈরি করে লোক দিয়ে যুগলকিশোরবাবুর বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। দুপুরের মধ্যেই।

এই সময়েই কৌশিক এসে জানালো যে, থানা এখনো পর্যন্ত কোনো খবর পায়নি—কাল্লু বা পচাই-সংক্রান্ত।

বাসু নমস্কারান্তে বিদায় নিলেন হাসপাতাল থেকে। যাবার আগে জনান্তিকে মিস্ অ্যাগনেসকে বললেন, আজ নয়, এর পরের বার এসে তোমার স্যাগীর সঙ্গে দেখা করে যাব।

—স্যাগী?

—ইন সাবহিউমান ফর্ম : কুন্তী দোসাদ। আজ থাক।

নন্দু অথবা শৈলেশ মান্না হারাধনের বিষয়ে নতুন কোনও আলোকপাত করতে পারলো না। ওরা দুজন যা জানত তা আগেই পুলিশকে বলেছে—অথবা পুলিশের কাছে গোপন করে জনান্তিকে মিস্ অ্যাগনেস ডুরান্টকে। যেমন শৈলেশের সঙ্গে একবার হারুর ধাক্কা লেগে যায়, আর শৈলেশের ধারণা হয়, তার পকেটে একটা লোডেড রিভলভার থাকে। তখন সে প্রচণ্ড অবাক হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার ঘোষালকে সে জানায়, তিনি পাত্তা দেননি। অ্যাগিকেও জানায়—তিনি চেপে যেতে বলেছিলেন। তখনো শৈলেশ জানতো না যে, ডাক্তারসাহেব ঐ হারাধনকে অ্যাপয়েন্ট করেছেন দেহরক্ষী হিসাবে।

শৈলেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বললে, কিছু মনে করবেন না স্যার, হারুর কোনও দোষ আমি ধরি না—

—ধর না? বল কি! কেন গো? লোকটা দেবতুল্য ডাক্তারকে খুন করলো—

—আজ্ঞে হ্যাঁ, মানছি! কিন্তু পেটের দায়ে! যেমন পেটের দায়ে আমি শালা স্টিয়ারিং ঘোরাই, নন্দু ডাক্তরবাবুর জুতো সাফা করে, রুক্‌মিনি পরের এঁটো বাসন ধোয়! কী করব? শালা পেট যে মানে না! মাপ করবেন স্যার, রাগের মাথায় খিস্তি করে ফেলেছি। তা সে যাহোক, ঐ হারামজাদা হারুও তো তেমনি পেটের দায়ে মদের গ্লাসে বিষ মিশিয়েছিল। শালা কি নিজের ইচ্ছেয় মিশিয়েছে? বলুন, হক কতা কিনা। শালা যখন ধরা পড়বে, তখন দেখবেন ও হারামজাদার ঘরেও আছে মা-মরা চুন্নিমুন্নি—মাসির কোলে মানুষ হচ্ছে! যেমন হচ্ছে আমার মুনিয়া। দোষ কি ঐ হারামজাদা হারুর? দোষ তো সেই বাঞ্চোতের! যে ওকে টাকার টোপ দেখিয়ে এই কুকাজে লাগিয়েছে! অথচ ধরা পড়লে হারুশালার ঝোলা গোঁফ একটা-একটা করে টেনে উপড়ে ফেলবে গণেশ মামার সেপাইগুলো। আর সেই হাড়-হারামজাদ এমপ্লয়ার? যে ওকে দশ-বিশ হাজারের টোপ ঠেকিয়ে গেঁথে তুলেছিল? ধরতে পারলেও তার কী করবেন আপনারা? কিস্‌সুটি করতে পারবেন না, স্যার। তাকে তো আপনারা এম এল এ বানাবেন, মন্ত্রী মানাবেন? কী স্যার? ভুল বলছি?

শৈলেশ মান্নার দোষ নেই। সে বুঝেছে এ চাকরি তার খতম্। টেলিফোন আসার আগেই সাতসকালে পুরো একটি বোতল কালীমার্কা গিলে সে বুঁদ হয়ে বসেছিল এতক্ষণ।

বাসু বললেন, তা ঠিক। তুমি বিশ্রাম নাও গে যাও!

খ্যাক-খ্যাক করে হেসে ওঠে শৈলেশ—বিশ্রাম! কী বলছেন স্যার? 'চাকরি-নট'-এর বিশ্রাম! চোপর দিনই তো এখন বিশ্রাম!

নন্দু রঙে ছিল না।

বাসু বলেন, তুমি তো সাত বছর ধরে এ বাড়িতে আছ নন্দু। এই সাত বছরের ভিতর ডাক্তারবাবুর কোনো আত্মীয়স্বজনকে কখনো আসতে দেখেছ? ভাই-ভাগ্নে-বোন-বোনাই?

নন্দু বললো, না, স্যার। একটা কালো-মতো মুশ্‌কো জোয়ান আগেকার দিনে আসত। বলত, সে নাকি ডাক্তারবাবুর ভাই হয়। তার মুখ দিয়ে সর্বক্ষণ ভক্ ভক্ করে মদের গন্ধ। ডাক্তারসাব তারে পাত্তা দিতেন না। সে-ও ইদানীং আসেনি। অনেকদিন।

—কী রকম ভাই? খুড়তুতো, পিস্‌তুতো?

—আজ্ঞে না। সে তো বলতো ডাক্তারবাবুর সতাতো ভাই। সত্যি-মিথ্যা জানি না। কিন্তু এট্টা কতা জিগাই সাহেব? দুপুরে আপনে খাবেন কোই?

বাসু ওর পিঠে একটা থাপ্পড় মেরে বললেন, খুব খুশি হলাম নন্দু, তুমি এ-কথা জানতে চাওয়ায়। সে মানুষটা তো দুনিয়ার মায়া কাটালো, কিন্তু তুমি আজও তার আতিথেয়তার ধারা বজায় রেখে চলেছ। না, নন্দু, চিন্তা নেই। আজ আমার দুপুরে যুগলকিশোরবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ আছে। এবার বরং বল, ঐ হারাধন লোকটা কি করে এখানে মাথা গলালো? সে যখন প্রথম আসে তখন তুমি বাড়ি ছিলে?

—আজ্ঞে না, হুজুর। বাজারে গেছিলাম। ফিরে এসে শুনলাম, হারুবাবু কাজে বহাল হইছেন। তা তাঁর কাজডা কী ছিল, তা তো আজও আমার মালুম হলনি। আপনমনে থাকতেন। সিগ্‌রেট ফুঁকতেন। ভালোমন্দ আহারে রুচি ছিল। ডাক্তারবাবুরে দুডো রসগোল্লা দিতি গেলি তিনি বলতেন—অ্যাড্ডা হারাধনেরে দিস! অরে আমার গুরুঠাউর!

—লোকটা কি লেখাপড়া জানত? খবরের কাগজ পড়ত? টেলিফোন করত? ডাক্তারবাবুর সঙ্গে গল্পটল্প করত?

—আজ্ঞে না। খগরের কাগজ তাঁরে ছুঁতি দেখিনি। টেলিফোনও নয়। তয়, বাড়ি ফাঁকা থাকলি দুজনে গুজগুজ-ফুস্‌ফুস্‌ করতেন। যান, নতুন বে-হওয়া বরবউ!

—বল কী নন্দু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ ছার! হক্কথা! আমাদের দেখলি দু-জনে দু বাগে সরি যেতেন—যান্‌ একে অপররে চিনেনই না!

বাসু নন্দুকে বুঝিয়ে বলেন, আসল ব্যাপার কি জান, নন্দু? ঐ হারাধনকে ডাক্তারবাবু বহাল করেছিলেন দেহরক্ষী হিসাবে। দেহরক্ষী বোঝ তো? বডিগার্ড আর কি!

—হাঁ বুঝি! কিন্তু সেই বডিগার্ডই তো ডাকতারবাবুরে দংশন করলো : কালসাপ!

বাসু বলেন, দেখ নন্দু, আমার পরিচয় তুমি জানই। আমি এসেছি জানতে : কে ঐ কালসাপকে এ বাড়িতে ঢুকিয়েছিল। কেউ-না-কেউ ডাক্তারবাবুকে নিশ্চয় বলেছিল : ঐ হারাধন একজন বিশ্বস্ত বডিগার্ড! কারণ ডাক্তারবাবু তাকে চিনতেন না আগে। গত সাত বছর সে এ বাড়ি আসেনি—এলে তুমি তাকে চিনতে পারতে। তার উপর এখন শোনা যাচ্ছে, হারু একটা দাগী আসামী—খুন করে সে ফেরার ছিল। পুলিস এখনো তাকে খুঁজছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন তা নয়—আমি জানতে চাই: কে ঐ লোকটাকে ডাক্তারবাবুর কাছে সুপারিশ করে পাঠায়? আসলে সেই তো খুনী। হারু তো নগদ টাকা পেয়ে কুকাজ করে কেটে পড়েছে। তাই না? শৈলেশ মান্নাও তো তাই বললে। কী?

—তা তো বটেই।

—তা ঐ লোকটার সম্বন্ধে আর কিছু জান? ও কি নেশাভাঙ করত?

—আজ্ঞে তা জানি না। চোপর দিন দোর বন্ধ করি রাখত। তবে হ্যাঁ, মানুষডা জলে ডরাতো।

—জলকে ভয় পেত? কী করে বুঝলে?

—ছান করতি চাইতো না। কিন্তু এবার আমি এড্ডা কথা জিগাব কর্তা? ডাক্তারবাবু তো শুনিছি দারুণ বুদ্ধিমান আছিলেন। ইস্কুলে বরাবর কেলাসে ফাস্টো হতেন। এমন পণ্ডিত মানুষরে কোন হারামজাদা এমন বোকা বানাইল, কয়েন তো?

বাসু বললেন, হেইকতার জবাবটা আম্মো খুঁজে বেড়াচ্ছি নন্দু!

ভাত, নারকেল দিয়ে মুগডাল, বড়িভাজা, কুমড়োর পোড়েভাজা, আলুপোস্ত, ইলিশমাছের সর্ষেবাটা, আনারসের চাটনি আর দই।

রান্নার তারিফ করলেন বাসুসাহেব। প্রতিটি পদের। সবচেয়ে ভালো লেগেছে বললেন—ঐ ইলিশ মাছের পাতুরি।

পম্পা বললো, পাতুরি নয়, মামু। এটা সর্ষেবাটা। পাতুরি বানাতে হয় কলাপাতায় জড়িয়ে। ভাপে সেদ্ধ করে—

বাসু বললেন, সে যাই হোক, খেতে যা হয়েছে : লা জবাব!

যুগলকিশোর বাড়ি ছিল না। কোথায় বুঝি কোন মন্ত্রীর ভাষণ আছে। তাকে হাজিরা দিতে যেতে হয়েছে।

আহারান্তে বাসুসাহেব একটা ইজি-চেয়ারে লম্বমান হলেন। বললেন, তুমি এবার খেয়ে নাও পম্পা।

—ও আসুক। ও এখনি ফিরবে। একসঙ্গে খাব।

কৌশিক জানতে চায় : বলুন পম্পাদেবী, এই ঘটনা নিয়ে যদি গোয়েন্দা গল্প লিখি তাহলে আপনার কী ছদ্মনাম দেব?

বাসু ধমকে ওঠেন, ওমা! 'ছদ্মনাম' দেবে কেন? ষাট-বালাই! এমন গ্র্যান্ড ইলিশ মাছের পাতুরি খাওয়ালো আর তুমি সে কৃতিত্বটা দিয়ে দেবে কোন খেঁদি-পেঁচী, আন্নাকালীকে?

পম্পা খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে। তারপর হাসির বেগ কমলে বলে, মামু! ওটা কিছু মাছ-পাতুরি নয়, সর্ষেবাটা।

বাসু বলেন, ঐ হলো। কিন্তু স্বাদ যা হয়েছিল...

কৌশিক পাদপূরণ করে: লা গ্র্যান্ডি!

এই সময় মিস্ অ্যাগি ডুরান্টের কাছ থেকে একজন পিয়ন একটি মুখবন্ধ খাম নিয়ে এসে হাজির। কৌশিক পিয়ন বইতে সই দিয়ে খামটা বাসু-সাহেবকে দিল। বাসু খুলে দেখলেন ওঁর চিহ্নিত আটজন দাতা গত নয় বছরের মধ্যে কে কত টাকা ঐ মানসিক আরোগ্যনিকেতনকে দিয়েছেন ; ইনকামট্যাক্স থেকে কিছুটা রেহাই পেতে :

(সংখ্যা হাজারের গুণীতকে প্রকাশিত)

নাম	86..'87..'88..'89..'90..'91..'92..'93..'94..
অ্যাগনেস ডুরান্ট	2.0..2.0..3.0..3.0..3.0..5.0..5.0..5.0..5.0
অমরেশ দাশ	..1.0..1.0..1.0..2.0..2.0..2.0..3.0..3.0..3.0
যুগল সেনরায়	..0.5..0.5..0.5..0.5..1.0..1.0..1.0..1.0..1.0
ব্রজদুলাল রায়	.. ..2.0..2.0..2.0..2.0..2.0..2.0
ইন্দ্রকুমার	1.8..1.8..1.8..2.4..2.4..2.4..3.0..3.0..3.6
গুণবতী মোহান্তি	.. .. .. 5.0..5.0..5.0..5.0..5.0..5.0..4.0
সুভদ্রা মোহান্তি	.. .. .. 2.0..2.0..2.0..2.0..2.0..3.0..2.0
ছায়া পালিত	.. 1.0..1.0..1.0..1.0..1.5..1.5..1.5..1.5

বাসু কাগজখানা কৌশিকের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। সে তার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললো, এই কাক্কেশ্বর কুচ্‌কুচের ভগ্নাংশের হিসেবটা কোন গোস্টস্-ফাদারের শ্রাদ্ধে লাগবে, মামু?

—ঐ তো তোমাদের দোষ ছোক্‌রা! ওতে কী আছে তা বুঝবার মতো চোখ যে ভগবান তোমাদের দেননি। বুঝবে কোত্থেকে?

—দু-একটা উদাহরণ যদি দিতেন, মামু?

—শোন। ও থেকে বোঝা যাচ্ছে :

এক : যুগল সেনরায়ের স্ত্রী—খেঁদি, পেঁচী, আন্নাকালী যেই হোক, 1986 থেকে ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিল।

দুই : অমরেশ দাশের আরোগ্যনিকেতনে চাকরি দশ বছরের বেশি।

তিন : ব্রজদুলালের সঙ্গে ডাক্তার ঘোষালের আলাপ 1988 নাগাদ। তার আগে নয়।

চার : ইন্দ্রকুমার দশ বছর ধরে সাধ্যমতো ক্রমবর্ধমান হারে দান করে যাচ্ছে।

পাঁচ : সুভদ্রার পিতৃবিয়োগ হয়েছে 1988 সালের পরে নয়।

ছয় : সুভদ্রার বর্তমান বয়স অন্তত আটাশ।

পম্পা হঠাৎ বলে ওঠে : আটাশ! দেখলে তো তা মনে হয় না।

—না হতে পারে। এই ভগ্নাংশের অঙ্কের হিসাবটা বলছে ফিনানশিয়াল ইয়ার '86-'87-এই সে অষ্টাদশী হয়ে পড়েছিল, না হলে তাকে ইনকামট্যাক্স দিতে হতো না। '87-এ যে

আঠারো, '97-এ সে অনিবার্যভাবে আটাশ—মেক-আপের কল্যাণে তাকে যতই খুকি-খুকি মনে হোক।

পম্পা সোৎসাহে বলে ওঠে: ওফ! দারুণ ডিডাক্‌শন! আপনাকে একটা প্রণাম করব, মামু?

বাসুসাহেব ইজিচেয়ারের হাতলে ঠ্যাঙজোড়া তুলে দিয়ে বলেন, কর। এরা তো ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ ছাড়া আর কিছু চিনল না। তুমি শুধু ভালো রাঁধুনীই নও, বুদ্ধিমতী। অমন দারুণ ইলিশের মাছ-পাতুরি বানালে, আবার চট করে বুঝে নিলে...

পম্পা বলে, না মামু, ওটা মাছ-পাতুরি নয়...

কৌশিক বাধা দিয়ে বলে, ছেড়ে দিন পম্পা দেবী। এর পরের দিন আমি জোড়া ইলিশ নিয়ে আসব। পাশাপাশি দু-বাটিতে কব্জি ডুবিয়ে না খেলে আমাদের মাথায় ঢোকে না—কোনটা সর্ষেবাটার ভগ্নাংশ আর কোনটা মাছ-পাতুরিরই ত্রৈরাশিক!

বাসু তাঁর ভগ্নের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালেন যে, উনি দুর্বাসা মুনি হলে কৌশিক এতক্ষণে : 'গো—ওয়েন্ট—গন'—স্রেফ অ্যাশেস্!

চৌদ্দ

শনিবার, চৌঠা নভেম্বর। অর্থাৎ পরদিনই। সকাল সাতটা নাগাদ বুড়োবুড়ি বসেছেন প্রাতরাশে। সংসারের বাকি দুজন—সুজাতা আর কৌশিক—ভোরবেলায় ট্যাক্সি নিয়ে রওনা দিয়েছে হাওড়া স্টেশন। ইস্পাত ধরে ঘাটশিলা যাবে। সেখানে থেকে ট্যাক্সি ধরে গালুডিতে। পরদিন, রবিবারের মধ্যে ওদের ফিরে আসার কথা। আজ বিশ্বনাথ টোস্ট বানায়নি। দুজনকেই দিয়েছে কাটা ফল।

রানু পাকা পেঁপের টুকরো কাঁটায় গাঁথতে-গাঁথতে বললেন, গালুডিতে ওদের দুজনকে অহেতুক পাঠালে তুমি। ইন্দ্রকুমারের অ্যালেবাইটা যাচাই করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। সে ছিল ঘোষাল-ডাক্তারের বাল্যবন্ধু। সে-ই সবচেয়ে বেশি আঘাত পেয়েছে এ দুর্ঘটনায়। তাছাড়া ডাক্তারের মৃত্যুতে সে তো কোনোভাবেই লাভবান হচ্ছে না।

বাসু বললেন, জানি। কৌশিকও সে-কথা বলেছিল। কী জান? একে বলে রুটিন চেক। কাল বিকালে ফিরে এসে ওরা কনফার্ম করুক যে, ইন্দ্রকুমার তেইশ থেকে ত্রিশ তারিখ ঐ হোটেলে ছিল, ব্যস! আমি তখনি ইন্দ্রকে সন্দেহ-তালিকার বাইরে রাখব। কারণ ডাক্তার পার্টি দেবে বলে মনস্থির করেছে ইন্দ্রকুমার রওনা হবার পর—নাহলে তার নিমন্ত্রণই সবার আগে হতো।

রানু বলেন, কেন? তর্কের খাতিরে যদি ধরা যায় ইন্দ্রকুমার ঐ সময় তার শ্যামপুকুরের বাসায় ছিল, তাহলে তুমি তাকে সন্দেহ-তালিকায় রাখতে? সে যে গার্ডেন-পার্টিতে যায়নি এটা তো প্রমাণিত।

—সেটা কথা নয় রানু। ডাক্তারের গ্লাসে বিষটা কে মিশিয়েছে তা আমরা সহজেই আন্দাজ করতে পারছি। যেহেতু সে পরমুহূর্ত থেকেই ফেরার। যেহেতু সে একটা প্রফেশনাল কিলার। তাকে তো কেউ একজন দশ-বিশ হাজার টাকা খাইয়ে কাজটা করতে নিয়োগ করেছে! সেই লোকটা কে? পচাইকে পুলিস তন্নতন্ন করে খুঁজছে, যাতে জানা যায়—কে তাকে খুনী হিসাবে নিয়োগ করেছিল। নিঃসন্দেহে সে লোকটা ঘোষালের অত্যন্ত বিশ্বস্ত। খুবই কাছের মানুষ।

—কেন? সেটা কী করে বুঝলে?

—নাহলে সেই লোকটা পচাইকে কীভাবে হারাধনের পরিচয়ে ডাক্তারের বাড়িতে ঢুকিয়ে দিতে পারবে, বল? ভেবে দেখ, পুরীতে থাকতেই ডাক্তার আমাকে বলেছিল, অ্যাগির টেলিফোন পেয়ে সে কিছু বিচলিত। আমি তাকে সেদিনই একজন বিশ্বস্ত দেহরক্ষী দিতে চাইলাম। তখন সে রাজি হয়নি। বলেছিল, চিনসুরায় ফিরে গিয়ে পরিস্থিতি বুঝে সে আমাকে জানাবে। তা সে জানায়নি। কেন? দ্বিতীয়ত, যুগলকিশোরও ডাক্তারকে একজন বিশ্বস্ত দেহরক্ষী দিতে চেয়েছিল। ডাক্তার তাকে প্রত্যাখ্যান করে। সে যুগলকে জানিয়েছিল যে, অত্যন্ত বিশ্বস্ত সুত্র থেকে একজন ভালো দেহরক্ষী সে ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়—যে-লোকটা ঐ হারাধন দাসকে পাঠায় তাকে শিবশঙ্কর ঘোষাল খুব ভালোভাবে চিনত এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাস করত। এই জন্যই আমার প্রথম সন্দেহ-তালিকায় আছে চারটি নাম : ব্রজদুলাল, ইন্দ্রকুমার, অ্যাগি এবং অমরেশ দাশ। মুশকিল হচ্ছে এই : এদের মধ্যে কেউই ডাক্তারের মৃত্যুতে তিলমাত্রর লাভবান হয়নি। এরা প্রত্যেকেই ডাক্তারকে ভালোবাসে, তার কাজকে শ্রদ্ধা করে, তার প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ সাত-আট বছর ধরে সাধ্যমতো দান করে গেছে।

রানু পট থেকে কাপে কফি ঢালতে ঢালতে বললেন, একদিক থেকে অবশ্য ওদের দুজনকে গালুডি পাঠানোটা ভালোই হয়েছে।

—কোন দিক থেকে?

—তোমার পাল্লায় পড়ে ওরা দুটিতে তো গোল্লায় গেছে। দিবারাত্র শুধু খুন-জখম নিয়ে মেতে আছে। রাতদিন চোর-পুলিস খেলছে। ওরা বোধহয় ভুলেই গেছে যে, ওদের পরিচয় শুধু 'সুকৌশলী'-র পার্টনার হিসাবেই শেষ হয়ে যায় না : ওরা স্বামীস্ত্রী! যাক্ দুদিন ঘাটশিলায় ফুর্তি করে আসুক!

বাসু হাসলেন। বলেন : তা ঠিক!

—না, শুধু হাসলে হবে না। তুমি একটা জিনিস খেয়াল করেছ? ওদের এত বছর বিয়ে হয়েছে, অথচ বাচ্চা-টাচ্চা হয়নি। কেন? আপত্তিটা কার?

—কী আশ্চর্য! তা আমি কেমন করে জানব?

—তা তো বটেই! তুমি কেমন করে জানবে? সন্তান না হওয়ার অপরাধে ওদের যখন পুলিসে গ্রেপ্তার করছে না, তখন তুমি তো নির্লিপ্ত! তুমি জান না, আমি জানি!

—কী জান?

—ওদের দুজনের কারও শারীরিক কোনও ডিফেক্ট নেই। সুজাতা আমার কাছে স্বীকার করেছে। সন্তান হচ্ছে না—কারণ ওরা সেটা চাইছে না।

র-কফিতে একটা চুমুক দিয়ে বাসু সংক্ষেপে বললেন : আই সি!

—না! কিছুই দেখতে পাও না তুমি। কারণ তুমি ছুঁচোর মতো অন্ধ। কী দেখবে তুমি? দেখার চোখ কি আছে তোমার? সুজাতার কত বয়স হয়েছে বল তো? এর পর 'ফার্স্ট কনফাইনমেন্ট' যে বিপদজনক তা তুমি জান? এ সংসারে একটা চুন্নিমুন্নি এলে সকলের জীবন—বিশেষ করে আমার এই বন্ধ্যা-জীবন—কেমন আনন্দঘন হয়ে উঠবে তা তুমি কোনোদিন ভেবে দেখেছ?

বাসু রীতিমতো বিব্রত হয়ে বলেন, কী আশ্চর্য! তা এ বিষয়ে আমি কী করতে পারি?

—তুমিই তো যত নষ্টের গোড়া! ওদের বিয়ের পর থেকে আপন মনে কাঁটার পাহাড় বানাচ্ছ! কাঁটার পরে কাঁটা! শেষ হতে-না-হতেই আবার কাঁটা! কোনো বিরাম নেই, বিশ্রাম

নেই, শুধু কাঁটা! ডাইনে কাঁটা, বাঁয়ে কাঁটা, হেঁটোয় কাঁটা, মুড়োয় কাঁটা! বলি, সকল কাঁটা ধন্য করে ফুলটা কি ফুটবার সুযোগ পাচ্ছে?

বাসু তাঁর পাকাচুলে আঙুল চালিয়ে কী একটা কথা জবাবে বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই বেজে উঠলো টেলিফোনটা।

রানু বলেন, ঐ শোন! স্বামীস্ত্রীতে দুটো সংসারের কথা বলার সুযোগ নেই। তার মাঝখানে শুরু হলো খোঁচানি : 'টেলিফোনের কাঁটা'!

বিশে পাশের ঘর থেকে হান্ড্রেড-মিটার রেসের শেষ ক'মিটার পাড়ি দিয়ে এসে টেলিফোনটা তুলে নিল। তার 'কথামুখে' বললো, ব্যারিস্টার বাসুসাহেবের বাড়ি। বলুন? কারে চাইছেন?

বাসু প্রসঙ্গটা বদলের সুযোগ পেয়ে বলেন, বিশেটা এখন কেমন চালু হয়ে গেছে দেখেছ?

রানু জবাব দিলেন না। শুনলেন, বিশে টেলিফোনে একনাগাড়ে বলে যাচ্ছে, আজ্ঞে না, বাড়ি নেই।..না, দুজনের কেউই নেই। কলকাতার বাইরে গেছেন, গিয়া...কী? তা আমি জানি না।...কী?...ও আচ্ছা ধরেন—

কর্ডলেস টেলিফোনটা এনে বাসু সাহেবের হাতে ধরিয়ে দেয়। তিনি টেলিফোনের 'কথামুখে' হাত চাপা দিয়ে বললেন, হ্যাঁরে, ওটা কী বললি? সুজাতা-কৌশিক কোথায় গেছে তা তুই জানিস না?

—কেন জানবনি? ঘাটশিলায় গেছেন তো। কিন্তু ঘরের কতা বাইরের লোকেরে বেহুদ্দো বল্‌তি যাব কেনে?

বাসু রানুর দিকে ফিরে বললেন, বিশেকে আজ তোমার হাতখরচা থেকে দশটা টাকা বকশিস্ দিও। উই মাস্ট অ্যাপ্রিশিয়েট হিজ ইন্টেলিজেন্স!

তারপর টেলিফোনটা কানে লাগিয়ে বলেন : বাসু স্পিকিং।

—গুড মর্নিং স্যার! আমি গুণবতী বলছি, মানে মিসেস্ মোহান্তি।

—গুড মর্নিং। বল, গুণবতী? কী খবর?

—আমি, দাদা, ঐ কৌশিক-সুজাতাদের খুঁজছিলাম। তা যে টেলিফোন ধরেছিল—বোধহয় কাজের লোক—সে বললো, ওরা দুজনে কলকাতার বাইরে গেছে। কোথায় গেছে ওরা?

বাসু সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, ওদের খুঁজছ কেন গো? জরুরি কাজ? আগামীকাল রাত্রেই ওরা ফিরে আসবে। পরশু সকালে ফোন কর বরং।

—পরশু তো আমি নিজেই পুরীতে ফিরে যাব। তার আগে দেখা হলেই ভালো হতো। তা কোথায় গেছে ওরা দুজন?

বাসু অম্লানবদনে বললেন, ভুবনেশ্বর।

—ভুবনেশ্বর! কেন? ভুবনেশ্বর কেন?

—তা তো বলতে পারব না, মা। 'সুকৌশলী'-র অফিসটা আমার বাড়িতে বটে, কিন্তু ওরা গোয়েন্দাগিরির কাজকর্ম করে পৃথকভাবে। আমার সঙ্গে যৌথভাবে নয়।

—আমি জানি দাদা। সে-ক্ষেত্রে আমি কি একবার আপনার কাছে আসতে পারি?

—কখন? কবে?

—আপনার অসুবিধা না হলে এখনই। ধরুন সল্টলেক থেকে নিউ আলিপুর যেতে যতটুকু সময় লাগে, তার পর।

—ব্যাপারটা জরুরি এবং প্রফেশনাল মনে হচ্ছে?

boiRboi.net

—আজ্ঞে হ্যাঁ, দাদা। জরুরি তো নিশ্চয়ই। এবং প্রফেশনালও বটে।

—বেশ তো, এস। তুমি কি একা আসছ?

—আজ্ঞে না। খুকুও থাকবে আমার সঙ্গে। সে অবশ্য স্রেফ সৌজন্য সাক্ষাতে যাচ্ছে—কাটিসি-ভিজিট। আমি যাচ্ছি কাজে। প্রফেশনাল ভিজিট।

—এস। আমি অপেক্ষা করব।

—আর একটা কথা, দাদা। আমি যে আপনাকে প্রফেশনালি এনগেজ করেছি তা যেন জানাজানি না হয়ে যায়।

—দুটো কথা বলব, মিসেস্ মোহান্তি। এক : তুমি আমাকে আদৌ প্রফেশনালি এনগেজ করনি, করার একটা প্রস্তাব দিয়েছ। আমি তা এখনো গ্রহণ বা বর্জন করিনি। দ্বিতীয় কথা, তোমার কোনো গোপন কথা তোমার শত্রুকে অথবা তোমার শত্রুর কোনো গোপন কথা তোমাকে আমি জানাব না—ইফ্ আইদার অব য়ু বি মাই ক্লায়েন্ট।

—জানি দাদা, আয়াম সরি।

সকাল নটার মধ্যেই মা-মেয়ে এসে হাজির। ওদের বোধহয় নিজেদের ভিতর কথাবার্তা আগে থেকেই হয়েছিল। বাইরের ঘরে কিছুক্ষণ 'খেজুরে-আলাপ' শেষ করে সুভদ্রা রানুকে বললে, চলুন মাসিমা, আমরা দুজন বাইরের বারান্দায় গিয়ে বসি।

বাসু বললেন, না সুভদ্রা। তার দরকার হবে না। আমিই বরং তোমার মা-কে নিয়ে আমার চেম্বারে গিয়ে বসছি। তোমরা এখানেই গল্পগুজব, কথাবার্তা চালাতে পার।

গুণবতীকে নিয়ে বাসুসাহেব চেম্বারে ঢুকলেন। মিসেস্ মোহান্তি আসামাত্র রানুদেবীকে জানিয়ে রেখেছিলেন যে, ওঁরা এইমাত্র ব্রেকফাস্ট সেরে এসেছেন—রানু যেন চা-কফির হাঙ্গামা না করেন।

বাসু বলেন, এবার বল। 'সুকৌশলী'কে খুঁজছিলে কেন?

গুণবতী প্রতিপ্রশ্ন করেন, ওরা কেন ভুবনেশ্বরে গেছে সত্যিই আপনি জানেন না, দাদা?

বাসু পাইপটা এতক্ষণে ধরাবার প্রয়োজন অনুভব করলেন। বললেন, দেখ গুণবতী, আমাদের প্রফেশনটা এমন যে, একজনের কথা অপরজন বলি না। এই যে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ—তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করি বা না করি—তা আমি তৃতীয় ব্যক্তিকে বলতে পারি না। সুতরাং সুজাতা-কৌশিক কেন ভুবনেশ্বরে গেছে তা জানলেও আমি তোমাকে জানাতে পারি না। ইট্স্ আওয়ার প্রফেশনাল এথিক্স।...এবার বল, তুমি আমাকে কী জানাতে এসেছ? তোমার প্রস্তাবটা কী?

—আমি শুনেছি, অ্যাবে বিল শবরিয়ার দেহটা কবর থেকে খুঁড়ে বার করার আয়োজন হচ্ছে। পরীক্ষা করে দেখতে, তার মৃত্যু কী কারণে হয়েছে—হার্ট-ফেল না বিষের ক্রিয়ায়। এ-কথাটা সত্যি?

বাসু একটু বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, একই কথা বারে-বারে বলতে আমার ক্লান্তি লাগছে, গুণবতী। তুমি কি বুঝতে পার না যে, সে-কাজটা আদৌ করা হলে তা করা হবে ওড়িশা সরকারের স্বরাষ্ট্র-বিভাগের নির্দেশে। তারা তা করছে কি করছে না, তা আমার জানার কথা নয়। জানলেও তা আমি তোমাকে জানাতে পারি না।

—এখন পারেন না। কিন্তু আমি যদি আপনার ক্লায়েন্ট হয়ে যাই? তখনো কি পারেন না?

—ক্লায়েন্ট! কী 'কেস'-এর ক্লায়েন্ট?

—ধরুন, আমি যদি বলি : জোড়া-খুনের। দুটোরই। বিল শবরিয়া এবং ডক্টর ঘোষাল?

—নো। আয়াম সরি। ঐ জোড়া-খুনের কেসটা আমি ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছি। ব্রজদুলাল রায় আমার মক্কেল।

—আমার ইন্টারেস্ট দেখতে আপনি আমাকে ক্লায়েন্ট বলে স্বীকার করতে পারেন না?

—সে-কথার জবাব পরে দেব। তোমার ইন্টারেস্টটা কী জানার পর। কিন্তু তুমি তো প্রাথমিকভাবে কোনো সলিসিটারের কাছে লিগ্যাল অ্যাডভাইস্ খুঁজছিলে না। তুমি তো এ-বাড়িতে ফোন করে প্রথমে 'সুকৌশলী'কে খুঁজেছিলে। তাই না? শোন, মিসেস্ মোহান্তি! তোমার সমস্যাটা কী, তা আমি জানি না। তা যদি 'সুকৌশলী'কে জানাতে চাও তাহলে পরশু সকালে তা জানাতে পার। তার আগে নয়। আর যদি আমার পরামর্শ চাও, তাহলে সর্বপ্রথমে আমাকে আদ্যোপান্ত মনের মধ্যে খুলে বলতে হবে। এভাবে আধো-খোলা, আধো-ঢাকা নয়। সবটা কেস শুনে আমি তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি, প্রত্যাখ্যানও করতে পারি। কিন্তু আমাদের প্রফেশনটা এমন যে, সেই গোপন কথা আমি তৃতীয় ব্যক্তিকে বললে আমার বার লাইসেন্স খোয়াতে হবে। এমনি কেউ যদি স্বীকার করে যে, সে স্বহস্তে খুন করেছে—তাহলে আমি তার কেস নিতে পারি, নাও নিতে পারি—কিন্তু পুলিস ডেকে তাকে ধরিয়ে দিতে পারি না। অ্যাম আই ক্লিয়ার?...এখন তোমার ইচ্ছা। তুমি মন খুলে আমাকে সব কথা বলে আইনত পরামর্শ চাইতে পার। আমি তা দিতে পারি, না-ও দিতে পারি। বলতে পারি : তুমি অন্য কোনও ল-ইয়ারের কাছে যাও। কিন্তু তোমার গোপন কথা প্রকাশ করতে পারি না। বুঝতে পারলে?

গুণবতী বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, দাদা। জলের মতো বুঝেছি। বেশ। আমি সব কথা আপনাকে খুলেই বলি। তারপর আপনি যদি কেস না নেন তাহলে আমি অন্য উকিল দেখব।

—বেশ কথা। বল।

সুভদ্রার বাবা যে কন্সটিটুয়েন্সি থেকে নির্বাচনে জয়লাভ করেন তার ভিতর পড়ে ঐ গুনপুরের শবরদের এলাকাটা। কয়েক হাজার বয়ঃপ্রাপ্ত শবর ঐ এলাকায় বাস করে। গুনপুর চার্চের অ্যাবট—অর্থাৎ অ্যাবে শবরিয়ার উপরে যিনি ঐ গির্জার প্রধান ধর্মযাজক, তিনি বুঝেছিলেন, শবরদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে পারলে একটা ভালো 'ভোট-পকেট' তৈরি করা যায়। নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই তিনি প্রাপ্তবয়স্ক শবর নরনারীকে ভোটার তালিকাভুক্ত করে একটি দল গড়ে তোলেন। অ্যাবে শবরিয়াও প্রাণপাত করে এ-কাজ করেছেন। ওঁদের উদ্দেশ্য ছিল একটাই—যে প্রার্থী ঐ নিঃস্ব, রিক্ত, অদ্যভক্ষ্যধনুর্গুণ শবরদের মঙ্গলার্থী তাকেই ওঁরা ভোট দেবেন।

সুভদ্রার বাবা ভোটে জিতলেন শবরদের বিরাট ভোট পেয়ে।

অ্যাবে এবং অ্যাবটকে খুশি করে দিতে টাকা নিয়ে এগিয়েও এসেছিলেন। এঁরাই প্রত্যাখ্যান করেন। বলেন, দান যা দেবার তা চার্চকে দিতে হবে। ব্যক্তিকে নয়।

মুশকিল হচ্ছে এই যে, চার্চ-এর সঙ্গে এখানকার হিন্দু নেতাদের রেষারেষি ছিল—ভোটার কাড়াকাড়ির ব্যাপারে। ফলে সুভদ্রার বাবা প্রকাশ্যে চার্চকে টাকা দিতে পারেননি।

এ নিয়ে একটা বিশ্রী মন-কষাকষি হয়।

বাজারে এমন কথাও রটে যায় যে, সুভদ্রার বাবা অন্যায়ভাবে ঘুষ নিয়ে কোটি কোটি টাকা কামিয়েছেন। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ গোপনে রাখা আছে ঐ অ্যাবট এবং অ্যাবের কাছে। ঐ সময় মোটর দুর্ঘটনায় চার্চের অ্যাবট নিহত হন। দুষ্টলোক বলে—ওটা মোটেই দুর্ঘটনা ছিল না, ছিল রাজনৈতিক কারণে হত্যা।

বিরোধীপক্ষের চাপাচাপিতে সি. বি. আই তদন্ত বসে। দুর্ভাগ্যই বল, আর সৌভাগ্যই বল—হঠাৎ হার্ট-অ্যাটাকে মারা গেলেন সুভদ্রার বাবা!

মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদন্ত চালাতে ওঁর শত্রুরা উৎসাহিত হলো না। ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ল। মোহান্তিসাহেবের প্রয়াণে সিটটা খালি হলো। বাই-ইলেকশনেও মোহান্তির পার্টির লোকই জিতল।

গুণবতীর আশঙ্কা: এখন যদি অ্যাবে শবরিয়ার মৃতদেহ এক্সহিউম করে বিষের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়, তাহলে লোকে বলবে : এটাও রাজনৈতিক হত্যা। অর্থাৎ প্রয়াত রাষ্ট্রমন্ত্রীর চ্যালা-চামুণ্ডারা এভাবে প্রতিশোধ নিয়েছে। গুণবতী আর সুভদ্রার উপস্থিতিতেই তিনি মারা যান। এই কারণে গুণবতীর ইচ্ছে নয় ওড়িশার স্বরাষ্ট্র দপ্তর গুনপুর চার্চে গিয়ে ঐ কেঁচো খোঁড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করে। আশঙ্কা : কে জানে কী সাপ বেরিয়ে আসবে!

বাসু সবটা শুনে বললেন, প্রথম কথা, মোহান্তিসাহেব প্রয়াত। ফলে বিল শবরিয়ার দেহে বিষের অস্তিত্ব পাওয়া গেলেও প্রয়াত রাষ্ট্রমন্ত্রী দায়ী হতে পারেন না। দ্বিতীয় কথা, ওড়িশা সরকার যদি এ-কাজ করতে চান তাহলে বাসুসাহেব বা সুকৌশলী সে বিষয়ে কী করতে পারে?

গুণবতী ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত দুটো প্রশ্নেরই জবাব দিলেন। প্রয়াত রাষ্ট্রমন্ত্রীকে নতুন করে ফাঁসি দেওয়া যাবে না এ-কথাও যেমন ঠিক, তেমনি রাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যেসব তদন্ত অনেক খরচপাতি করে চাপা দেওয়া গিয়েছিল, সেগুলো নিয়ে সি. বি. আই নতুন করে তদন্ত শুরু করতে পারে।

—সেগুলো কী জাতীয় অপরাধের তদন্ত?

—সুভদ্রার বাবার সম্পত্তির সঙ্গে তাঁর উপার্জনের অসামঞ্জস্য। এক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে অর্জিত সম্পত্তি বলে কি ওয়ারিশদের কাছ থেকে সরকার সেসব সম্পত্তি কেড়ে নিতে পারেন?

বাসু জানতে চান, আমি শুনেছি মোহান্তিসাহেব মন্ত্রী থাকাকালে পাঁচখানি ভদ্রাসন কিনেছিলেন। তাই না? কলকাতা, দিল্লি, মুম্বাই, বাঙ্গালোর আর পুরী? আন্দাজ কত কোটি টাকা মূল্য হবে সব কয়টি মিলিয়ে?

গুণবতীর কণ্ঠস্বর নিচু হলো। হঠাৎ কি জানি কেন তিনি মাতৃভাষায় জবাব দিলেন, দ্বি-তিন কোটি হেবে। মুই না জানুছি।

বাসু খুব সাধারণভাবে বললেন, গড়ে পঞ্চাশ লাখ করে ধরা যাক, আড়াই কোটি? তা এই টাকাটা তিনি কত বছরের ভিতর উপার্জন করেছিলেন?

এবার মিসেস্ মোহান্তি সোজা হয়ে উঠে বসেন। আবার ফিরে আসেন বঙ্গভাষে, সে তো সারাজীবন ধরে। উনি চল্লিশ বছর ধরে কটকে প্র্যাকটিস করেছেন। টানা চল্লিশ বছর।

—কী প্র্যাকটিস করতেন?

—ডাক্তারী।

—উনি মেডিকেল প্র্যাকটিশনার? এম. বি. ডিগ্রি ছিল তাঁর?

—না, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারী। ওড়িশা গরিব দেশ—তাই উনি হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করতেন।

—বুঝেছি। আর রাষ্ট্রমন্ত্রী পদে ছিলেন কত বছর?

—আড়াই বছর!

—তার মানে হিসাবে দাঁড়ালো—বছরে কোটি। মানে মাসে গড়ে সওয়া আট লক্ষের

উপর! হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ গুণবতী, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। আর আদালত রুলিং দিলে ঐ অন্যায়ভাবে উপার্জিত সম্পত্তি সরকারের খাস হয়েও যেতে পারে।

—কিন্তু উনি তো অন্যায়ভাবে উপার্জন করেননি।

—বটেই তো! সে তো তোমার-আমার বিচারে। আদালত সে-কথা নাও মানতে পারেন!

—ঐ কথাটাই ভাবছি, দাদা। দেখুন না—আদালতের কী কাণ্ড! অমন দেবতুল্য মানুষ—জপ-তপ নিয়ে পড়ে আছেন—একরকম সন্ন্যাসীই! অতদিন প্রধানমন্ত্রীত্ব করলেন। তাঁকে পর্যন্ত চারশো বিশ ধারায় ফাঁসিয়ে হয়রানি করছে! কোনো মানে হয়?

—তা তুমি কী করতে চাইছ?

—ঐ কেঁচো-খোঁড়ার কাজটা চাপা দিতে! আমি শুনেছি, আপনি নিজেই এটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে করছেন। ডক্টর ঘোষালের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আপনিই অ্যাবে শবরিয়ার ধামাচাপা পড়া মৃত্যুর কেসটাকে আবার খুঁচিয়ে তুলেছেন। আর সেজন্যই কৌশিক-সুজাতা ভুবনেশ্বরে গেছে।

বাসু বিরক্ত হয়ে বলেন, আমার মনে হয় তোমার অন্য কোনও উকিলের কাছে পরামর্শ নেওয়া উচিত। আমি এজাতীয় কাজ হাতে নিই না।

—সুকৌশলী...?

—কাল বাদে পরশু! ওরা ভুবনেশ্বর থেকে ফিরে এলে কথা বল।

—তাহলে তাই সই! আপনি যখন আমার কেসটা নিতেই পারবেন না বলছেন। বিধবা বোনটির প্রতি যখন আপনার কিছুতেই কৃপা হলো না, তখন ফিরেই যাই।

ওঁরা ফিরে এলেন বাইরের ঘরে।

সুভদ্রা বললো, তোমাদের আলোচনা হয়ে গেল?

মা বললে, হ্যাঁ, হয়ে গেল। চল, এবার ফেরা যাক।

মেয়ে বললে, সে কি! এবার তুমি মাসিমার সঙ্গে গল্পগাছা কর। আমি মেসোমশাইয়ের সঙ্গে একটু 'প্রফেশনাল টক' করে আসি। অতবড় ব্যারিস্টারকে হাতের কাছে পেয়েছি। আইনের কথা কিছু শোনাই, কিছু শুনি? চলুন মেসোমশাই। বেশি সময় আমি নেব না।

বাসু আবার গিয়ে বসলেন তাঁর স্টাফড্ রিভলভিং চেয়ারে। ওঁর চেম্বারের ডোর-ক্লোজার লাগানো কবাটটা নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। সুভদ্রা সামনের চেয়ারে বসে বললো, আমি বাজি রাখতে পারি : আপনি আমার মায়ের প্রস্তাবে রাজি হননি। কাজটা অ্যাকসেপ্ট করেননি।

—কাজটা কী, তা তুমি জান?

—মা বলেনি। আমি আন্দাজ করেছি। এটা যদি মায়ের একার প্রবলেম হতো, তাহলে আমি নাক গলাতাম না। কিন্তু আমার স্বার্থও একইভাবে জড়িত। তাই জেনে যেতে চাইছি।

—কী তোমার প্রশ্ন?

—বাপি আমাকে তিনখানা বাড়ি উইল করে দিয়ে গেছে। সল্টলেকে একটা দোতলা বাড়ি, পুরীতেও একটা দোতলা বাড়ি ; আর বাঙ্গালোরে একটা সিক্স-স্টোরিড বিল্ডিং।

বাসু জানতে চাইলেন, তিনটের মিলিত ভ্যালুয়েশন কত হবে?

—কী ভ্যালুয়েশন? কর্পোরেশন ভ্যালুয়েশন, না বর্তমান বাজারদর?

—দ্বিতীয়টা তুমি আন্দাজ করতে পার? জান?

—ওমা! আন্দাজ করব কেন? সম্পত্তিটা যখন আমার, তখন বাজারদরটা জানব না? তিনটে মিলিয়ে ধরুন তিন কোটি।

—তা, তোমার প্রশ্নটা কী, সুভদ্রা?

—বিল শবরিয়ার বডি এক্সহিউম করে যদি দেখা যায় যে, তাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে এবং তা নিয়ে যদি সরকার এনকোয়্যারি করায়—ডিপার্টমেন্টাল, অর সি.বি.আই-এর মাধ্যমে—আর যদি ঐ সূত্রে প্রমাণ হয় আমার পূজ্যপাদ স্বর্গত পিতৃদেব উৎকোচ গ্রহণ করে ঐ বাড়িগুলি বানিয়েছেন তাহলে সরকার সে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারেন?

—পারেন। আদালত সেই মর্মে নির্দেশ দিলে।

—আমরা মা-মেয়ে কি তখন পুরীর স্বর্গদ্বারে ভিক্ষা করতে বসব?

—আদালত সচরাচর অতটা নিষ্করুণ হয় না। উৎকোচের অর্থে অন্যায়ভাবে নির্মিত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করলে সচরাচর সরকার থেকে ওয়ারিশদের একটা সামান্য কিছু অর্থমূল্য দেওয়া হয় ; যা দিয়ে তারা আবার নতুন করে ভদ্রভাবে জীবন শুরু করতে পারে। সেসব নির্ভর করে কেস-এর মেরিটের উপর। বিচারকের মর্জির উপর।

—মেসোমশাই! এটা বন্ধ করা যায় না? বিল শবরিয়ার দেহটা কবর থেকে ওঠাতে চাইলে শবর সম্প্রদায় বিদ্রোহ করতে পারে। ওরা রোমান ক্যাথলিক।

—সে সমস্যা ওড়িশা সরকারের। তোমার-আমার নয়। তার আগে বল তো, তোমার এখন বয়স কত?

—ত্রিশ। কেন?

—তোমার মা কিছুদিন আগে বলেছিলেন ছাব্বিশ।

—মা অলওয়েজ আমার বয়স চার বছর কমিয়ে বলেন। এটা ওঁর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। অটোমেটিক রিফ্লেক্স অ্যাকশন। আমি সতের বছরে স্কুল ফাইনাল পাস করি। মা দুনিয়াভর লোককে বলেছে তের বছর বয়সে। আমার অন্নপ্রাশনের সময়ে—শোনা কথা অবশ্য—মায়ের বন্ধুদের প্রশ্নের জবাবে মা নাকি বলেছিল আমার তখন বয়স ছিল মাইনাস তিন বছর দু-মাস।

—তার মানে?

—অঙ্কের হিসাব। আমার অন্নপ্রাশন হয়েছিল বাস্তবে দশ মাস বয়সে। মা যথারীতি তা থেকে চার বছর বাদ দিয়ে পেয়েছে 'মাইনাস আটত্রিশ মাস'।

বাসু জানতে চাইলেন, আর ইন্দ্রকুমারের বয়স কত?

—ঠিক জানি না। আন্দাজ পঞ্চাশ-একান্ন। কারণ ও ছিল ডাক্তার ঘোষালের ক্লাসফ্রেন্ড। ডাক্তার ঘোষালের মৃত্যুসময়ে বয়স হয়েছিল একান্ন—অন্তত কাগজে তাই লিখেছে।

—তার মানে, তোমার থেকে ইন্দ্রকুমার অন্তত বিশ বছরের বড়?

—হিসেবে তাই তো দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু এ হিসাবটা কেন করছেন মেসোমশাই?

—তুমি বুদ্ধিমতী। নিশ্চয় বুঝতে পারছ।

—তা পারছি! তবে এটা আমার ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা। আমি কচি খুকি নই। সব দিক বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত যা নেবার তা নেব। আমরা বরং যে-কথা আলোচনা করতে এসেছি, সেই প্রসঙ্গেই ফিরে যাই। বিল শবরিয়া। আমি জানি, আপনি মায়ের প্রস্তাবটা নিশ্চয় প্রত্যাখ্যান করেছেন; কিন্তু 'সুকৌশলী' কি 'কেসটা' নিতে পারে? আপনার কী মনে হয়?

বাসু বিরক্ত হয়ে বলেন, তোমাদের কেসটা কী তাই তো বুঝছি না আমি।

—বিল শবরিয়ার দেহ কবর থেকে তোলা ঠেকাতে মা—আমার যদ্দূর আন্দাজ—পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত খরচ করতে রাজি। দশ সে দেবে 'সুকৌশলী'কে অ্যাজ এজেন্ট, বাকি চল্লিশ ভুবনেশ্বরে স্বরাষ্ট্রবিভাগে ইনসিডেন্টাল এক্সপেন্সেস!

বাসুর ভ্রূকুঞ্চন হলো। বলেন, কেন বল তো? তোমার মা কি সে-কথা বলেছে তোমাকে? ফিফ্‌টি থাউজেন্ড!

—কেন? আপনাকে টাকার অঙ্কটা বলেনি?

—না। সে প্রসঙ্গই ওঠেনি।

—ও!

বাসু বললেন, তোমার মা-কে বলিনি, কিন্তু তোমাকে বলছি সুভদ্রা, অ্যাবে বিল শবরিয়ার মৃত্যু বিষক্রিয়ায় হয়েছে এটা প্রমাণ করার সঙ্গে তোমার বাবার ঐ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবার সম্ভাবনা খুবই অল্প—ইন ফ্যাক্ট : নেই। রাজনৈতিক বৈরিতাবশত একই পার্টির লোক যদি এ-কাজ করেও থাকে—যা প্রমাণ করা অলমোস্ট ইম্পসিব্‌ল্—তাহলেও তোমার বাবার উপার্জিত সম্পত্তির প্রসঙ্গ আদৌ আসে না। তাঁর ওয়ারিশদের ধরে এতদিন পরে টানাটানি করার সম্ভাবনা প্রায় নেই-ই। তা-ছাড়া তোমার বাবা যে রাজনৈতিক দলে ছিলেন, সেই দলই তো এখন ওড়িশার ক্ষমতাশীল।

—আই নো! আই নো!

—য়ু নো? তুমি তা বুঝতে পারছ? তাহলে আমাকে একটু বুঝিয়ে বল তো, মা,—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—তোমার মা কেন এই সহজবোধ্য জিনিসটা বুঝতে পারছে না? সে কেন মনে করছে : কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুবে? সাপটা আসলে কী? তোমাদের সম্পত্তি? না আর কিছু?

সুভদ্রা অস্বস্তি বোধ করে। ইতস্তত করে বলে, তা আমি কী করে জানব? মায়ের কথা মা-ই বলবে। তাকে জিজ্ঞেস করুন।

—কিন্তু সে কি তোমাকে ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকার অঙ্কটা শুনিয়েছে?

সুভদ্রা সামলে নেয় নিজেকে, নট ইন সো মেনি ওয়ার্ডস্। ওটা আমার আন্দাজ! ঠিক আছে, মেসোমশাই, আজ এই পর্যন্তই থাক।

—তাই থাক। কিন্তু অ্যাবে বিল শবরিয়ারক দেহ এক্সহিউম করাতে তোমাদের কেন এত আপত্তি সেটা বাপু আমার এই মোটা মাথায় ঢুকলো না সুভদ্রা! ফিফ্‌টি থাউজেন্ড! গুড গড!

বেলা এগারোটা নাগাদ আবার একটা টেলিফোন এল। এবারও 'সুকৌশলী'কে কেউ খুঁজছে। কর্ডলেস ফোনটা বিশে নিয়ে এসে ধরিয়ে দিল বাসুসাহেবের হাতে। বাসু বললেন, কৌশিক বা সুজাতা ক'দিনের জন্য কলকাতার বাইরে গেছে। পরশু সকালে তাদের পাওয়া যাবে। ও-প্রান্ত থেকে ভেসে এল, ব্যারিস্টারসাহেব, আমি ইন্দ্রকুমার বলছি।

—হ্যাঁ, বল ইন্দ্র? তুমি কি কৌশিককে খুঁজছ?

—তাই খুঁজছিলাম। তা ওরা দুজন তো নেই, আপনার একটু নষ্ট করার মতো সময় হবে? একটা জরুরি বিষয়ে কিছু আলোচনার ছিল।

—ঘোষালের কেস সংক্রান্ত?

—অফকোর্স! আপনি কি ফ্রি আছেন? আমি আসতে পারি?

—তুমি কোথা থেকে টেলিফোন করছ, ইন্দ্র? ব্রজদুলালের বাড়ি থেকে?

—আজ্ঞে না। আমি শ্যামপুকুরে আমার নিজের ডেরায় ফিরে এসেছি। আমার ফোন নেই। একটা টেলিফোন বুথ থেকে বলছি। আপনার অসুবিধা না হলে আমি এখনি ট্যাক্সি নিয়ে চলে আসতে পারি। ধরুন ঘণ্টাখানেকের মধ্যে।

—তোমার মধ্যাহ্ন আহার হয়েছে?

—আজ্ঞে না। ফিরে এসে খাব।

—তার চেয়ে এক কাজ কর না ইন্দ্র। আমার বাড়িতেই লাঞ্চ কর। খেতে খেতে কথা

হবে। না, না—তোমার সঙ্কোচ করার কিছু নেই। কৌশিক-সুজাতা নেই—আমরা আজ রান্নাবান্না করিনি। চাইনিজ আনিয়ে খাব। তুমি চাইনিজ ভালোবাস তো?

—শিওর। তবে একটা অনুরোধ! মিষ্টিটা আমি নিয়ে যাব। শ্যামপুকুরে একটা দোকান আছে, চিত্তরঞ্জন মিষ্টান্ন ভাণ্ডার —দারুণ কড়াপাক বানায়। আপনাদের নিউ আলিপুরে অমন সন্দেশ পাওয়াই যায় না।

—অলরাইট! কিন্তু লাঞ্চের আগে কী খাব? জীন না বিয়ার?

—ওটা আমার রেস্পনসিবিলিটি, স্যার! আমার কাছে ভালো জিন আছে। মিনিট পনের আপনার ডিপ-ফ্রিজে রাখলেই তৈরি হয়ে যাবে।

—অ্যাজ য়ু প্লিজ।

রানু বিরক্ত হলেন। মধ্যাহ্ন আহারে ইন্দ্রকুমারকে নিমন্ত্রণ করার জন্য নয়—ঐ সঙ্গে 'জিন'-এর আমন্ত্রণ হওয়ায়।

বারোটা থেকে একটা পুরো একঘণ্টা গেল জিন-পানে।

বাসুসাহেবের চেম্বারে। রানু টু-ইন-ওয়ানে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলেন। নিজের চেম্বারে জিনের গ্লাস নিয়ে বাসু বললেন, এবার বল, কী বলতে চাইছ?

ইন্দ্র জিন-এর সঙ্গে লাইম মেশাতে মেশাতে বলে, ব্যাপারটা আপনার সঙ্গে আলোচনা করে লাভ হবে না মনে হচ্ছে—

—তাহলে এলে কেন?

—বলছি। সুকৌশলীর কেউ থাকলে সুবিধা হতো। কারণ আমার আশঙ্কা আপনি এসব অ্যান্ডারহ্যান্ড ডিল্‌স্‌-এ রাজি হবেন না।

—আন্ডারহ্যান্ড ডিল্‌স্‌? মানে ঘুষ? না, তা হব না! ঠিকই বলেছ।

—আগে ব্যাপারটা শুনুন তো।

—বল?

ইন্দ্রকুমার সব কথা খুলে বলে:

ইন্দ্রকুমারের বাল্য ও কৈশোরকাল কেটেছে বিহারে। ধানবাদে। সেখানকার চিরাগোড়া বয়েজ হাইস্কুলে পড়ত। ওরা বাবা ছিলেন ধানবাদের অ্যাসিস্টেন্ট স্টেশনমাস্টার। ফলে, বিহারে ওর অনেক বন্ধুবান্ধব, সহপাঠী ছড়িয়ে আছে। তেমনি একজন—সে এখন বৈশালী জেলার এস.পি.—ইন্দ্রকুমারকে জানিয়েছে যে, বঙ্গাল মুলুকের ফেরারী আসামী পচাই ঘড়াই এখন বিহারে। বৈশালী হচ্ছে পাটনার উত্তরে এবং মজঃফরপুরের দক্ষিণে একটি জেলা। ইন্দ্রের সেই বন্ধু, পাণ্ডেসাহেব জানিয়েছেন যে, পঞ্চানন ঘড়াই, ওরফে পচাই, বর্তমানে বিহারের রেলডাকাতি গ্যাঙে নাম লিখিয়েছে। তার হাল-হকিকৎ পুলিসের জানা। তবে বিশেষ আর্থ-রাজনৈতিক হেতুতে পুলিস ওকে ধরতে চায় না। ওদের মূল আস্তানা গণ্ডক নদীর ধারে একটি জনপদ: হাজিপুর। পাণ্ডে-সাহেব পচ্ছিম-বঙ্গাল-কা পুলিসের হাতে ঐ ফেরারী আসামীটিকে তুলে দিতে পারেন। অনায়াসেই। তবে এ কাজে আন্দাজ দশ হাজার টাকা 'এথি'-বাবদ খরচ হবে। সে টাকা কি কেউ দিতে রাজি আছে? তাহলে ইন্তাজাম হইয়ে যাবে। টাকাটা পঞ্চাশ টাকার বাণ্ডিলে দিলেই চলবে।

বাসু বললেন, দেশটা কোথায় যাচ্ছে ইন্দ্র?

—সম্ভবত জাহান্নামে। সে-প্রসঙ্গ থাক। সেটা তো বাংলা-বিহারের জনগণের তরফে দেখছেন জ্যোতিবাবু আর লালুবাবু! আমার প্রশ্ন হচ্ছে: পচাইটাকে ধরতে না পারলে আমরা কিছুতেই বুঝতে পারব না—কে ঘোষালকে ওভাবে হত্যা করালো। পচাই তো একটা

অ্যান্টিসোস্যাল, প্রফেশনাল খুনী। কিন্তু তাকে এমপ্লয় করলো কে? পচাইকে জেল-হাজতে রেখে থার্ড-ডিগ্রির মাধ্যমে ঐটুকু তথ্য আমাদের সংগ্রহ করতেই হবে। যদি না অবশ্য—ঐ যে কী-যেন নাম?—হ্যাঁ, সুজাত ভদ্রের চ্যালাচামুণ্ডা হাঁ-হাঁ করে বাধা দেয়।

বাসু জানতে চান: সুজাত ভদ্র কে?

—ঐ যে এ.পি.ডি.আর-এর বড়সাহেব। সে যাহোক, আমি ব্রজদুলালকে কনভিন্স করেছি। সে রাজি হয়েছে—আই মিন, দশ হাজার ইনভেস্ট করতে। কিন্তু আমি বলেছি যে, ও-টাকা আমি ছোঁব না। ট্র্যানজ্যাকশনটা হবে 'সুকৌশলী'র মারফৎ। আমি শুধু উপস্থিত থাকব। সারা ভারতের এই সব ফ্রিলান্স গোয়েন্দাদের একটা সঙ্ঘবদ্ধ ফেডারেশন গড়ে উঠেছে। ক্রিমিনালরা এবং পলিটিক্যাল মস্তানরা যেমন দিন-দিন ফুলে-ফেঁপে উঠছে, ঠিক সেই হারে মানুষ পুলিসের উপর আস্থা হারাচ্ছে। ফলে এই সব ফ্রিলান্স গোয়েন্দার দল বাজার ক্যাপচার করছে। ওদের একটা অল-ইন্ডিয়া ফেডারেশন গড়ে উঠেছে। আমি জানি—'সুকৌশলী' তার সদস্য। আমি চাই, 'সুকৌশলী' ওদের পাটনা-অফিসকে টেলিফোন করে প্রথমে জেনে নিক—বৈশালী জেলার এস. পি. পাণ্ডে-সাহেবের ঐ দশ হাজার টাকার অফারটা জেনুইন কিনা। যদি জেনুইন হয়, তবে পাটনার কোনও ব্যাঙ্কের উপর একটা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট নিয়ে আমি আর কৌশিক চলে যাব পাণ্ডের কাছে।

—ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট! মিস্টার পাণ্ডে নেবেন?

জিনের গ্লাসে একটা বড় চুমুক দিয়ে ইন্দ্রকুমার বললে, কী যে বলেন, স্যার! তাই কি নেয়? ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টটা তো আমাদেরই ভাঙাতে হবে। তবে পাটনা যেতে যে পরিমাণ রেল-ডাকাতি হচ্ছে তাতে নগদে দশ হাজার টাকা কে নিয়ে যাবে বলুন? হয়তো ট্রেনের মধ্যেই পাইপগান দেখিয়ে ঐ পচাইই টাকাটা ছিনতাই করবে?

—তা ঠিক। তবে কী জান ইন্দ্র, এসব ব্যাপারে আমি একবারে নভিস। বাহাত্তর বছর বয়েস হলো—আজ পর্যন্ত ঘুষ কখনো দিইনি বা নিইনি। তুমি এ বিষয়ে কৌশিকের সঙ্গেই কথা বল বরং। সে পরশু সকালে বাড়িতে থাকবে।

—আমি এটাই আশঙ্কা করেছিলাম। আপনি এ ডিলে থাকতে রাজি হবেন না।

—সেটা যদি জানাই থাকে তাহলে আমার কাছে অ্যাট অল এলে কেন, ইন্দ্র?

—ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়াটা নির্বুদ্ধিতা হবে বলে। আমরা 'সুকৌশলী'কেই নিয়োগ করছি—আমি আর ব্রজ; কিন্তু আপনার জ্ঞাতসারে।

বাসু বললেন, আর এক পেগ নেবে?

—দিন। তবে এটাই শেষ। মাসিমা অনেকক্ষণ একা একা গান শুনছেন। বেলাও প্রায় একটা বাজল।

বাসু নিজের জন্যও এক পেগ নিলেন। বললেন, তোমার একজ্যাক্ট বয়সটা কত ইন্দ্র?

—ফর্টি সিক্স!

—ঘোষালের চেয়ে তুমি পাঁচ বছরের ছোট?

—হ্যাঁ। ওর এটা একান্ন চলছিল।

—অথচ তোমার সহপাঠী?

—কে? আমি? ঘোষালের? না তো! ও আমার চেয়ে পাঁচ ক্লাস উঁচুতে পড়ত।

—ঘোষাল তো একষট্টির ব্যাচ। ম্যাট্রিকের। তুমি কত সালে পাস কর?

—বিটুইন য়ু অ্যান্ড মি, স্যার। আমি ম্যাট্রিক পাস করিনি।

—তোমরা এক স্কুলে পড়তে না?

boiRboi.net

—পড়তাম। ও আমার চেয়ে পাঁচ ক্লাস ওপরে পড়ত।

বাসু বললেন: আই সি!

বাস্তবে কিন্তু সব কিছুই গুলিয়ে গেল তাঁর। তাহলে ঘোষাল কেন পুরীতে বলেছিল ওরা একই বছর, একই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেছিল?

বাসুসাহেবের মনে হলো—ঠিকই বলেছিলেন রানু: তিনি ছুঁচোর মতো অন্ধ।

বিশে এসে বললো, মা জানতে চাইলেন, খানা কি লাগানো হবে?

বাসু বললেন, লাগা।

চিকেন-অ্যাস্‌প্যারাগাস স্যুপ, মিক্সড-ফ্রায়েড-রাইস, চিলি-চিকেন, চাওমিঙ আর ফ্রায়েড প্রন। ঐ সঙ্গে শ্যামপুকুরের কড়াপাক। লাঞ্চটা জমল ভালোই। আহারের অবকাশে ইন্দ্রকুমার জানতে চাইলো, সুজাতা-কৌশিক হঠাৎ দু-দিনের জন্য কোথায় গেল?

অম্লানবদনে বাসুসাহেব বললেন, ভুবনেশ্বর।

—অ্যাবে শবরিয়ার দেহটা কবর থেকে তোলার ব্যাপারে?

বাসু ফ্রায়েড প্রন চিবোতে-চিবোতে বললেন, ওরা কখন কোথায় যায়, কী করে, তা কি আমাকে জানায়? কে ওদের এমপ্লয় করেছে তাও তো জানি না।

—কেন? ব্রজদা তো বললো, সে-ই করেছে।

—তাহলে তাই।

ইন্দ্রকুমার এবার রানুর দিকে ফিরে বললে, আপনারা একবার গালুডি ঘুরে আসুন, মাসিমা। গ্র্যান্ড জায়গা। শীতকালেই ভালো। হোটেলটাও বেশ সুন্দর। খাওয়া-থাকার ব্যবস্থাপনাও ভালো।

রানুর মনে ছিল। তবু জানতে চান, কী যেন নাম হোটেলটার?

—'সুবর্ণরেখা'! কলকাতা থেকেই ঘর বুক করা যায়। গেলে আপনারা ব্রজদার বড় ভ্যানটা নিয়ে যাবেন—বাই রোড—তাহলে হুইল-চেয়ারটা নিয়ে যাওয়ার সুবিধা হবে।

বাসু নির্লিপ্তের মতো জানতে চান, তুমি কদ্দিন ছিলে ওখানে?

—হপ্তাখানেক। গিয়েছিলাম ও মাসের তেইশে, আর ফিরে এলাম সোমবার ত্রিশে।

—ওখানে থাকতেই ডাক্তারের মৃত্যুসংবাদ পেলে বুঝি?

—হ্যাঁ। উনত্রিশে, রবিবারে শিবুদাকে একটা এস.টি.ডি করেছিলাম, ঐ হোটেল থেকে। ধরল অ্যাগি। তার কাছেই শুনলাম মর্মান্তিক খবরটা—রবিবার রাত্রে। পরদিন সকালের ট্রেনে ফিরে এলাম কলকাতায়।

বাসু জানতে চান, হোটেল থেকে সুবর্ণরেখা নদী কতদূর?

—হাঁটাপথ। তাছাড়া ফুলডুংরি নামে ঘাটশিলাতে একটা পাহাড় আছে। গাড়ি নিয়ে তার মাথায় উঠে যেতে পারবেন মাসিমাকে সঙ্গে নিয়ে। ভা-রি সুন্দর দৃশ্য। বসুন, আপনাদের দেখাই।

কাঁটা-চামচ দিয়ে আহার করছিলেন ওঁরা, হাত ধুতে হলো না। ইন্দ্রকুমার ব্রিফকেস খুলে একতাড়া রঙিন ফটোগ্রাফ বার করে আনল। সুন্দর ফটো উঠেছে। সুবর্ণরেখার উপলবন্ধুর জলোচ্ছ্বাস, অনাদ্যন্তকাল প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে থাকা জলমগ্ন পাথর, মাছরাঙার শিকার ধরা, পাথুরে পথ, গাছ-গাছালি, সূর্যাস্তদৃশ্য, ফুলডুংরি, বিভুতিসদন, 'ইস্‌মাইল প্লিজ' গ্রুপ ফটো। সর্বসমেত ত্রিশটা। পোস্টকার্ড সাইজ।

বাসুসাহেবের সন্ধানী চোখে নজর হলো, ফটোর নিচে কোনায় তারিখটা ছাপা আছে প্রতিটি ক্ষেত্রে। ইলেকট্রনিক হরফে—চেকের নম্বর যে ভাষায় লেখা হয়। বাসু জানতে চাইলেন, এটা কী ক্যামেরা গো? তারিখও ছাপা পড়েছে দেখছি!

ইন্দ্র বললে, জাপানী ক্যামেরা। জোজো না গোজো কী যেন নাম। দারুণ ক্যামেরাটা। সব কিছু অটোমেটিক। অ্যাপারচার, টাইমিং কিছুই অ্যাডজাস্ট করতে হয় না। বিষয়বস্তুটা ভিয়ু-ফাইন্ডারের ভিতর আছে কিনা ঠিকমতো দেখে নিলেই হলো। আলো কম থাকলে আপনিই ফ্ল্যাশ বাল্‌ব্ জ্বলবে। অপ্রয়োজনে জ্বলবে না। তার উপর, যে-তারিখে ছবিটা তোলা হয়েছে তাও নেগেটিভে ছাপা হয়ে যাবে।

বাসু জানতে চান, কোথায় কিনেছিলে ক্যামেরাটা? দাম?

—কিনেছিলাম ওসাকাতে। পঁচাত্তর সালে। ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে দাম পড়েছিল হাজার দেড়েক। কলকাতায় পাওয়া যায় কি না জানি না। কী আশ্চর্য ক্যামেরা দেখুন—ওরা দুটো ফ্রি ব্যাটারি দিয়েছিল, কিন্তু আজ বিশ বছরের ভিতর ব্যাটারি বদলাতে হয়নি। কোনোরকম মেরামতি করতে হয়নি। ভিতরটা খুলেই দেখিনি কখনও। ক্যামেরাটা এখনো যেন ব্র্যান্ড নিউ।

বাসু বললেন, আমাকে একবার ক্যামেরাটা দেখিও তো, ইন্দ্র!

ইন্দ্রকুমার মাথা নেড়ে বললে, এক্সট্রীমলি সরি, স্যার! ওটা নেই। খোয়া গেছে।

রানী চমকে ওঠেন—সে কি! কবে? কী করে?

ইন্দ্রকুমার সে বেদনার কাহিনীটি সবিস্তারে পেশ করে। অ্যাগির কাছ থেকে দুঃসংবাদ পেয়ে সে যখন ত্রিশ তারিখ, সোমবার কলকাতার ফিরে আসে তখন ওর মাথার ঠিক ছিল না। ক্যামেরাটা জানলার হুক থেকে টাঙিয়ে রাখে। হাওড়ায় পৌঁছে সেটা নামাতে ভুলে যায়।

বাসু বলেন, তার আগেই রিলটা শেষ হয়েছিল নিশ্চয়!

—হয়েছিল। নতুন একটা রিল ভরাও হয়েছিল।

বাসু তারিখ অনুযায়ী ছবিগুলো সাজাতে থাকেন। বাইশ তারিখ, রবিবারে তোলা হয়েছে নয়টা ফটো, তেইশে তিনটে, চব্বিশে কোনো ছবি নেই, পঁচিশে একটা, ছাব্বিশে তিনটে, সাতাশে চারটে, আটাশে ছয়টা, উনত্রিশে চারটে, ত্রিশে কোনো ছবি তোলা হয়নি। একুনে ত্রিশটি ফটোগ্রাফ।

বাসু জানতে চান, এই ত্রিশটি ছবির নেগেটিভ তোমার কাছে আছে?

—আছে। কেন বলুন তো?

—তাহলে এই ত্রিশটা ছবি আপাতত আমার কাছে থাক।

—কেন? আপনি কী করবেন?

—টোপ হিসাবে ব্যবহার করব।

—মানে?

—ওরা দুজন ভুবনেশ্বর থেকে ফিরে এলে ওদের দেখাব। লোভে পড়ে যদি রাজি হয়, তাহলে ঘোষালের এই কেসটা মিটলে আমরা চারজন গালুডি যাব। সুবর্ণরেখা হোটেলে দিন সাতেক কাটিয়ে আসব।

ইন্দ্রকুমার খুশি মনেই ছবিগুলো রেখে গেল।

আহারান্তে ইন্দ্রকুমার বিদায় হলে রানু জানতে চাইলেন, তুমি ফটোগুলো রাখলে কেন, বল তো?

—ছবিগুলোই তো কনক্লুসিভ প্রুফ যে, ডাক্তার ঘোষালের মৃত্যুর সঙ্গে ইন্দ্রকুমারের

boiRboi.net

কোনও সম্পর্ক নেই। এর অনেকগুলিতেই ইন্দ্র সেল্‌ফ্ এক্সপোজার দিয়েছে। প্রমাণ হচ্ছে, বাইশে অক্টোবর থেকে ত্রিশে অক্টোবর ইন্দ্রকুমার ছিল গালুডিতে।

রানু বললেন, আমি আগেই বলেছিলাম, ওদের গালুডি পাঠাচ্ছ অহেতুক।

—না, না, অহেতুক নয়! মাঝে মাঝে ওদের মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, ওরা শুধু সুকৌশলীর পার্টনারই নয়—বিবাহিত জীবনেও পার্টনার। শুধু হেঁটোয় কাঁটা-মুড়ো কাঁটা, কাঁটা থামতে না থামতেই আবার কাঁটা—এ সব ভালো নয়।

রানু হাসতে হাসতে বলেন, তাই বুঝি ?

পনের

ইস্পাত ঠিক সময়মতোই পৌঁছেছিল ঘাটশিলায়। বেলা দশটায়। স্যুটকেস হাতে ট্যাক্সি-স্ট্যান্ডে দরাদরি করছিল কৌশিক আর পিছন-পিছন ঘুরছে ব্যাগ কাঁধে সুজাতা; এমন সময়ে একটি অল্পবয়সী বাঙালী ছেলে এগিয়ে এসে বললে, আপনারা কি 'সুবর্ণরেখা' হোটেলে যেতে চাইছেন, স্যার? গালুডিতে?

—হ্যাঁ, তুমি কি করে আন্দাজ করলে, ভাই?

—আজ্ঞে না, আন্দাজ নয়, ঐ ট্যাক্সি-ড্রাইভারটি বললে। আমি ঐ হোটেলের অ্যাম্বাসাডারটা চালাই। একজন বোর্ডারকে ইস্পাত ধরাতে নিয়ে এসেছিলাম। ওঁরা এই ট্রেনেই সম্বলপুর চলে গেলেন। এখন খালি ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরে যাব। উঠুন, স্যার। আপনার দুজন তো?

কৌশিক বললে, হ্যাঁ, দুজন। তুমি কি মিটারে যাবে?

—মিটার কোথায় স্যার? এ তো হোটেলের গাড়ি। প্রাইভেট। ভাড়া আমাকে দিতে হবে না। হোটের বিলের সঙ্গে ন্যায্য ভাড়া টাইপ করে উঠে যাবে। আমার লগবুকে একটা সই দিয়ে দেবেন শুধু।

কৌশিক আর সুজাতা উঠে বসলো। ছেলেটি বললো, মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে যাই, কি বলেন স্যার? যদি হোটেলের আর কোনও শেয়ার-প্যাসেঞ্জার পেয়ে যাই।

কৌশিক বললে, ঠিক আছে। তবে পাঁচ মিনিটের চেয়ে বেশি দেরি কর না যেন।

ছেলেটি তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন, স্যার। অপেক্ষা করছি আমার নিজের স্বার্থে নয়—আপনার স্বার্থে।

—মানে?

—'সুবর্ণরেখা' হোটেলের আর কোনও বোর্ডার যদি ইস্পাতে এসে থাকেন, আর আমি তাঁকে পাকড়াও করতে পারি, তাহলে আমার কোনো লাভ নেই, হোটেলেরও কোনো লাভ নেই—কিন্তু আপনার গাড়ি ভাড়া 'হাফাহাফি' হয়ে যাবে।

কৌশিক বললে, বুঝলাম। সিগ্রেট চলে?

প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরে।

ড্রাইভার—বছর বিশ-বাইশ বয়স হবে তার, লাজুক-লাজুকভাবে একটা স্টিক নিয়ে পিছন ফিরলো। নিজেই ধরালো। এদিক-ওদিক খদ্দের খুঁজে দেখতে থাকে কিছুক্ষণ। স্টেশন ক্রমশ ফাঁকা হয়ে আসছে। অর্থাৎ ইস্পাতে যাঁরা এসেছেন তাঁরা সবাই গেট পার হয়ে ঘাটশিলায়

জনারণ্যে মিশে গেছেন। ছেলেটি সুখটান দিয়ে সিগ্রেটটা ফেলে দিয়ে ড্রাইভারের সিটে এসে বসলো। বললে, আপনার 'ব্যাড লাক', স্যার। 'সুবর্ণরেখা'র বোর্ডার আজ আপনারা শুধু দুজনই।

স্টার্ট দিল সে গাড়িতে।

কৌশিক জানতে চায়, তোমার নামটা কী ভাই?

—কার্ত্তিক। কার্ত্তিক দাশ।

—কতদিন কাজ করছ এই হোটেলে?

—হোটেল খোলা ইস্তক। হোটেলের ম্যানেজারবাবু—প্রসূন ঘোষ, আমার ভগ্নিপতি।

সুজাতা কথোপকথনে যোগ দেয়: 'ঘোষ' তো কায়স্থ উপাধি। তোমরা কি কায়স্থ?

কার্তিক গাড়ি চালাতে-চালাতেই বললে, আজকাল কি আর জাত-পাত দেখে কেউ বিয়ে করে দিদিভাই? ওসব সেকালে হতো। তবে ম্যানেজারবাবুকে যেন বলবেন না, আমি বলেছি যে, উনি আমার জামাইবাবু।

সুজাতা জানতে চায়, সেকি! কেন গো?

ম্লান হেসে কার্তিক বললে, দেবসেনাপতি যে রথী নন, সারথী!

সুজাতা জবাব দিল না। বোঝে. এটা কার্তিকের বেদনার স্থান। হীনম্মন্যতা। হয়তো লেখাপড়া শেখেনি। ভগিনীপতির কৃপায় করে খাচ্ছে। একটু পরে কার্তিক নিজে থেকেই জানতে চায় : কদ্দিন থাকবেন?

সুজাতা বললে, মাত্র দু'দিনের ছুটি। কাল রোব্বারেই সন্ধ্যার ইস্পাত ধরে ফিরে যাব। সোমবারে ওঁকে জয়েন করতে হবে অফিসে।

—তা আজ বিকালে যদি শেয়ারের প্যাসেঞ্জার পাই তাহলে বের হবেন? লোকাল ট্রিপে?

—কী কী দেখা যাবে?

—ফুলডুংরি পাহাড়, সুবর্ণরেখা নদী, বিভূতিসদন লাইব্রেরি, বিভূতিবাবু যে বাড়িতে থাকতেন, যেখানে দেহ রেখেছিলেন—

কৌশিক জানতে চায়—আমাদের দুজনের মাথাপিছু কত করে খরচ পড়বে?

—সেটা স্যার নির্ভর করছে আপনারা কতজন যাচ্ছেন তার উপর। ঠিক আছে, আমি লাঞ্চের মধ্যেই আপনাকে জানাব। দেখি, আর কোনও বোর্ডার পাই কিনা।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা এসে পৌঁছল হোটেলে। রিসেপশনে এসে কৌশিক রসিদটা দেখাল। খাতায় নাম-ঠিকানা লিখে দিল। প্রসূনবাবু জানতে চাইলেন, কদ্দিন থাকবেন, স্যার?

—উইকেন্ডের ছুটি। সোমবার জয়েন করতে হবে। কাল সন্ধ্যায় ইস্পাতে ফিরব।

—টিকিট কাটা আছে? না কাটতে দেব?

—না। আপ-ডাউন টিকিট কেটেই এসেছি। আর ফিরবার সময় ঐ কার্তিকের গাড়িতেই ঘাটশিলায় যাব ট্রেন ধরতে। কার্তিককেও বলে রেখেছি।

ম্যানেজারবাবু একটি বেলবয়কে ডেকে একটা চাবি ধরিয়ে দিয়ে বললেন, বীরু, এঁদের দোতলার তিন নম্বরে নিয়ে যা। ঘরটা রেডি আছে।

বীরু স্যুটকেস আর কাঁধের ঝোলাটা তুলে নিয়ে বললে, আসুন!

বেশ ছিমছাম ডবল-বেড রুম। পিছনের জানলা খুলে দিলে সুবর্ণরেখার উপত্যকার অনেকটা আরণ্যক ভূমি দেখা যায়। জল দেখা যায় না অবশ্য। শীতের শুরু হচ্ছে। কলকাতায় এ সময় বেশ গরম—এখানে খোলামেলায় উত্তাপ কিছু কম। বীরু দেখিয়ে দিল বাথরুমে

অব্যবহৃত সাবান ও তোয়ালে রাখা আছে। বিছানার চাদর পাটভাঙা। সুজাতা জানতে চাইলো, বেলবয়কে ডাকতে হলে কোনটা সুইচ?

বীরু বললে, আজ্ঞে না। সুইচ নেই। ঘরে ঘরে ফোন আছে। সার্ভিস চাইলে '17' ডায়াল করবেন। রেস্টুরেন্ট—'11' আর রিসেপশন '21'।

কৌশিক বললো, দু-পেয়ালা কপি নিয়ে এস তো হে।

—এখনি নিয়ে আসছি স্যার। তৈরি কফি, না পটে? সঙ্গে আর কিছু? স্ন্যাক্স্ জাতীয়?

সুজাতা বলে, পটেই নিয়ে এস। না। সাড়ে এগারোটা বাজতে যাচ্ছে। এখন কিছু খেলে দুপুরের লাঞ্চটা মাটি হয়ে যাবে।

বীরু নিজে থেকেই বললো, দুপুরে কী কী পাওয়া যাবে তা ঐ 'ডব্‌ল্ ওয়ান'-এ ফোন করে জেনে নিন। এখনো তো সিজন ঠিকমতো শুরু হয়নি। সব সময় সবকিছু পাওয়া যায় না।

সুজাতা বলে, চাইনিজ পাব?

—রাত্রে ডিনারে পাবেন, দিদি। এ বেলা এখন অর্ডার দিলে সার্ভ করতে অনেক বেলা হয়ে যাবে।

—তাহলে লাঞ্চের সময় অর্ডার দিয়ে দেব। ইন্দ্রদা বলেছিল, চাইনিজই নাকি তোমাদের স্পেশালিটি। কথাটা সত্যি?

বীরু প্রতিপ্রশ্ন করে, ইন্দ্রদা কে? বোর্ডার?

—ইন্দ্রকুমার। ফিল্‌ম স্টার। গত সপ্তাহেই তো এসে এ হোটেলে সাতদিন ছিলেন। তুমি দেখনি তাঁকে?

বীরু বললে, না দিদি। দেখিনি। তিনি তিনতলায় দু'নম্বরে ছিলেন। গত সোমবার ফিরে গেছেন। উনি ফিরে যাবার পর জানতে পারলাম। তাই অটোগ্রাফটা নেওয়ার সুযোগ হয়নি। তা আপনি ইন্দ্রকুমারকে চেনেন?

—ওমা, চিনব না কেন? ইন্দ্রদা তো আমার মাস্‌তুতো দাদা হয়। আমার মায়ের খুড়তুতো বোনের ছেলে। ঠিক আছে, আমি তোমাকে ইন্দ্রদার অটোগ্রাফ যোগাড় করে ডাকে পাঠিয়ে দেব।

—থ্যাঙ্ক্ দিদি। বসুন। আগে কফিটা নিয়ে আসি।

বীরু চলে যায় দু-কাপ কফি আনতে।

কৌশিক জামা-জুতো খুলতে খুলতে বললে, ফার্স্ট ওভারেই দু-দুটো উইকেট নেমে গেল!

—তার মানে?

ক্রিকেটী-ভাষা সুজাতা বোঝে না। অথচ কৌশিক বি.ই. কলেজ ক্রিকেট টিমে এককালে খেলত।

কৌশিক বুঝিয়ে বলে, মামু আমাকে দু-দুটো দিন সময় দিয়েছেন, কিন্তু ভগবান দিয়েছেন আরও বড় দান: সুন্দরী শুধু নয়, বুদ্ধিমতী বউ। দারুণ কায়দা করে জেনে নিয়েছ: ইন্দ্রকুমার এসেছিলেন, এ হোটেলেই উঠেছিলেন। এটা আমাদের ফার্স্ট উইকেট। আর সেকেন্ড উইকেটটা আরও মারাত্মক: তিনি সোমবার ফিরে গেছেন। অর্থাৎ শনিবার ঘটনার রাত্রি, আটাশে অক্টোবরের পরের পরের দিন। সুতরাং ইন্দ্রকুমার সন্দেহ তালিকার বাইরে!

সুজাতা তার চুলের কাঁটাগুলো খুলে-খুলে ড্রেসিং টেবিলে সাজিয়ে রাখছিল—বিন্দি টিপটা খুলে আয়নার কাচে আটকে দিতে দিতে বললে : হিসাবটা বুঝলাম না। কীভাবে ইন্দ্রকুমার হিসাবের বাইরে যাচ্ছেন?

—বুঝলে না? ইন্দ্রকুমার কলকাতা ত্যাগ করেছেন সোমবার তেইশে অক্টোবর। তখনো ডক্টর ঘোষাল পার্টি দেবার ব্যাপারে মনস্থির করেননি। কারণ, করলে ইন্দ্রকুমারের নিমন্ত্রণ হতো সবার আগে। তা হয়নি। ইন্দ্রকুমারই তাঁর নিকটতম বাল্যবন্ধু। দ্বিতীয় কথা, হারাধন চিনসুরায় জয়েন করে মঙ্গলবার। তারপর ঐ পার্টির ব্যবস্থা হয়। তৃতীয় কথা : ঘাটশিলা থেকে ইন্দ্রকুমার কলকাতা ফিরে আসেন সোমবার—ঘটনার পরে। ফলে ঘোষালের মৃত্যুর সঙ্গে ইন্দ্রকুমারকে কিছুতেই জড়ানো যাচ্ছে না।

সুজাতা ততক্ষণে স্যুটকেস খুলে শাড়ি-ব্লাউজ বার করতে শুরু করেছে। স্নানের পরে যা পড়বে। বললে, আজ্ঞে না, স্যার। এখনো কিছুই প্রমাণিত হয়নি। ইন্দ্রকুমার যে তেইশে অক্টোবর এখানে আসেন, তা বীরু বলেনি। শুধু বলেছে যে তিনি গত সোমবার ফিরে গেছেন—

—দ্যাটস এনাফ! কবে এসেছেন সেটা তো রিসেপশনে খাতা দেখেই জানা যাবে।

—তা যদি যায় তাহলে তিনি কবে চেক-আউট করেছেন তাও খাতা দেখে বলে দেওয়া যায়। কিন্তু লোকটা যে ন্যায্যত ইন্দ্রকুমারই তা প্রমাণ হয় না। বিশেষ বীরু তো চেখেই দেখেনি ইন্দ্রকুমারকে। সে শোনা কথা আউড়ে গিয়েছে। আইনের ভাষায় যাকে বলে: হেয়ার-সে রিপোর্ট!

—আই নো! আই নো! বীরু বলেছে "উনি ফিরে যাবার পর জানতে পারলাম..." সুতরাং এখন আমাদের জেনে নিতে হবে ও কার কাছে শুনেছে। নাইন্টি-পার্সেন্ট চান্স: তিনতলার বেলবয়। ইন্দ্রকুমার একজন সিনেমা আর্টিস্ট। তাকে কেউ-না কেউ নিশ্চয় নোটিস্ করেছে। হয়তো অটোগ্রাফ খাতায় স্বাক্ষরও নিয়েছে। তাহলে ওর ডেটেড সিগ্‌নেচার পাব। তা স্নানে আগে কে যাবে। তুমি না আমি?

সুজাতা বলে, কফিটা তো আসুক।

বলতে বলতেই দরজায় নক করে বীরু এসে হাজির। কফির ট্রেটা নামিয়ে দিয়ে, খাবার জলের স্টেনলেস স্টিলের জলপাত্রটা তুলে নিয়ে বললে, আজকে পারশে মাছ এসেছে, দিদি। পারশে মাছ ভালো লাগে? তাহলে ডবল-ওয়ানে দু-প্লেট পারশে মাছের সর্ষেবাটা অর্ডার এখনি করে দিন।

সুজাতা বললে, দিচ্ছি। একটা কথা, বীরু। ইন্দ্রদা আমাদের টেলিফোন করে বলেছেন যে, এখান থেকে ফিরে যাবার পর ওঁর একটা পকেট-বুক খুঁজে পাচ্ছেন না। পকেট-বুক মানে, ছোট্ট কালো রঙের একটা খাতা। তাতে নানান লোকের টেলিফোন নাম্বার লেখা। তুমি ভাই একটু খোঁজ নিয়ে দেখবে, ইন্দ্রদা যে ঘরে ছিলেন তার বেলবয়কে জিজ্ঞেস করে?

—কাশীদাকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। ইন্দ্রকুমারবাবু ফিরে যাবার পর ওঁর ঘরে যদি কেউ কোনো ঐ রকম খাতা খুঁজে পায়—তা সে কাশীদাই হোক, ঝাড়ুদারই হোক অথবা জমাদার—সে জমা দেবে অফিস-কাউন্টারে। ঠিক আছে, দিদি। আমি খোঁজ নিয়ে দেখব।

সুজাতা পট থেকে কাপে কফি ঢালতে বলে, কাশীনাথ কে? তিনতলার বেলবয়?

বীরু চলতে শুরু করেছিল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। ইন্দ্রকুমার যে ঘরে ছিলেন—তিনশ দুই —কাশীদা ঐ ঘরটা অ্যাটেন্ড করে।

—ঐ কাশীদাই বুঝি তোমাকে বলে, ইন্দ্রকুমার এসেছিলেন, সোমবারে ফিরে গেছেন?

—না দিদি! খবরটা আমাকে দিয়েছিল কার্তিকদা।

—কার্তিক? ঐ অ্যাম্বাসাডার গাড়িটা যে চালায়?

—হ্যাঁ। কার্তিকদাকেও আপনি চেনেন?

—বাঃ! ওর গাড়িতেই এলাম তো।

লাঞ্চ-আওয়ার্স বারোটা থেকে আড়াইটা। কৌশিক পারশে মাছের সর্ষেবাটা দু-প্লেট অর্ডার করে দিয়েছিল আগেভাগেই। প্রায় দেড়টা নাগাদ ওরা নেমে এল ডাইনিং-হলে। খানা-কামরায় তখন যথেষ্ট ভিড়। কৌশিক সুজাতাকে বললে, আমাদের তো কোনো তাড়া নেই। চল, এই মওকায় একবার রিসেপশনটা ঘুরে আসি। দেখা যাক, ম্যানেজারের কাছ থেকে জেনে নেওয়া যায় কি না—ইন্দ্রকুমার কবে চেক-ইন করেন আর কবেই বা চেক-আউট করেন।

সুজাতা রাজি হয়।

ওরা দুজনে এগিয়ে যায় রিসেপশন কাউন্টারের দিকে। সেখানে এখন লোকজন বিশেষ নেই। ম্যানেজার প্রসূনবাবু একখণ্ড খবরের কাগজ নিয়ে একাগ্র মনে পড়ছিলেন। ওরা এগিয়ে আসতেই কাগজটা সরিয়ে রেখে বললেন, আসুন। লাঞ্চ হয়েছে?

সুজাতা বলে, আজ্ঞে না। ডাইনিং-হলটা এখন ভর্তি। তাই এই সুযোগে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম, একটা ব্যাপারে।

—বলুন?

—আপনাদের হোটেলটার কথা প্রথম শুনি ইন্দ্রদার কাছে—মানে ফিল্ম-স্টার ইন্দ্রকুমার—উনি আমার দাদা হন সম্পর্কে। ইন্দ্রদা হোটেলের খুব সুখ্যাতি করলো, আপনার কথাও বললো।

হাসলেন প্রসূনবাবু। বললেন, ওঁরা তো নটরঙ্গে নতুন বই নামাচ্ছেন কালীপূজার পর। আমাকে নিমন্ত্রণ করে গেছেন। খুব অমায়িক লোক।

—ইন্দ্রদার দিলটা চিরকালই দরাজ। ও! ভালো কথা! ইন্দ্রদা এখান থেকে ফিরে যাবার পরে একটা পকেট নোটবুক খুঁজে পাচ্ছে না। তাতে শুধু টেলিফোন নাম্বার লেখা আছে। আমাদের বলেছে, আপনাকে জিজ্ঞেস করতে—সে কি খাতাটা হোটেলের ঘরে ফেলে গেছে?

—হ্যাঁ, বীরু, মানে আপনার রুমের বেলবয় সে-কথা আমাকে একটু আগেই জানিয়েছে। কিন্তু সরি, কেউ তো তা আমার কাছে জমা দেয়নি। ওটা যদি ঘড়ি, ফ্লাস্ক, ক্যামেরা, বা মানিব্যাগ হতো তাহলে না হয় অন্যরকম সম্ভাবনার প্রশ্ন উঠত। কিন্তু নোটবইটা তো আর কারও কোনও কাজে লাগবে না। ফলে, বেলবয়-ঝাড়ুদার-জমাদার যে কেউ পেলে নিশ্চয় আমাকে দিয়ে যেত। খুব সম্ভবত উনি সেটা অন্য কোথাও হারিয়েছেন।

সুজাতা খুব ক্যাজুয়ালি বললো, তা হবে। তা উনি তো গত সোমবার, মানে ত্রিশ তারিখে ফিরে গেছেন। তাই না?

—হ্যাঁ! তাই হবে বোধহয়!

কৌশিক বলে, আবার 'বোধহয়' কেন মিস্টার ঘোষ? হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। আপনি তো রেজিস্টার দেখে নিশ্চিতভাবে সেটা বলে দিতে পারেন। তাই না?

একগাল হেসে প্রসূন বলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। তা অবশ্য পারি।

কৌশিক বলে, কাইন্ডলি খাতাখানা দেখে সেটা বলবেন?

প্রসূনবাবু তখনো সহাস্যবদন। বলেন, কেন বলুন তো?

—ইন্দ্রদাই আমাকে বলেছিলেন, খবরটা জেনে যেতে। উনি রবিবারে কলকাতা ফিরেছেন, না সোমবার?

প্রসূনবাবুর হাসিমুখ একই রকম রইলো। বললেন, আই সি! সেক্ষেত্রে তাঁকে বলবেন, আমাকে চিঠি লিখতে অথবা টেলিফোন করতে!

কৌশিককের ভ্রূকুঞ্চন হলো। একটু অন্যসুরে বলে, কিন্তু কেন বলুন তো? এটা এমন কি গোপন ব্যাপার যে, আমাদের জানাতে পারেন না?

—না, না, গোপন ব্যাপার-স্যাপার কিছু নেই। তবে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি প্রতিটি বোর্ডারের স্বার্থ দেখে থাকি। একজনের কথা অপরজনকে জানাই না। এটা আমাদের হোটেল বিজনেস্-এর এস্থেটিক্যাল এটিকেট!

কৌশিক পকেট থেকে তার আইডেন্টিটি-কার্ড বার করে প্রসূনবাবুর দিকে বাড়িয়ে ধরল। বললো, ইন্দ্রকুমার চৌধুরী শুধু সম্পর্কে আমার স্ত্রীর দাদাই নন. তিনি সুকৌশলীর ক্লায়েন্ট। তাঁর স্বার্থেই আমরা প্রশ্নটা করেছি।

এতক্ষণে প্রসূনবাবুর মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেল। গম্ভীরভাবে তিনি বললেন, "সুকৌশলী"? আই সি! একটি গোয়েন্দা-সংস্থা! তা ইন্দ্রকুমারের কাছ থেকে কোনও চিঠিপত্র আপনারা এনেছেন কি?

—না হলে আপনি কোনও রেজিস্টার্ড গোয়েন্দা এজেন্সিকে ঐ ফর্মাল খবরটুকু দেবেন না? তিনি কবে এসেছিলেন এবং কবে চেক-আউট করে ফিরে যান?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক তাই। আপনি যদি পুলিস হতেন, সরকারি গোয়েন্দা হতেন, অথবা ইন্দ্রকুমারের চিঠি দেখাতে পারতেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমি সব কিছু আপনাকে জানিয়ে দিতাম। কিন্তু এখন—যখন দেখছি, আপনি প্রাইভেট গোয়েন্দা এবং যখন আপনি ইন্দ্রকুমারের কোনও চিঠি দেখাতে পারছেন না—তখন তো আমি বুঝতে পারছি না যে, আপনি ইন্দ্রকুমারের স্বার্থে ও প্রশ্ন করছেন অথবা ইন্দ্রকুমারের শত্রুর স্বার্থে ও কাজ করছেন! আইদার অব দিস্ মে বি ট্রু! তাই নয় কি? সরি স্যার! আমার জবাব: নো কমেন্টস্!

কৌশিক বললে, হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। ইন্দ্রদার কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে আসা উচিত ছিল আমাদের।

—থ্যাঙ্কু স্যার। আপনি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ। তাই আমার সমস্যাটা বুঝতে পেরেছেন। আমাদের কাছে সবার আগে দেখতে হবে বোর্ডারের ইন্টারেস্ট। যদি না 'স্টেট' হস্তক্ষেপ করে। তাই নয়? প্রাইভেট গোয়েন্দা এজেন্সিকে ওব্লাইজ করা আমাদের কর্তব্য নয়। যেমন ধরুন, এই ভদ্রমহিলা—আপনার স্ত্রী। আপনি বলেছেন, আমি মেনে নিয়েছি। কিন্তু কোনো গোয়েন্দা এজেন্সি যদি ভবিষ্যতে এসে খোঁজ করে আপনি একা ছিলেন, না সস্ত্রীক, তাহলে আমি কি তার জবাব দিতে পারি? আমি কি জানি যে আপনি বিবাহিত না ব্যাচিলার?

—থ্যাঙ্কু অল দ্য সেম, মিস্টার ঘোষ। আমি আপনার সমস্যাটা বুঝতে পেরেছি!

ডাইনিং রুমে ফিরে এসে কৌশিক বললো, ম্যানেজারটি একটি বাস্তুঘুঘু! তোমার কী মনে হলো?

হোটেলের পরিবেশনকারী দুটি প্লেট, ছুরি-কাঁটা-ফর্ক আর জলের গ্লাস দিয়ে গেল। সে শ্রুতিসীমার বাইরে যেতেই সুজাতা বললো, আমার তা আদৌ মনে হলো না। উনি যা বলেছেন, তা যুক্তিপূর্ণ এবং এথিক্যাল। তুমি যদি ঝপ করে 'সুকৌশলী'-র কার্ডখানা ভদ্রলোকের নাকের ডগায় মেলে না ধরতে তাহলে আমি হয়তো সুকৌশলে খবরটা জেনে নিতাম। তুমি তাড়াহুড়া করায় তা হলো না।

কৌশিক ঢোক গিলল।

পারশে মাছের সর্ষেবাটা কিন্তু ভালোই হয়েছিল।

আহারান্তে কৌশিক মুখটুক ধুয়ে যখন ক্যাশ-কাউন্টারে এসেছে তখন দেখা দিল কার্তিক। কৌশিক জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার?

—আপনি পেমেন্টটা সেরে নিন, তারপর বলছি।

কৌশিক বিল মিটিয়ে এসে দেখে খানা-কামরার বাইরে কার্তিক আর সুজাতা কথা বলছে। কৌশিক এগিয়ে আসতেই সুজাতা বললো, কার্তিক বলছে, বিকালে লোকাল-ট্রিপের একটি পার্টি ও যোগাড় করেছে। প্রফেসর অ্যান্ড মিসেস্ সেনগুপ্তা, আর তাঁদের নাতনি। তার মানে, ন্যায্য যা ভাড়া হবে তার টু-ফিফ্থ্ আমাদের দিতে হবে। বিকাল সাড়ে চারটের সময় বের হতে হবে। তুমি কী বল?

—বাই অল মিন্স্। আমরা নিশ্চয় যাব। তার আগে একটু ওঁদের সঙ্গে প্রাথমিক আলাপ সেরে নিলে ভালো হয়। ওঁরা কত নম্বর ঘরে আছেন?

সুজাতা কার্তিকের দিকে তাকায়। সে বলে, ওঁরা আছেন তো তিনতলার একটি ঘরে; কিন্তু আপাতত তিনজনেই লাঞ্চ সেরে বসে আছেন লাউঞ্জে—টি.ভি. দেখছেন। আসুন না?

ওরা তিনজনে এগিয়ে যায়। কার্তিক প্রফেসর সেনগুপ্তকে বলে, এই এঁদের দুজনের কথাই বলছিলাম, স্যার।

বৃদ্ধ প্রফেসর সেনগুপ্ত একেবারে সোফা থেকে উঠে দাঁড়ান। যুক্তকরে এদের দুজনকে নমস্কার করে বলেন, আমরা এসেছি প্রায় দিন-সাতেক। রোজই পায়ে হেঁটে বেড়াই। আজ ভাবছি, হোটেলের গাড়িটা নিয়ে ঘাটশিলায় বিভূতিবাবুর বাড়িটা দেখে আসব। তা আপনারা দুজন...?

কৌশিক বললে, আমার নাম কৌশিক মিত্র, এ আমার স্ত্রী, সুজাতা। আপনার নাম তো জেনেছি প্রফেসরসাহেব, এবং মিসেস্ সেনগুপ্তার পরিচয়টাও পেয়েছি...

ওপাশ থেকে একটি কুড়ি-বাইশ বছরের সালোয়ার-কামিজ পরা মেয়ে কৌশিকের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, বাকি যে রইল তার নামটা হচ্ছে টুকাই। সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী!

সুজাতা বললে, টুকাই তো ডাকনাম, ভালো নামটা?

টুকাই বললে, দিদা যদি মিসেস্ সেনগুপ্তার পরিচয়ে একটি সন্ধে পাড়ি দিতে পারেন—ভালোমন্দ নাম ছাড়াই—তাহলে আমিই বা ছাড় পাব না কেন?

কৌশিকের লক্ষ্য হলো, টুকাই-এর বামচক্ষুটি অদৃশ্য। সে বলে, কিন্তু একটি সন্ধেতেই আমাদের যোগাযোগটা শেষ হয়ে যাবে এমন কথা কেন মনে করছ, টুকাই? কাল সকালে...

—পাখি উড়ে যাবে—ফুরুৎ! কাল সক্কালেই আমরা চেক-আউট করব।

প্রফেসরসাহেব তাঁর মানিব্যাগ খুলে একটি কার্ড বাড়িয়ে ধরে বলেন, কিন্তু পাখি তো শেষমেশ তার সাবেক দাঁড়ে গিয়ে বসবে? সুতরাং যোগাযোগটা শেষ না হবার সম্ভাবনাই বেশি।

মিসেস্ বলেন, তাছাড়া তুই নিশ্চয়ই আজ সন্ধেয় কিছু ছবি তুলবি—সেগুলোও তো সুজাতাদের পাঠাতে হবে? না কী?

সুজাতা তার লেডিজ ব্যাগ খুলে ওদের যৌথ-নামাঙ্কিত একটি বিজনেস্ কার্ড বার করে দেয়।

দেখে নিয়ে প্রফেসর বলেন, 'সুকৌশলী'? নামটা যেন চেনা-চেনা লাগছে!

টুকাই জানতে চায়, কাঁটা-সিরিজের সুকৌশলী নাকি? হ্যাঁ তাই তো হবে। আপনারা 'মেড-ফর-ইচ আদার'—কৌশিক আর সুজাতা।

সবাই হেসে ওঠে।

টুকাই বলে, আমি তাহলে আপনাকে এখনি একটা প্রবলেম দেব, কৌশিকদা। আপনি সল্যুশন করে দিন।

কৌশিক বলে, কিন্তু আমাকে তাহলে প্রফেশনাল ফি দিতে হবে। তোমার পুরো নামটা জানাতে হবে।

—অল রাইট! যদি সল্যুশনটা সল্‌ভ্ করে দিতে পারেন।

বলতে বলতেই টুকাই তার ভ্যানিটি ব্যাগটা খোলে। এক গোছা পোস্টকার্ড সাইজ রঙিন ফটোগ্রাফ থেকে বেছে নিয়ে, একখানা বাড়িয়ে ধরে বলে, বলুন দেখি, দাদুর পাশে ঐ যে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর নামটা কী?

কৌশিক ফটোগ্রাফখানা নিয়ে দেখল। সে যে চূড়ান্ত বিস্মিত হয়েছে তা তার মুখভঙ্গি দেখে বোঝা গেল না। নির্লিপ্তের মতো বললে, এটা আবার একটা সমস্যা নাকি? তোমার দাদুকে জিজ্ঞেস করলেই তো তিনি বলে দেবেন।

—না! দাদু গাড্ডু মেরেছেন। জানেন না। আমি জানি ; দাদু-দিদাকে বলেওছি কিন্তু ওঁরা বিশ্বাস করছেন না।

কৌশিক প্রফেসরের দিকে ফিরে বলে, কী স্যার? আপনি এঁকে চিনতে পারছেন না? ইনি তো নামকরা অভিনেতা : ইন্দ্রকুমার চৌধুরী।

টুকাই তার দাদুকে বললে, দেখলে?

কৌশিক বলে, টুকাই! এবার আমার প্রফেশনাল 'ফি'টা?

—অফ কোর্স! আমার পিতৃদত্ত নাম : সুচরিতা সেনগুপ্তা।

প্রফেসর বলেন, তাহলে আরও একটা সমস্যার পূরণ করে দিতে হবে আপনাকে—

—উঁ হুঁ হুঁ! 'আপনি' নয়, স্যার, 'তুমি'।

—অলরাইট। তুমি আর একটা সমস্যার সমাধান করে দাও। আমি না হয়, তোমার প্রফেশনাল ফি-টা অগ্রিম মিটিয়ে দিচ্ছি। দেবদুলাল সেনগুপ্ত ছাড়াও আমার আর একটা নাম আছে—পিতৃদত্ত নয়, ছাত্রদলদত্ত : ডি. ডি. এস!

সবাই হেসে ওঠে! কৌশিক জানতে চায়, বলুন স্যার, সমস্যাটা কী?

—ঐ ইন্দ্রকুমারের পার্মানেন্ট অ্যাড্রেসটা কী?

—এটা কি একটা সমস্যা? রিসেপশনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই তো তা জানতে পারবেন!

—না ভাই, কৌশিক। সে চেষ্টা করা হয়েছে। সেখানেও টুকাইয়ের দাদু গাড্ডু মেরেছেন। হোটেলের ম্যানেজার সবিনয়ে এবং সুদৃঢ়ভাবে জানিয়েছেন : হোটেল-এথিক্সে মানা আছে এক বোর্ডারের কথা অপর একজনকে বলা।

কৌশিকের সঙ্গে সুজাতার দৃষ্টি বিনিময় হলো। সুজাতা জানতে চায়, কিন্তু আপনিই বা ওঁর ঠিকানা জানবার জন্য এত উদ্‌গ্রীব কেন? মানছি, ইন্দ্রকুমার ব্যাচিলার, কিন্তু যতই লালটু-মার্কা চেহারা হোক, তিনি পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই। আপনার নাতজামাই হিসাবে তাকে মানাবে না।

টুকাই তার হাতে-ধরা ম্যাগাজিনটা দিয়ে সুজাতার হাঁটুতে একটা ছদ্মতাড়না করে।

দেবদুলাল বললেন, তাহলে গল্পটা খুলে বলতে হয়।

কার্তিক হঠাৎ বলে ওঠে, আমি চলি, স্যার। তাহলে ঐ কথাই রইলো। আমি সাড়ে-চারটের সময়ে গাড়ি লাগাব।

এতক্ষণে সকলের খেয়াল হলো—কার্তিক ওঁদের সম্মতির অপেক্ষায় অদূরে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। প্রফেসার বললেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে কার্তিক । বিকাল সাড়ে-চারটে।

দেবদুলাল বিস্তারিত জানালেন তাঁর ইন্দ্রকুমার সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা। সাত দিনের জন্য 'সুবর্ণরেখা হোটেল' বুক করে উনি এসেছেন গত সোমবার, ত্রিশে অক্টোবর সকালে। ইস্পাতে। ট্রেন ঠিক সময়েই এসেছিল। সকাল দশটায়। উনি কলকাতা থেকেই হোটেলের গাড়িটা বুক করেছিলেন। কার্তিক স্টেশনে ছিল। একই ট্রেনে হোটেলে আগমনেচ্ছু আর একটি দম্পতি ছিলেন—অবাঙালী। পাঁচজনকে নিয়ে কার্তিক হোটেলের প্রবেশদ্বারের সামনে গাড়িটা পার্ক করা মাত্র ঐ ভদ্রলোক বারান্দা থেকে ছুটে এসে কার্তিককে ধমকে উঠলেন : তোমার কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই! আমি তোমাকে কটার সময় বুক করেছিলাম?

কার্তিক বলেছিল, কার্লা-হাওড়া এক্সপ্রেস ধরবেন তো, স্যার? মাসে পঁচিশ দিন সেটা লেটে আসে। ধরা যাক আজ তা এল না। তাতেই বা কী? আপনার ট্রেন ছাড়বে—রাইট-টাইম এগারোটা সাতাশ। এখনো পাক্কা এক ঘণ্টা সময় আছে। রিজার্ভেশন তো করানোই আছে। ঘাবড়াচ্ছেন কেন? এখান থেকে ঘাটশিলা স্টেশন তো বাইশ মিনিটের জার্নি। আসুন স্যার, উঠে বসুন।

ভদ্রলোক তবু গোঁজ-গোঁজ করতে থাকেন। ডিকি থেকে এঁদের মালপত্র নামাবার সময়টা পর্যন্ত যেন দিতে চান না। এর মধ্যে টুকাই বেমক্কা ওঁকে প্রশ্ন করে বসল, আপনাকে আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে! কোথায় বলুন তো?

ভদ্রলোক হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, সেটা আমার দুর্ভাগ্য! আমি সর্বত্র বিরাজমান। আমার নাম হরিদাস পাল!

গল্পটা থামিয়ে সুজাতা টুকাইকে বললে, এর জবাবে তুমি ওঁকে কিচ্ছু বললে না?

—না, সুজাতাদি! আমি চাইনি, ইন্দ্রকুমার তার বদমেজাজের জন্য ট্রেনটা মিস্ করুক। আমি ওকে ঠিকই চিনতে পেরেছিলাম। তাই ক্লিক করে এই ছবিটা তুলে নিলাম।

ইন্দ্রকুমার খেপে আগুন : এ কি! আপনি পার্মিশন না নিয়ে, আমার ছবি তুললেন কেন?

টুকাই জবাবে বলেছিল, আপনি ভুল করছেন মিস্টার হরিদাস পালমশাই! আমি দাদুর ফটো নিয়েছি—তিনিই আমার এ শটের হিরো ; আপনি ইন্‌সিডেন্টালি ফ্রেমে আছেন, এই যা—অ্যাজ একস্ট্রা! ফিল্মি-লব্‌জ্ বোঝেন তো মিস্টার হরিদাস পাল?

—তারপর, তারপর?—সুজাতা সোৎসাহে জানতে চায়।

—ওর ট্রেন ধরার তাড়া ছিল। ঝগড়া করার টাইম নেই। নিরুপায় গাড়িতে উঠে বসল মালপত্র সমেত. আর কার্তিক হুস্ করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। দাদু আমাকে বললেন, তুই বেমক্কা হরিদাসবাবুর ফটো নিলি কেন? তখন আমি দাদুকে বুঝিয়ে বললাম, ও 'হরিদাস পাল' থোড়াই। ও একজন অভিনেতা—ইন্দ্রকুমার চৌধুরী। তাই ধরাকে সরা জ্ঞান করে। তা দাদু বিশ্বাস করলো না।

কৌশিক জানতে চায়, কিন্তু সে ক্ষেত্রে ইন্দ্রকুমারের ঠিকানা জানার কী প্রয়োজন হলো?

দিদা এবার কথোপকথনে যোগ দেন, সে আর এক গল্প। ঘটনাচক্রে ঐ ইন্দ্রকুমারের সদ্য ছেড়ে যাওয়া ঘরখানাই আমাদের অ্যালট করা হয়েছিল। তিনতলায় দু-নম্বর ঘর। আমি বেতো রুগী, দোতলায় চেয়েছিলাম—কিন্তু দোতলায় কোনো ঘর খালি ছিল না। সে যাহোক, ঘরটা সাফা করার পর আমরা সেটা দখল করলাম। উনি হাতঘড়িটা খুলে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে রাখতে গিয়ে দেখেন সেখানে একটা ছোট্ট নোটবই।

প্রফেসার স্ত্রীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন. না, নোটবই ঠিক নয়—মিনি-টেলিফোন-রেকনার। এ-বি-সি-ডি করে পৃষ্ঠা সাজানো। তাতে দশ-বিশটি টেলিফোন নাম্বার লেখা। মনে হলো অধিকাংশ কলকাতার নম্বর। প্রথম পৃষ্ঠায় মালিকের নাম লেখা আছে—স্বাক্ষরের মতো

হস্তাক্ষরে: "ইন্দ্রকুমার"। এমনকি "চৌধুরী"ও লেখা নেই। কোনও ঠিকানার বালাই নেই। ইন্দ্রকুমারের এন্ট্রি নেই। হয় ভদ্রলোকের নিজস্ব টেলিফোন নেই, অথবা ইচ্ছে করেই সেটা লেখেননি। টুকাই বলছে যে, ভদ্রলোক অভিনেতা—নাম ইন্দ্রকুমার চৌধুরী। টেলিফোন নোটবইটা দেখার পর তা বিশ্বাস হলো। কিন্তু তাহলে তিনি কেন টুকাইকে বললেন যে, ওঁর নাম হরিদাস পাল?

টুকাই বাধা দিয়ে বলে ওঠে, বুঝলে না? স্রেফ ভেনগ্লোরিয়াসনেস্! চালবাজি! কেওকেটা ভাব!

প্রফেসর বললেন, হয়তো তাই। তা আমি সরলভাবে খাতাটা কাউন্টারে জমা দিতে চাইলাম। বাধা দিলেন টুকাইয়ের দিদা!

বাধা দিয়ে মিসেস্ সেনগুপ্তা বলেন, না! আমি না। টুকাই।

—তোমরা দুজনেই!

—তা বলতে পার। আমি টুকাইয়ের পক্ষ নিয়েছিলাম।

তারপর সুজাতার দিকে ফিরে বলেন, তুমিই বল, সুজাতা, কেন আমি টুকাইয়ের পক্ষ নেব না? ভদ্রলোক যেরকম অভদ্রতা করে গেলেন...

কৌশিক বলে, আপনার বক্তব্য স্ববিরোধী হয়ে যাচ্ছে দিদা! ভদ্রলোকেরা অভদ্রতা করে না। টুকাই, তুমিই বুঝিয়ে বল—

টুকাইয়ের বাঁ-দিকে একটা চুলের গোছা (সেটা, —হোক আমার রচনা 'স্ববিরোধী'—অতি সুবিন্যস্তভাবে অবিন্যস্ত। অর্থাৎ মাথা নাড়লেই চুলের গোছা বাঁ-চোখের উপর অসোয়াস্তিকর ভাবে ঝুলতে থাকে, চোখটা অদৃশ্য হয়ে যায়। আর টুকাই সেটা ক্রমাগত সরিয়ে দেয়) চোখের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে বললে, আমিই দাদুকে বললাম, খাতাখানা আমাকে দিতে। আমি চেয়েছিলাম রিসেপশন-কাউন্টার থেকে ইন্দ্রকুমারের ঠিকানাটা সংগ্রহ করে তাঁকে রেজিস্ট্রি-ডাকে ঐ ছোট্ট খাতাখানা ফেরত পাঠাতে। খামের উপর লেখা থাকবে ইন্দ্রকুমার চৌধুরীর নাম—পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের খাতিরে; আর ভিতরে থাকবে আর একখানা খাম 'শ্রীল শ্রীযুক্তবাবু হরিদাস পাল'-কে সম্বোধন করে। মিনি-টেলিফোন বুকের সঙ্গে থাকবে ঐ ফটোটা এবং কিছু উপদেশ : মঞ্চ থেকে নেমে আসার পর অভিনেতাদের কাছ থেকে কী জাতীয় ভদ্র ব্যবহার প্রত্যাশা করে সাধারণ দর্শক।

সুজাতা জানতে চায়, তার সঙ্গে তোমার নাম-ঠিকানা থাকবে না?

চুলের গোছা আবার সরিয়ে দিয়ে টুকাই বললো, না! অ্যান এম্ফাটিক : নো! আমি নাম-ঠিকানা জানালেই ঐ অভদ্র লোকটা ভাবত আমি এভাবে ওর সঙ্গে পত্রবন্ধুত্ব করতে লালায়িত। সে ইচ্ছা আমার আদৌ নেই।

কৌশিক জানতে চায়, তা রিসেপশন-কাউন্টারে ইন্দ্রকুমারের নাম-ঠিকানা পেলে না?

—না! পেলে আর কেন দাদু আপনাকে বলবেন সেটা যোগাড় করে দিতে? বলুন?

—তা ঠিক। তা রিসেপশনের ঐ ভদ্রলোক—প্রসূনবাবু কী বললেন?

—প্রসূনবাবু কি না জানি না—উনিই বোধহয় ম্যানেজার—টাক মাথা, বছর পঞ্চাশ বয়স, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা—তিনি বললেন, হোটেলের নিয়ম নেই এক বোর্ডারের নাম-ধাম-ঠিকানা তাঁর বিনা অনুমতিতে অন্য বোর্ডারকে জানানো।

সুজাতা জানতে চায়, সে-ক্ষেত্রে খাতাটা অফিসে জমা দিলে না কেন?

—কেন দেব? অত সহজে আমি হার মানবার পাত্রী নই। আমি জানি, ইন্দ্রকুমার এখন

'নটরঙ্গ' পাবলিক স্টেজে অভিনয় করে। সেখানে গিয়ে ওরা ঠিকানা সংগ্রহ করা কঠিন হবে না। সবাই তো আর প্রসূনবাবুর মতো নয়।

সুজাতা এবার বলে, তোমাকে এতক্ষণ বলিনি টুকাই—ইন্দ্রকুমার সম্পর্কে আমার দাদা হয়। ও কনফার্মড ব্যাচিলার! শ্যামপুকুরে থাকে। ওর বাড়িতে টেলিফোন নেই। তবে ওর ঠিকানা আমার অ্যাড্রেস-বইতে লেখা আছে।

টুকাই তার বামচক্ষু আবরিত-করা অলকগুচ্ছকে শাসন করে কৌশিকের দিকে ফিরে জানতে চায়, সত্যি?

কৌশিক বলে, ট্রুথ। বাট নট দ্য হোল ট্রুথ!

সুজাতা রুখে ওঠে, কী মিথ্যা বলেছি আমি?

—মিথ্যা বলনি। তবে অজ্ঞানে অসত্য বলেছ। ইন্দ্রকুমারের বয়স পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই, ইফ নট্ অন দ্য সিনিয়ার হাফ অব দ্য সেঞ্চুরি—কিন্তু সে 'কনফার্মড' ব্যাচিলার নয়। দু-দুজন মহিলা—আমার জ্ঞানমতে মাত্র দুইজনই—ইন্দ্রকুমারের সঙ্গে নীড় বাঁধায় উৎসাহী!

টুকাই বলে, তাহলে কলকাতায় ফিরে অ্যাড্রেস-বই দেখে ইন্দ্রকুমারের শ্যামপুকুরের পোস্টাল অ্যাড্রেসটা জানাবেন?

সুজাতা বললো, কলকাতা যেতে হবে না। 'পত্তা-কেতাব' আমার সঙ্গেই আছে। বিকালেই তোমাকে ইন্দ্রকুমারের ঠিকানাটা দিয়ে দেব...

কৌশিক পাদপূরণ করে,...একটি শর্তে।

—কী শর্ত?

—আমাদের প্রফেশনাল ফি দিতে হবে।

—এবার সেটা কী?

কৌশিক বললো, ঐ যে ফটোগ্রাফটা দেখালে—যাতে দেখা যাচ্ছে ইন্দ্রকুমার ডিকিতে মাল তুলছেন আর তোমার দাদু মাল নামাচ্ছেন—ঐ ফটোখানা আমাদের দিয়ে দিতে হবে। নেগেটিভ তো তোমার কাছে রইলই, তুমি আর এক কপি বানিয়ে নেবে।

—এ আর কী এমন শক্ত ব্যাপার, নিন্—

কুন্তলগুচ্ছ শাসনে এনে সে ফটোগ্রাফখানা বাড়িয়ে ধরে।

কৌশিক বলে, আরও একটু কৃত্য আছে টুকাই। ঐ ফটোর পিছনে লিখে দাও যে, 'এই ফটোখানা আমি সোমবার, 30.10.95-এ বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় গালুডির 'সুবর্ণরেখা' হোটেলের সামনে তুলেছিলাম। ছবিতে আমার দাদু প্রঃ ডি. ডি. সেনগুপ্ত এবং একজন বোর্ডারকে দেখা যাচ্ছে, যিনি বলেছিলেন তাঁর নাম হরিদাস পাল।'—এইটুকু লিখে সই করে দিতে হবে। ডেটেড সিগ্‌নেচার।

টুকাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। প্রফেসর সেনগুপ্ত বলেন, কেন বল তো? সেটা নিয়ে তুমি কী করবে?

কৌশিক বলে, আমি তো অন্যায় কিছু দাবি করিনি প্রফেসর সেনগুপ্ত। টুকাই তার জ্ঞানমতে যা সত্য বলে জানে তাই তো জানাচ্ছে।

প্রফেসর বলেন, বাট হোয়াই?

কৌশিক বললে, সচরাচর আমরা হাতের তাস দেখাই না। কিন্তু আপনাকে দেখাব। কথাটা গোপন রাখবেন। আমরা এখানে ঠিক বেড়াতে আসিনি; এসেছি একটা ইনভেস্টিগেশনে। আটাশে অক্টোবর হুগলিতে এক ভদ্রলোক খুন হয়েছেন। সে ভদ্রলোক

ইন্দ্রকুমারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। পুলিস হয়তো চাইবে ইন্দ্রকুমারকে আসামী হিসাবে খাড়া করতে। আমরা 'সুকৌশলী'র তরফে প্রমাণ সংগ্রহ করতে এসেছি যে, শনিবার আটাশে অক্টোবর ইন্দ্রকুমার ঘটনাস্থলের অনেক দূরে ছিলেন। তাঁর ব্যবহার ভদ্রজনোচিত হোক বা না হোক—এই বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি খুনী হতে পারেন না।

প্রফেসর শুধু বললেন, গুড গড! য়ু মিন ঐ ফটোগ্রাফটাই প্রমাণ দেবে ইন্দ্রকুমারের অ্যালেবাঈ?

—আমি তাই আশা করছি।

মিসেস্ সেনগুপ্তা বলেন, তার মানে টুকাইকে তোমরা সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চাইছ?

টুকাই দৃঢ় প্রতিবাদ করে, তাতে দোষ কী দিদা? একজন নির্দোষী মানুষকে বাঁচানোর দায়িত্ব তো প্রত্যেকেরই সামাজিক কর্তব্য। সেক্ষেত্রে ঐ টেলিফোনের মিনি বইটাও আপনি নিয়ে যেতে পারেন। দাদুকেও কাঠগড়ায় তুলে ব্যারিস্টার বাসুসাহেব প্রশ্ন করে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন যে, দাদু এটা সুবর্ণরেখা হোটেল 3/2 নম্বর ঘরে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে খুঁজে পায়। সেটাও ঐ সোমবার এগারোটা নাগাদ।

মিসেস্ সেনগুপ্তা মন খুলে বলেই ফেলেন, আমার বাপু এসব ভালো লাগছে না। এলাম বেড়াতে, তার মধ্যে ঢুকে পড়লো খুনখারাপি, আদালতের সমন।

প্রফেসর তাঁকে বললেন, দিস্ ইস্ লাইফ, রমা! ঠিকই বলেছে টুকাই—নিরপরাধীকে রক্ষা করা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব! সকালবেলা একগ্লাস নিমপাতার রস যে তুমি আমাকে দাও—সেটা কি স্বাদের আকর্ষণে পান করি আমি? শারীরধর্ম রক্ষার জন্য খাই। সমাজের শারীরধর্ম রক্ষার জন্য এইটুকু আমাদের করণীয়। ইয়েস ইয়ং ম্যান! আই এগ্রি! প্রয়োজনে আমরা দাদু-নাতনি সাক্ষী দেব যে, হুগলিতে যখন হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় তার দেড়-দু'দিন পরে ইন্দ্রকুমার গালুডি ছেড়ে কলকাতা-মুখো রওনা হন।

রাত্রে শুতে যাবার আগে ভালো পোশাকটা ছেড়ে সুজাতা একটা নাইটি পরেছে। নৈশ মুখপ্রক্ষালনও শেষ হয়েছে। মুখে কী-একটা ক্রিম মাখতে মাখতে বললো, বাব্বা! এতক্ষণে সব সমস্যার সমাধান হলো। মানে, যে মিশন নিয়ে এসেছি। নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে ইন্দ্রকুমার টুকাইয়ের সঙ্গে যতই দুর্ব্যবহার করে থাক, চুঁচুড়ার হত্যাকাণ্ড থেকে সে শতহস্ত দূরে।

কৌশিক বললে, একটা কথা সুজাতা! তুমি ঐ কথাটা বরাবর আমার কাছ থেকে গোপন রেখেছিলে কেন বলত?

—কোন কথাটা?

—ইন্দ্রকুমার টেলিফোন করে তোমাকে জানিয়েছিল যে, সে এই হোটেলে একটা ছোট্ট নোটবই—টেলিফোন-রেকনার—ফেলে গেছিল?

সুজাতা এদিকে ঘুরে কৌশিকের মুখোমুখি বসে। এক গাল হেসে বলে. এটা এত শক্ত প্রবলেম যে, সুকৌশলীর সিনিয়র পার্টনারের মাথায় ঢুকবে না। ...এই না, না, রাগ কর না—শোন বুঝিয়ে বলি। এককথায়: গালুডিতে এসে আমি না 'অলীকবিবি' হয়ে গেছি!

—কী হয়ে গেছ? 'অলীকবিবি'? তার মানে?

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীকবাবু'কে মনে আছে? গুলসম্রাট অলীকবাবু? সে ইচ্ছামতে একের পর এক গুল মারত, আর চোখের সামনে দেখত, তার গুলগুলো সত্যি হয়ে গেছে অলীকবাবু এক লক্ষপতি মারোয়াড়ির নামে গুল ঝাড়ল. তৎক্ষণাৎ স্টেজে এক মারোয়াড়ি

হাজির: 'আগে কাম, পিছে সেলাম—উঁ উঁ উঁ!' অলীকবাবু চীনেম্যানের কথা বললো : তৎক্ষণাৎ চ্যাঙ-চুঙ চীনেম্যান স্টেজে হাজির!

—তার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক?

—বেলবয়ের সঙ্গে আর ম্যানেজারের সঙ্গে খেজুরে-আলাপ জমাতে হবে বলে আমি একটা নির্ভেজাল খাঁটি গুল ঝাড়লাম : ইন্দ্রদা আমাকে বলেছে, সে একটা ছোট পকেট-রেকনার এই হোটেলে ফেলে রেখে গেছে। স্রেফ মিথ্যে কথা। গুল! আর এই 'অলীকবিবি'র গালে একটা থাপ্পড় মেরে প্রফেসর ডি. ডি. এস. বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি। এইতো সেটা!' কী অদ্ভুত কাকতালীয় কাণ্ড বল তো?

—তার মানে, ইন্দ্রকুমার যে সত্যিই একটা নোটবই ফেলে গেছেন তা তুমি জানতে না? গুল মেরেছিলে?

—না তো বলছি কি? খবরটা জানা থাকলে কি আমি তোমার কাছেও গোপন করব?

—তা বটে!

পরদিন ওরা হাওড়া থেকে ট্যাক্সি নিয়ে যখন নিউ আলিপুর এসে পৌঁছলো তখন রাত সাড়ে দশ। বেল বাজাতে, ম্যাজিক আই দিয়ে ভালো করে দেখে নিয়ে বিশে সদর খুলে দিল।

কৌশিক বলে, কি রে বিশে? মামা-মামী শুয়ে পড়েছেন?

—না তো! ঘরে বসে গপ্পোসপ্পো করছেন আর কি। সাহেব আজ সেইটা বার করেছেন—হাতের মুদ্রায় শ্যিভাস-রিগ্যালের বোতলটা দেখায়।

সুজাতা বলে, তুই খেয়ে নিয়েছিস্?

—না। এইবার খাব। আপনারা?

—আমার রাতে খেয়ে এসেছি। মামিমাকে বলে দিস...

করিডোরের ও-প্রান্তে একটা সুইচ জ্বলে ওঠে। হুইল-চেয়ারে পাক মেরে রানু এগিয়ে আসেন। বলেন, এই তো! এসে গেছ তোমরা। রাতের খাবার ফ্রিজে রাখা আছে। বিশে শুধু গরম করে দেবে।

কৌশিক বলে, না মামিমা, আমরা রাতের খাবার ট্রেনেই খেয়ে এসেছি। হোটেল থেকে প্যাকেট দিয়েছিল। ফ্রিজে যা আছে তা কাল সকালে সদ্ব্যবহার করা যাবে। মামু কি শুয়ে পড়েছেন?

—না। তাঁর থার্ড পেগ চলছে। তোমরা গিয়ে প্রাথমিক রিপোর্টটা দাখিল কর, দেখি সেই মওকায় হাতসাফাই করে বোতলটা সরিয়ে ফেলতে পারি কি না। এস তোমরা।

তিনজনে এগিয়ে আসেন বাসুসাহেবের ঘরে। উনি একটা ইজিচেয়ারে লম্বমান। পাশে টি-পয়তে গ্লাস-বোতল-জল-আইস কিউব।

সুজাতা-কৌশিক এদিক থেকে প্রাচীন ভারতীয় শালীনতা মেনে চলে। মাত্র দু-দিনের জন্যে কলকাতার বাইরে গিয়েছিল। কিন্তু এগিয়ে এসে দুজনেই বাসুসাহেবকে প্রণাম করলো। মামীকেও।

বাসু বললেন, এই যে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস্ সুকৌশলী! আপনারা দুজন যে নিরাপদে ফিরে আসতে পেরেছেন এতেই আমরা ধন্য।

বোঝা গেল, তিন পেগেই বাসুমামুর নেশাটা জমজমাট।

রানু ইতিমধ্যে কায়দা করে হুইল-চেয়ারটা টি-পায়ের ওপাশে ভিড়িয়ে বড় বোতলটা

দখল করেছেন। বলেন, ওদের কাছ থেকে প্রাথমিক রিপোর্টটা শুনে নিয়ে 'লেটস্ কল ইট এ ডে'! বিস্তারিত রিপোর্ট কাল শুনো!

—তা না হয় শুনব। কিন্তু তুমি... মানে, ইয়ে...ওটা নিয়ে যাচ্ছ কেন?

বোতলটা সুজাতাকে হস্তান্তরিত করে রানু বলেন, তোমার বরাদ্দ মতো দু-পেগ শেষ করে একটা এক্সট্রা পেগও হয়ে গেছে। আর নয়!

প্রসঙ্গটা চাপা দিতে কৌশিক বলে, আমাদের মিশন সাক্সেস্ফুল। বুঝলেন মামু?

—রিয়েলি! কী মিশন নিয়ে তোমরা ঘাটশিলা গেস্লে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস্ সুকৌশলী?

—বাঃ! আপনার মনে নেই? ঘোষাল-হত্যা মামলায় চার-চারজন সম্ভাব্য অপরাধীর কথা আপনি ভাবছিলেন—ব্রজবাবু, ইন্দ্রকুমার, অ্যাগি আর ডঃ দাশ। তাই ইন্দ্রকুমারের অ্যালেবাঈটা যাচাই করে দেখতে আমাদের দুজনকে গালুডি পাঠিয়েছিলেন। দ্যাট চ্যাপটার ইজ ক্লোজড। ইন্দ্রকুমার ঐ চারটি সম্ভাব্য কাঁটার ভিতর থেকে সমূলে উৎপাটিত—

—কী? কী বললে? কিসের থেকে?

—সম্ভাব্য কণ্টক। কাঁটা—

কোথাও কিছু নেই, ব্যারিস্টারসাহেব একেবারে দুর্বাসা মুনি: তোমরা কি আমাকে একটুক্ষণও শান্তিতে থাকতে দেবে না, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস্ সুকৌশলী! মধ্যরাত্রে একা একা বসে মৌজ করছি, এখানেও সেই কাঁটা? কী পেয়েছ তোমরা? অ্যাঁ? ডাইনে কাঁটা, বাঁয়ে কাঁটা, হেঁটোয় কাঁটা, মুড়োয় কাঁটা! শুধু কাঁটা আর কাঁটা! একটা শেষ হতে না হতেই আর একটা! তাহলে সকল কাঁটা ধন্য করে জোলাপটা কখন ফুটবে? অ্যাঁ? আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন মিস্টার অ্যান্ড মিসেস্ সুকৌশলী?

রানু কৌশিককে আস্তিন ধরে টানলেন। ওদের ইঙ্গিত করলেন কেটে পড়তে।

তাই পড়লো ওরা। নিঃশব্দে। পা টিপে টিপে। বাসু ক্লান্ত হয়ে আবার ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়েছেন। তাঁর চোখ দুটি বোজা।

সুজাতা ফিস্ফিস্ করে রানুকে বলে, মামা কি আজ একেবারে আউট? জোলাপের কথা কী যেন বললেন, মামু?

রানু হাসলেন। বললেন, উনি না হয় তিন পেগের পর কথাটা মুখ ফস্কে বলে ফেলেছেন। কিন্তু তোমরা দুজন তো মদ্যপান করনি। বুঝতে পার না—উনি 'জোলাপের'র কথা বলছেন না? বলছেন : 'গোলাপ'-এর কথা!

সুজাতা অবাক হয়ে বলে, গোলাপ! মানে?

রানু বললেন. গোলাপ একটা ফুলের নাম, সুজাতা। তুমি ভুলে গেছ। একটু চেষ্টা করে দেখ. মনে পড়ে যাবে। এখন যাও, শুয়ে পড়।

—কিন্তু মামু যে—

—ভবের ভ্রূকুটির ভাবনাটা ভবানীকেই ভাবতে দাও, সুজাতা! তোমরা দুজন বরং ভেবে দেখ গোলাপের কথা আজ এতদিন পরে হঠাৎ কেন বললেন উনি। কাঁটা নয়—গোলাপ!

boiRboi.net

ষোলো

সাত তারিখে, মঙ্গলবার। অর্থাৎ কৌশিক-সুজাতা যে রাত্রে ঘাটশিলা থেকে ফিরে আসে তার দু-দিন পরের কথা। সকালের দিকেই একটা টেলিফোন এল। ধরলেন রানু। ওপ্রান্ত থেকে কথা বলছে অনুরাধা বসু : বাসুসাহেব আছেন?

রানু লাইনটা চেম্বারের এক্সটেনশনে দিয়ে দিলেন।

বাসু বললেন, হ্যাঁ বল, অনুরাধা? তুমি আমাকে খুঁজছ? বিষয়টা কি ঘোষালের মৃত্যু-সংক্রান্ত?

—আজ্ঞে না। সমস্যাটা আমার নিজের। একটু আইন বিষয়ে পরামর্শের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমার সামান্য উপার্জনে—

বাসু ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেন, এসব কী বলছ, অনু? মেসোমশায়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে পয়সা খরচ করতে হয় নাকি? তুমি কোথা থেকে ফোন করছ? তোমার বাড়িতে টেলিফোন আছে?

—আজ্ঞে না, নেই। আমি ফোন করছি আমার বাসাবাড়ির কাছাকাছি একটা টেলিফোন বুথ থেকে।

—কলকাতার কোন অঞ্চলে থাক তুমি?

—মদন বড়াল লেনে। বউবাজার অঞ্চলে।

—ঠিক আছে। তুমি চলে এস। আমি ফ্রি আছি। বাসে আসবে তো? নিউ আলিপুরে আসার সরাসরি বাস আছে?

—সেসব আপনাকে ভাবতে হবে না, মেসোমশাই। আপনার বাড়ি আমি চিনি। মিনিট দশ-পনের সময় আপনার নষ্ট করব। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে আসছি।

—এস। —লাইনটা কেটে দিলেন বাসুসাহেব।

আটাশে অক্টোবর, শনিবার, ঘোষাল ডাক্তারের বাড়ির পার্টিতে অনুরাধা উপস্থিত ছিল। জয়ন্ত মহাপাত্রের সঙ্গে সে এক ট্রেনে যায়। ফিরে আসে পরদিন ছায়া পালিতের গাড়িতে। বাসুসাহেব তার জবানবন্দি পড়েছেন। তার সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন বোধ করেননি। এখন সে নিজে থেকেই ফোন করছে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে হাজির। সরাসরি তার সমস্যার কথায় এল অনুরাধা :

সে 'নটরঙ্গ' ছেড়ে দিচ্ছে। ওর সঙ্গে ব্রজদুলালের যে কন্ট্রাক্ট ছিল তাতে কোনও নাটক চলাকালে—যে নাটকে ওর পার্ট করছে—ও নটরঙ্গ ত্যাগ করতে পারে না। সেক্ষেত্রে ওকে মোটা খেসারত দিতে হবে। কিন্তু এখন যেহেতু কোনও নাটক চালু নেই—দু-পক্ষই পনের দিনের নোটিশে কন্ট্রাক্টে সমাপ্তিরেখা টানতে পারে। অনুরাধা এই সপ্তাহেই নটরঙ্গকে নোটিশ দিয়েছে—সে আর ঐ পাবলিক-বোর্ডে অভিনয় করবে না। হেতুটাও সে অকপটে স্বীকার করলো : ব্রজদুলাল আগামী নাটক 'প্রবঞ্চক'-এ অনুরাধাকে দিয়েছেন সহনায়িকার ছোট চরিত্র এবং সুভদ্রাকে নায়িকার। অনুরাধা সেটা মেনে নিতে পারছে না। সুভদ্রা নভিস, অনুরাধা দীর্ঘদিনের মঞ্চসফল নায়িকা। সে অপমানিত বোধ করেছে।

বাসু জানতে চান : তাহলে কী করবে এবার?

—যাত্রায় যাব। তিন-চারটি যাত্রা-পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছি। যার অফার সবচেয়ে ভালো মনে হবে সেখানেই যাব। না—মেসোমশাই, সেসব নিয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে আসিনি। এসব ব্যাপার আমাদের জলভাত! যাত্রা-থিয়েটার-সিনেমার চুক্তিগুলো।

—তাহলে কিসের পরামর্শ চাইতে এসেছ আমার কাছে?

অনুরাধা সঙ্কোচ করে না। জানে, ডাক্তার আর উকিলের কাছে সত্যগোপন করলে নিজেরই ক্ষতি। তাই অকপটে সে সব কথা স্বীকার করে। অনুরাধার বয়স বর্তমানে ছেচল্লিশ। মদন বড়াল লেনের ঐ বাড়িটায় সে ভাড়া আছে ত্রিশ বছর ধরে। পঁয়ষট্টি সালে ঐ দু-কামরার বাড়িটা ইন্দ্রকুমার ভাড়া নিয়েছিল আশি টাকা ভাড়ায়। বাড়িওয়ালাকে বলেছিল, বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে সে ভালোবেসে বিয়ে করেছে, মাথা গোঁজার ঠাঁই পাচ্ছে না। বাড়িওয়ালা প্রথমে রাজি হয়নি ; কিন্তু পরে ইন্দ্রকুমারের সদ্যোবিবাহিতা বধূকে দেখে রাজি হয়ে যায়! স্বামী-স্ত্রী পরিচয়েই ওরা থাকত, ঐ বাড়িতে। বাড়িঅলা একাত্তর সালে মারা যান। তিনি এই বিশ্বাস নিয়েই প্রয়াত হয়েছিলেন যে, ইন্দ্র আর অনু স্বামী-স্ত্রী। তারপর ইন্দ্র বোধকরি মোহমুক্ত হয়—শ্যামপুকুরে বাসা ভাড়া করে উঠে যায়। বাড়িওয়ালার বিধবা অনুকে মেয়ের মতো ভালোবাসতেন যদিও ভাড়াটের নাম ইন্দ্রকুমার চৌধুরী তবু ইন্দ্রকুমার ও বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর থেকে তিনি অনুরাধাদেবীর নামেই বরাবর রসিদ কেটে গেছেন। সম্প্রতি সেই ভদ্রমহিলাও গত হয়েছেন। তাঁর দুই ছেলে—তারা জানে যে, অনুরাধা ইন্দ্রকুমারের বৈধ স্ত্রী নয়—এখন ভাড়াটে উচ্ছেদের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। অনু জানতে চায়—তার কী করণীয়? কতটা তার অধিকার?

বাসু বলেন—তুমি কি মাস-মাস ভাড়া দিয়ে রসিদ নিচ্ছ?

—হ্যাঁ। মাসিমা মারা যাবার পর ওরা ভাড়া নিতে অস্বীকার করায়, রেন্ট-কন্ট্রোলে জমা দিচ্ছি। মাসিক আশি টাকা। ওরা আমার ইলেকট্রিক লাইন কেটে দিয়েছে। রাস্তার মাঝখানে জামাকাপড় খুলে নেবে বলে ক্রমাগত শাসাচ্ছে।

—ইন্দ্র কী বলছে?

—সে আবার কী বলবে? নতুন 'গুড়িয়া' পেয়ে সে তো আপনমনে পুতুলখেলায় মেতেছে। সে তো একা থাকে, শ্যামপুকুরে।

—বুঝলাম। তুমি নির্ভাবনায় থাক, অনু। আমি পুলিসের এক বড়কর্তাকে বলে দেব। পুলিস বাড়িওয়ালার দুই ছেলেকে থানায় ডেকে পাঠাবে। আচ্ছা করে কড়কে দেবে। তুমি একটা কাগজে ওদের নাম, বয়স, বাপের নাম, ঠিকানা সব লিখে দিয়ে যাও। ওরা কোনোরকম চ্যাংড়ামো করলেই আমাকে টেলিফোন করবে। তবে, ঐ আশি টাকা ভাড়াটা বাড়িয়ে নিজে থেকেই তুমি ওটা একশ টাকা করে দিও। যাত্রায় গেলে সেটা তোমার পক্ষে অসম্ভব হবে না নিশ্চয়।

—আজ্ঞে না। একশ তো হওয়াই উচিত। ও পাড়ায় এখন ঐ রকম একটা ফ্ল্যাট সাত-আটশ টাকাতেও পাওয়া যাবে না।

বাসু বলেন, একটা কথা অনুরাধা। ইন্দ্রের সঙ্গে তোমার কতদিনের পরিচয়?

—ঐ ত্রিশ-বত্রিশ বছরই হবে। আমার বয়স তখন পনের-ষোলো। ওই আমাকে এ লাইনে নিয়ে আসে।

—ইন্দ্র কতদূর লেখাপড়া জানে? কদ্দূর পড়েছে ও?

—থার্ড ডিভিশনের ম্যাট্রিক। তারপর আর পড়েনি। কলেজে ফার্স্ট-ইয়ারে ভর্তিও হয়েছিল—কিন্তু পড়াশোনা চালাতে পারেনি। স্কুলে থাকতেই একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে বিয়ে করে। বাড়ি ছেড়ে পালায়।

—বিয়ে করে? বল কী! তুমি কী করে জানলে?

—ইন্দ্র নিজেই গল্প করেছিল। ওর বিবাহিত জীবন মাত্র দু বছরের। সন্তান হতে গিয়ে ওর বউ মারা যায়। সন্তানটাও বাঁচেনি। তার পরেই আমার সঙ্গে আলাপ। আমরা থিয়েটারে নামি।

বাসু বলেন, ওর সেই বউকে তুমি নিশ্চয় দেখনি, কিন্তু তার কোনও ফটোগ্রাফ দেখেছ?

—দেখেছি। তবে আমার কাছে নেই। ইন্দ্রর অ্যালবামে আছে।

—তুমি ওর ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটটা দেখেছ, অনু?

—না! কেন বলুন তো?

—তবে কেমন করে জানলে যে, সে ম্যাট্রিক পাস?

—ও নিজেই বলেছিল। অনেকদিন আগে। কেন বলুন তো?

—ঠিক আছে। তুমি বরং এই কাগজখানায় আমাকে একটা চিঠি লেখ, তোমার সমস্যার কথা জানিয়ে। মানে, বাড়িওয়ালার দুই ছেলে তোমাকে কীভাবে শাসিয়েছে তা জানিয়ে। ঐ সঙ্গে ওদের নাম, বাবার নাম উল্লেখ কর।

অনুরাধা ইতস্তত করে বললো, তার চেয়ে এক কাজ করুন, মেসোমশাই। আপনি ধীরে ধীরে ডিক্‌টেশন দিন। আমি শুনে শুনে লিখে ফেলি। গুছিয়ে চিঠি লেখার অভ্যাস তো নেই!

—অলরাইট! লেখ তাহলে—

এরপর এলেন ব্রজদুলাল আর ইন্দ্রকুমার। নিজেদের গাড়িতে। অশোক ড্রাইভ করে আসেনি। নিয়ে এসেছে নটরঙ্গের পেশাদার ড্রাইভার। বাসু ওদের দুজনকেই আপ্যায়ন করে বসালেন। বললেন, বলুন কী খবর?

ব্রজদুলাল বলেন, সে কি, স্যার! লেটেস্ট খবর আপনি জানেন না?

—কী লেটেস্ট খবর? বিল শবরিয়া সংক্রান্ত, না পঞ্চাননের ধরা পড়ার খবর?

ইন্দ্র বলে, ওসব কিছু নয়। লেটেস্ট খবর হচ্ছে আজ ভোর রাতে আমাদের চারজনের বাড়িতে পুলিসের রেইড হলো যে। অবশ্য ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যেই রেহাই দিয়েছে।

বাসু জানতে চান, 'চারজন' মানে?

ইন্দ্রকুমার বলে, আমার, ব্রজদার, ওদিকে অ্যাগ্‌নেসের আর ডক্টর দাশের।

বাসু বলেন, ওঁদের দুজনের বাড়ি যে রেইড হয়েছে তা জানা গেল কীভাবে?

—কী করে আবার? টেলিফোন করে!

বাসু জানতে চাইলেন, পুলিস সার্চ-ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছিল তো?

ব্রজদুলাল বললেন, অফকোর্স! ইন্দ্র করেছে কি না জানি না, আমি আমার সাংবিধানিক অধিকার পুরোপুরি আদায় করে নিয়েছি। সার্চের আগে পুলিসদের সার্চ করে নিয়েছে।

মিসেস্ বাসু বলেন, কী খাবেন বলুন, চা না কফি?

ব্রজ বলেন, যা ঘোল খেয়েছি, আজ আর কিছু খাব না। তবে বাসুসাহেব অনুমতি করলে গাড়িতে আমার ভদ্‌কার একটা বোতল আছে—

বাসু কথাটা চাপা দিয়ে বললেন, পুলিসে কিছু 'সিজ' করেছে নাকি?

ব্রজ বলেন, করেছে। কিছু খাতাপত্র, ডায়েরি, নটরঙ্গের ফটো অ্যালবাম, আর আমার পাসপোর্টখানা।

বাসু জানতে চান, আপনি কি বছর দশকের মধ্যে জাকার্তা গিয়েছিলেন ব্রজবাবু?

—হ্যাঁ গিয়েছিলাম। বরবুদারের মন্দির দেখতে। কেন বলুন তো?

বাসু সেকথার জবাব না দিয়ে ইন্দ্রকুমারের দিকে ফিরে বললেন, তোমার কি কিছু 'সিজ' করেছে?

—হ্যাঁ, দু-একটা ডায়েরি। ফটো অ্যালবাম।

—পাসপোর্ট?

—না, সেটা দেখেছে। সিজ করেনি। দেখে, ফেরত দিয়েছে।

বাসু দুঃখপ্রকাশ করলেন : পুলিসের 'নেই কাজ তো খই ভাজ!'

ব্রজদুলাল বললেন, কিন্তু 'ভদ্‌কা'র ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত হলো?

বাসু বললেন, আমি খাব না। আপনারা দুজনে খেতে চান তো বলুন। আমি স্ন্যাকস্, বরফ ইত্যাদি আনিয়ে দিচ্ছি।

ইন্দ্র বলে, না, না, তাহলে আজ বরং থাক। দাদার যখন মুড নেই।

—সত্যিই মুড নেই, ইন্দ্র। নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পারছ—পুলিস এত লোক থাকতে কেন বেছে বেছে তোমাদের চারজনকে সার্চ করলো?

ব্রজদুলাল ইন্দ্রের হয়ে জবাবটা দাখিল করেন, পুলিসের ধারণা 'হারাধন'কে যে রেকমেন্ড করেছে, সে ঘোষালের খুব কাছের লোক ছিল—খুব বিশ্বাসী লোক।

ইন্দ্রকুমার বলে, অবভিয়াসলি। কিন্তু ঐ লোকটা—কী যেন নাম?—পচাই। সে এখনো ধরা পড়েনি?

বাসু বললেন, এখনো কোনো খবর নেই।

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠলো। বাসু তুলে নিয়ে শুনলেন। বললেন, এখন ব্যস্ত আছি। একটু পরে রিং-ব্যাক করব। টেলিফোনের কাছাকাছিই থেক।

ব্রজ আর ইন্দ্রের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো। শেষে ব্রজদুলাল বললেন, আজ তাহলে আমরা উঠি বাসুসাহেব। ঐ সার্চের খবরটা আপনাকে জানাতে এসেছিলাম। আর পাণ্ডেসাহেবের 'এথি'র ব্যাপারে আপনার পরামর্শটা জানতে চাই।

বাসু বললেন, সরি, ব্রজবাবু। ঐ 'এথি' বা 'পান-খাওয়ানোর' ব্যাপারটা আমি ভালো বুঝি না। সুকৌশলীর সঙ্গে কথা বলুন। ওরা বোধহয় ওদিকের উইং-এ ঘরেই আছে।

ওঁরা চলে যাবার পর বাসু ফোন করলেন চুঁচুড়ায়। অ্যাগিকে বললেন, ঐ সময় আমার ঘরে লোক ছিল বলে কথা বলতে পারিনি।

অ্যাগি বলেন, সেটা আন্দাজ করেছি। তা লেটেস্ট খবর শুনেছেন?

—হ্যাঁ, তোমার আর ডাক্তার দাশের বাড়ি সার্চ হওয়া তো? পুলিসে কি কিছু 'সিজ করেছে?

—না। আমি আপত্তি করেছিলাম। বলেছিলাম, সার্চ ওয়ারেন্টের কাগজে 'সিজ' করার কথা কিছু নেই। পুলিস জোর করে তা করলে একটা 'আন্ডারটেকিং' দিতে হবে যে, এই হাসপাতালের সমস্ত রোগীর জিম্মাদারী পুলিস নিচ্ছে। কারণ বিভিন্ন রেজিস্ট্রি ও ডায়েরিতে বিভিন্ন রোগীর কেস হিস্ট্রি লেখা আছে। তা শুনে ওরা কিছু সিজ করেনি।

—ভেরি গুড। তোমার পাসপোর্ট?

—হ্যাঁ, দেখতে চেয়েছিল। দেখে ফেরত দিয়ে গেছে। আচ্ছা, পাসপোর্ট দেখতে চাইল কেন?

—ঠিক জানি না। আন্দাজ করছি, পুলিস জানতে চায় তোমাদের চারজনের মধ্যে কেউ কখনো ইন্দোনেশিয়া গেছ কি না। তুমি গিয়েছিলে?

—না। আমি ক্রমশ হাল ছেড়ে দিচ্ছি, মিস্টার বাসু!

বাসু বললেন, আমি তোমার সঙ্গে একমত নই। আমার তো মনে হচ্ছে, আমরা ক্রমশ জাল গুটিয়ে আনতে পারছি। আমার বিশ্বাস, আর এক সপ্তাহের মধ্যেই মার্ডারার ধরা পড়বে।

—য়ু মিন পঞ্চানন ঘড়াই?

—নিশ্চয় নয়। পঞ্চানন তো একটা সীসের বল! যে লোকটা দূর থেকে ট্রিগারটা টেনেছে, আমি তার কথা বলছি।

—আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারছেন?

—তাই তো মনে হয়। কিন্তু টেলিফোনে এসব কথা আলোচনা করা ঠিক নয়। ডক্টর দাশের বাড়ি থেকে পুলিস কিছু সিজ করেছে?

—না। আপত্তিকর কিছু পায়নি। 'সিজ'ও করেনি।

—হতাশ হয়ে না, অ্যাগি। জাল ক্রমশ গুটিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

পরের সপ্তাহের কথা। ষোলো তারিখ, বৃহস্পতিবার। ইতিমধ্যে চিনসুরা থেকে যুগলকিশোরের একটা জরুরি কল এসেছিল। গুরুত্ব বুঝে রানু কলটা বাসুসাহেবের ঘরে ট্রান্সফার করে দিলেন। ইচ্ছে করলে তিনি এক্সটেনশনে ওদের কথোপকথন শুনতে পারতেন, কিন্তু শুনলেন না।

তার কিছুক্ষণ পরে বাসুসাহেব সবাইকে ওঁর চেম্বারে ডেকে পাঠালেন। সুজাতা-কৌশিক বাড়ির অপর অংশ থেকে এসে বসলো বাসুসাহেবের প্রাইভেট চেম্বারে। বিশ্বনাথ রইলো দ্বারপালের ভূমিকায়।

বাসু বললেন, পরিস্থিতি কিছুটা বদলে গেছে। মনে হচ্ছে আমরা যেভাবে অগ্রসর হচ্ছিলাম সে-ভাবে সমস্যার সমাধানে পৌঁছনো যাবে না। ইন্দ্রকুমারের অ্যালেবাঈটা যাচাই করা গেছে। তবু আমি তাকে সন্দেহ-তালিকার বাইরে রাখতে পারছি না। কারণ স্বহস্তে খুনটা তো করেছে পঞ্চানন। ফলে রিমোট কন্ট্রোলে কে কী করেছে বলা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে দু-দুটি মারাত্মক ডেভেলপ্‌মেন্ট হয়েছে। তা তোমরা জান না, আমি জানি। যুগল আমাকে টেলিফোনে জানিয়েছে। আমি সবার আগে তথ্যগুলো তোমাদের সামনে প্লেস করতে চাই। তারপর যুক্তি করে ঐ চারজনের বিরুদ্ধেই অপক্ষপাতে আমাদের সন্ধান করতে হবে। প্রথম খবর : ওড়িশা স্বরাষ্ট্র বিভাগ থেকে টেলেক্স করে পশ্চিমবঙ্গ স্বরাষ্ট্র বিভাগকে জানানো হয়েছে যে, অ্যাবে উইলিয়াম শবরিয়ার মৃত্যু হার্টফেল করে হয়নি। হয়েছে একটি তীব্র বিষের ক্রিয়ায়। সেই একই নিকোটিন-ডেরিভেটিভের অস্তিত্ব তার দেহে পাওয়া গেছে। সুতরাং মিলিয়ান-টু-ওয়ান চান্সও আর থাকল না যে, এ দুটি হত্যাকাণ্ড বিক্ষিপ্ত ঘটনা। দুজন পৃথক অপরাধীর সম্পর্ক-বিরহিত কাজ। কারণ ঐ নিকোটিন-ডেরিভেটিভ ভারতে দুষ্প্রাপ্য। সামান্য আমদানি করা হয় ইন্দোনেশিয়া থেকে, গবেষণামূলক কাজে।

সুজাতা বলে, তার অর্থ : আপনি যে চারজনকে প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করেছিলেন তা থেকে দুজনকে বাদ দিতে হয়। মিস্ অ্যাগনেস ডুরান্ট আর ডক্টর দাশ। তাঁরা অ্যাবে শবরিয়াকে চিনতেনই না।

কৌশিক বললে, সে বিচার করলে ইন্দ্রকুমারকেও বাদ দিতে হয়। তিনিও প্র্যাকটিক্যালি অ্যাবে শবরিয়াকে চিনতেন না। ঐ বারই পুরী গিয়ে প্রথম চিনলেন। বরং গুণবতী দেবীকে ইনক্লুড করতে হয়। কারণ তিনি দুজনকেই ভালোভাবে চিনতেন—

রানু বলেন, দুজনকে তো ব্রজবাবুও ভালোভাবে চিনতেন।

সুজাতা বলে, তা ঠিক। প্রথম কথা : পাসপোর্টে দেখা গেছে ব্রজবাবুই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি ইন্দোনেশিয়ায় গেছেন। দ্বিতীয় কথা : এটা চিন্তাই করা যায় না যে, গুণবতী মোহান্তি পঞ্চানন ঘড়াইকে রেকমেন্ড করেছিলেন, আর ডাক্তারবাবু সেটা বিনা-বিচারে মেনে নিয়েছিলেন।

রানু বাসুসাহেবকে বলেন, তুমি দুটো মারাত্মক ডেভেলপমেন্টের কথা বলেছ। একটা তো হলো। দ্বিতীয়টা কী?

—দ্বিতীয় খবরটাও যুগলকিশোরের সরবরাহ করা। পঞ্চানন ঘড়াই ধরা পড়েছে। বেগুসরাই স্টেশনে। বিহার সরকার তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিচ্ছে।

কৌশিক বলে, কিন্তু আমরা তো পাণ্ডেসাহেবকে দশ হাজার টাকার 'ইয়ে'টা—

—না! ইন্দ্রকুমারের বাল্যবন্ধু পাণ্ডেসাহেব ছাড়াও বিহার পুলিসে কিছু সৎলোক যে আছেন এটা তার প্রমাণ। পঞ্চানন আগামীকাল এসে যাবে। যুগল গাড়ি নিয়ে কাল বিকালে আসবে। আমাকে জেল হাজতে নিয়ে যাবে, পঞ্চাননকে জেরা করায় সাহায্য করতে।

রানু বলেন, মোটমাট পরিস্থিতিটা কী দাঁড়ালো?

বাসু বলেন, খুব ঘোরালো। আমাদের হাতে যথেষ্ট 'ডাটা' নেই, অথচ অনেকগুলো তথ্য আছে যার যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা নেই। ঐসব আপাত-অসঙ্গত 'ফ্যাক্ট'গুলোর বিষয়ে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করার আগে এ রহস্যের জট ছাড়ানো যাবে না।

সুজাতা বলে, কী কী অসঙ্গতি আপনি একে এক বলুন। আমরা নোট করি।

—**এক নম্বর** : গুণবতী মোহান্তি একটি ঘাঘু মহিলা। তিনি সবিশেষ অবগত আছেন যে, বিল শবরিয়ার দেহে বিষের অস্তিত্ব প্রমাণিত হলে তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে না। সে-ক্ষেত্রে তিনি এমন মরিয়া হয়ে ঐ মৃতদেহটা কবর থেকে ওঠানোতে আপত্তি করছেন কেন? কেন তাঁর মেয়ে বলে গেল এজন্য গুণবতী পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ করতে প্রস্তুত? কেঁচো খুঁড়তে কী সাপ বের হয়ে পড়ার ভয় করছেন মিসেস্ মোহান্তি?

—**দু নম্বর** : ঘোষাল পুরীতে আমাদের বলেছিল—ইন্দ্রকুমার তার সহপাঠী। দুজনে একই বছরে ম্যাট্রিক পাস করে এবং ইন্দ্র পাস করেছিল থার্ড ডিভিশনে। একথাটা অনুরাধা বোসের কাছেও ইন্দ্র স্বীকার করেছিল—আমি জানি। অথচ ইন্দ্র নিজে বলছে, সে নন্-ম্যাট্রিক। কেন? হোয়াই?

—**তিন নম্বর** : ডক্টর ঘোষাল অমন তাড়াহুড়া করে একটা পার্টি থ্রো করলো কার পরামর্শে? কী উদ্দেশ্যে? কেন সে বেছে বেছে পুরী-পার্টির সব কয়টি লোককে যোগাড় করার চেষ্টা করেছিল? তার আস্তিনের তলায় একটা 'মজারু' লুকনো ছিল—এ কথা সে টেলিফোনে ছায়া পালিতকে বলে। সেই 'মজারু'টা কী?

—**চার নম্বর** : অত্যন্ত দামী বিষের প্রয়োগে দু-দুটো মানুষ খুন হলো, কিন্তু কেউ কোনোভাবে লাভবান হলো না। তাহলে হত্যাকারীর মূল উদ্দেশ্যটা কী? 'মোটিভ'টা কী?

কৌশিক বলে, আচ্ছা মামু, এমন কি হতে পারে না যে, হত্যাকারী পুরীর পার্টিতে আসলে ডক্টর ঘোষালকেই হত্যা করতে চেয়েছিল। অ্যাবে শবরিয়া ভুল করে ঐ বিষের গ্লাসটা তুলে নেন?

বাসু বলেন, না কৌশিক, এমনটা ঘটতে পারে না। তুমি সেদিন ঘটনাস্থলে ছিলে না। আমি ছিলাম। সুজাতাও ছিল। তার নিশ্চয় মনে আছে, কী ভাবে ড্রিংসগুলো পরিবেশিত হচ্ছিলো। আমরা তেরজনে মিলে নাহোক ত্রিশ-চল্লিশ পেগ পান করেছি। তার ভিতর মাত্র একটিতে ছিল তরল মৃত্যু! কিন্তু পরিবেশকেরা ট্রেতে করে পাঁচ-সাতটি গ্লাস নিয়ে ঘুরছিল। ফলে এই ব্যবস্থাপনায় আততায়ী কিছুতেই নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট গ্লাস ধরিয়ে দিতে পারে না। আমাদের অনেকের স্পষ্ট মনে আছে যে, অ্যাবে শবরিয়া যখন ট্রে থেকে গ্লাসটা তুলে নেন তখন ঐ ট্রের ওপর চার-পাঁচটি গ্লাস ছিল। তিনি তা থেকে ইচ্ছা মতো একটা গ্লাস তুলে নেন। কেউ এখানে 'ফোর্সিং কার্ড'-এর ম্যাজিক দেখায়নি। আততায়ী যদি নিজেও আমাদের সঙ্গে পান

করে থাকে, তাহলে তার নিজের পক্ষে বিষপানে মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল সমান—যতটা ছিল শবরিয়ার, ইন্দ্রের, ব্রজবাবুর, আমার, বা ঘোষালের।

কৌশিক বলে, তাহলে তো খোঁজ নিয়ে জানতে হয়—কে কে সেদিন ড্রিংক করেনি।

—না, কৌশিক। ওভাবে হবে না। আততায়ী কীভাবে নিজেকে রক্ষা করেছে সেটাই শেষ কথা নয়। আমাদের বুঝে নিতে হবে, কে কোন উদ্দেশ্যে ত্রিশ-চল্লিশটা পানপাত্রের মধ্যে একটা তীব্র বিষের গ্লাস মিশিয়ে দিয়েছিল! কেন? হয়তো বিল শবরিয়াকে সে মারতে চায়নি—কিন্তু কোনো একজন তো মারা যাবেই! এটা কেন? নিজে সে মদ্যপান করে থাকতেও পারে। ট্রে থেকে গ্লাস না উঠিয়ে সরাসরি বোতল থেকে ঢেলে। অনেকেই সেভাবে সার্ভার্স টেবিলে গিয়ে পছন্দমতো কক্‌টেল বানিয়ে নিচ্ছিলেন। অন্তত হুইস্কির সঙ্গে সোডা ইচ্ছামতো মিশিয়ে নিয়ে এসে পান করছিলেন। সেভাবে সে মদ্যপান করেও বিষের গ্লাসটা এড়িয়ে যেতে পারে।

সুজাতা বলে, তাহলে আপনি কী করতে চান?

বাসু বলেন, 'সুকৌশলী'র মাধ্যমে দুটো তদন্ত আমাকে করাতে হবে। একটা হচ্ছে : বিল শবরিয়া সংক্রান্ত। কেন গুণবতী কেঁচো খুঁড়তে দিতে রাজি নয়? বস্তুত সাপটা কী? সেটা সরেজমিন তদন্ত করতে হলে তোমাদের দুজনকে যেতে হবে—পুরী, ভুবনেশ্বর, গুনপুর। কিন্তু সেটা হপ্তাখানেক পরে করাই বিধেয়। কারণ আমাদের দেখা দরকার বিল শবরিয়ার বিষপ্রয়োগে মৃত্যুর কথা জেনে ওড়িশার পুলিস কী করে। দ্বিতীয় তদন্তটা করতে হবে ধানবাদে : সমঝে নিতে হবে, কেন ডাক্তার ঘোষালের সঙ্গে ইন্দ্রকুমারের কথার মিল হলো না। ওরা কি সহপাঠী? বয়স ভাঁড়ানোর প্রয়োজনে সেটা ইন্দ্রকুমার অস্বীকার করতে পারে ; কিন্তু সে কেন আমাকে বললো যে, সে নন্-ম্যাট্রিক? অথচ বহুদিন পূর্বে অনুরাধাকে সে বলেছিল যে, সে ম্যাট্রিক পাস।

কৌশিক বলে, তার সঙ্গে এ হত্যারহস্যের কী সম্পর্ক?

—জানি না। তবে মনে হয়, এভাবে অসঙ্গতিগুলোর জট ছাড়াতে ছাড়াতেই আমরা সমাধানে পৌঁছব। সুতরাং সম্ভব হলে তোমরা দুজন আজই ধানবাদ রওনা হয়ে যাও। চিরাগোড়া বয়েজ স্কুলের রেকর্ড খতিয়ে দেখ। দেখ, ইন্দ্রকুমার অথবা শিবশঙ্করের বাল্য-কৈশোরের কোনও অনুদঘাটিত তথ্য সংগ্রহ করতে পার কিনা। প্রথম কথা, সঠিক জেনে এস : ইন্দ্রকুমার কি একষট্টি সালে থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাস করেছিল?

ধানবাদ স্টেশনে রিটায়ারিং রুমেই ওরা জায়গা পেয়ে গেল। যে-তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছে তাতে একটা দিনই যথেষ্ট। এতদিন পরে ঘোষাল বা ইন্দ্রকুমারের বাল্য-কৈশোরের কোনও তথ্য সংগ্রহ করা অসম্ভব। দুনিয়া অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। চিরাগোড়া বয়েজ স্কুলটা টিকে আছে কিনা সেটাই তো অজানা।

এরা ধানবাদে পৌঁছেছিল ভোরবেলা। রিটায়ারিং রুমে প্রাতঃকৃত্যাদি এবং স্নান সেরে সারাদিন মতো তৈরি হয়ে নিল। প্রথমেই পরদিন ফেরার জন্য কোনও মেল ট্রেনের দুটি বার্থ রিজার্ভ করলো। ঘটনাচক্রে ওয়েটিং লিস্টে থাকতে হলো না। একটা মিডল্, একটা আপার বার্থ পাওয়া গেল। এবার দুজনে রিকশা নিয়ে চললো চিরাগোড়া বয়েজ স্কুলে।

সৌভাগ্য ওদের। স্কুলটা জিন্দা। তার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবও সম্প্রতি হয়ে গেছে। ওরা যখন পৌঁছলো তখন বেলা প্রায় এগারোটা। হেডমাস্টারমশাই ঘরে একা বসে এক বাণ্ডিল পরীক্ষার খাতা দেখছিলেন। ওদের স্লিপ পেয়ে ডেকে পাঠালেন।

দুজন ঘরে ঢুকে হাত তুলে নমস্কার করলো। ভিজিটার্স চেয়ারে বসলো। হেডমাস্টারমশাই প্রৌঢ়। বললেন, কহিয়ে জী, হাউ ক্যানাই সার্ভ য়ু।

সুজাতা-কৌশিক স্থির করে এসেছিল যে, প্রথমেই তারা নিজেদের তাস বিছিয়ে দেবে। দিলও তাই। জানালো : ওরা একটি গোয়েন্দা-সংস্থার দুই পার্টনার। বঙ্গাল মুলুকে একজন জবরদস্ত ডাক্তার-সাব খুন হয়েছেন। তিনি এই চিরাগোড়া বয়েজ স্কুল থেকে তিনটে লেটার এবং ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ নিয়ে ম্যাট্রিক পাস করেন। উনিশশো একষট্টি সালে। অর্থাৎ চৌত্রিশ বছর আগে। ঘটনাচক্রে তাঁর এক বন্ধু—ইন্দ্রকুমার চৌধুরী—তিনিও এই স্কুলের ছাত্র—পুলিসের বিষনজরে পড়েছেন। পুলিস তাঁকে হত্যাকারী বলে চিহ্নিত করে যে কোনো সময়ে গ্রেপ্তার করতে পারে। ওরা দুজন তাই কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছে। ...না, না, হেডমাস্টারমশাইকে কোনো আদালতে সমন ধরানোর প্রশ্নই নেই। তবে স্কুল-রেজিস্টার ঘেঁটে ওরা জানতে চায় ঐ শিবশঙ্কর ঘোষাল আর ইন্দ্রকুমার চৌধুরী সহপাঠী ছিল কিনা, কে কবে ম্যাট্রিক পাস করেন ইত্যাদি।

হেডমাস্টারমশাই রাষ্ট্রভাষায় জানালেন যে, তিনি এই স্কুলে দীর্ঘদিন আছেন বটে, তবে যোগদান করেছেন উনিশশো একষট্টির অনেক পরে। 'খয়ের, ইস্‌মে কোই এতরাজ নেহি—আপনারা কাল সুবে আসুন, আমি খাতাপত্র দেখে রাখব।'

সুজাতা হাত দুটি জোড় করে হিন্দিতে বললো, মাস্টারসাব, আমরা জানতাম, আপনি এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রকে বাঁচাতে এটুকু নিশ্চয় করবেন। কিন্তু মুশকিল-কি-বাৎ ইয়ে হ্যায় কি আজই রাতের ট্রেনে আমরা বার্থ রিজার্ভ করেছি। কাইন্ডলি যদি মেহেরবানি করে...

প্রাক্তন ছাত্রকে ফাঁসির দাড়ি থেকে বাঁচাতে মাস্টারজী রাজি হলেন। শুরু হলো অন্বেষণ। দপ্তরি আর আর্দালি ধুলো-টুলো ঝেড়ে অনেক পুরাতন রেজিস্টার নিয়ে এসে জড়ো করলো হেডমাস্টারমশায়ের টেবিলের উপর। অনেক সন্ধান করে তিনি জানালেন : শিবশঙ্কর ঘোষাল একষট্টি সালে স্কুলের ভিতর ফার্স্ট হয়ে ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। সচ্ বাত! লেকিন তার সঙ্গে ইন্দ্রকুমার চৌধুরী নামে কেউ থার্ড ডিভিশনে পাস করেনি। সুজাতার সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি বাষট্টি থেকে সাতষট্টি পর্যন্ত পুরাতন রেজিস্টার ঘেঁটে দেখলেন কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা : ইন্দ্রকুমার চৌধুরী না-পাত্তা! ও নামে কোনো ছাত্র একষট্টি থেকে সাতষট্টির মধ্যে এই স্কুল থেকে পাস করেনি। তথ্যটা ওরা দুজন মেনে নিতে পারলো না—কারণ ঐ কয় বছরে ক্লাস সিক্স থেকে ক্লাস টেন-এর ক্লাস-রেজিস্টারের ভিতরেও কোনও ছাত্রের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেল না, যার নাম: ইন্দ্রকুমার চৌধুরী।

এটা কেমন করে হয়? দুজনেই মিথ্যা বলেছে? ঘোষাল যে সত্য বলেনি তার প্রমাণ তো হাতে-হাতে। উনিশশো একষট্টি সালে ঐ স্কুল থেকে বেয়াল্লিশজন ছাত্র পাস করেছিল। সাতজন প্রথম বিভাগে, নয় জন দ্বিতীয় এবং বাকি ছাব্বিশ জন তৃতীয় বিভাগে—ইন্দ্রকুমার চৌধুরীর নাম তার ভিতর নেই। ফেল-করা ছাত্রদলেও নেই। সিদ্ধান্ত : শিবশঙ্কর ঘোষাল সত্য কথা বলেনি। কিন্তু সেখানেই তদন্তটা শেষ হচ্ছে না—ইন্দ্রকুমার যদি তার চেয়ে পাঁচ বছর নিচের ক্লাসের ছাত্র হয় তাহলে তার নাম সেই ক্লাস-রেজিস্টারে নেই কেন?

কৌশিক বলে, সে আমলের কোনও শিক্ষক কি আছেন?

হেডমাস্টারমশাই হাসলেন, এ কী পাগলের মতো কথা! চৌত্রিশ বছর পরে তেমন লোক কি পাওয়া সম্ভব? লেকিন—

—লেকিন?

—অগর রামজী আপ্‌কো কিরপা করেঁ তো পতা মিল যায়েগা!

—বহ্ কৈসে?

মাস্টারসাব বললেন, এই স্কুলের এক অতিবৃদ্ধ হেডমাস্টারমশাই আজও জিন্দা আছেন। তিনি পঁচিশ বছর আগে রিটায়ার করেছেন। এখন বয়স আশির উপর। কিন্তু অসাধারণ তাঁর স্মৃতিশক্তি। আপনারা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটা শেষ চেষ্টা করতে পারেন। আমি ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। কিন্তু মধ্যাহ্নে—বেলা দুটো থেকে চারটে—তিনি বিশ্রাম করেন। নিদ্রা দেন, আর কি। আপনারা চারটের পর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। হয়তো নাম শুনেই—খাতাপত্র না দেখেই তিনি ইন্দ্রকুমার চৌধুরীকে চিনে ফেলবেন।

ওরা দুজনে ফিরে এল স্টেশনে। রেলওয়ে ক্যান্টিনে আহারাদি সেরে রিটায়ারিং রুমে বিশ্রাম নিল। বিকাল চারটে নাগাদ একটা অটো ধরে চললো শহরের অপর প্রান্তে—রিটায়ার্ড হেডমাস্টার পণ্ডিত রামনন্দন ত্রিবেদীজীর ডেরায়।

কড়া নাড়তে দ্বার খুলে দিল একটি তরুণী। বৃদ্ধের নাতনি। সে ওদের দুজনকে আপ্যায়ন করে বৈঠকখানায় বসালো। জানালো যে দাদাজীর দিবানিদ্রা ভেঙেছে। তিনি ইজিচেয়ারে শুয়ে অখবর পাঠ করছেন। তাঁকে সংবাদ দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ত্রিবেদীজী বরাম্‌ভন। এরা দুজন পাদস্পর্শ করে প্রণাম করলো। বৃদ্ধ হিন্দিতে জানতে চাইলেন: কী চান আপনারা?

সুজাতা দীর্ঘসময় ধরে তাদের আগমনের হেতুটা জানালো। ওরা এসেছে শিবশঙ্কর ঘোষাল আর ইন্দ্রকুমার চৌধুরীর সম্বন্দে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহে। স্কুলের রেজিস্টারে তারা কোনও সন্ধান পায়নি। তবে বর্তমান হেডমাস্টারমশায়ের কাছ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে ওরা ওঁকে বিরক্ত করতে এসেছে।

বৃদ্ধ বিশুদ্ধ হিন্দিতে বললেন, না, না। বিরক্ত কিসের? এ তো আমার কর্তব্য! ওয়ার্না শিবুটা বেমক্কা খুন হয়ে গেল?

কৌশিক বলে, আপনার স্যার মনে আছে শিবশঙ্করের কথা?

—থাকবে না? রোল ইলেভেন। সে তো তিনটে লেটার পেয়েছিল। ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ ভি পায়! তারপর ডগডর বন গয়ে। বঙ্গাল মুলুকমে সে পাগলদের একটা হাসপাতাল ভি বনাইয়েসে। স্কুলের গোল্ডেন-জুবিলিতে সে আসতে পারেনি, লেকিন টু হান্ড্রেড রুপিজ ডোনেশন ভেজিয়েছিল! তাকে ভুলে যাব? ক্যা আপসোস্ কি বাত! শিবুটা খুন হইয়ে গেল!

কৌশিক বললে, জী হ্যাঁ। বহুৎ আপ্‌সোস কি বাৎ! লেকিন স্যার, ইন্দ্রকুমার চৌধুরীর কথা আপনার য়্যাদ নেই!

—কৌন?

—ইন্দ্রকুমার চৌধুরী। বংগালী! শিবশঙ্করের চেয়ে কিছু নিচু ক্লাসে পড়ত! অথবা প্রায় একই সঙ্গে—

—ইন্দ্রকুমার?

—জী হাঁ?

—চৌধুরী?

—জী হাঁ!

—নেহী জী! নো ওয়ান অফ দ্যাট নেম ওয়াজ আ স্টুডেন্ট অফ আওয়ার স্কুল ফ্রম ফিফটি ওয়ান টু সিক্সটি ওয়ান, বোথ ইয়ার্স ইনক্লুসিভ!—

যেন সুপ্রীম কোর্টের রায়!

—আর য়ু শিয়োর স্যার?

—হোয়াট! অগর রেজিস্টারমে কুছ কনট্রাডিক্টরি এন্ট্রি আপ কো মিল যায় তো হেডমাস্টার-সাবকে কহ্না কী রেজিস্টার কারেক্ট কর রাখ্না ঠিক হ্যায়। মাই মেমারি ইজ দ্য ফাইনাল ওয়ার্ড!

দিন পাঁচেক পরের কথা। বাসুসাহেব আবার সবাইকে ডেকে পাঠালেন। আবার চারজন এসে বসলেন বাসুর চেম্বারে। উনি বললেন, আবার তোমাদের পরামর্শ চাইছি। বল, আমাদের কীভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত?

কৌশিক জানতে চায়, কী বিষয়ে? আপনি এর আগের দিন বলেছিলেন, চারটি মৌল সমস্যার সমাধান না হলে আমরা কোনোদিকে অগ্রসর হতে পারছি না। তার কী একটারও সমাধান হয়েছে?

বাসু বললেন, না, হয়নি। কিন্তু এই কয়দিন আমি আরও কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি। অধিকাংশই যুগলকিশোরের মাধ্যমে। সেগুলি আমি তোমাদের জানাতে চাই। আবার আমার নিজের ডিডাকশনে আমি কিছু আন্দাজ করেছি যা যুগলকিশোর বা পুলিস জানে না। এখন আমার মনে হচ্ছে, হয়তো এভাবে সবকিছু নিজের আস্তিনের তলায় লুকিয়ে রাখাটা আমার উচিত হচ্ছে না। তাই তোমাদের পরামর্শ চাইছি।

সুজাতা বলে, মামু, আপনি ইতিমধ্যে কী জেনেছেন, কী আপনার আস্তিনের তলায় লুকোনো আছে, তা আমরা কেউ কিছুই জানি না। ফলে আমরা কী পরামর্শ দেব?

বাসু বলেন, কারেক্ট। তাই প্রথমেই আমি আমার তাসগুলি টেবিলে বিছিয়ে দিই। রঙের টেক্কাটা ছাড়া। প্রথম কথা : তোমরা যেদিন ধানবাদ চলে গেলে তার পরদিনই যুগলকিশোর আমাকে প্রেসিডেন্সি জেলের হাজতে নিয়ে যায়। সেখানে ছিল পঞ্চানন ঘড়াই। দেখেই চিনতে পারলাম, ঐ লোকটার ফটো নিঃসন্দেহে উঠেছিল ছায়া পালিতের ক্যামেরায়। যুগলকে সরিয়ে আমি একা লোকটার সঙ্গে জনান্তিকে কথা বললাম। লোকটা কেমন যেন ঘোরের মধ্যে ছিল। ভালো করে আমার চোখে-চোখে তাকাতেই পারছিল না।

রানু জানতে চান, নেশা করে বসেছিল?

—কী বলছ? জেল হাজতে বসে? নিশ্চয় নয়। সম্ভবত এটা থার্ড-ডিগ্রির প্রভাব। সে যা হোক, তার কথায় পারম্পর্য ছিল। ও আমার নাম জানে, তা স্বীকার করলো। অর্থাৎ ক্রিমিনাল ল-ইয়ার হিসাবে আমার সুখ্যাতি শুনেছে বললো। আমি তাকে সরাসরি অফার দিলাম : কে তোমাকে চিনসুরায় ডাক্তার ঘোষালের বাড়িতে চাকরি করতে পাঠিয়েছিল তা যদি সত্যি করে আমাকে গোপনে বলে দাও পঞ্চানন, তাহলে আমি বিনা 'ফি'তে তোমায় ডিফেন্স দেব, যতদিন মামলা চলবে! রাজি আছ?

বাসু থামলেন। সুজাতা তাগাদা দেয়, তারপর? ও কী বললো?

—লোকটা আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, আজ দু-দিন ধরে ঐ একই প্রশ্ন নিয়ে 'কচুয়া-ধোলাই' চলছে, হুজুর! কী বলব বলুন? চুঁচুড়ার সেই খুন-হয়ে-যাওয়া ডাক্তারবাবুকে আমি চিনিই না।

বাসুসাহেব তখন ওঁর পকেট থেকে ছায়া পালিতের তোলা একটা ফটো বার করে পচাইকে দেখান। প্রশ্ন করেন, এই লোকটা কে? চিনতে পার?

পচাই অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বললে, কবুল খাচ্ছি হুজুর, এটা আমারই ফটো। কেউ আমার অজান্তে তুলেছে। কোথায়, তা বলতে পারব না।

—তাহলে তো বাকিটুকুও তোমাকে কবুল খেতে হবে, পচাই। ডাক্তার ঘোষালের

বাড়িতে তুমি ছিলে। গতমাসের শেষাশেষি। কারণ এ ছবি তোলা হয়েছে আটাশে অক্টোবর অন্তত দশ-পনেরজন সাক্ষীর সম্মুখে—ঐ ডাক্তার ঘোষালের বাড়িতে!

লোকটা চুপ করে রইলো এ-কথা শুনে। বাসু তাগাদা দেন, কী হলো? কিছু তো বলবে?

—কী বলব, হুজুর! চুঁচুড়ায় জীবনে একবারই গেছিলাম সাত বছর বয়সে, আমার কাকার বিয়েতে, বরযাত্রীদের সঙ্গে—'নিতবর' হয়ে। তারপর আর জীবনে কখনো চুঁচুড়ায় যাইনি!

—তাহলে তোমার ফটো কি করে উঠলো চুঁচুড়ার ডাক্তারবাবুর বাড়িতে? মাত্র গতমাসে?

—এ ফটোতে কারসাজি আছে, হুজুর। আমার ছবি কেটে এনে ঐ ছবিতে বসিয়ে কেউ ফটো তুলেছে!

—সেটা তুমি প্রমাণ করতে পারবে না, পচাই। আমি কিন্তু প্রমাণ করতে পারব যে, এ ফটো গতমাসে দশজন সাক্ষীর সম্মুখে তোলা হয়েছিল। ত্রিশটা ফিল্মের গোটা নেগেটিভটাই আছে আমার কাছে। ঐ দশজনই বলবে যে, তুমি উপস্থিত ছিলে ওখানে, তোমাকে তারা চেনে।

পচাই হাত জোড় করে বলেছিলে, ঠিক আছে হুজুর। তাই সই। মেনে নিলাম। তিনটে খুনের বিচার হবে—একটা-না-একটার জন্যে ফাঁসিতে তো ঝুলতে হবেই। এটাও না হয় মেনে নেব। তিনের বদলে চার!

—তাহলে বল, কে তোমাকে এ-কাজে বহাল করেছিল? কত টাকায়?

—আজ্ঞে আমি বলব না। না হয়, আমার আপনারা তিনের বদলে চারবার ফাঁসি দেবেন।

বাসুসাহেব থামলেন। রানু বললেন, লোকটার দুর্জয় সাহস কিন্তু।

বাসু পাইপটা ধরাতে ধরাতে বললেন, ওর সাহসটাই শুধু দেখলে, রানু? ঐ সমাজবিরোধী লোকটার প্রভুভক্তিটা দেখলে না? ট্রাস্টওয়ার্দিনেস? জান দেবে তবু জবান দেবে না!

সুজাতা বলে, তার মানে বোঝা গেল পচাই ধরা পড়ায় আমাদের কোনও লাভ হলো না। সে কোনো মতেই স্বীকার করবে না, কে তাকে নিয়োগ করেছিল।

রানু বললেন, এবং তার মানে, তোমার মামার মতে, ঐ পাঁচটি সমস্যার সমাধান না হওয়াতক্ আমরা আন্দাজ করতে পারব না : কে ঘোষাল-ডাক্তারকে হত্যা করিয়েছে, অথবা অ্যাবে শবরিয়াকে।

বাসুসাহেব ম্লান হাসলেন। বললেন, না রানু! সে-কথা কিন্তু আমি বলিনি। আমি বলেছি : ঐ পাঁচটি আপাত-অসঙ্গতির ব্যাখ্যা না পেলে এই হত্যারহস্যের সামগ্রিক রূপটা আমরা প্রণিধান করতে পারব না। আততায়ীকে চিহ্নিত করার কথা আমি বলিনি।

—বাঃ! সেটাই তো মূল সমস্যা?

—না, রানু, না। মূল সমস্যা হচ্ছে সামগ্রিক চিত্রটার রূপায়ণ। শুধু 'কে' নয়, 'কেন'-সমেত কে!

কৌশিক তার মামিমার পক্ষ নিয়ে বলে, মামীও তো তাই বলছেন—'কে' এবং 'কেন'?

বাসু পাইপটার ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, আয়াম সরি, কৌশিক। আমি কিন্তু তা বলিনি। 'কে?'—প্রশ্নটা আমি আদৌ তুলিনি, আমার কাছে একমাত্র সমস্যা : 'কেন'? 'why'? কেন স্কাউড্রেলটা এভাবে পর পর দু-দুজন মানুষকে হত্যা করলো। 'কে' করেছে এ-প্রশ্নটা তো আমার জানা।

তিনজনেই যেন বজ্রাহত হয়ে গেলেন।

রানুই প্রথম বাঙ্ময় হলেন : তুমি জান? সঠিক আন্দাজ করেছ?

—হ্যাঁ, জানি। আন্দাজ নয়, ঘোষালের হত্যাকারী কে, তা আমি নিশ্চিতভাবে জানি। কনক্লুসিভ প্রমাণ আছে আমার এক্তিয়ারে। কিন্তু সে কেন একাজ করেছে তা জানি না।

কৌশিক বলে, তাহলে সে লোকটা কে—তা আপনি আমাদের বলছেন না কেন? এই চার-দেওয়ালের ভিতর খবরটা গোপন রাখার কোনো বিশেষ হেতু আছে কি?

আবার হাসলেন উনি। বললেন, বিশেষ হেতু না থাকলে তোমাদের তিনজনের কাছ থেকে অহেতুক সেটা গোপনই বা করব কেন, বল?

আবার তিনজন কথা খুঁজে পান না। রানুই আবার বলে ওঠেন, বেশ! লোকটার নাম তুমি আমাদের না জানাতে চাও জানিও না, কিন্তু কী কারণে তা জানাচ্ছ না সেটাও কি জানাতে পার না?

—না, তা পারি! লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত! জানে, তার পালাবার আর কোনো পথ নেই। তবে আমি যেমন তাকে চিনতে পেরেছি, মনে হয়, সেও তেমনি বুঝে ফেলেছে যে, তার মৃত্যুবাণ আমি ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করেছি। সে মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করতে পারে। সে চেষ্টা তৃতীয় একটা হত্যা। এবার আমাকে। আর সেজন্যই নামটা তোমাদের কাছে গোপন রাখছি, যাতে তোমাদের জীবনও একই ভাবে বিপন্ন না হয়ে পড়ে।

পুনরায় নীরবতা ঘনিয়ে আসে। রানুই আবার নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন, সেই জন্যেই কি কাল রাত্রে আলমারি থেকে রিভলভারটা বের করে পকেটে রাখলে?

—হ্যাঁ, তাই। কিন্তু তোমরা তো রিভলভার পকেটে নিয়ে ঘুরতে পারবে না, তাই আপাতত খবরটা আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকুক। কিন্তু আমাকে হত্যা করলেও যে তার নিষ্কৃতি নেই এটা তাকে পাকেচক্রে জানিয়ে দেব—

—'নিষ্কৃতি নেই' মানে?

—তোমাদের তিনজনকে দেখিয়ে এই সীলবন্ধ খামটা আমার সেফভল্টে তুলে রাখছি। আমার যাবতীয় যুক্তি সমেত ঐ লোকটার নিশ্চিত গিল্‌টি-ভার্ডিক্ট হবার তথা এই খামে রইল। আমার অবর্তমানে খামটা যুগলকিশোরকে দিও। আমি কায়দা করে আততায়ীকে জানিয়ে রাখব আমাকে হত্যা করলেও তার মুক্তি নেই।

রানুর মুখটা ধীরে ধীরে সাদা হয়ে গেল।

বাসু ধীরপদে উঠে গিয়ে একটা সীলমোহর করা বড় ম্যানিলা খাম ওঁর চেম্বারের সেফ্‌টি ভল্টে তুলে রাখলেন। ফিরে এসে নিজের আসনে বসতেই সুজাতা, বললে, আচ্ছা, এমনটা কী করে হয়, মামু? আপনি যেসব তথ্য জানেন, আমরাও তো তাই-তাই জানি। তাহলে আমরা কেন লোকটাকে চিহ্নিত করতে পারছি না, অথচ আপনি পারছেন?

বাসু বললেন, না, সুজাতা, কথাটা তোমার ঠিক হলো না। আমি যা-যা জানি, তোমরা তার সবটা জান না। আবার তোমরা দুজন যা জানো তার সবটা আমিও জানি না।

—যেমন? দু-একটা উদাহরণ দিন?

—যেমন ধর, তোমার দুজন ধানবাদ যাওয়ার পথে ট্রেনে মুড়ি-মশলা কিনে খেয়েছে কিনা তা আমি জানি না। যে প্রফেসর ভদ্রলোক কৌশিককে ইন্দ্রকুমারের টেলিফোন রেকনারট দিয়েছিলেন তাঁর গোঁফ আছে কি না, পণ্ডিত ত্রিবেদী দাড়ি রেখেছেন কিনা—এসব জানো আমি জানি না।

কৌশিক বলে, এসব তো ইর্‌রেলিভেন্ট কথা, অপ্রাসঙ্গিক।

—না কৌশিক, কোন কোন সূত্রটা প্রাসঙ্গিক, কোনটা নয়, তা দেখবার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী নজর থাকা চাই। ইন্দ্রকুমারের ক্যামেরাটা ট্রেনে হারানোর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম কিন্তু স্পষ্ট সূত্র আছে, তা কি তোমরা খেয়াল করেছ? করনি। ডক্টর দাশ আমাকে যে ডোনার্স লিস্টটি দিয়েছিলেন—দশ বছরের দানের হিসাব, তার ভিতর একটা অতি সূক্ষ্ম কিন্তু সুস্পষ্ট আঙ্কিব

সূত্র আছে, তা কি তোমাদের নজরে পড়েছে? পড়েনি। কেন গুণবতী সাপের ভয়ে কেঁচো খুঁড়ছেন না, অথবা ঘোষাল কেন একজন নন-ম্যাট্রিককে ম্যাট্রিক বলে চালাতে চেয়েছিল তা তোমরা বিশ্লেষণ করে দেখেছ? দেখনি। ক্লু কিন্তু এই সব সূত্রেই ছড়ানো। তা থেকেই আমি অপরাধীকে শনাক্ত করেছি। তুমি, কৌশিক, যুগলকিশোরের স্ত্রীর কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে—

বাধা দিয়ে সুজাতা বলে, কী প্রতিশ্রুতি?

—এই দ্যাখ, সেটা আমি জানি, কৌশিক জানে, কিন্তু সুজাতা অথবা রানু জানে না। সুতরাং আমরা সবাই সবকিছু জানি না। কৌশিক যুগলের স্ত্রীকে বলেছিল সে এই হত্যারহস্য নিয়ে একটা গোয়েন্দা গল্প লিখবে। তা যদি লেখ কৌশিক, তাহলে কাহিনীর এই পর্যায়ে থেমে গিয়ে তুমি পাঠক-পাঠিকাকে জানিয়ে দিতে পার যে, তারা যে-যে তথ্য জানে, তোমার বাসুমামু তার চেয়ে একতিলও বেশি জানেন না। এইখানে গল্পের বইটা বন্ধ করে পাঠকের চেষ্টা করা উচিত আততায়ীকে চিহ্নিত করতে—কে প্রকৃত খুনি ; এবং বাসুসাহেব একই তথ্যের বেসিসে কেমন করে তাকে চিহ্নিত করলেন। কী জান কৌশিক—তুমি গোয়েন্দা গল্প লেখ তো, তাই বলছি : ঈশপের গল্পে আর পঞ্চতন্ত্রের গল্পে মর‍্যালটা থাকে কাহিনীর শেষে, আর সার্থক গোয়েন্দা কাহিনীতে সেটা থাকে গল্পের মাঝামাঝি একটি বিশেষ মুহূর্তে। ঠিক যে মুহূর্তে গোয়েন্দা উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মতো ঘোষণা করেন : বেদাহমেতম্ ! আমি জানি!

কৌশিক বলে, সেক্ষেত্রে আপনি যতটুকু জানেন তা পুলিসকে জানিয়ে দিচ্ছেন না কেন? যুগলকিশোরকে সব কথা বলছেন না কেন?

—যুগলকে আমার সন্দেহের কথা বলামাত্র সে লোকটাকে অ্যারেস্ট করবে। কেস আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আদালতে উঠবে। কিন্তু আমি যে এখনো জানি না—লোকটা কেন জোড়া খুন করল! এক্ষেত্রে আসামীপক্ষের কাউন্সেলার একটা অ্যাডভান্টেজিয়াস পজিশনে থাকবে। একটা জোরালো যুক্তি। সে বলবে : হুজুর! বাদীপক্ষের ওই প্রমাণের কোনও বনিয়াদ নেই! কোনো অর্থ নেই। একটা মানুষ ঠাণ্ডা মাথায় দু-দুটো খুন করবে কেন? যদি তার নিজের কিছুমাত্র লাভ না হয়? এর জবাব আমার এখনো জানা নেই। ফলে বিচারক হয়তো সব জেনে বুঝেও 'বেনিফিট অব ডাউটে' আসামীকে ছেড়ে দিতে পারেন। কারণ ভারতীয় আইন বলছে : "একশোটা অপরাধীকেও বিচারক 'নট-গিলটি' বলতে পারেন, কিন্তু একটিও নির্দোষীকে সাজা দিতে পারেন না।" সেজন্য পুরোপুরি তৈরি না হয়ে আমি যুগলকে আমার সমাধানটা জানাতে পারছি না। ঘোষালের হত্যা কে করেছে, আমি জানি, নিশ্চিত জানি। কেন করেছে তা আন্দাজ করেছি, আমার আশা বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে সেই 'কেন'র জবাব আমার হাতে এসে যাবে—মোটিভ সংক্রান্ত কনক্লুসিভ প্রুফ। কিন্তু বিল শবরিয়াকে লোকটা কেন হত্যা করল? নাহং বেদ! না, তা আমি জানি না।

কথা বলতে বলতে টেলিফোনটা বেজে উঠল। সুজাতা সেটা নিয়ে শুনলো। তারপর যন্ত্রটা বাসুসাহেবের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে, আপনার ফোন। ব্রজদুলালবাবু—

বাসু ওর হাত থেকে ফোনটা নিয়ে বললেন, সুপ্রভাত ব্রজবাবু, বলুন?

—সুপ্রভাত স্যার। আগামী শনিবার সন্ধেয় কি আপনি ফ্রি আছেন?

—আগামী শনিবার? দাঁড়ান, ডায়েরি দেখে বলছি। কিন্তু কেন বলুন তো? আপনি আসবেন?

—আজ্ঞে না। আপনারা আসবেন। ম্যাডামও আসবেন। আমি বড় গাড়িটা পাঠিয়ে দেব।

—কেন? কী ব্যাপার?

—আগামী শনিবার সন্ধে ছয়টায় আমাদের 'সসজ্জা শেষ মহড়া'।

—'সসজ্জা শেষ মহড়া'! তার অর্থ?

—ওফ্! আপনি সোজা কথা বোঝেন না, ব্যারিস্টারসাহেব? ওর সাদা বাংলা হচ্ছে : ড্রেস রিহার্সাল!

—ড্রেস রিহার্সাল! গুড গড! ড্রেস রিহার্সাল!!

—কী আশ্চর্য! কথাটা আগে শোনেননি? কোনো নতুন নাটক মঞ্চস্থ করার আগে একটা পরীক্ষামূলক ...

বাসুসাহেব বাকিটা শুনতে পেলেন না। অন্যমনস্কের মতো টেলিফোনটাকে ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখলেন। ক্র্যাডলে নয়, টেবিলে। পাইপে অগ্নি সংযোগ করে স্বগতোক্তি করলেন : মাই গড!

টেবিলে নামিয়ে রাখা টেলিফোন যন্ত্রটা লেগহর্ন মোরগের মতো ক্রমাগত 'কক্-কক্' করে চলেছে। সবাই স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে। এসব বাসুসাহেবের চেতন মনে ছায়াপাত করছে না। তিনি জানালা দিয়ে বাইরের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। ঠোঁট থেকে পাইপটা ঝুলছে। ড্রেসিং গাউনের দু-পকেটে দুই হাত। উনি যেন অন্য জগতে চলে গেছেন।

সুজাতা রানুর দিকে তাকায়। দেখে, তিনি নিঃশব্দে অধরোষ্ঠের উপর তর্জনীটা রেখে চুপ করে থাকতে বলছেন।

বাসু যেন ধ্যানস্থ!

রানু টেলিফোনযন্ত্রটা টেবিল থেকে নিঃশব্দে তুলে নিলেন। কানে চেপে ধরে শুনলেন। ব্রজদুলাল একটানা বলে চলেছেন, হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো...

আস্তে, কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণে রানু টেলিফোনের কথামুখে বললেন, মিস্টার রায়, টেলিফোন ক্র্যাডল-এ রেখে দিন। আমি মিসেস বাসু বলছি। উনি কথা বলতে বলতে এদিকে একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে। ডোন্ট বি প্যানিকী। উনি একটু পরে আপনাকে রিং-ব্যাক করবেন।

এসব কোনো কথাই বোধহয় কর্ণগোচর হয়নি বাসুসাহেবের। তিনি যেন হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেলেন। এদিকে ফিরে সহাস্যে বললেন : গট ইট!

রানু জানতে চান : কী?

—ফুল সলুশন অব দ্য কেস! সব সমস্যার নিষ্কণ্টক সমাধান। ইট্স্ : ড্রেস রিহার্সালের কাঁটা। অ্যান্ড দ্যাটস্ দ্য : 'মজারু'!

সতের

বাসু জিজ্ঞেস করলেন, শেষ পর্যন্ত নিমন্ত্রিত কতজন হলো? তের নয় তো?

রানু লিস্টের নামগুলি পড়ে গেলেন, ব্রজদুলাল, ইন্দ্রকুমার, অশোক, ক্যাপ্টেন আর মিসেস ছায়া পালিত, গুণবতী আর সুভদ্রা, অনুরাধা, জয়ন্ত, ওদিকে চিনসুরার অ্যাগি ডুরান্ট, ডঃ দাশ, সস্ত্রীক ডি আই জি এবং সস্ত্রীক যুগলকিশোর ; এছাড়া বিশুকে ধরে বাড়ির পাঁচজন—একুনে কুড়িজন।

—ওই সঙ্গে আর দুটো নাম যোগ হবে, প্রথমত যে-ছোকরা ঘোষালের মৃত্যুর পর তদন্ত করতে যায় : ইন্সপেক্টর চন্দন নন্দী। দ্বিতীয়ত অপর্ণা। ওর বাচ্চার জন্য একটা প্যাকেটও ওকে

ধরিয়ে দিতে হবে। সর্বসমেত তাহলে বাইশ জন। রানু আর সুজাতা টেলিফোনে সবাইকে নিমন্ত্রণ করবে। শনিবার, আঠারই নভেম্বর, সন্ধে ছ'টায়। শুধু পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ করার দায়িত্ব আমার—চিনসুরার ডি আই জি আর যুগলকিশোরকে সস্ত্রীক, আর ওই ইন্সপেক্টর ছোকরাকে, চন্দন নন্দীকে।

সুজাতা বলে, কিন্তু লোকে যখন জানতে চাইবে উপলক্ষটা কী, তখন কী বলব?

বাসু বলেন, এই মওকায় যদি কিছু প্রেজেন্টেশন পাওয়ার বাসনা থাকে তাহলে বল, তোমার জন্মদিন, অথবা তোমাদের বিবাহ-বার্ষিকী। না হলে বল, মামুর পাগলামি।

কৌশিক বলে, ব্রজদুলাবাবুকে কী বলব?

বাসু বলেন, নাঃ, ব্রজদুলাল আমার ক্লায়েন্ট। ওকে যা বলার তা আমাকেই বলতে হবে। ধর তো ফোনে।

রানু ফোনে ব্রজদুলালকে ধরলেন। শনিবার নিমন্ত্রণও করলেন। ব্রজদুলাল আকাশ থেকে পড়েন, ওফ! আপনাদের ব্যাপার-স্যাপার কিছুই বোঝা যায় না। আঠারই আমার ড্রেস-রিহার্সাল ছিল, সেটাকে কাঁচিয়ে দিয়ে...

কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে রানু বলেন, উনি আমার পাশেই বসে আছেন, সে কৈফিয়ৎ ওঁর কাছেই শুনুন—

বাসু টেলিফোনের জঙ্গমযন্ত্রটি গ্রহণ করে, তার কথামুখে বললেন, সরি ব্রজবাবু। আপনার ড্রেস-রিহার্সালটা সাতদিন পেছিয়ে দিতে হবে। আর ভালো কথা, আমার অনুমতি ছাড়া নতুন নাটকের কোনও বিজ্ঞাপন কোথাও ছাপতে পাঠাবেন না, টিকিট বিক্রি শুরু করবেন না, বুঝেছেন?

—কেন বলুন তো? ওফ্! আপনি কি আমাকে দ'য়ে মজাতে চান?

বাসু বলেন, শুনুন মশাই! আমি আপনার আইনত পরামর্শদাতা। আমি যা পরামর্শ দেব, আপনাকে সেই মতো চলতে হবে। কেন, কী বৃত্তান্ত সে পরে বলব। শনিবার ঠিক ছটার মধ্যে আমার বাড়িতে চলে আসবেন। আপনারা তিনজনই—অর্থাৎ ইন্দ্রকুমার এবং অশোককে নিয়ে। ওদের আমি অবশ্য পৃথকভাবে নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছি। ককটেল-ডিনার পার্টি!

অন্যান্য সকলেও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। শুধু গুণবতী একটু আপত্তি করেছিলেন, তাঁর নাকি শুক্রবারের ফ্লাইটে ভুবনেশ্বরে ফিরে যাবার টিকিট কাটা আছে।

বাসু বললেন, সেটা ক্যানসেল করলেই ভালো করতে। শুনেছ বোধহয় : অ্যাবে শবরিয়ার শবদেহ ব্যবচ্ছেদের রিপোর্টটা পাওয়া গেছে?

—হ্যাঁ, শুনেছি। তার সঙ্গে আপনার এই পার্টির কী সম্পর্ক?

—ঠিক যতটা নিকট সম্পর্ক তোমার সম্পত্তির সঙ্গে। অবশ্য জরুরি কাজ থাকলে আমি আটকাবো না।

গুণবতী এককথায় রাজি হয়ে গেলেন, ফ্লাইটটা ক্যানসেল করে পরের সোমবারের নতুন টিকিট কাটার ব্যবস্থা করবেন তিনি।

ছায়া পালিতও কৌতূহলী হয়েছিল, কী ব্যাপার বলুন তো মাসিমা? হঠাৎ মেসোমশাই পার্টি দিচ্ছেন যে?

রানু বললেন, পাঁচ বাড়ি নেমন্তন্ন খেয়ে এসে একদিন তো পাঁচজনকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে হয়?

ছায়া মানতে রাজি নয়। বলে, না মাসিমা, আপনি কিছু একটা কথা গোপন করে যাচ্ছেন।

রানু হেসে বললেন, তা যাচ্ছি!

—বাঃ! সেক্ষেত্রে আমাকে বলুন ভিতরের ব্যাপারটা আসলে কী?

—তোমার মেসোমশাই সেটা গোপন রাখতে চান। তবে আমাকে বলে রেখেছেন—শুধু ছায়াকে আসল কথাটা জানাতে পার : ওঁর আস্তিনের ভিতর একটা "মজারু' লুকিয়ে রাখা আছে। উনি সেটা ওই নৈশাহারের টেবিলে বার করে দেখাবেন। ঘোষালের অসমাপ্ত খেলাটা।

ছায়া বললে, আমিও সেটাই আন্দাজ করেছি। সেক্ষেত্রে আমি ক্যামেরা আবার লোড করি, কী বলেন?

রানু বলেন, কোনো উৎসব-রজনীর স্মৃতি ক্যামেরায় বন্দি করার বিরুদ্ধে ইন্ডিয়ান পিনাল কোডে যখন কোনো আপত্তিকর...

কথাটা তাঁর শেষ হয় না। ছায়া খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

কৌশিক বিজলী গ্রিলকে অর্ডার দিয়ে এসেছে। ক্যাটারিং এজেন্টের পক্ষে এত অল্পসংখ্যক ভোজনার্থীর ক্ষেত্রে ঠিক পড়তা পোষায় না। তবে যেহেতু এটা লগনশার বাজার নয় এবং তদুপরি নিমন্ত্রণকর্তা একজন বিখ্যাত লোক তাই বিজলী গ্রিল রাজি হয়ে গিয়েছিল।

ড্রিংস-এর আয়োজন বাসুসাহেব সরাসরি করেছেন আবদুল মিঞার সঙ্গে যোগাযোগ করে। বিশ-ত্রিশ বছর আগে বার-লাইব্রেরিতে 'তরল-নৈশাহারের' আয়োজন হলে আবদুলের মাধ্যমেই পানীয় সংগ্রহ করা হতো।

সন্ধে থেকেই লোক সমাগম শুরু হয়েছে। ব্যবস্থাপনা একই রকম। বাগানের মধ্যে একদিকে বড় একটি টেবিলে বিজলী গ্রিলের সেবকেরা খাদ্যাদি সাজিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখেছে। চার-পাঁচটি স্পিরিট ল্যাম্পও সাজানো আছে। অপর দিকে আর একটি টেবিলে আবদুলের সরবরাহ করা অমৃত! যেসব বোতল খোলা হবে না তা ও ফেরত নিয়ে যায়।

কিছু দূরে দূরে দু-চারজন করে বসে আড্ডা দিচ্ছেন। ব্রজদুলাল একটি প্রকাণ্ড বড় ফুলের বোকে নিয়ে এসেছেন। তুলে দিলেন রানুর হাতে। সুজাতা সেটি সাজিয়ে রাখলো। ছায়া ঘুরছে-ফিরছে আর তার হাতে ফ্ল্যাশ বাল্‌ব্ ঝিলিক দিয়ে উঠছে। জয়ন্ত এগিয়ে এসে বলল, ক্যামেরাটা আমাকে দিন, না হলে কোনও ফটোতেই আমরা ছায়াদিকে দেখতে পাব না। এবার বরং আমি তুলি।

সুভদ্রা সুজাতাকে জনান্তিকে পাকড়াও করে বলল, একটা সুখবর আছে, সুজাতাদি। আপনাকে গোপনে জানাচ্ছি—নটরঙ্গের পরের নাটকে আমি হিরোইনের রোল করছি!

সুজাতা বলে, সেটা শুনেছি। আমরা কিন্তু তার চেয়েও বড় জাতের একটা সুখবরের প্রত্যাশায় আছি। সে অ্যানাউন্সমেন্টটা কবে হচ্ছে?

সুভদ্রা লজ্জা পেল, বলল, কথা ছিল ড্রেস-রিহার্সালের পরেই রেজিস্ট্রেশনটা হবে। মাকে না জানিয়ে। তারপর মাকে বলব। ফর্মাল বিবাহ-উৎসব কীভাবে হবে তা এখনো স্থির হয়নি। মা রাজি হলে একরকম, না রাজি হলে অন্যরকম।

সুজাতা সুযোগ বুঝে বলে, তুমি একটু এদিকে এসো তো সুভদ্রা, তোমার সঙ্গে কিছু গোপন কথা আছে।

সুভদ্রা একটু অবাক হলো ; কিন্তু কথা শুনলো। সুজাতার পিছু পিছু সে বাগান ছেড়ে ওদের ফ্ল্যাটের দিকে চলতে থাকে। ইন্দ্রকুমার এগিয়ে এসে বলে. কী ব্যাপার? 'প্রাইভেট টক্' মনে হচ্ছে?

সুভদ্রা জবাব দেবার আগেই সুজাতা চটজলদি বলে, না, ওকে টয়লেটে নিয়ে যাচ্ছি। আমরা এখনি ফিরে আসব।

নিজের ঘরে ওকে নিয়ে এসে সুভদ্রা বলে, তুমি সব দিক ভালো করে ভেবেচিন্তে দেখেছ তো সুভদ্রা? তোমাদের দুজনের বয়সের পার্থক্যটা...

সুভদ্রা হাসতে হাসতে বলে, আমিও কিছু কচি খুকি নই সুজাতাদি। তাছাড়া হিন্দু কোড বিলের রক্ষাকবচ তো আছেই। সিনেমা-থিয়েটারের জগতে স্বামী-স্ত্রীর সাতপাকে বাঁধা সম্পর্কটা তো এখন পদ্মপত্রে পানি। না পোষালে কেটে পড়ব। ততদিনে আমি নিজেই অভিনয়-জগতে নাম করে ফেলব। ইন্দ্রকুমার তো মগডালে ওঠার একটা মই মাত্র।

সুজাতা রীতিমতো অবাক হলো। এভাবে যে নিজের জীবন নিয়ে কেউ ভাবতে পারে এটা ওর ধারণাই ছিল না। বললে, কিন্তু তোমাদের শিক্ষাদীক্ষায় যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। তুমি গ্র্যাজুয়েট আর শুনেছি, ইন্দ্রবাবু ম্যাট্রিকও পাস করেননি।

—না, ও ম্যাট্রিক পাস। আমাকে বলেছে।

—তুমি ওর ম্যাট্রিক সার্টিফিকেট দেখেছ?

সুভদ্রা খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। বলে, আপনি কি ভাবছেন আমি ওকে চাকরি দিচ্ছি?

—না, তা দিচ্ছ না ; কিন্তু জীবনসঙ্গী করার আগে ওর ব্যাকগ্রাউন্ডটা ভালো করে জেনে নিয়েছ তো? অবশ্য আমার পক্ষে হয়তো এসব অনধিকারীর প্রশ্ন, তবু তোমাকে ভালোবাসি বলেই...তুমি কিছু মনে করছ না তো?

—না, সুজাতাদি। বরং খুশিই হচ্ছি। মায়ের সঙ্গে এসব কথা আলোচনা করা যায় না। মা অত্যন্ত কনজারভেটিভ। আর দুনিয়ায় একটি জিনিসই চেনে : টাকা! ...তুমি যা বলছিলে, হ্যাঁ, ইন্দ্র তার সব কথাই আমাকে বলেছে। ওর বাবা রেলে কাজ করতেন। ওর ভাইবোন কেউ নেই। ম্যাট্রিক পাস করে বিহারের একটা স্কুল থেকে।

বাধা দিয়ে সুজাতা বলে, হ্যাঁ, শুনেছি। ডঃ ঘোষাল আর উনি একই স্কুল থেকে একই বছর ম্যাট্রিক পাস করেন।

সুভদ্রাও বাধা দিয়ে বললে, না! সেটা ঠিক নয়। ডঃ ঘোষাল ওর চেয়ে পাঁচ ক্লাস উপরে পড়তেন। ক্লাস-মেট নয়, স্কুলমেট। তা সে যাই হোক, কলেজে ফার্স্ট-ইয়ারে পড়তে পড়তে ও একটি মেয়েকে বিয়ে করে। মাত্র দু বছরের মাথায় সন্তান হতে গিয়ে ওর সেই স্ত্রী মারা যায়।

—আর বাচ্চাটা?

—না, সেটাও বাঁচেনি। তারপর থেকে ও বিপত্নীক! যদিও অভিনয়-জগৎ জানে, ও কনফার্মড-ব্যাচিলার। ইন্দ্র তার জীবনের সব কথাই খুলে বলেছে আমাকে।

—কী বলেছে? এই ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ওর জীবন ছিল স্ত্রীভুমিকাবর্জিত?

—তা কেন? সেকথাও ও অকপটে স্বীকার করেছে। সবাই তা জানেও। ও তো অনুরাধাদিকে নিয়ে থাকত, বউবাজারে একটা বাসা ভাড়া করে।

যেটুকু জানার ছিল সুজাতার, তা জানা হয়েছে। বলে, চল এবার বাগানে যাওয়া যাক। ওঁরা বোধহয় আমাদের অভাবটা ফিল করছেন।

কৌশিক গুনতি করে দেখল সবাই এসেছেন, শুধু একজন বাদ—চিনসুরার সেই ইনভেস্টিগেটিং ইন্সপেক্টর, চন্দন। বাসুকে সে কথা বলতেই তিনি জনান্তিকে বললেন, না, চন্দন এসেছে। আড়ালে আছে। সময়মতো সে পজিশন নেবে—

—সেই নাটকীয় মুহূর্তটা কখন আসবে মামু? বিফোর না আফটার ডিনার?

—আফটার ডিনার! পুরীতে ডিনার খাওয়া যায়নি, চিনসুরাতেও কেউ খেতে পারেনি, এখানে তা আমি হতে দেব না।

—কিন্তু আফটার ডিনার কি ড্রিংক্‌স্ চলবে?

—চলবে! চালাতে জানলে সবই চলে!

বাসুসাহেবের পরিকল্পনা মতোই কাজ শুরু হলো। গল্পগুজব হাসি-হুল্লোড়ের মধ্যে নিরাপদে ড্রিংক্‌স্-পর্ব সমাধা হলো। তারপর আগের মতোই সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ব্যুফেডিনার সারলেন। অপর্ণাকে বাচ্চার জন্য একটা প্যাকেটও ধরিয়ে দেওয়া হলো. সে বেচারি কাউকেই চেনে না। বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়বে এই অজুহাত দেখিয়ে অপর্ণা সবার আগে চলে গেল। খিদমদ্‌গারেরা প্লেট ও টেবিল সাফা করতে শুরু করেছে। পরিকল্পনামতো কৌশিক, সুজাতা আর বিশু চেয়ারগুলো একটু দূরে গোল করে সাজিয়ে দিল। রাত তখনো বেশি হয়নি। মাত্র সাড়ে আট।

বাসু বললেন, কিছু ভালো ওয়াইন রাখা আছে—ডেসার্ট-ওয়াইন, অর্থাৎ ডিনারের পর সেব্য ; আর আছে ড্রাই-মার্টিনী ; আসুন, সবাই বসা যাক আবার। বেশ গোল হয়ে।

রানু বলেন, আর আমরা? যাদের ওসব চলবে না? আমরা কি বুড়ো আঙুল চুষব?

—তা কেন? তাদের জন্যও ব্যবস্থা আছে। আইসক্রীম, কফি, মিল্কশেক—যার যা পছন্দ!

সবাই ঘনিয়ে আসে। ছায়া পালিত রানুর কানে-কানে বলে, এবার কি 'মজারু' পালাটা হবে?

রানু চাপা ধমক দেন, চোপ।

ডি আই জি বার্ডওয়ান বলেন, এবার কেউ একটা গান শোনান।

ইন্দ্রকুমার বলে, আরে ছি ছি, আগে বলতে হয় যে, সান্ধ্য আসরে গানবাজনা হবে, তাহলে তৈরি হয়ে আসতাম।

ব্রজদুলাল সবিস্ময়ে বলেন, মানে? তুমি গান গাইতে জানো নাকি? আর তাছাড়া 'তৈরি হয়ে আসতে' মানে?

ইন্দ্র বলে, দুটো প্রশ্নের একই জবাব। আমার প্লে-ব্যাক সিঙ্গারকে সঙ্গে নিয়ে আসতাম। আমার কাজ তো ঠোঁট নাড়ানো।

সবাই হেসে ওঠে।

ব্রজদুলাল বলেন, অনুরাধা গান জানে। অনু একটা ধর।

অনুরাধা বলে, আমিও ইন্দ্রদার মতো বলব, 'আগে বলতে হতো'! ভরপেট খাওয়ার পর, আইসক্রীম খেতে খেতে গান হয় নাকি?

ডি আই জি বলেন, বুঝলাম! গান চলবে না। কিন্তু গল্প তো চলতে পারে? বাসু-কাকু একটা ছাড়ুন। পুরনো একটা কেস হিস্ট্রি। বেশ জমাটি একটা খুনের মামলা! কীভাবে অপরাধীকে স্পট করলেন সেই কিস্‌সা।

বাসু যথারীতি পাইপে টোব্যাকো ঠেসতে ঠেসতে বলেন, ঠিক আছে। তাই শোনাব। তবে 'একটা' নয়, জোড়া খুনের কেস। কিন্তু ব্রতকথা শোনার আগে প্রত্যেকের হাতে ফুল-বেলপাতা থাকা চাই। এক-একটা গ্লাস উঠিয়ে নিন আপনারা। মেয়েরাও নাও—জিন, ভারমুথ, নিদেন আইসক্রীম, মিল্কশেক বা কফি।

খিদমদ্‌গারেরা ট্রে নিয়ে ঘুরছে। সবাই একটা করে পানপাত্র বা আইসক্রীম প্লেট তুলে নিলেন। কৌশিক একটা গ্লাস তুলে নিয়ে বললে, এটা কী?

বাসু নিজে নিয়েছেন তাঁর সাবেক ব্র্যান্ড—শিভাস রিগ্যাল অন-রকস্। বললেন, ওটা ড্রাই-মার্টিনী। নিশ্চিন্তে খেতে পার।

কৌশিক বলে, নেশা হবে না তো?

বাসু ধমক দেন, কী পাগলামি করছ? ওতে আছে জিন, আর ভারমুথ। মেয়েদের ড্রিংক্স্। আফটার ডিনার ডেলিকেসি।

কৌশিক গ্লাসটা উঠিয়ে নিয়ে বললে, এবার শুরু করুন মামু, আপনার জোড়া খুনের কিস্সা! সবার হাতেই ফুল-বেলপাতা পৌঁছে গেছে!

বাসু গল্পটা শুরু করেন, জোড়া খুনের আসামীর নাম ... নাঃ! আমি বরং আসল নামটা গোপন রেখে একটা ছদ্মনাম ব্যবহার করি। ধরা যাক্, লোকটার নাম : বটুক চোংদার।

ছায়া তীব্র আপত্তি জানায় : এ ম্যা! কী বিশ্রী নাম! জোড়া খুনের মামলার আসামী : বটুক চোংদার! আমি ভাবতেই পারছি না।

বাসু বলেন, কেন? চোংদার উপাধি হয়, শোননি?

ছায়া মাথা নেড়ে বলে, কোনো জন্মে নয়।

জয়ন্ত বললে, আমাদের ক্লাসে একজন 'চোংদার' পড়ত। ওই টাইটেলটা শুনেছি। আপনি গল্পটা বলুন, স্যার।

বাসু বলেন, আর কেউ? চোংদার টাইটেল? অনুরাধা? সুভদ্রা? পম্পা? ইন্দ্রকুমার?

কেউ কোনো জবাব দেয় না। অনেকেই মাথা নাড়ে।

ব্রজদুলাল বলেন, ওফ্! গল্পটা কেন থেমে গেল? আমরা মেনে নিচ্ছি 'চোংদার' টাইটেল আছে; গল্পটা চলুক।

বাসু বলেন, বেচারির দোষ কী? পিতৃদত্ত নাম, বংশগত উপাধি। ওই বিশ্রী নামের বোঝা নিয়েই সে স্কুলে সহপাঠীদের উপদ্রব সহেছে। তবে দেখতে ছেলেটা সুন্দর ছিল। ক্রমে ম্যাট্রিক পাস করে মফস্বল থেকে কলকাতায় চলে এল। স্কুলে থাকতেই বটুক একজন বিত্তশালী জোদ্দারের কিশোরী মেয়ের প্রেমে পড়ে। মেয়েটিও সুন্দরী, তবে নাবালিকা। বিশ্রী নাম সত্ত্বেও মেয়েটিও বটুক চোংদারের প্রেমে পড়লো। বলতে ভুলেছি, ঘটনাস্থল—বিহারের ধানবাদ শহর। বটুক ওইখানে চিরাগোড়া বয়েজ স্কুলে পড়ত। চোংদারের কিশোরী প্রেমিকার নাম—আচ্ছা, আবার একটা ছদ্মনামই নেওয়া যাক—ধর : কুন্তী দোসাদ।

ডঃ অমরেশ দাশের হাতে ওয়াইন-গ্লাসে তরল পদার্থটা একটু চলকে উঠলো। তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে প্রশ্ন করেন, কী নাম বললেন? কুন্তী দোসাদ?

বাসু একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলেন, কী ব্যাপার? এ নামটা কি তোমার কাছে বিশ্রী মনে হচ্ছে নাকি? কুন্তী তো মহাকাব্য থেকে নেওয়া নাম বাপু, পাণ্ডবজননী?

মিস্ ডুরান্টের দিকে তাকিয়ে ডঃ দাশ কেমন যেন থতমত খেয়ে থেমে যান। ব্রজদুলাল সোজা হয়ে উঠে বসেন। বলেন, জাস্ট এ মিনিট, ব্যারিস্টারসাব, নামটা বিশ্রী বলে নয়, কোথায় যেন শুনেছি মনে হচ্ছে। কোথায় বলুন তো?

যুগলকিশোর বলে, তাতে কী হলো? ধানবাদের ওই চিরাগোড়া স্কুলের নামটাও তো আমি শুনেছি। ডঃ ঘোষাল তো ওখান থেকেই ম্যাট্রিক পাস করেন। আর ইয়ে, আপনিও তো ওই স্কুলেই ডঃ ঘোষালের সঙ্গে একই ক্লাসে পড়তেন, তাই নয়?

এবার যুগলকিশোর প্রশ্নটা করেছে ইন্দ্রকুমারের দিকে সরাসরি তাকিয়ে। ইন্দ্রকুমার এতক্ষণ মাথাটা নিচু করে শুনে যাচ্ছিলো। এবার সোজা হয়ে উঠে বসে। গলাটা ঝেড়ে স্পষ্টভাবে বলে, হ্যাঁ, আমিও ওই স্কুলেরই ছাত্র ছিলাম। তবে ঘোষালদার সঙ্গে এক ক্লাসে নয়, অনেক নিচুতে। আর ঘোষালদার ব্যাচে চোংদার উপাধিধারী কোনো ছাত্র ছিল কি না তা মনে নেই। অনেকদিনের কথা তো—

তারপর হঠাৎ ব্রজদুলালের দিকে ফিরে বললে, আমার বড্ড মাথা ধরেছে, ব্রজদা। তোমাদের যদি ফেরার দেরি থাকে তাহলে আমি বরং একটা ট্যাক্সি নিয়েই ফিরে যাই।

উঠে দাঁড়ায় ইন্দ্রকুমার। সুভদ্রাও তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ায়। বলে, ট্যাক্সি কেন? চল, আমি পৌঁছে দিচ্ছি। আমি গাড়ি নিয়েই এসেছি।

ওরা দুজনে যাবার জন্য প্রস্তুত। ঠিক তখনই উঠে দাঁড়ায় কৌশিক। তার হাতে ড্রাই-মার্টিনীর একটা গ্লাস। পূর্বমুহূর্তেই সে তাতে প্রথম চুমুকটা দিয়েছে। দিয়েই উঠে দাঁড়িয়েছে। বোধহয় তরল পদার্থটা থু-থু করে ফেলে দেবে বলে। কিন্তু তা সে পারল না। গ্লাসটা ঠক করে নামিয়ে রাখল টেবিলে। তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠেছেন বাসুসাহেব। তিনিও গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে জড়িয়ে ধরলেন কৌশিককে : কী হয়েছে? অমন করছ কেন? কৌশিক! কৌশিক!!

বাসুসাহেব ওভাবে জড়িয়ে না ধরলে কৌশিকের সংজ্ঞাহীন দেহটা হয়তো মাটিতে লুটিয়ে পড়ত। ওর ডান হাতটা এলিয়ে পড়েছে। বাঁ হাতটা কণ্ঠনালীতে। একই খণ্ডমুহূর্তে জয়ন্তের হাতে ছায়া পালিতের ক্যামেরাটা ঝিলিক দিয়ে উঠল। আর ছায়া পালিত—কোথাও কিছু নেই—গোলকিপার যেভাবে ডাইভ মেরে পেনাল্টি বাঁচায়—সেইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে দু-হাতে চেপে ধরল কৌশিকের টেবিলে নামিয়ে রাখা মার্টিনীর গ্লাসটা।

একটা বিশৃঙ্খলা! প্যান্ডিমোনিয়াম। ঠিক পূর্বমুহূর্তে হয়ে গেছে লোডশেডিং! বাসু চিৎকার করে উঠলেন, ডোন্ট বি প্যানিকী! যে যেখানে আছ স্থির হয়ে থাক!

ধীরে ধীরে কৌশিকের সংজ্ঞাহীন দেহটা উনি শুইয়ে দিলেন ঘাসের উপর। এ-পাশ ফিরে বললেন, ডঃ দাশ! প্লিজ—

ডাঃ দাশ ছিলেন একটু দূরে। এগিয়ে এলেন তিনি। বসলেন হাঁটু গেড়ে ঘাসের উপর। না! গোটা এলাকাটায় লোডশেডিং হয়নি। ওঁর বাড়িতেই কোনো কারণে ফিউজ হয়ে গেছে নিশ্চয়। রাস্তায় আলো জ্বলছে। পাশের বাড়িতেও। বাগানটা অন্ধকার নয়, আলো-আঁধারি। ডঃ দাশ কৌশিকের মণিবন্ধটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করছেন। বাসু এ-পাশ ফিরে ডাকলেন, সুজাতা! সুজাতা কোথায়? সুজাতা—

সুজাতা নির্দেশমতো কুন্তী দোসাদের নাম ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পা টিপে-টিপে চলে গিয়েছিল সিঁড়ির নিচে ইলেকট্রিক মিটার-বক্সের কাছে, সময়মতো মেইন সুইচটা 'অফ' করতে।

সাড়া দেয় বিশ্বনাথ, দিদি ওদিকপানে গেল! বলেন, তাঁরে ডাকতিছেন কেন? আমিই তো খাড়া আছি।

দাশসাহেব বলেন, বাট হি ইজ অ্যালাইভ! অ্যাগি দেখ তো—যেন মৃত্যুই প্রত্যাশিত ছিল!

বাসু চিৎকার করে ডেকে ওঠেন : সুজাতা?

এইরকমই নির্দেশ ছিল। সুজাতা সুইচটা 'অন' করে দিল। বাগানে আবার জ্বলে উঠল আলোর মালা।

একসার মানুষ একটা শায়িত সংজ্ঞাহীন দেহকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। থিয়েটারের ভাষায় যাকে 'স্টিল' হয়ে যাওয়া বলে! আলো জ্বলে ওঠার পর দেখা যায় কৌশিকের মাথাটা ডাঃ দাশের বাম জানুতে : আর অ্যাগি কৌশিকের নাড়িটা ধরে দেখছেন। ব্রজদুলাল—শুধু ব্রজদুলাল কেন, সকলে তাকিয়ে আছে ওই সংজ্ঞাহীন যুবকটির দিকে। একটিমাত্র ব্যতিক্রম। ইন্দ্রকুমার।

সে স্থিরলক্ষ্যে তাকিয়ে আছে বাসুসাহেবের দিকে—ঈগলনেত্রদহনকারী জ্বলন্ত দৃষ্টিতে।

বাসুও তাকিয়েছিলেন তার দিকেই। ধীরে ধীরে এ-পাশ ফিরে ছায়াকে বললেন, তুমি দু হাতে ওই গ্লাসটা ধরে আছ কেন, মা?

ছায়া দৃঢ়স্বরে বললে, এবার আর ভুল হতে দেব না বলে। এই গ্লাসটাই কৌশিকদা নামিয়ে রেখেছিল টেবিলে। ইট কন্‌টেইন্স পয়জনাস্ ড্রাগ।

বাসু হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিলেন। বললেন, সরি, ছায়া! এবারও মিস্ করেছ তুমি!

—নো স্যার! আয়াম পজেটিভ! হান্ড্রেড পার্সেন্ট—

—দেন লেট মি ড্রিংক ইট টু দ্য লী—

গলায় ঢেলে দিলেন গ্লাসের তলানিটা।

কৌশিকের গ্লাস নয়—এটা ছিল শিভাস রিগ্যালের তলানি। ওঁরই পানপাত্রটা। বাসু এদিকে ফিরে বললেন, তোমার অভিনয় শেষ হয়েছে, কৌশিক! এনকোর বলব না, বলব স্প্লেন্ডিড! ওঠ। উঠে বস।...সরি টু ট্রাবল য়ু ডঃ দাশ অ্যান্ড অ্যাগি—

ব্রজদুলালের গলকণ্ঠটা বার দুই ওঠা-নামা করল। এক ঢোক পানীয় সেই কণ্ঠনালীতে ঢেলে দিয়ে উনি বললেন, এর মানেটা কী হলো, ব্যারিস্টারসাহেব? মশ্‌করা?

ইন্দ্রকুমার বললে, চিপ গিমিক! এ ফিল্‌থি জোক! চলে এস, সুভদ্রা!

সে চলতে শুরু করে।

বজ্রগম্ভীর স্বরে পিছন থেকে ডি আই জি বার্ডওয়ান বলে ওঠেন, হোল্ড অন, প্লিজ। কেউ আসর ছেড়ে চলে যাবেন না।

রুখে ওঠে ইন্দ্রকুমার : মানে? কী বলতে চান আপনি? আমরা কি গ্রেপ্তার হওয়া আসামী?

ডি আই জি ওর চোখে চোখ রেখে বললেন, অন্য সকলের কথা থাক। কিন্তু আপনি চলে যাবেন না, মিস্টার চৌধুরী। ওই চেয়ারে বসে থাকুন। আমাকে জেনে দিতে দিন মিস্টার পি কে বাসু এই উৎকট রসিকতাটা কেন করলেন—ওই 'ফিল্‌থি জোক'টা।

ইন্দ্রকুমার এদিক-ওদিক তাকিয়ে আবার বসে পড়ে।

ডি আই জি এবার বাসুসাহেবের দিকে ফিরে বললেন, এটা আপনি কেন করলেন বাসুকাকু?

—এটা একটা ড্রেস-রিহার্সাল, বাচ্চু! আমি একটা পরীক্ষা করে দেখতে চাইছিলাম—দশ-বিশজন প্রত্যক্ষদর্শীর সামনে ওইভাবে হাতসাফাইটা করা চলে কিনা! অবশ্য পঞ্চানন করেছিল বিজলিবাতির আলোয়, আমাকে আলো-আঁধারির পরিবেশের সাহায্য নিতে হল। কারণ আমি প্রায় নিশ্চিত জানতাম—কৌশিক পড়ে গেলেই কেউ-না-কেউ ওর গ্লাসটাকে দখল করতে চাইবে। অ্যাবে শবরিয়ার বেলা আমরা বুঝতেই পারিনি ব্যাপারটা কী হতে যাচ্ছে। ঘোষালের বেলাতেও পঞ্চানন হাতসাফাইটা করতে পেরেছিল; কিন্তু আমার আশঙ্কা ছিল বার-বার তিনবার ম্যাজিকটা দেখানো চলবে না—যদি না একটু আলো-আঁধারির ব্যবস্থা করা যায়।

পকেট থেকে একটা কাচের গ্লাস বার করে বাসু সেটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। বললেন, কৌশিক এই গ্লাসে ড্রাই-মার্টিনী পান করছিল। ছায়া হুমড়ি খেয়ে পড়ার আগেই আমি ওটা সরিয়ে নিতে পেরেছিলাম। বাস্তবে, আমি পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলাম—দু-দুবার পানপাত্রের তলানিতে বিষের হদিস পাওয়া গেল না কেন। আদালতে এ প্রশ্নটা উঠবেই। আমার মুখের কথায় হয়তো বিচারককে 'কনভিন্স' করানো যেত না। তাই দু-দুশজন সাক্ষীর ব্যবস্থা আমাকে করতে হল। প্রমাণ করতে : এটা সম্ভব!

ডি আই জি বলেন, আপনি কি বলতে চান, পঞ্চানন ঘড়াই ওইভাবে হাতসাফাই করে গ্লাসটা সরিয়ে ফেলেছিল?

—আমি কেন বলব? তোমরা যে কেউ বল না—তা না করা হয়ে থাকলে গ্লাসের তলানিতে বিষের ইঙ্গিত পাওয়া গেল না কেন? আপনারা বিকল্প কোনো সমাধান দাখিল করতে পারেন?

ডি আই জি বলেন, না, পারি না। কিন্তু তাহলে অ্যাবে শবরিয়ার ক্ষেত্রে সমাধানটা কী হবে? সেখানে তো পঞ্চানন ঘড়াই ছিল না।

বাসু বলেন, তার একমাত্র কারণ পঞ্চানন ঘড়াই ঘোষালকে হত্যা করেনি। দু-দুটি ক্ষেত্রে ম্যাজিশিয়ান যদি একই ব্যক্তি হয়, তাহলে পঞ্চাননকে ঘোষালের মৃত্যুর জন্য দায়ী করা চলে না।

ব্রজদুলাল বলেন, সেটা কী করে সম্ভব? পঞ্চানন তাহলে ওভাবে পালিয়ে গেল কেন? পঞ্চাননকে দেহরক্ষী হিসাবে কে নিযুক্ত করেছিল?

—কেউ নয়, ব্রজদুলালবাবু, কেউ নয়! পুলিস যাকে 'পঞ্চানন' বলছে, সেই অ্যান্টিসোস্যালের অনেক দোষ, কিন্তু এক্ষেত্রে কেউ তাকে প্রফেশনাল খুনি হিসাবে নিযুক্ত করেনি। বাস্তবিকপক্ষে ডাক্তার ঘোষালকে বিষপ্রয়োগে যে হত্যা করেছে, সে পঞ্চানন ঘড়াই নয়, ঘোষালের সহপাঠী এবং বাল্যবন্ধু, অর্থাৎ আমার ওই 'জোড়াখুন কাহিনী'র নায়ক : বটুক চোংদার!

ব্রজদুলাল অবাক হয়ে বলেন, আপনি বলতে চান, বটুক চোংদার সেদিন সন্ধেয় ঘোষাল ডাক্তারের বাড়ির পার্টিতে ছিল?

—ছিল!

—অথচ এতগুলি মানুষের মধ্যে কেউ তাকে দেখতে পেল না?

—না, কেন জানেন? সবাই তাকে দেখেছে, তবে ছদ্মবেশে : পঞ্চানন ঘড়াই-এর ছদ্মবেশে। চোংদার ছদ্মবেশ ধারণে অসাধারণ দক্ষ। আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়, পঞ্চানন ঘড়াই যখন পুলিসের এক্তিয়ার থেকে পালায় তখন আরক্ষা বিভাগ থেকে একটি পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই ঘোষণাপত্রে পচাই-এর সামনে থেকে এবং পাশ থেকে দুটি ফটো ছাপা হয়েছিল। বটুক চোংদার সে দুটি যোগাড় করে। আপনি জানেন কি জানেন না, জানি না, ব্রজবাবু—একবার একটা মজাদার ঘটনা ঘটে। ফুটবল-সম্রাট পেলে কলকাতায় এসে যখন তাঁর নিজস্ব নৈপুণ্য দেখাতে পারলেন না, তখন লোকে কী বলাবলি করেছিল জানেন? বলেছিল : আই এফ এ পেলেকে আদপেই দক্ষিণ আমেরিকা থেকে উড়িয়ে আনেনি। পেলের 'মেক-আপ' নিয়ে মাঠে নেমেছিল, ছদ্মবেশ ধারণে অসাধারণ দক্ষ অভিনেতা ওই : বটুক চোংদার!

ব্রজদুলাল ধীরে ধীরে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাকিয়ে দেখলেন তাঁর বন্ধু ইন্দ্রকুমারের দিকে। ইন্দ্র তখন তার জুতোর ফিতে বাঁধায় হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ব্রজদুলাল বলেন, এসব কী বলছেন আপনি? ইন্দ্র? তার কী স্বার্থ? সে কেন এমন জঘন্য কাজ করবে? আর তাছাড়া ...ওরা...ওরা তো বাল্যবন্ধু! ঘোষালের মৃত্যুতে ইন্দ্র কীভাবে ভেঙে পড়েছিল তা নিজে চোখে দেখেননি?

হঠাৎ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে ইন্দ্রকুমার। ডি আই জি বার্ডওয়ান রেঞ্জের দিকে ফিরে বলে, সরি, স্যার! সহ্যের একটা সীমা আছে! এ পাগলের প্রলাপ এভাবে আর বসে

বসে শুনতে পারছি না। আমাকে ওই আষাঢ়ে গল্পটা জোর করে শোনাতে হলে আমাকে অ্যারেস্ট করতে হবে গুড নাইট! এস সুভদ্রা—

ডি আই জি ধীরেসুস্থে বললেন, ইট্‌স্ য়োর প্রিভিলেজ, মিস্টার চৌধুরী। আই মিন, গল্পটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে ওই চেয়ারে বসে থাকতেই হবে। তবে হ্যাঁ, আপনি চাইলে হ্যান্ডকাপ পরে বসে বসে শুনতে পারেন। ...চন্দন!

যেন অন্তরীক্ষ থেকে আবির্ভূত হল ইন্সপেক্টর চন্দন নন্দী। তার বাঁ হাতে স্টেনলেস-স্টিলের হ্যান্ডকাপ। ডান হাত তুলে সে ডি আই জি-কে স্যালুট দিয়ে বললে, ইয়েস স্যার?

ডি আই জি কোনো আদেশ দেবার আগেই বাসুসাহেব বলে ওঠেন, ইট্‌স্ মাই পার্সোনাল অ্যাপিল, ডি আই জি বার্ডওয়ান রেঞ্জ, স্যার! ইন্দ্রকুমার চৌধুরী ওরফে বটুক চোংদার, ওরফে পঞ্চানন ঘড়াই আজ সন্ধ্যায় আমার আমন্ত্রিত অতিথি। এ বাড়ির ভিতরেই ওকে হাতকড়াটা না-ই বা পরালেন? আমি কথা দিচ্ছি—ও শান্ত হয়ে বসে সব কথা শুনবে। শোনাটা ওর দরকার—বিশেষ দরকার, ওর নিজের স্বার্থেই!

তারপর ইন্দ্রকুমারের দিকে ফিরে বললেন, শোন ইন্দ্র, তুমি আমার ক্লায়েন্ট নও, তবু তোমার সাংবিধানিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে দিতে চাই। এই বাড়ি ছেড়ে বার হওয়ামাত্র পুলিস তোমাকে ফর্মালি গ্রেপ্তার করবে ; বাস্তবে, তুমি এখনো ডি-ফ্যাক্টো আন্ডার-অ্যারেস্ট। তাই আমার পরামর্শ : তুমি এখন একটি কথাও বলবে না। শুধু শুনে যাবে। তোমার স্বরূপ বুঝে ফেলার পর তুমি আর আমার বন্ধু নও—কিন্তু আজ রাত্রে—আগেই বলেছি—তুমি আমার আমন্ত্রিত অতিথি। চুপটি করে বসে থাক তুমি—বুঝে নেবার চেষ্টা কর : কীভাবে নাগপাশে জড়িয়ে পড়েছ। আত্মরক্ষা যদি আদৌ করতে পার, আমি খুশি হব।

যুগলকিশোর জানতে চায়, আপনার প্রথম সন্দেহটা কবে জাগে?

বাসু বলেন, পুরীতে। বিল শবরিয়ার মৃত্যুর আগের রাতের ঘটনাটায়। গভীর রাত্রে, একান্ত নির্জনে, বারান্দায় ইন্দ্রকুমার যখন ডক্টর ঘোষালকে বলেছিল, কোট 'আমাকে আর নীতিকথা শোনাতে আসিস না রে শিবু! তোর বৃন্দাবনলীলার কথা কি আমি জানি না, মনে করিস?' আনকোট।

ব্রজদুলাল অবাক হয়ে বলেন, সে-কথা আপনি কেমন করে জানলেন? আপনি নিজেই বলছেন : 'গভীর রাত্রে', 'একান্ত নির্জনে'...

—এ প্রশ্ন আদালতে যখন ইন্দ্রকুমারের উকিল আমার কাছে জানতে চাইবে তখন তার জবাব দেব। আপাতত শুধু বলি, তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম ইন্দ্র মিছে কথা বলেছে—ওরা দুজন বাল্যবন্ধু, সহপাঠী। দুজনের সম্পর্ক 'তুই-তোকারি'র। তবে ইন্দ্রকুমার যেহেতু অভিনয়-জগতে বয়সটা কমাতে চায় তাই ঘোষাল এই কথাটা গোপন রাখে। কিন্তু ওই 'বৃন্দাবনলীলা'র ব্যাপারটা তখন বুঝতে পারিনি। সে বিষয়ে সন্দেহ জাগল যখন ডঃ অমরেশ দাশ গত দশ বছরের ডোনার্স-লিস্ট-এর হিসেবটা দেখালেন।

কৌশিক বলে, হ্যাঁ, আগেও আপনি অমন একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কিন্তু ওই হিসাবে সন্দেহজনক কিছু তো দেখিনি।

—দেখা উচিত ছিল কৌশিক ; তুমি পাস-করা এঞ্জিনিয়ার। অঙ্কশাস্ত্রটা তোমার দখলে। শোন, বুঝিয়ে বলি। প্রথম কথা : ইন্দ্রের রোজগার যখন কম ছিল, দশ বছর আগে, তখনও সে দান করে গেছে। কেন? সে তো ইনকামট্যাক্স দিত না তখন। তাই আর সবাইয়ের মতো 80 G ধারায় ইনকামট্যাক্সে ছাড়া পাওয়ার প্রশ্ন তো তখন ছিল না—

সুজাতা বলে, ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, বন্ধুর সৎকাজে ইন্দ্রবাবু নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী সাহায্য করেছিলেন।

—সেটাই স্বাভাবিক সমাধান। কিন্তু অঙ্কের হিসাবে একটু অসঙ্গতি নজরে পড়ল আমার। অন্য সবাই যা বার্ষিক দান হিসাবে দিয়েছেন, তা হাজার অথবা পাঁচশত টাকার গুণিতকে। লক্ষ্য করে দেখ, সংখ্যাগুলি 500/-, 1,000/-, 1.500/-, 2000/-, 3,000/-, এবং 5.000/-। অথচ ইন্দ্রের ক্ষেত্রে এমনটা হয়নি। সে 1986 থেকে '88 পর্যন্ত দিয়েছে 1800/- হারে ; পরের তিন বছর 2.400/- টাকা করে, এবং তারপর অবশ্য হাজারের গুণিতকে 3,000/- করে। ইদানীং দিচ্ছে 3.600/- টাকা বার্ষিক। কেন? ঐ চারটি সংখ্যা—1.800/- হারে ; 2,400/-, 3.000/- এবং 3,600/- কেন হলো? কেন হলো না থওকা হিসাবে যথাক্রমে : 2,000/-, 2,500/-, 3.000/- এবং 3.500/- ?

সুজাতা বললো, এর কি কোনো কারণ থাকতে পারে?

—পারে। যদি ঐ সংখ্যাগুলিকে '12' দিয়ে ভাগ কর। সেক্ষেত্রে মাসিক দেয় হয় : 150/-, 200/-, 250/-, 300/-, তাই না?

সুজাতা বলে, তাতেই বা কী প্রমাণ হয়?

—না, প্রমাণ কিছু হয় না, তবে একটা সম্ভাবনার সূত্র পাওয়া যায়। পুরীতেই ডাক্তার ঘোষাল কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, ওঁর হাসপাতালে বর্তমানে কোনো রোগীকে রাখতে হলে মাসিক চার্জ হচ্ছে 300/- টাকা। আগে ছিল আড়াই শ' করে। আরও আগে মাসিক দুইশত করে দিলেই চলত, যদিও প্রথম পর্যায়ে বেড-চার্জ ছিল মাত্র দেড় শ' ; ফলে একটা সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে : ইন্দ্র হয়তো বার্ষিক দান করত না আদৌ। একটি রোগীকে পার্মানেন্টলি হাসপাতালে রাখার মাসিক খরচটা বছরে একবার মিটিয়ে দিত। প্রমাণ নয়, সম্ভাবনা।

কৌশিক বললো, এ-দিকটা আমরা খেয়াল করিনি।

বাসু বলেন, ঐ অজানা রোগীর পরিচয় আমাকে কেউ জানায়নি, কিন্তু দুজনের ঐ গোপনীয়তা থেকেই আমরা সন্দেহ হলো রোগী নয়, ইন্দ্র যার চার্জ মেটায় সে রোগিণী! আর ঐ বৃন্দাবনলীলার প্রসঙ্গ যখন উঠেছে, তখন মেয়েটি 'কুন্তী দোসাদ' হলেও হতে পারে। কিন্তু সেটা তো আমার আন্দাজ। প্রমাণ হবে কী ভাবে? কুন্তী দোসাদের পরিচয় জানত ঘোষাল, কিন্তু সে মৃত ; আর জানে ইন্দ্র : সে বলবে না। অ্যাগিও তা জানে না। বন্ধুর প্রতি বিশ্বস্ততায় ঘোষাল তা হয়তো অ্যাগির কাছ থেকেও গোপন করেছিল। তাহলে? আর একটা অসঙ্গতির কথা তখন বিশ্লেষণ করতে বসলাম। ঘোষাল সরল মনে গল্প করেছিল যে, ওরা সহপাঠী। ইন্দ্রকুমার তার সঙ্গে একই বছরে, 1961-তে, ম্যাট্রিক পাস করে। থার্ড ডিভিশনে। একথা ইন্দ্র স্বীকার করেছে অনুরাধার কাছে, এবং সুভদ্রার কাছেও। অথচ আমাকে বলেছে, সে নন্‌ম্যাট্রিক। কেন? চিরাগোড়া বয়েজ স্কুলের খতিয়ানেও ইন্দ্রকুমার চৌধুরীর নাম পাওয়া গেল না। এ সমস্যার একমাত্র সমাধান হতে পারে : যদি ইন্দ্রকুমার পরবর্তী জীবনে এফিডেবিট করে তার পিতৃদত্ত নাম—যে-নাম আছে ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটে—তা পরিবর্তন করে থাকে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি বিচার করতে বসলাম। আমারই পরামর্শ অনুযায়ী যুগলকিশোর চারজন সাসপেক্ট-এর বাড়ি তল্লাশি করায়। চারজনকে করা হলো এজন্য, যাতে প্রকৃত অপরাধী সন্দিহান না হয়ে পড়ে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল দেখা, ইন্দ্রকুমারের কোনো পাসপোর্ট আছে কিনা, থাকলে তার নম্বর কত?

অনুরাধা জানতে চায়, কেন? পাসপোর্টের নম্বর পেলে কী লাভ হবে?

—তুমি জান না, অনু, পাসপোর্টের জন্য আবেদন করার সময় দরখাস্তকারীকে জানাতে হয়, তার কোনও 'অ্যালায়াস' আছে কি না, অর্থাৎ জীবনের কোনো পর্যায়ে সে অন্য কোনো নামে, অন্য কোনও পরিচয়ে পরিচিত ছিল কি না। ওর পাসপোর্টের নম্বর ধরে ব্রেবোর্ন রোডের পাসপোর্ট অফিসে তল্লাশি করে জানা গেল, ইন্দ্রকুমার দরখাস্তে জানিয়েছিল তার বাবার নাম মোহিনীমোহন চোংদার এবং ওর পিতৃদত্ত নাম বটুকেশ্বর চোংদার। সেই আমি প্রথম জানলাম : ইন্দ্রকুমারের পিতৃদত্ত নাম ও উপাধি।

যুগলকিশোর এই সময়ে বলে ওঠে, স্বীকার করব, এই আবিষ্কারে আমি কিন্তু খুব কিছু উল্লসিত হইনি। আমার মনে হয়েছিল : সিনেমার জগতে 'বটুক চোংদার' নাম নিতান্ত অচল বলেই উনি এফিডেবিট করে নামটা বদলেছেন। কিন্তু ব্যারিস্টারসাহেব আমার দৃষ্টি অন্য একটা দিকে আকর্ষণ করলেন। ইন্দ্রকুমার সিনেমার নামার চার বছর আগে এফিডেবিট করে নামটা বদলেছেন। স্বতই প্রশ্ন জাগে : কেন? বাসুসাহেবের পরামর্শমতো আমি একজনকে ধানবাদে পাঠিয়েছিলাম। এবার স্কুলের নথিতে দেখা গেল বটুকেশ্বর চোংদার ঐ একষট্টি সালেই থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাস করেছিল। স্কুলের এক প্রাক্তন অতিবৃদ্ধ হেডমাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে জানা গেল, ঐ বটুক চোংদার ধানবাদের একজন বর্ধিষ্ণু জোদ্দারের নাবালিকা মেয়েকে ইলোপ করেছিল। থানাতে চৌত্রিশ বছর আগেকার এফ. আই. আর. পাওয়া গেল। যিনি এফ. আই. আর. লজ করেছিলেন তিনি প্রয়াত ; কিন্তু তাঁর পুত্র মহাবীর দোসাদের কাছ থেকে জানা গেল—তাঁর অপহৃতা দিদি কুন্তী দোসাদের কোনও হদিসই করতে পারেনি বিহার-পুলিস। এ থেকেই আমরা দুইয়ে-দুইয়ে চার করেছি—

ইন্দ্রকুমার আর স্থির থাকতে পারে না। হঠাৎ বলে ওঠে, বাট...বাট...মাই অ্যালেবাঈ...আটাশে অক্টোবর আমি তো গালুডিতে...'সুবর্ণরেখা' হোটেলে।

বাসু ধমকে ওঠেন : শাট আপ্! তুমি কোনও কথা বলবে না, ইন্দ্র! যতক্ষণ না তোমার সলিসিটার এসে উপস্থিত হন। তবে হ্যাঁ, প্রশ্নটা যখন বেমক্কা করে ফেলেছ তখন জবাবটা জেনে যাও। দেখ, কোনোভাবে জোড়াতালি দিয়ে নিজের ডিফেন্সটা দিতে পার কি না। আমি সব কখানা তাসই বিছিয়ে দেব। চিড়িতনের দুরি থেকে রঙের টেক্কা। দেখ আত্মরক্ষা করতে পার কি না। শোন : তুমি ঘটনার আগের শনিবার, একুশে গালুডি যাও। তিনতলার একখানা ডব্‌ল্‌বেড রুম বুক কর। পুরো একটা দিন সকলের সঙ্গে হৈ-হৈ করেছ। একদিনেই গোটা ত্রিশেক ফটো তুলেছ। তারপর ঘরটা লক্ করে কলকাতায় ফিরে এসেছিলে। ঘরটা খাতাপত্রে তোমার নামেই বুক করা ছিল। চুঁচুড়ায় বন্ধুকৃত্য সেরে তুমি উনত্রিশে, রবিবার আবার গালুডিতে ফিরে যাও। এবং পরদিন সোমবার চেক-আউট করে কলকাতায় ফিরে এসেছিলে। এই তো? হিসেব মিলছে?

ডি. আই. জি. বলেন, তার কোনো প্রমাণ আছে?

—রাশি, রাশি। বিষ সংগ্রহ করায় এবং হাতসাফাইয়ে ইন্দ্র যে প্রফেশানলিজম্ দেখিয়েছে তার তিলমাত্র দেখাতে পারেনি ওর ঐ ভুয়ো অ্যালেবাঈ-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায়। একে একে বলি। যুগলকিশোর এজন্য চন্দন নন্দীকে 'সুবর্ণরেখা' হোটেলে পাঠায়। হোটেলের বিলে দেখা যাচ্ছে একুশে সে প্রথম খাবারের বিল মেটায় লাঞ্চে, দুপুরে। তারপর আফটার-নুন টি, ডিনার ; পরদিন বাইশে বেড-টি থেকে ডিনার সব কিছুর বিলের কাউন্টার-ফয়েল পাওয়া যাচ্ছে। সোমবার, তেইশে বেড-টির পর : ব্ল্যাঙ্ক! তেইশ থেকে আটাশ পাক্কা ছয়দিন বোর্ডার রেস্তোরাঁর কোনও বিল মেটায়নি। সুবর্ণরেখার ধারে-কাছে কোনও খাবার দোকান নেই। ফলে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ইন্দ্রকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে—কেন সে ছয়দিন রুদ্ধদ্বার কক্ষে

প্রায়োপবেশনে কাটিয়েছে। আসলে ঘরটা বুক করে রেখে সে চুঁচুড়ায় ফিরে আসে। ছদ্মবেশে। ঘোষাল তাকে দেহরক্ষীরূপে বাড়িতে থাকতে দেয়। ঘোষাল স্বপ্নেও ভাবেনি, ইন্দ্র কেন এভাবে ছদ্মবেশে এসেছে। ইন্দ্র যে একজন কুখ্যাত অ্যান্টিসোস্যালের ছদ্মবেশ ধারণ করেছে তা কেউ আন্দাজ করেনি। পঞ্চাননের অ্যাকটিভিটি ছিল মুর্শিদাবাদে। ইন্দ্র ঘোষালকে একটা পার্টি দেবার জন্য প্ররোচিত করে। হয়তো দুই বন্ধুতে বাজি ধরেছিল—এই বাজি ধরার কথা ঘোষাল টেলিফোনে জানিয়েও ছিল ছায়াকে—কেউ ইন্দ্রকুমারের ছদ্মবেশ ধরতে পারে কিনা। এজন্যই বেছে বেছে পুরী-পার্টির লোকদের ডাকা হয়েছিল। আবার পার্টি হবে কিন্তু অ্যাগি, ডঃ দাশ বা যুগলকিশোরের নিমন্ত্রণ হবে না তা তো হয় না। আফটার-ডিনার ইন্দ্রকুমার ছদ্মবেশ খুলে ফেললে দারুণ একটা 'ফান' হবে—সেটাই ছিল সে রাত্রের : 'মজারু'!

কৌশিক বলে, কিন্তু মিস্টার চৌধুরী যে ছবি তুলেছিলেন তাতে তো তারিখও ছাপা পড়ে গেছে। আটাশে—যেদিন ডক্টর ঘোষাল মারা যান সেই তারিখেরও তো খান-ছয়েক ফটো আছে।

বাসু পকেট থেকে ফটোর বান্ডিলটা বার করে বেছে বেছে একটি ফটো বাড়িয়ে ধরেন ডি. আই. জি-র দিকে। বলেন, এই ফটোখানা দেখ বাচ্চু। গ্রুপ ফটোতে সাত-আটজন আছে। ডাইনিং-হলে ফ্ল্যাশ বালবে তোলা ছবি। পিছনের দেওয়ালে দেওয়াল ঘড়িতে সময়টা পড়া যাচ্ছে : রাত আটটা পঁয়তাল্লিশ। ছবিতে তারিখ আছে 28th। তাই না?

ডি. আই. জি. খুঁটিয়ে দেখে বললেন, হ্যাঁ তাই।

—ইন্দ্র দাবি করছে এ ছবি আটাশ তারিখ রাত পৌনে নয়টায় 'সুবর্ণরেখা' হোটেলের ডাইনিং-হলে তোলা। তাই তো?

যুগলকিশোর বলে, ছবির ঘড়ি এবং ক্যামেরার অটোমেটিক ছাপ তো তাই প্রমাণ দেয়। দেয় না?

—না, দেয় না। বাস্তবে আটাশ তারিখে রাত পৌনে নয়টায়, অর্থাৎ—ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম রাত আটটা পঁয়তাল্লিশে, ভারতবর্ষের যে কোনো ভূখণ্ডে ঐ ক্যামেরায় ফটো তোলা হলে অটোমেটিক জাপানী ক্যামেরায় তারিখটা উঠবে উনত্রিশে।

অনুরাধা বলে, সে কি! কেন?

—যেহেতু টোকিও-টাইম ভারতীয় সময়ের চেয়ে সাড়ে চার ঘণ্টা এগিয়ে। জাপানে ঐ সময় রাত একটা পনের—আটাশ নয়, উনত্রিশ তারিখের।

অনুরাধা বলে, ব্যাপারটা বুঝলাম না।

—ইন্দ্র বলেছে, সে ঐ জাপানী ক্যামেরাটা ওসাকাতে কিনেছিল। দোকানদার যে দুটো ব্যাটারি ভরে দেয় তা আজও কার্যকরী। সে ভিতরের অ্যারেঞ্জমেন্টে কখনো হাত দেয়নি। সেক্ষেত্রে জাপানী ক্যামেরায় জাপানের সময়ই দেবে। ভারতীয় সময় নয়।

—তাহলে এ ছাপটা পড়ল কীভাবে?

—ফিল্মটা ডেভেলপ হয়ে যাবার পর কোনও দক্ষ চিত্রশিল্পীকে দিয়ে—ঐ যারা চালের উপর নাম লিখে দেয়—সেই জাতীয় শিল্পীকে দিয়ে ইচ্ছেমতো তারিখগুলো লেখানো হয়েছে। এজন্যই ওকে বলতে হয়েছে ক্যামেরাটা খোয়া গেছে—ওর কাছে নেই। কিন্তু যেহেতু বেচারি থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাস করে—ভূগোলে বোধহয় খুব কম নম্বর পায়—তাই ও ঠিকমতো কারচুপি করতে পারেনি। জানে না যে, এখানে আটাশ তারিখ রাত পৌনে নয়টায় ফটো তুললে ঐ জাতীয় ক্যামেরায় ডেট পড়বে উনত্রিশ তারিখের। আরও একটা কথা—গোয়েন্দা বিভাগ যদি তদন্ত করে দেখে, তাহলে দেখা যাবে ঐ ফটোতে যাদের

দেখা যাচ্ছে—আটাশ তারিখের আগেই 'সুবর্ণরেখা' হোটেল থেকে তাদের অনেকে চেক-আউট করে চলে গেছে!

পম্পা এই সময় আকুলভাবে প্রশ্ন করে ওঠে, কিন্তু একটা কথা! অমন দেবতুল্য মানুষকে ইন্দ্রকুমার খুন করলেন কেন? কী ক্ষতি করেছিলেন ডাক্তার সাহেব?

—আস্ক হিম! ঐ তো বসে আছে লোকটা। জিজ্ঞেস কর ওকে!

পম্পা কিন্তু তা পারলো না। ইন্দ্রের মাথাটা নেমে গেছে—মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টি।

বাসুই পাদপূরণ করেন : ঘোষাল ডাক্তার যে ইন্দ্রর অনেক-অনেক উপকার করেছে। নাবালিকা অপহরণের অভিযোগে ওকে ধরিয়ে দেয়নি। ওর নাম, উপাধি, বয়স গোপন রেখেছে—এমনকি দীর্ঘ বিশ-পঁচিশ বছর ওর 'উইনসাম-ম্যারো' অ্যাগি ডুরান্টের কাছ থেকেও গোপন রেখেছে উন্মাদিনী কুন্তী দোসাদের প্রকৃত পরিচয়। এত এত উপকারের প্রতিদান দিতে হবে না?

যুগলকিশোর বলে, এটা তো সেন্টিমেন্টের কথা হলো, স্যার! হত্যার একটা জোরালো মোটিভ তো থাকবে?

—দেন, বেটার আস্ক সুভদ্রা মোহান্তি।

সুভদ্রাও মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টি। জবাব দেয় না।

বাসুই আবার বলেন, মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সুভদ্রা ইন্দ্রকে রেজিস্ট্রি বিবাহ করতে যাচ্ছে—আগামী সপ্তাহেই। সুভদ্রা না হোক কোটি টাকার সম্পত্তি লাভ করেছে বাবার উইল মোতাবেক। তাই ইন্দ্র তার সাবেক সঙ্গিনী অনুরাধাকে ত্যাগ করে এখন সুভদ্রার সঙ্গে এনগেজমেন্ট করেছে। কিন্তু ডক্টর ঘোষাল জীবিত থাকলে তা হতো না। ঘোষাল ওকে নাবালিকা-হরণের অপরাধে ধরিয়ে দেয়নি বটে, কিন্তু সে দিক থেকে শিবশঙ্কর অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক। দশ বছর ধরে ইন্দ্রর দেয় টাকা সে আদায় করে এসেছে কড়াক্রান্তি হিসাবে। কুন্তী ইন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী। সাবালিকা হবার পর রীতিমতো রেজিস্ট্রি করে তাকে বিয়ে করেছিল ইন্দ্র। ফলে, ইন্দ্রকুমার বুঝে নিয়েছিল, সুভদ্রার ঐ কুবেরির্ষিত সম্পত্তি গ্রাস করতে হলে দুজনের একজনকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে। হয় কুন্তী দোসাদ, ওরফে কুন্তী চৌধুরী, অথবা শিবু ঘোষাল। কুন্তীকে হত্যা করা অত্যন্ত কঠিন। হাসপাতালে প্রহরী আছে, অ্যাগির সতর্ক ব্যবস্থাপনা আছে, সর্বোপরি আছে ঘোষাল ডাক্তারের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। কারণ ইন্দ্র জানে যে, ঘোষাল জানে—ইন্দ্র কুন্তী নামক আপদটাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে উন্মুখ। তাই ইন্দ্রকুমার বেছে নিল ঘোষালকেই। সে জানত, ঘোষাল অতটা আশঙ্কা করবে না—ইন্দ্রকুমার হয়তো কুন্তীর ক্ষতি করতে পারে, বন্ধুর কোনো ক্ষতি করবে না।

অনুরাধা বললে, তাই বলে খুন! ও তো এমন ছিল না।

—না, ছিল না ; কিংবা কে জানে, হয়তো ছিল। পাপের পথে যাবার সুযোগটা এতদিন পায়নি। এখন হঠাৎ দেখলো, রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্ব লাভের পথে দুটি পর্বতপ্রমাণ বাধা : হিন্দু কোড বিল আর বাল্যবন্ধু ঘোষাল! হয়তো বছরখানেকের মধ্যেই আমরা খবর পেতাম ভুল করে সুভদ্রা বেশি পরিমাণে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ফেলেছে। ধর্মপত্নীর দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুতে নটসূর্য বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ত—ঠিক যেমন সে পাগলের মতো কেঁদেছিল বাল্যবন্ধু ঘোষালের অকালমৃত্যুতে।

ডি. আই. জি. বললেন, একটা সমস্যার সমাধান কিন্তু এখনো হয়নি বাসুকাকু। অ্যাবে বিল শবরিয়ার মৃত্যুটা...?

—সেটা নেহাৎই একটা ড্রেস-রিহার্সাল। মহড়া দিতে দিতে যখন ডিরেক্টরের আত্মবিশ্বাস

এসে যায় যে, সে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত হয়েছে, তখন সে একটা 'ড্রেস-রিহার্সালের' আয়োজন করে। সমঝে নিতে চায় দর্শকমণ্ডলী তার হাতসাফাইটা ধরতে পারে কি না।

—শুধু সেজন্য একটা মানুষকে কেউ খুন করে?

—করে। করেছে। তবে ইন্দ্র একটা চান্সও নিয়েছিল। ইন্দ্রকুমার খুব ভালোভাবে জানত যে, ডাক্তার ঘোষাল সবচেয়ে পছন্দ করে 'ভদ্‌কা-উইথ-লাইম'। অ্যাগি ডুরান্টের জবানবন্দিটা আবার একবার পড়ে দেখ বাচ্চু, সেও ঐ কথা বলেছে। ঘোষালের বাড়িতে ফ্রিজে ঐ একটা পানীয়ই থাকত—'ভদ্‌কা'। তাই পুরীতে ইন্দ্রর নির্দেশে খিদ্‌মদ্‌গার যখন ট্রে নিয়ে ঘোষালের সামনে এসে দাঁড়ায় তখন ট্রেতে ছিল ছয়টা গ্লাস—আমার স্পষ্ট মনে আছে। তিনটে ছিল স্কচ-হুইস্কি—বাসন্তী রঙের, দুটো রম, নীলচে-কালো, আর একটি মাত্র পাত্রে ভদ্‌কা-উইথ-লাইম, সাদা! আততায়ী আশা করেছিল রঙ দেখেই ঘোষাল বুঝে নেবে একটাই ভদ্‌কা আছে। বড়জোর সে জিজ্ঞেস করতে পারে, 'এটা কী? জিন নাকি?'—ইন্দ্র জানে, ঘোষাল জিনে স্ট্যান্ড করতে পারত না। তাই তার নব্বই পার্সেন্টি আশা ছিল ঘোষাল স্বেচ্ছায় ভদ্‌কার গ্লাসটা তুলে নেবে। কিন্তু ঐ! রাখে কেষ্ট মারে কে? ঘোষাল তুলে নিল স্কচ, একটু সোডা মিশিয়ে নিল। নেক্সট বসেছিলাম আমি। নিলাম স্কচ-অন-রক্‌স্! খিদ্‌মদ্‌গার যখন অ্যাবে শবরিয়ার সামনে এসে দাঁড়ালো তখন ট্রের উপর ছিল দুটো রম, একটা হুইস্কি আর একটা ভদ্‌কা। মারে কেষ্ট রাখে কে? অ্যাবে স্বেচ্ছায় তুলে নিল হলাহল পাত্রটা!

সুজাতা জানতে চায়, 'সুবর্ণরেখা' হোটেলে টেলিফোন রেকনারটা ফেলে আসার উদ্দেশ্যও কি তাই? আর একটা বাড়তি প্রমাণ সংগ্রহ করে রাখা যে, ঐ ঘরে উনি ছিলেন?

—তা তো বটেই। দেখ ওর ধূর্তবুদ্ধি। বইটাতে নাম সই করেছে, কিন্তু ঠিকানা লেখেনি। আশা করেছে, কেউ না কেউ ওটা কাউন্টারে জমা দেবে। সেখানে ওর বাড়ির ঠিকানা আছে। হোটেল ম্যানেজারের কাছে চিঠি লিখে এবং খরচ পাঠিয়ে ওটা ডাকে ফেরত নেবে। আর একটা এভিডেন্স থাকবে ওর স্বপক্ষে। টুকাইয়ের সঙ্গে অহেতুক গায়ে পড়ে ঝগড়া করার উদ্দেশ্যটাও তাই। যাতে টুকাই সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ওকে চিনতে পারে—হ্যাঁ, ঐ ভদ্রলোকই ছিলেন সুবর্ণরেখা হোটেলে।

বাসুসাহেব থামলেন।

সকলেই নীরব। ইন্দ্রকুমারের মুখটা দেখা যাচ্ছে না। সে ঘাড় গুঁজে বসে আছে। অনুরাধা—কী আশ্চর্য! মেয়েটা কি সত্যিই ভালোবেসেছিল ইন্দ্রকুমারকে?—যে ওকে ভাঙা পেয়ালার মতো আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল? কী জানি। হয়তো দীর্ঘ দুই দশকের অনেক হাসি-কান্নার স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে ওর। অনুরাধার দুই চোখে দুটি জলের ধারা। ব্রজদুলাল এখনো আঘাতটা সামলে উঠতে পারেননি।

বাসু জানতে চান, আর কারও কোনও প্রশ্ন আছে? কোনও অসঙ্গতি কি নজরে পড়ছে?

কেউ কোনো কথা বলে না।

হঠাৎ ছায়া পালিত বলে ওঠে, না, অসঙ্গতি কোনো কিছু নজরে পড়েনি, তবে আমার মনে হচ্ছে আপনি রঙের টেক্কাখানা এখনো টেবিলে নামিয়ে দেননি, মেসোমশাই।

বাসু বলেন, ও ইয়েস। আয়াম সো সরি, ছায়া! সেটার কথা বলা হয়নি। এবার বলি—

ইন্দ্রকুমারের দিকে ফিরে বললেন, এ পর্যন্ত যা বলেছি তা কনক্লুসিভ প্রুফ নয়। তোমার ল-ইয়ার তার ছিদ্র খুঁজে বার করতে পারবেন ; কিন্তু এই চূড়ান্ত প্রমাণের কোনও 'মার' নেই। ঘটনাটা আপনারা শুনুন : ঘটনার রাত্রে ছায়ার সামনে যখন হারাধন ড্রিংক্‌স্-এর ট্রেটা নিয়ে হাজির হয় তখন ছায়া তাকে বলে কোনো একটা সফ্‌ট্ ড্রিংক্‌স্ তুলে দিতে, যাতে

অ্যালকোহল নেই—যেমন, গোল্ড স্পট, সিট্রা, কোকোকোলা। কারণ কোন গ্লাসে কী আছে ও বুঝতে পারছিল না। হারাধন তখন ওর হাতে একটা 'পেপ্‌সি'র গ্লাস তুলে দেয়। এরপর ট্রে-হাতে ডক্টর ঘোষালের সামনে হারাধন এসে দাঁড়ায়। ছায়া তার জবানবন্দিতে আমাকে বলেছিল যে, তার স্পষ্ট মনে আছে : ট্রের ওপর তখন ছিল চার-পাঁচটা গ্লাস—হুইস্কি, রম, রেড-ওয়াইন, ভদ্‌কা। লক্ষণীয় ভদ্‌কা ছাড়া কোনোটাই সাদা রঙের নয়। এই সময় ঘোষাল হারাধনকে কী-একটা প্রশ্ন করেন—ঠিক 'কী' তা ছায়া শুনতে পায়নি। খুব সম্ভবত ডাক্তার ঐ সাদা রঙের গ্লাসটা দেখিয়ে জানতে চেয়েছিলেন, পানীয়টা 'জিন' না 'ভদ্‌কা'। কারণ জিন খেলেই ওঁর হেঁচ্‌কি উঠত। সম্ভবত হারাধন জানায় যে, ওটা ভদ্‌কা। হারাধন জানত : ঘোষাল ভদ্‌কার স্বাদ পছন্দ করেন। তাই ট্রেতে ঐ একটাই সাদা রঙের পানীয় ছিল—বিষমিশ্রিত ভদ্‌কা! ...ঘটনা হচ্ছে এই যে, ঘোষাল যখন প্রথম সিপ গিলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তখন ছায়ার মনে হয়েছিল যে, সে অভিনয় করছে। তারপর যখন ছায়া বুঝতে পারলো ওটা অভিনয় নয়, ডক্টর ঘোষাল মারা গেছেন, তখনই সে ঐ সন্দেহজনক মানুষটার খোঁজ করে—হারাধন দাশ! ও রীতিমতো অবাক হয়ে যায় : লোকটা ঐ মারাত্মক ঘটনার মধ্যেই সরে পড়েছে! ছায়ার দৃঢ় সন্দেহ হয়—ঐ হারাধন দাশই এ-ক্ষেত্রে বিষমিশ্রিত পানীয়টা ঘোষালকে গছিয়ে দিয়েছিল। সে তৎক্ষণাৎ একটা কাজ করে। ওর হাতের পানীয়টা মাটিতে ঢেলে ফেলে দিয়ে গ্লাসটা ন্যাপকিনে মুড়ে নিজের ব্যাগে ভরে ফেলে। গ্লাসটা ও নিয়ে এসে আমাকে দিয়েছিল...

ডি. আই. জি. বার্ডওয়ান জানতে চান, তারপর?

—আমি আমার পরিচিত একজন এক্সপার্টকে দিয়ে ঐ গ্লাসের লেটেস্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট উদ্ধার করি। দেখা যায়—ছায়া পালিতের আঙুলের ছাপ ছাড়া কোনো একজন পুরুষের তিনটি আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। আমি সেই তিনটি ফিঙ্গারপ্রিন্টের ফটোকপি যুগলকিশোরকে পাঠিয়ে দিই। পঞ্চানন ঘড়াইয়ের যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট জেল হাজতে আছে তার সঙ্গে মিলিয়ে বুঝতে পারি যে, হারাধন দাশ লোকটা পঞ্চানন ঘড়াই-এর যমজ ভাই হতে পারে, পঞ্চানন নয়!

—তারপর?

—সন্দেহজনক যে কয়জন লোক আছে তাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করতে শুরু করি। ইন্দ্রকুমার একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, মধ্যাহ্ন ভোজন করে। আমরা কিছু প্রাগাহার মদ্যপানও করেছিলাম। ও যে গ্লাস থেকে পান করে সেটি ভালো করে মুছে নিয়ে ছিলাম আগে থেকেই। ফলে ইন্দ্রকুমারের আঙুলের সুস্পষ্ট ছাপ সংগ্রহ করা গেল। আমার পরিচিত এক্সপার্ট-এর মাধ্যমে। সেদিন থেকেই আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, ডক্টর ঘোষালের বাড়িতে হারাধনের ছদ্মবেশে যে লোকটা দেহরক্ষীর চাকরি করছিল, বাস্তবে সে ইন্দ্রকুমার চৌধুরী।

যুগলকিশোর বলে, কিন্তু আপনি তো সেকথা আমাকে জানাননি।

—না, জানাইনি। কারণ তখনও আমি বুঝে উঠতে পারিনি এই খুনের মূল উদ্দেশ্যটা কী। তখনো কুন্তী দোসাদের প্রকৃত পরিচয় এবং সুভদ্রার এনগেজমেন্টটার কথা আমার জানা ছিল না। ...সুতরাং বলা চলে এ খেলায় রঙের টেক্কাখানা—আই মিন কনক্লুসিভ প্রমাণটা আমরা আদালতে দাখিল করতে পারব শ্রীমতী ছায়া পালিতের উপস্থিত বুদ্ধির জন্য। আর কেউ কিছু বলবেন?

এবার আর কেউ কিছু বললো না।

বাসু নিজে থেকেই বলেন, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলমেন! আমরা সবাই এখানে সমবেত

হয়েছিলাম একটি আনন্দসন্ধ্যা উদ্‌যাপন করতে। দুর্ভাগ্য আমাদের : আসরটা শেষ হলো একটা বেদনাদায়ক পরিবেশে। উপায় নেই। অ্যাবে বিল শবরিয়া এবং ডক্টর শিবশঙ্কর ঘোষাল দুজনকেই আমি বন্ধু বলে স্বীকার করে নিয়েছিলাম। তাদের প্রতি আমার যেটুকু বন্ধুকৃত্য ছিল তা আমি পালন করেছি। ইন্দ্রকুমারও আমার বন্ধু ছিল এক সময়, স্নেহভাজন ছিল—এখন তা নয়। তবে আজ রাত্রে সে আমার নিমন্ত্রিত অতিথি। তাই আমি আমার সব কয়টা তাস তার সামনে মেলে ধরেছি। কীভাবে ধীরে ধীরে, ধাপে-ধাপে তাকে আমি চিহ্নিত করেছি, কী কারণে আজ তাকে পুলিসের হাতে তুলে দিচ্ছি তা খোলাখুলি জানিয়েছি। যাতে সে তার ডিফেন্স কাউন্সেলের সঙ্গে পরামর্শ করে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হতে পারে। আমি বিচারক নই। কিন্তু আইন কিছুটা বুঝি। এই পৈশাচিক অপরাধের—স্থিরমস্তিষ্কে যুগ্মহত্যার অপরাধের—একটিমাত্র শাস্তিই বিধেয়। তাই লোয়ার কোর্টে যদি আসামীর 'যাবজ্জীবনের' মেয়াদ হয়, তাহলে আমি থামতে পারব না। এ কোনো প্রতিশোধস্পৃহায় নয়, এ আমার বন্ধুকৃত্য! উপরে, আরও উপরে সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত বাদীপক্ষকে টেনে নিয়ে যাব—যতদিন না ন্যায়াধীশের কণ্ঠে এই অমানুষিক বিশ্বাসঘাতকতার জন্য নির্দিষ্ট চরম দণ্ডাদেশটা ধ্বনিত হয় : দ্যাট দ্য গিল্টি পার্সন শ্যাল বি হ্যাঙড্ বাই দ্য নেক, আনটিল...

বাসু থামলেন।

নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে এল আবার।

দূরে বেতারে কেউ বাঁশী বাজাচ্ছে, আশাবরীতে। সম্ভবত আকাশবাণীতে। বাসু আবার শুরু করলেন—গুরুগম্ভীর কিন্তু নিচু গলায় : লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলমেন! আমি এবার আপনাদের অনুরোধ করব একটু উঠে দাঁড়াতে। আমাদের পরিচিত দুই প্রয়াত প্রিয় বন্ধুর আত্মার সদগতি কামনায়... না, না, রানু! প্লিজ! তোমাকে বলিনি! পরম করুণাময় তোমার সে অধিকার কেড়ে নিয়েছেন। তুমি বসে বসেই ওঁদের আত্মার সদগতি কামনা করবে।

রানু দু হাতে মুখটা ঢাকলেন।

বাসুসাহেবের শেষ ভবিষ্যদ্বাণীটা কিন্তু সফল হলো না। সবাই উঠে দাঁড়াল ; কিন্তু শুধু রানু দেবী নয়, আরও একজন দু পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারল না। পাপের ভারে বেচারি আচমকা প্রতিবন্ধীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। মৃত্যুভীত মানুষটা দু হাতে মুখখানা ঢেকে শব্দহীন কান্নায় ভেঙে পড়ল চেয়ারে বসেই!

সবাই মুদিতনেত্র! তাই কেউ দেখতে পেল না দৃশ্যটা :

যৌবনোত্তীর্ণা এক উপেক্ষিতা নারীর শীতল হাত আস্তে আস্তে নেমে এল ঐ মৃত্যুপথযাত্রীর পিঠে—নিঃশব্দ সহানুভূতিতে।

boiRboi.net

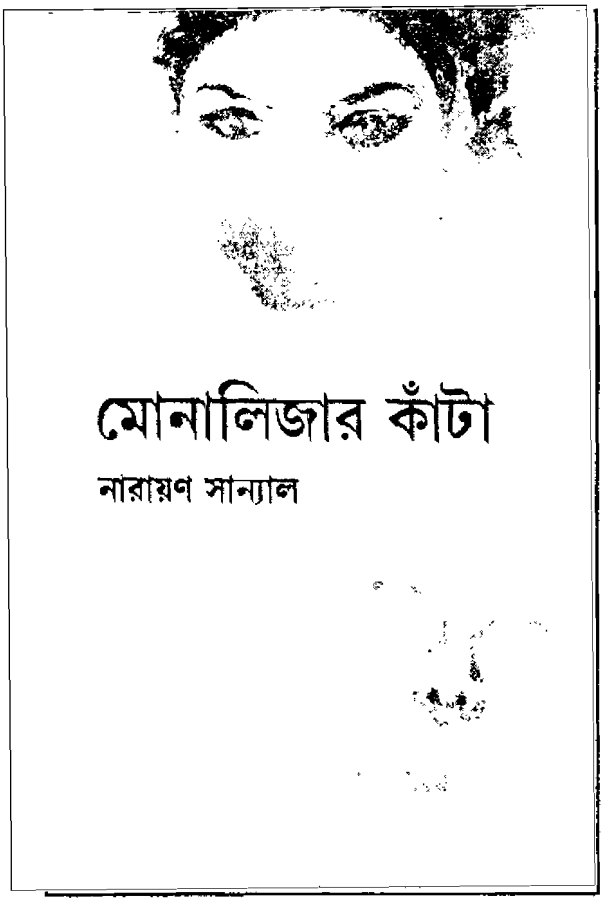

মোনালিজার কাঁটা

রচনাকাল :
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি 2001
প্রচ্ছদশিল্পী : বিজন কর্মকার
উৎসর্গ : শ্রীমতী পাপড়ি কুণ্ডু,
শ্রী বাসব নারায়ণ কুণ্ডু

—ধুৎ! তুই কি পাগল হয়ি গেলি রে বিশে! তু 'কান' শুনতি 'ধান' শুনিছিস। অ্যাই বুড়ো বয়সে দাদু টোপর পরতি যাবে কেনে, ক ?

হাসির দমকে হিজবিজবিজের মতো মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছিল বিশে। দু-হাতে পেট চেপে ধরে। সেই অবস্থাতেই বলে, যা তু। নিজি-কানে শুনি আয়, মাইরি বুলছি দিদি।

ফুট্‌কি রান্নাঘরের মেজে মুছছিল। ন্যাতাটা বালতিতে ডুবিয়ে হাতটা আঁচলে মুছতে মুছতে চলে আসে বাইরের ঘরে। দরজার আড়াল থেকে কান পেতে শুনতে থাকে। বিশেও উঠে এসেছে দিদির পিছু পিছু। দুজনেই দরজার ফাঁকে আড়ি পেতেছে।

বাইরের বারান্দায় ওঁরা সাড়ে-চারজনে ব্রেকফাস্টে বসেছেন। মিঠুর জন্য বাইরের বারান্দায় একটা দোলনা টাঙানো হয়েছে। তাতেই দোল খাচ্ছে। সেটাই যেন তার ব্রেকফাস্ট। বাসু কফিপট থেকে পেয়ালায় গরম পানীয় ঢালতে ব্যস্ত। সুজাতা রানী দেবীকে জিজ্ঞাসা করে, কী মামিমা, আপনি রাজি আছেন তো? বেনারসী শাড়ি, মাথায় মুকুট, কপালে চন্দনের ফোঁটা...

রানী কর্তার দিকে একটা চোরা-চাহনি হেনে বললেন, উপায় কি? তোমাদের শখ হয়েছে, আবদার করছ, রাজি না হয়ে পারি? একটা সন্ধ্যার তো মামলা—আর তাও জীবনে একবারই...

এবার সুজাতা বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বলে, তাহলে আপনিই বা গররাজি কেন? চুনট করা ধুতি, সিল্কের গুরুপাঞ্জাবি, গলায় গোড়ে মালা, আর মাথায় টোপর, ব্যস্! মাত্র একটা সন্ধ্যার মামলা! কী মামু?

বাসু গম্ভীর হয়ে বলেন, বাঁদরামো কর না। যা হয় না, তা হয় না। উনি রাজি আছেন তো ওঁকে নিয়েই উৎসব কর তোমরা। আমাকে টানাটানি করছ কেন?

—বা—রে! বিবাহের সুবর্ণ-জয়ন্তী বলে কথা! ও কি একা-একা হয়? আমাদের শখ হয়েছে—

বাসু বলেন, শখ হয়েছে তো শখ মেটাও, শুধু মামিকে নিয়ে। তাই বলে 'টোপর'? তোমরা ফটো তুলবে নিশ্চয়!

—ওমা! ফটো কেন? ভি. ডি. ও ক্যামেরায়...

—দেন মাই আনসার ইজ: নো! অ্যান এম্ফাটিক্ নো!

—কিন্তু কেন? কারণ তো দেখাবেন একটা?

—এই বুড়ো বয়সে.....

এবার সুজাতাকে মদৎ দিতে আলোচনায় যোগ দেয় কৌশিক। বলে, কিছু মনে করবেন না, মামু। এবার আপনার যুক্তিগুলো পরস্পরবিরোধী হয়ে পড়ছে। সেইরকম—'গুড্-ফ্রাইডের ছুটিটা এ বছর রবিবারে পড়ায় নষ্ট হলো'। যুবা বয়সে কারও বিবাহের গোল্ডেন জুবিলি হতে পারে? হওয়া সম্ভব? আপনাদের বিয়ে হয়েছে নাইনটিন ফিফ্টিনাইনে। শতাব্দীর এই শেষ বছরে আপনাদের বিবাহের গোল্ডেন জুবিলি হচ্ছে—তাই আমরা একটু ফুর্তিফার্তা করতে চাইছি, ভালমন্দ খেতে চাইছি। মামি রাজি, শুধু আপনিই বাগড়া দিচ্ছেন? আপনি এত নিষ্ঠুর কেন?

বাসু বলেন, তা বেশ তো! তোমরা খাওয়া-দাওয়া করতে চাও, কর। আমি খরচপাতি দেব। কিন্তু তাই বলে 'টোপর'! দ্যাটস অ্যাবসার্ড।

সুজাতা কৌশিককে চোখ টিপে বারণ করল। নিজে বলল, বেশ হাফাহাফি রফা হক। টোপর বাদ, কিন্তু আর সব কিছু থাকবে—চুনট করা ধুতি, গুরুপাঞ্জাবি, কপালে চন্দন...

—না, না, চন্দন-টন্দন চলবে না!

সুজাতা উঠে দাঁড়ায়। বলে, আমাদের সব প্রস্তাবই যদি আপনি এভাবে উড়িয়ে দেন, তাহলে আমরা অনশন ধর্মঘট করতে বাধ্য হব। মামিমা, ফুট্‌কিকে বলে দেবেন আমি আজ দুপুরে খাব না।

—আম্মো না!—সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেয় কৌশিক।

বাসু বলেন, গাড়িতে তেল কম আছে, ভরে নিও। আর রেস্তোরাঁর টেলিফোন নাম্বারটা জানিয়ে যেও। যাতে এমার্জেন্সিতে যোগাযোগ করতে পারি।

—বাঃ! কিসের রেস্তোরাঁ? আমরা তো অনশন করছি...

ঠিক এই সময় গেটের সামনে এসে থামল একটি ট্যাক্সি। রানী তাঁর টেবিলের তলায় যে সুইচটা আছে সেটা টিপে দিলেন। এক লহমায় ড্রইংরুম থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল বিশে। দাঁড়ালো অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে।

ততক্ষণে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে মেয়েটি গেট পার হয়ে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। একাই এসেছে সে। কাঁধে একটা শান্তিনিকেতনী ব্যাগ। বুটিক করা তাঁতের শাড়ি। শাড়িরই অংশ থেকে কেটে বানানো ম্যাচিং-ব্লাউজ। পায়ে চপ্পল। বেশ সুশ্রী চেহারা। সুন্দরীই বলা চলে। রঙ অবশ্য খুব ফর্সা নয়। শ্যামলা-ঘেঁষা। শহুরে সাজগোজ সত্ত্বেও কেমন যেন একটা গ্রাম-বাংলার ছাপ। বয়স আঠারো-বিশের কাছাকাছি।

রানী বিশেকে বললেন, ওকে নিয়ে গিয়ে অফিস-ঘরে বস। আমি এক্ষুণি আসছি।

রানীর কথা শেষ হবার আগেই মেয়েটি সিঁড়ির দুটি ধাপ উঠে এসেছে। যুক্তকরে নমস্কারও

করেছে। রানী দেবীর কথাগুলো সে শুনেছে। বিশের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়, যেন জানতে চায়: অফিস-ঘরটা কোনদিকে ?

রানী বলেন, তুমি যদি আমাদের সঙ্গে এক পেয়ালা চা বা কফিতে যোগ দিতে চাও তাহলে এখানে এসেই বসতে পার।

মেয়েটি বললে, ধন্যবাদ মামিমা, এইমাত্র আমি ব্রেকফাস্ট খেয়ে এসেছি। চল বিশ্বনাথ, আমাকে অফিস-ঘরে নিয়ে চল।

বিশে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার পর কৌশিক নিচু গলায় বলে :ব্বাস রে! এ যে দেখছি 'শার্লকী হোমা।' শার্লক হোমস্ স্ত্রীয়াম্ আপ্। দর্শনমাত্র সমঝে নিল আমাদের গৃহভৃত্যটির নাম : বিশ্বনাথ।

সুজাতা বললে, সচরাচর মামির বয়সী অপরিচিতা মহিলাকে 'মাসিমা' সম্বোধন করে ওই বয়সের মেয়েরা। এ কিন্তু 'মাসিমা' না বলে 'মামিমা' বলেছে...

বাসু বললেন, এ থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় : এবছর কৌশিক তার 'কাঁটা সিরিজের' জন্য আরও বেশি রয়্যালটি পাবে। ভাল, ভাল। গোত্রং নঃ বর্ধতাম্। 'সুকৌশলী'র শ্রীবৃদ্ধি হোক।

বলে, নিজেও উঠলেন। রানী দেবীর হুইল চেয়ারের পিঠে হাত লাগাল ফুটকি। সেও ইতিমধ্যে বার হয়ে এসেছে।

প্রথামতো রানী দেবী মেয়েটির প্রাথমিক পরিচয় প্রথমে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে নিলেন, আজকের তারিখে।

নাম : দেবযানী মজুমদার। বয়স একুশ। যাদবপুরে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে সবে ভর্তি হয়েছে। ফার্স্ট ইয়ার। থাকে গড়িয়ায়, এক সহপাঠিনীর বাড়িতে পেইং-গেস্ট হিসাবে। ঠিকানা দিল, টেলিফোন নম্বরটাও। বান্ধবীর নাম রেখা নিয়োগী।

রানী ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললেন, একটু অপেক্ষা কর, দেবযানী। আমি একটা ফোন সেরে নিই।

রানী ক্র্যাডল্ থেকে টেলিফোনটা তুলে নিয়ে সাতটা নম্বর ডায়াল করলেন। ওপ্রান্তে মহিলাকণ্ঠে 'বলুন?' শুনে বললেন, মিসেস্ রেখা নিয়োগী বলছেন?

—হ্যাঁ এবং না। অর্থাৎ আমি রেখা নিয়োগীই বলছি। তবে মিসেস্ নই, আমি মিস্।

—ও আয়াম সরি। ওখানে কি দেবযানী আছে? দেবযানী মজুমদার?

—না, সে একটু বেরিয়েছে। আপনি কে ফোন করছেন?

রানী বললেন, ঠিক আছে, তাড়াহুড়ো নেই, আমি বরং পরে ফোন করব।

বলেই লাইনটা কেটে দিলেন। দেখলেন, দেবযানী হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই বলল, এই ডবল্-চেকিংটা বুঝি 'কৌতূহলী কনের কাঁটা'র পর থেকে চালু করেছেন, মামিমা?

রানী বললেন, তুমি 'কাঁটা সিরিজের' অনেক বই পড়েছ মনে হচ্ছে।

—প্রত্যেকটি। একাধিকবার। সুতরাং বুঝতেই পারছেন আমার সমস্যাটা ঠিক কী, তা আমি এ-ঘরে বলব না। চলুন, মামুর কাছে যাই—

রানী হাসলেন। বললেন, চল—

—এ কি? আপনি শর্টহ্যান্ড নোটবইটা নিলেন না?

—না! প্রযুক্তিবিদ্যা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, দেবযানী। আমাকে আর মক্কেলের জবানবন্দী শর্টহ্যান্ডে লিখে নিতে হয় না।

—এ খবরটা তো জানা ছিল না।

ফুট্‌কি ওঁকে পৌঁছে দিয়ে চলে গিয়েছিল। রানী নিজেই চাকা ঘুরিয়ে বাসু-সাহেবের চেম্বারের দিকে যেতে চাইলেন। দেবযানী বাধা দিল। সে ওঁর পিছনে দাঁড়িয়ে হুইল-চেয়ারটা ঠেলতে ঠেলতে ওঁকে সংলগ্ন বাসু-সাহেবের প্রাইভেট চেম্বারে নিয়ে এল। এ কামরাটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এবং শব্দনিরোধক। ঘরের একপ্রান্তে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবল। বাসু-সাহেবের ঘূর্ণমান চেয়ার। বিপরীতে তাঁর অতিথিদের জন্য গদিমোড়া পাশাপাশি তিনটে চেয়ার। বাসু-সাহেবের চেয়ারের পিছনে এবং ঘরের দু-পাশে শুধু বই আর বই। শুধু আইনের নয়। বিভিন্ন বিষয়ের। বাসু বললেন, এস দেবযানী। বস ওই চেয়ারটায়।

দেবযানী একটু অবাক হলো। বলল, আপনি আমার নাম জানলেন কী করে? আমি তো আপনাকে আমার নাম বলিনি।

—বাঃ! তুমি আমার বাড়ির কাজের লোকটার নাম পর্যন্ত জানতে পার, আর আমি তোমার নামটা জানব না?

দেবযানীর বিহ্বল দৃষ্টি দেখে রহস্যটা ভেঙে দেন। বলেন, রানীকে তুমি ও-ঘরে যে প্রশ্নটা করেছিলে—ওই শর্টহ্যান্ড নোটবইয়ের ব্যাপারে, সেটাও পরিষ্কার করে দিই। এ-ঘরে তুমি-আমি যা বলব তা একটা ক্যাসেটে বন্দী হয়ে থাকবে। ভবিষ্যৎ রেফারেন্সের জন্য। তাই রানীকে আজকাল আর শর্টহ্যান্ড নোট নিতে হয় না। তবে এই ছোট্ট ক্লিপটা তোমার ব্লাউজের উপরের বোতামের কাছাকাছি আটকে নাও।

দেবযানী বলল, ও হ্যাঁ, বুঝেছি। টি. ভি. রেকর্ডিং-রুমে এমন করে দেখেছি।

বাসু বললেন, নাউ স্টার্ট টকিং। আগে তোমার বিশদ পরিচয়টা দাও। পিতৃ-মাতৃ পরিচয়, বাল্যকালের কথা। কোথায় পড়েছ স্কুলে থাকতে ইত্যাদি। যে-কারণে এসেছ সেটা পরে শুনব।

দেবযানী মজুমদারের দেশ আদমগড়। আজিমগঞ্জের কাছাকাছি। আজিমগঞ্জ থেকে বিশ কিলোমিটার দক্ষিণে। আদমগড় ভাগীরথীর পশ্চিমপারে—ছাতরা আর লালগোলার মধ্যবর্তী অবস্থানে। আদমগড় গ্রামও নয়, শহরও নয়—মাঝামঝি অবস্থা। আম-জাম-কাঁঠাল গাছে পথঘাট ছায়ানিবদ্ধ। আবার পাকাবাড়ির ছাদে দূরদর্শনের অ্যান্টেনাও নজরে পড়ে। ইদানীং বহু দোকানপাট হয়েছে, দ্রুত উন্নতি হচ্ছে গণ্ডগ্রামটির। ইলেকট্রিসিটি এসেছে, টেলিফোন এসেছে। তবে দূরদর্শনের চ্যানেল ভালভাবে ধরা যায় না। দেবযানী ওই গণ্ডগ্রামের বিদ্যালয় থেকে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে যাদবপুরে পড়তে এসেছে। ওর বাবা দীনেশচন্দ্র মজুমদার আদমগড় উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

বাসু বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, বল কী! আদমগড়ে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল পর্যন্ত আছে? গ্রামের পপুলেশন কত?

—লোকসংখ্যা কত তা জানি না। তবে আদমগড় একটি অতি প্রাচীন জনপদ। ওখানকার জমিদারদের এককালে 'রাজাই' বলা হতো। 'পাঠক-কাসল' একটা দেখবার মতো জিনিস যদি যান কখনো আমি ওদের কিউরিও আর কালেকশান সব দেখাব আপনাকে। সত্যিই দেখবার মতো।

—জমিদারদের উপাধি বুঝি 'পাঠক'?

—হ্যাঁ, পাঠক। তবে ওঁরা বর্ণহিন্দু নন। রোমান ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ান। গ্রামে নিওগথিব স্টাইলের গীর্জা আছে। প্রকাণ্ড সিমেটারি আছে। জমিদারি অ্যাবলিশনের পর ওঁরা এগ্রিকালচারে মনোনিবেশ করেছেন। আদমগড়ে একটা মিনি-কোল্ড স্টোরেজ পর্যন্ত আছে।

—আমার কৌতূহলটা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে, দেবযানী। এবার বল, সংসারে তোমাদের কে কে আছেন?

—বাবা রিটায়ার করে আবার এক্সটেনশান পেয়েছেন। বিল্‌কাকু ওঁকে কিছুতেই অবসর নিতে দেবেন না।

—'বিল্‌কাকু' টি কে?

—উইলিয়াম পাঠক। গ্রামের প্রাক্তন জমিদার। বস্তুত গোটা অঞ্চলের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা। স্কুল-কমিটির তিনিই প্রেসিডেন্ট।

—বুঝলাম। আর কে আছেন তোমাদের সংসারে?

—মা নেই। আমার এক ছোট ভাই আছে, বঙ্কু। আমার এক বালবিধবা পিসিমাও আছেন—বাবার দূরসম্পর্কের বোন : গিরি পিসিমা।

—তুমি বললে আদমগড় ভাগীরথীর পশ্চিমপাড়ে। গ্রাম থেকে গঙ্গা কত দূরে?

—মাইল দশেক। তবে অবগাহন স্নানের জন্য গ্রামেই আছে 'মেমসায়র'—বিরাট একটা দীঘি। টলমলে নির্মল জল।

বাসু বলেন, তোমাদের গ্রাম গণ্ডগ্রাম বা গঞ্জ যাই হোক—আদমগড়ের একটা ছবি পেয়েছি। তোমাদের পরিবারের একটা ভার্বাল স্কেচও। এবার বল, তোমার সমস্যাটা কী? কীজন্যে কলেজ কামাই করে আমার কাছে ছুটে এসেছ।

—কলেজ কামাই করতে হয়নি, স্যার। স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ান স্ট্রাইক ডেকেছে।

—সে তো তারা সারা বছর ধরেই ডাকে, ছুটির দিনগুলো বাদে। আর তাছাড়া মনে হচ্ছে তারা ধর্মঘট না ডাকলেও তুমি আজ কলেজের বদলে এখানেই আসতে, তাই নয়? নাউ স্টার্ট টকিং...

দেবযানী অধোবদন হলো। বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করল। তারপর নিম্নকণ্ঠে বলল, আমি...আমি...এক্ষেত্রে কী করব বুঝতে পারছি না। তাই আপনার কাছে ছুটে এলাম। অবশ্য আপনি আমাকে কীভাবে সাহায্য করবেন তাও বুঝে উঠতে পারছি না।

—বেশ তো, তুমি কী করবে সেটা আমাকেই নির্ধারণ করতে দাও না? অর্থাৎ ব্যাপারটা শোনাই যাক।—বাসুর কণ্ঠে স্নেহের সুর।

দেবযানী নতনেত্রে বললে, প্রায় বছর তিনেক আগে একটি ছেলের সঙ্গে—আমাদের গ্রামেরই ছেলে—আমার একটা ইয়ে...মানে এন্‌গেজমেন্ট হয়েছিল। ঠিক বিলাতী কায়দায় নয়। দেশী কায়দায়। সে প্রথম প্রপোজ করেছিল, কিংবা আমি, তা আজ আর মনে নেই। তবে দুজনেই দুজনকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে, আমরা পরস্পরকে বিবাহ করব। কোনো প্রতিবন্ধকতাকেই আমরা মানব না এবং যতদিন না আমরা উভয়েই সম্পূর্ণ প্রস্তুত হচ্ছি ততদিন অভিভাবকদের পীড়াপীড়িতে অন্যত্র বিবাহ করব না।

—বুঝলাম। ছেলেটি কি তোমাদের গ্রামের? আদমগড়ের?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বস্তুত উইলিয়াম পাঠক কাকুর একমাত্র পুত্র : হিমু।

—গুড নিউজ! তারপর?

নতনেত্রে দেবযানী বলল, হিমু এখন এন্‌গেজমেন্টটা ভেঙে দিতে চাইছে। সে বলছে যে, সে বিয়ে করবে না!

বাসু নিঃশব্দে টেবিলের উপর মিনিট-খানেক দশ আঙুলে টরেটক্কা বাজালেন। তারপর বললেন, আই সী। সে এখন তোমাকে বিয়ে করতে চাইছে না। এন্‌গেজমেন্টটা ভেঙে দিতে চাইছে। তা—সে কী করে? কোথায় আছে?

boiRboi.net

—সে আমার চেয়ে ছয় বছরের বড়। বরাবর দার্জিলিঙে কনভেন্ট স্কুলে পড়াশুনা করেছে। ছুটিছাটায় দেশে আসত। বি. এসসি পাশ করে সে মিলিটারিতে যোগ দেয়। ইন্‌ফ্যাক্ট, ওদের পরিবারে একটা ট্রাডিশন যে, প্রতি জেনারেশনেই একজন মিলিটারিতে যাবে। ওর বাবা কর্নেল, ঠাকুর্দাও ছিলেন মেজর, তাঁর বাবা ব্রিগেডিয়ার। তাই সেই প্রথা মেনে ও নিজেও মিলিটারিতে গেছিল। মাত্র এক বছরে সে সেকেন্ড লেফটানেন্ট পদে প্রমোশন পেয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ কী জানি কী হলো, বিল্‌কাকু তাকে রিজাইন করতে বাধ্য করলেন। কমিশনে পদত্যাগ করে ও এখন আদমগড়ে ফিরে এসেছে। খুবই ফ্রাস্ট্রেটেড। ও এখন বলছে যে, আমাকে বিয়ে করবে না।

—ও কি আর কাউকে জীবনসাথী করতে চায়? মানে মিলিটারিতে জয়েন...

—না, না, না! আপনি যা ভাবছেন তা মোটেই না। ও বলছে যে, ও আজীবন বিবাহই করবে না। বিশেষ কারণে।

—সেই বিশেষ কারণটা কী, তা কি ও বলেনি?

—বলেছে।

—সেটা কী?

একটু ইতস্তত করল দেবযানী। যেন একটা রুদ্ধ কান্নার বেগকে অনেক কষ্টে চেপে রেখেছে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, হিমুর ধারণা যে, সে পাগল হয়ে যাচ্ছে। ওর ধারণা, এটা ওর পাগলামির প্রথম স্টেজ। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ সে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবে। এটা নাকি ওদের হেরিডেটারি একটা অসুখ। দু-এক পুরুষ অন্তর এই ব্যাধিটা...

হঠাৎ থেমে পড়ে দেবযানী চোখে আঁচল চাপা দেয়। বাসু অপেক্ষা করলেন। পাশে বসা রানী দেবী আস্তে করে ওর পিঠে একটা হাত রাখলেন। দেবযানী সামলে নিল। চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে কাচটা মুছে আবার নাকে চড়াল। ধরা গলায় বলল, আমি জানি...আপনি আমাকেই পাগল ভাবছেন।...আই শুড হ্যাভ কনসাল্টেড এ সাইকিয়াট্রিস্ট রাদার দ্যান অ্যা ক্রিমিনাল ল-ইয়ার...

বাসু ওকে সামলাবার সময় দিয়ে বললেন, না, দেবযানী। আমি তোমাকে আদৌ পাগল ভাবছি না। তবে তোমার ও-কথাটাও ঠিক। আমার কাছে না এসে একজন বড় মনঃস্তত্ত্ববিদ চিকিৎসকের কাছেই তোমার যাওয়া উচিত ছিল।

দেবযানী নীরবে মাথা নাড়তে থাকে।

—কী না?

—বিল্‌কাকু কিছুতেই কোনও অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারকে দিয়ে ওকে দেখাবেন না। উনি নিজে গ্রামে হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস্ করেন। বিনা পয়সায়। বেশ সুনামও আছে। উনি অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারদের মনে করেন রক্তচোষা বাদুড়। তারা নাকি শুধু টাকার জন্যই পেশেন্টদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলে—'অমুক টেস্ট করান, তমুক টেস্ট করান—তবে আমি যে ল্যাবরেটরির নাম লিখে দিচ্ছি সেখান থেকে।' কারণটা ডাক্তারবাবুরা স্বীকার করেন না। তাঁরা বাঁ-হাতে ওই ল্যাবরেটরি থেকে কমিশন পান। এই হচ্ছে তাঁর ধারণা!

—তোমারও কি তাই ধারণা?

—না। অনেকে তা করে থাকেন। তবে নিশ্চয় সবাই নয়।

—তাহলে তুমি হিমুকে কলকাতায় নিয়ে এসে তেমন কোনো সাইকিয়াট্রিস্টকে দিয়ে দেখাচ্ছ না কেন? তুমি যদি চাও আমি দু-চারজনের নাম আর টেলিফোন নাম্বার লিখে দিচ্ছি।

—তা হবার নয় মামু। কারণ হিমু নিজেই তার বাবার সিদ্ধান্তটা মেনে নিয়েছে। ওর

নিজেরও ধারণা : ও ধীরে ধীরে পাগল হয়ে যাচ্ছে। এ রোগ কিছুতেই সারবার নয়। দু-দশ বছরে ও বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবে। তাই ও নিজের বংশের এই অভিশাপকে নির্মূল করতে নিজেই শহিদ হতে চাইছে—

—কেন? ওর কোনো ভাই-টাই নেই? জেঠতুতো, খুড়তুতো? যদি এটা বংশানুক্রমিক রোগই হয় তাহলে ও একা সারাজীবন ব্যাচিলার থেকে এ দুর্ভাগ্যকে কেমন করে ঠেকাবে?

—তাই ঠেকাবে। কারণ ও হচ্ছে বিল্‌কাকুর একমাত্র সন্তান। ওর জন্মের চার বছরের মাথায় ওর মা মারা যান। বিল্‌কাকুর কোনও ভাই নেই। মানে খুড়তুতো, জেঠতুতো ভাইও নেই।

—বংশানুক্রমিক অসুখ বলছ, তা ওর বাবা...

—না। বিল্‌কাকু সম্পূর্ণ সুস্থ। তাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। আমাদের আদমগড়ে খুবই পপুলার, যদিও সবাই তাঁকে বাঘের মতো ভয়ও করে। তবে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। কিন্তু তাঁর বাবা—নেভিল দাদু বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছিলেন। শেষ দিকের প্রায় বিশ বছর তাঁকে ওই পাঠক-কাস্‌ল্‌-এর একটি ঘরে চেন দিয়ে বেঁধে রাখতে হতো। আমি তাঁকে দেখিনি। উনি যখন মারা যান তখনো আমার জন্ম হয়নি। কিন্তু হিমু তাঁকে দেখেছিল। সে বীভৎস দৃশ্যটা ওর বালকমনে প্রবল ছাপ ফেলেছিল। ও তাঁকে ভুলতে পারে না। খাঁচাবন্দি বাঘের মতো তিনি উলঙ্গ অবস্থায় পায়চারি করতেন। সিংহের কেশরের মতো একমাথা পাকাচুল। একবুক দাড়ি। মাঝে মাঝে জান্তব আর্তনাদ করতেন। মানুষ দেখলে আঁচড়ে কামড়ে দিতে আসতেন। শুনেছি, বাঘ-সিংহের খাঁচার মতো ওঁর সেই খাঁচায় ডবল ডোর ছিল। তার মাধ্যমেই তাঁকে খাবার আর জল দিয়ে আসা হতো। কিন্তু ঘরটা পরিষ্কার করার কাজটা ছিল বীভৎস রকমের। হোসপাইপ দিয়ে জলের তোড়ে। কেউ তাঁর খাঁচায় ঢুকতে সাহস পেত না। হিমুর ভয় হয়, শেষ জীবনে ওর অবস্থাও ওই রকম হয়ে যাবে। সেই বীভৎস-জীবনকে এড়াতেই হয়তো ও একদিন আত্মহত্যা করে বসবে।

বাসু জানতে চান, নেভিল পাঠক ছাড়া ওদের বংশে অন্য কেউ কি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ, দু-তিন পুরুষ অন্তর এটা হয়। নেভিল-দাদুর এক পিসিমা পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। সব হিসেব আমি জানি না। সেসব তো অনেক-অনেকদিন আগেকার কথা। বাবা জানেন। তিনি ইতিহাসের এম.এ—ওই পাঠক পরিবার নিয়ে গবেষণা করেছেন। দুশ'বছরের ইতিহাস। বংশের আদিপুরুষ আদম থেকে তার সূত্রপাত।

বাসু বলেন, আদম? আদম-ঈভের আদম নন নিশ্চয়। বংশের আদিপুরুষ কোন সময়ের লোক? মানে কত বছর আগেকার কথা?

দেবযানী বলল, না, 'আদম' নয়, লোকের মুখে-মুখে নামটা বিকৃত হয়ে গেছে। বংশের আদিপুরুষের নাম মেজর অ্যাডামস্‌। তিনি নাকি ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির তরফে মীর কাসেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। সাল-শতাব্দী আমি বলতে পারব না—বাবা জানেন...

বাসু উঠে দাঁড়ালেন। বিড়-বিড় করতে করতে—মেজর অ্যাডামস্‌! মীর কাসেম! তোমাদের গ্রামটা আজিমগঞ্জের বিশ কিলোমিটার দক্ষিণে, লালগোলা আর ছাতরার মাঝামাঝি? ভাগীরথীর পশ্চিমপারে বললে, তাই নয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ,—

—জাস্ট আ মিনিট। শুধু তোমার বাবা কেন, রমেশচন্দ্রও বলতে পারবেন। এ ঘরে বসেই তোমাদের আদমগড়কে হয়তো 'অস্থিতে অস্থিতে' চিনে নিতে পারব। অষ্টাদশ শতাব্দীর

শেষপাদ—অ্যারাউন্ড সেভেনটিন সিক্সটি...হ্যাঁ, প্রায় ওই সময়েই গিরিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়েছিল...

কথা বলতে বলতে তিনি পিছনের আলমারি থেকে একটা মোটা বাঁধানো বই বার করে আনলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত রমেশচন্দ্রের তিন খণ্ডে বঙ্গদেশের ইতিহাস। পাতা উলটাতে উলটাতে আবার বসলেন তাঁর ঘূর্ণী-চেয়ারে।

বললেন, ইয়েস! আয়্যাম অলমোস্ট কারেক্ট।

'ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে গঙ্গার সহিত বাঁশলই নদীর সঙ্গমের নিকট নবাব মীর কাসেম ও ইংরেজ সৈন্যের মধ্যে 1763 খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে গিরিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইহা 'সূতীর যুদ্ধ' নামেও অভিহিত। মুর্শিদাবাদে মোতিঝিলের নিকট মীর কাসেমের সৈন্যদল পরাজিত হয়। পরে মীর কাসেম প্রেরিত সসৈন্য সেনাপতি সমরু, মার্কার, আসাদুল্লা প্রভৃতির সহিত সূতীর নিকটে মিলিত হয়। মেজর অ্যাডম্‌সের অধীনে ইংরেজগণ ভাগীরথী পার হইয়া উত্তরে আগাইয়া যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে মীর কাসেমের সেনাদল পরাজিত হইয়া রাজমহলের নিকট উধুয়ানালায় শিবির স্থাপন করেন। সেখানকার শিবির আক্রমণ করিয়া নবাবপক্ষকে অ্যাডাম্‌স্ একেবারে বিপর্যস্ত করিয়া দেন। রিভারিজ এই সূতীর যুদ্ধ ও গিরিয়া প্রান্তরের যুদ্ধকে মুর্শিদাবাদের পানিপথ বলিয়াছেন।"

—নাউ য়ু সী? খুব সম্ভবত এই মেজর আডাম্‌স্-এর নামানুসারে তোমাদের গ্রামের নাম হয়েছে : আদমগড়। আগে হয়তো তার নাম ছিল 'সূতীগ্রাম'।

রানী দেবী শান্ত স্বরে বাধা দিয়ে বললেন, আমি বলেছিলাম কি যে, এসব ঐতিহাসিক গবেষণাটা...

—ও ইয়েস্! বাই অল মীনস্! আমি একটু ইয়ে...মানে ক্যারেড অ্যাওয়ে হয়ে গেছিলাম। হ্যাঁ বল দেবযানী, কী যেন বলছিলে?

—আমি বলছিলাম বংশের আদিপুরুষ আদম—এখন শুনছি, তাঁর নাম মেজর অ্যাডাম্‌স্—তিনি নাকি...

বাধা দিয়ে রানী বলেন, তিনি দু-আড়াই'শ বছর আগে চিরশান্তি পেয়েছেন। তাঁর কথা থাক দেবযানী। তুমি হিমুর কথা বল। ওর ভাল নামটা কী?

—হেমন্তকুমার পাঠক।

বাসু একটু অবাক হলেন। জানতে চান, নেভিল, অ্যাডাম্‌স্-এর মধ্যে হঠাৎ অকাল-হেমন্ত এসে পড়ল কী করে?

দেবযানী জবাবে বলে, নামটা ওর মায়ের দেওয়া, গায়ত্রী কাকিমার। বাবার কাছে শুনেছি গত শতাব্দী পর্যন্ত ওঁদের উপাধি ছিল প্যাট্রিক—বস্তুত কিল্‌প্যাট্রিক। হিমুর ঠাকুরদার দাদা, রবিনসন, কি জানি কেন—এফিডেবিট করে উপাধিটা বদল করে 'পাঠক' উপাধি গ্রহণ করেন।

বাসু বলেন, হিমু কি নিজে তোমাকে বলেছে যে, সে পাগল হয়ে যাচ্ছে? সে জন্যেই সে তোমাকে প্রত্যাখান করছে।

নতনেত্রে দেবযানী ঘাড় নেড়ে স্বীকার করল।

—তাহলে একই প্রশ্ন আবার জিজ্ঞেস করি : তুমি আমার কাছে এলে কেন? কোনও নামকরা মনঃস্তত্ত্ববিদ ডাক্তারের কাছে হিমুকে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল না কি?

—কিন্তু ও কিছুতেই যাবে না। ওর বাবাও ওকে যেতে দেবেন না।

—কেন?

—এইমাত্র তো সে কথাই বললাম : বিল্‌কাকুর ধারণা অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারের দ্বারা হবে না। হিমুরও এখন তাই বিশ্বাস।

—'হিমুরও এখন তাই বিশ্বাস?' তার মানে, এ বিশ্বাসটা তার সম্প্রতি হয়েছে? আগে ছিল না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মিলিটারি চাকরি থেকে রিজাইন দেবার পর থেকে হয়েছে। ধরুন মাস-ছয়েক হলো। তার আগে ওর এরকম ধারণা ছিল না।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল বাসু-সাহেবের। তারপর বললেন, এক্ষেত্রে আমি কী করতে পারি, দেবযানী? আমি তো ক্রিমিনাল ল-ইয়ার...

—কিন্তু আমি তো কোনও ক্রিমিনাল ল-ইয়ারের কাছে আসিনি।

—আসনি? তবে কার কাছে এসেছ? আমি লোকটা কে?

—সত্যান্বেষীর উত্তরসূরী। ব্যোমকেশের প্রয়াণে আপনিই তো একমাত্র লোক—যিনি খুঁজে দেখতে পারেন : ভিতরের আসল ব্যাপারটা কী? বিল্‌কাকা রিটায়ার্ড কর্নেল, হিমু বি. এসসি পাশ। তাঁরা কেন বুঝতে পারছেন না যে, এ সমস্যার একমাত্র সমাধান কোনও সাইকিয়াট্রিস্টট-এর শরণাপন্ন হওয়া।

একটু চিন্তা করে নিয়ে বাসু বললেন, শোন দেবযানী, কাজটা হচ্ছে গোয়েন্দার, মানে প্রাথমিক পর্যায়ে; উকিল-ব্যারিস্টারের নয়। আমার এই বাড়িতেই ওদিককার উইংয়ে...

বাধা দিয়ে দেবযানী বলে ওঠে, জানি। 'সুকৌশলী'র অফিস। কৌশিকদা আর সুজাতাদির। সকালবেলা তো দেখলামই তাঁদের বাইরের বারান্দায়।

বাসু হেসে বললেন, ওরে ব্বাবা। 'ক' বলার আগেই যে তুমি কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে পড়লে। তা সেই 'সুকৌশলী'কে এখানে ডেকে পাঠাচ্ছি। তোমার প্রবলেমটা তাদের বুঝিয়ে বলতে হবে। তুমি কিছুটা বলবে, আমিও কিছু ইন্সট্রাক্‌শন দেব। তোমার ক'দিন কলেজ কামাই হবে বাপু। তুমি ওদের নিয়ে একবার আদমগড় ঘুরিয়ে আনো। প্রাথমিক তদন্তটা ওরা করে এলে আমার কাজের সুবিধা হবে। তারপর প্রয়োজন হলে আমিও যাব—

দেবযানী বলে, কিন্তু 'মিঠু'? মিঠু কার কাছে থাকবে?

এবার ওঁরা দুজনেই একসঙ্গে হেসে ওঠেন। বাসু বলেন, কাল রাতে আমরা কী দিয়ে ভাত খেয়েছি সেটাও কি তুমি জানো?

দেবযানী লজ্জা পায়। বলে, বা—রে! আপনার প্রথম 'ফেলিওর'টার কথাটুকু জানব না আমি?

—প্রথম 'ফেলিওর'?—সোজা হয়ে ওঠেন বাসু, বলেন, মানে?

—নার্সিং হোমে প্রথম দেখে তো আপনি 'গ্যেস' করতে পারেননি—আপনার নাতি হয়েছে না নাতনি। বাজি হেরেছিলেন মামিমার কাছে। এটা তো আপনার সব 'ফ্যান্' এতদিনে জেনে ফেলেছে!

বাসু প্রাণ-খোলা হাসি হাসলেন। বললেন, তা ঠিক। কিন্তু আমার প্রথম ব্যর্থতা আমার নিজের নাতনির কাছে। সে আত্মগোপন করতে পেরেছিল। এতে আমার লজ্জার কিছু নেই। সে যাক, তাহলে ওদের ডেকে পাঠাই?

—না। তার আগে একটা কাজের কথা। আপনাকে কী 'রিটেইনার' দেব?

বাসু আবার চেয়ারে এলিয়ে বসলেন। বললেন, তা হয় না দেবযানী। তুমি কোনও 'ক্রিমিনাল কেস' নিয়ে আসনি আমার কাছে। দ্বিতীয়ত, তুমি এসেছ 'সত্যান্বেষীর উত্তরসূরী'

সন্ধানে। তৃতীয়ত, তুমি আমাদের মামা-মামি ডেকেছ। তোমার কাছে আমি তো কোনও ফী নেব না, নিতে পারি না।

—ফি না নেন, 'এক্সপেন্সেস্' তো নেবেন?

—না। আমি নেব না। 'সুকৌশলী'র খরচপাতি বা তাদের ফী সম্বন্ধে কথা তাদের সঙ্গেই বলে নিও। তাছাড়া তোমার কেসটা আমার কাছে একটা পার্সোনাল ব্যাপার হয়ে উঠল কি না। তোমার সমস্যা ছাড়াও আরও অনেক সমস্যা। পাগলামির সঙ্গে হেরিডিটির কতটা সম্পর্ক? তাছাড়া আলেকজান্ডার অ্যাডাম্‌স্ নামে একজন ইংরেজ নাবিক 'মিউটিনি অন দ্য বাউন্টি'তে বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন। দুজনে কি একই ব্যক্তি? ওই বিদ্রোহটা হয় গিরিয়া যুদ্ধের বিশ-পঁচিশ বছর পরে।

রানী বাধা দিয়ে বলেন, এসব ঐতিহাসিক গবেষণা...

—বটেই তো! বটেই তো! সে সব কথা দেবযানীর বাবার সঙ্গে হবে। উনি ইতিহাসের এম. এ। পাঠকদের বংশাবলী নিয়ে গবেষণাও করেছেন। তাছাড়া...ইয়ে...আরও একটা কথা। 'প্যাট্রিক' কী করে পাঠক হলো তা আমরা জেনেছি। হিমুর ঠাকুর্দার দাদা এফিডেবিট করেছিলেন। বাট্ দ্য আদার চেঞ্জ? 'অ্যাডাম্‌স্' কী করে 'কিল্‌প্যাট্রিক' হলো? দ্যাটস্ অল্‌সো এ মিস্ট্রি!

রানী তাগাদা দেন, কৌশিকদের কি এবার ডাকতে পাঠাব?

—শ্যিওর! ওসব ঐতিহাসিক গবেষণা তো প্রাথমিক আলোচ্য বিষয় নয়। পরেও হতে পারে। তুমিই সব উল্টোপাল্টা করে দিচ্ছ।

রানী সবিস্ময়ে বলেন, আমি?

দেবযানী হেসে ফেলে।

—হাসছ কেন? জানতে চান বাসু-সাহেব।

—আপনাকে তো আগে কখনো দেখিনি। মনগড়া একটা ছবি এঁকেছিলাম। আপনি হুবহু তাই!

বাসু বলেন, এইসব ছেঁদো কথায় সময় নষ্ট করে কী লাভ? রানু, তুমি ওদের ডেকে পাঠাও।

একটু পরেই সুজাতা আর কৌশিক এল। বাসু ওদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। দেবযানী এতক্ষণে উঠে চারজনকেই প্রণাম করে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল। বাসু সমস্যাটা ব্যাখ্যা করলেন না। টেপ-রেকর্ডারটা চালিয়ে দিলেন। এ পর্যন্ত যা কথোপকথন হয়েছে তা সুন্দরভাবে পুনরায় শোনা গেল। তারপর সুইচটা অফ্ করে দিয়ে বাসু বললেন, তোমরা দুজন দেবযানীর সঙ্গে দিন-দুয়েকের জন্য আদমগড় ঘুরে এস। আজিমগঞ্জ থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে যেও।

কৌশিক বলে, আমরা কী বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করব? কী খুঁজতে যাচ্ছি?

—আই ডোন্ট নো। 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই...'। দেখ : আমাদের মূল লক্ষ্যটা হচ্ছে জেনে নেওয়া—কী কারণে হিমু হঠাৎ বিয়ে করতে অস্বীকৃত হচ্ছে। তার অনেকগুলি বিকল্প সমাধান হয়ে পারে। এক : হিমু ইতিমধ্যে একটি সুন্দরী, গ্ল্যামারাস মেয়ের প্রেমে পড়েছে। সেকথা সে দেবযানী'র কাছে স্বীকার করতে লজ্জা পাচ্ছে—

দেবযানী বলে, আমি একটা কথা বলব স্যার?

—না, বলবে না। আমরা এখন অ্যাকাডেমিক ডিস্‌কাশান করছি। তুমি রক্তমাংসের দেবযানী এ প্রবলেমে শুধুমাত্র 'D,' হেমন্ত 'H', তার বাবা কর্নেল 'C'! যাক, যে কথা

বলছিলাম। দ্বিতীয় সম্ভাবনা : 'C'একটি জবরদস্ত পাত্রীর সন্ধান পেয়েছেন। টাকার কুমির ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের একমাত্র কন্যা। সেও সুন্দরী, গ্ল্যামারাস। 'H' তাকে দেখেছে। মজেছে। এখন বাপ-বেটা উঠে পড়ে লেগেছেন প্রথমে 'D'-কে পাত্রস্থ করতে। সে বখেড়া মিটে গেলে 'H'-এর আর চক্ষুলজ্জা থাকবে না।

দেবযানী বাধা দিয়ে বলে ওঠে, কিন্তু আপনারা যা বলছেন...

—ওফ্! এর সামনে অ্যাকাডেমিক ডিস্‌কাশানটা করা যাবে না।

কৌশিক দেবযানীর দিকে ফিরে বলে, তুমি বললে...তোমাকে তুমিই বলছি দেবযানী...

—বাঃ! তাই তো বলবেন। প্রণাম করলাম না তখন?

—হ্যাঁ, যা বলছিলাম। তুমি বললে, হিমু বলেছে যে তার ধারণা সে পাগল হয়ে যাচ্ছে। এই 'শোনা-কথা' ছাড়া তুমি নিজে তার কোনও পাগলামির লক্ষণ দেখেছ? অসংলগ্ন কথাবার্তা? অসংলগ্ন ব্যবহার? অথবা কথা বলতে বলতে অপ্রাসঙ্গিক কোনও বিষয়ের অবতারণা করা।

দেবযানী বলল, না। দেখিনি। কিন্তু শেষের ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।

রানী দেবী শান্ত সিরিয়াস ভাবে বললেন, এই ধর আলোচনা হচ্ছে কোনো পেশেন্টের রোগের লক্ষণ নিয়ে। তার মধ্যে হঠাৎ কেউ 'মিউনিটি অন দ্য বাউন্টি'-র প্রসঙ্গ টেনে নিয়ে এলেন। এই রকম অপ্রাসঙ্গিক অসঙ্গতি।

দেবযানী ভয়ে ভয়ে বাসু-সাহেবের দিকে দৃকপাত করল। তিনি তখন পাইপে আগুন জ্বালাতে ব্যস্ত। রানী দেবীর কথায় কতটা খোঁচা খেলেন তা বোঝা গেল না। যেন একাগ্রমনে একটা অ্যাকাডেমিক ডিস্‌কাশান শুনছেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে এতক্ষণে বললেন, বলতে পার, দেবযানী, পাগলামির সংজ্ঞা কী? ম্যাডনেসের ডেফিনিশান কী?

দেবযানী বলে, আমার মনে আছে, মামু। আপনার কাছেই শেখা। 'ড্রেস রিহার্সালের কাঁটায়' আপনি ডেফিনিশানটা বলে দিয়েছিলেন : 'এ ম্যাড ম্যান ইজ ওয়ান, হু হ্যাজ নো সিকোয়েন্স ইন হিজ থট্‌স্।' অর্থাৎ যার চিন্তাধারায় কোনো পারম্পর্য নেই, সে পাগল।

—কারেক্ট। এখন বল, হিমুর কথাবার্তায়, আচার-আচরণে কখনো তোমার কি মনে হয়েছে যে, তার চিন্তাধারার মধ্যে পারম্পর্য হারিয়ে যাচ্ছে? একটা এক্‌জাম্পল দিই :1763-তে যে মেজর অ্যাডাম্‌স্ সুতীর যুদ্ধে মীর কাসেমের বাহিনীকে হারিয়ে দিয়েছিলেন তিনি শেষ জীবনে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন, এটা ফ্যাক্ট; আবার 1784-এর 'মিউটিনি অন দ্য বাউন্টির' বিদ্রোহীদলের প্রধান নায়ক আলেকজান্ডার অ্যাডাম্‌স্‌ও নাকি শেষ জীবনে পাগল হয়ে গেছিলেন। একুশ বছর আগে-পরের ঘটনা। এঁরা যদি পিতাপুত্র হন, তাহলে হেরিডিটি ও পাগলামির আলোচনায় এঁদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হান্ড্রেড-পার্সেন্ট রেলিভেন্ট! এমন সু-সংলগ্ন আলোচনার কথা কৌশিক কিন্তু জানতে চায়নি।

বাসু-সাহেব এই দীর্ঘ ব্যাখ্যার ভিতর একবারও রানী দেবীর দিকে তাকিয়ে দেখেননি; কিন্তু দেবযানী চোরাচাহনিতে দেখে নিয়েছিল : রানী মরমে মরে আছেন। সে বললে, না, আমি কোনোদিনই ওর কোনো পাগলামির লক্ষণ দেখিনি।

কৌশিক পুনরায় প্রশ্ন করে, হিমু কি তোমাকে বুঝিয়ে বলেছে, সে নিজে কী করে বুঝতে পারছে যে, সে পাগল হয়ে যাচ্ছে?

—হ্যাঁ বলেছে। সে ইদানীং বীভৎস দুঃস্বপ্ন দেখে, নাইট-মেয়ার।

—সে তো আমরা সবাই মাঝে মাঝে দেখি। বিশেষ, নৈশাহার বেশি হলে।

—ও দিনের বেলাতেও তা দেখে। কখনো দুনিয়া আঁধার হয়ে আসে, প্রখর রৌদ্রের মধ্যেই। কখনো ডব্‌ল্‌-ইমেজ দেখে!

বাসু সোজা হয়ে উঠে বসেন, ডব্‌ল্‌-ইমেজ? দূরের জিনিসের না কাছাকাছি?

—দু'রকমই। একেবারে পাশে বসে থাকা মানুষেরও।

—ও ড্রিংক করে?

—আগে করত, এখন করে না। একেবারে ছেড়ে দিয়েছে।

—স্মোকিং?

—না! কোনোদিনই করেনি।

—এনি ড্রাগস্?

—না।

—তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ দেবযানী—এই শেষ প্রশ্নটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। হিমুর কোনোরকম ড্রাগের নেশা নেই, এ বিষয়ে তুমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শ্যিওর?

—টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট!

—কিন্তু তুমি তো ওর সঙ্গে চব্বিশ ঘন্টা একসঙ্গে থাকনি। পুরো চব্বিশ ঘন্টা ওকে নজরবন্দি করে রাখনি। এক ঘরে রাত কাটাওনি। তাহলে তুমি কী করে জানলে? কী করে আন্দাজ করলে?

—আপনি সেটা কী করে জানলেন? কী করে আন্দাজ করলেন?

—কী?...ও আই আন্ডারস্ট্যান্ড...আয়াম সরি।

—নাথিং টু বি সরি ফর, স্যার! ডাক্তার আর উকিলের কাছ থেকে কোনো কিছু গোপন করতে নেই। আপনারা চারজনেই আমার হিতাকাঙ্খী। আমার দশ বছরের পরিচিত—যদিও বইপড়া বিদ্যা। আপনাদের কাছে সব কথা স্বীকার করব না কেন?

কৌশিক জানতে চায়, তোমাদের ওখানে ডাকবাংলো বা থাকার মতো হোটেল পাব তো?

—ওমা, হোটেলে থাকতে যাবেন কোন দুঃখে! বাবার হেডমাস্টার্স কোয়ার্টার্সে তিন-তিনটে বেড-রুম। একটায় বাবা, একটায় আমরা ভাই-বোন, তৃতীয়টা তো খালিই পড়ে থাকে।

—কেন? তোমার পিসিমা?

—গিরি-পিসিমা ঠাকুরঘরে একটা নেয়ারের খাটিয়া পেতে শোন। সে আপনাদের কোনও অসুবিধা হবে না। ওই শয়নকক্ষের সংলগ্ন স্নানাগারও আছে। পিসিমা দারুণ নিরামিষ রাঁধেন। আর মেম-সায়রের রুইমাছের দইমাছ রাঁধব আমি। দেখবেন কেমন রাঁধি।

বাসু বলেন, শুনে আমারই তো জিভে জল এসে যাচ্ছে।

—তা চলুন না আপনারও—বলেই অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

মনে পড়ে যায় রানী দেবীর অসহায়ত্বের কথা।

বাসু কথা ঘোরাতে বলেন, ওরা ঘুরে আসুক। তারপর না হয় আমিও যাব। খুব লোভ হচ্ছে আদমগড়টা দেখতে।

সুজাতা বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বলে, আমরা কি পরিচয় গোপন করে যাব?

একটু চিন্তা করে বাসু বলেন, সেটাই ভাল। আজকাল গ্রামে-গঞ্জেও 'কাঁটা সিরিজের' বই লোকে পড়ে। নাম শুনে কেউ হয়তো চিনে ফেলতে পারে। তখনই মানুষ সজাগ হয়ে যাবে। সরাসরি প্রশ্নের জবাব দেবে না। তারা ভাবতে থাকবে : 'সুকৌশলী' কিসের তদন্তে এসেছে।

boiRboi.net

কৌশিক বলে, আমি তাহলে হব প্রফেসর সুব্রত মিত্র। যাবদপুরে ইতিহাস পড়াই। সুজাতা আমার স্ত্রী, নাম সুস্মিতা। কলেজের সূত্রে দেবযানীর সঙ্গে আলাপ। ওর সঙ্গে আদমগড়ের 'পাঠক-প্যালেস' দেখতে এসেছি—হিস্টরিক্যাল ইন্টারেস্টে।

বাসু বলেন, কী বুদ্ধি! পাঁচ-মিনিটে ধরা পড়ে যাবে দীনেশবাবুর কাছে। উনি বলবেন, দিল্লীর সিংহাসনে তুঘলক বংশ এসেছিল লোদী বংশের ঠিক পরেই, এটা তো মানবেন?...আপনি কী জবাব দেবেন ইতিহাসের অধ্যাপক সুব্রত মিত্র মশাই? তার চেয়ে তুমি বরং যাদবপুরের সিবিল এঞ্জিনিয়ারিঙের অধ্যাপকের চরিত্রটা অভিনয় কর। সেটা তোমার দ্বারা হবে।

কৌশিক রুমাল দিয়ে কপালের ঘামটা মুছে নিয়ে বলে, ঠিক আছে, ঠিক আছে! বাই দ্য ওয়ে, মামু? তুঘলকরা কি লোদী বংশের পরে সিংহাসন দখল করে? না আগে?

—তুঘলকী শাসন তিরানব্বই বছরের। শেষ হয় 1413-এ। তারপর সৈয়দবংশ এবং তারপর লোদীরা। পানিপথের প্রথম যুদ্ধতক। সেটা কবে জান?

—আজ্ঞে না। তবে গিরিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধটা কবে হয়েছিল সেটা জানি : 1763-তে। "বিভারিজ ইহাকে মুর্শিদাবাদের পানিপথ বলিয়াছেন।"

বাসু-সাহেব কর্ণপাত করলেন না। দেবযানীর দিকে ফিরে বললেন, আচ্ছা, হেমন্ত রিজাইন করে ফিরে আসার পর আদমগড়ে কি কোনও চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে? এই বছরখানেকের ভিতর? কোনো স্ক্যান্ডালাস ব্যাপার? বা অলৌকিক কোনো কিছু—যার ব্যাখ্যা সাধারণ মানুষে খুঁজে পায়নি। হিমু ফিরে আসার পর?

—কী রকম ঘটনার কথা বলছেন?

—কোনো অহৈতুকী আত্মহত্যা, বা অর্থহীন হত্যা, সাঁতার জানা মানুষ পুকুরে ডুবে মারা গেল, অথবা আগুন লেগে অ্যাক্সিডেন্টে..

—আত্মহত্যার কেস একটা হয়েছে। কিন্তু সে আদৌ অহৈতুকী নয়। মৃত্যুপথযাত্রী পরিষ্কার ভাষায় স্বীকারোক্তি দিয়ে গেছে কেন সে আত্মহত্যা করছে।

—না, ও রকম না। মিস্টিরিয়াস্ কোনো কিছু? যার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়নি?

—হ্যাঁ, আরও একটা ঘটনা ঘটেছিল। অবশ্য সামান্য ব্যাপার। তবে মিস্টিরিয়াস! যার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়নি। কলিমুদ্দিন চাচার একটা পাঁঠার গলায় কেউ ক্ষুর দিয়ে নালিটা কেটে দিয়ে গিয়েছিল। রাতের বেলা। চুপি চুপি। পাঁঠাটা চুরি করে নিয়ে যায়নি কিন্তু। পুলিশের ধারণা এ কাজ কলিমুদ্দিন চাচার কোনও শত্রুর। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে। কিন্তু গ্রামের সব্বাই জানে, কলিমচাচা নির্বিরোধী অজাতশত্রু মজুর চাষী। একা থাকে। নিতান্ত ধর্মভীরু।

—তুমি কলিমুদ্দিনকে প্রশ্ন করনি কেমন করে এমনটা হলো?

—করেছিলাম। ও কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি। ওকে আমি পঞ্চাশ টাকা সাহায্য দিতে চেয়েছিলাম। ও নেয়নি। বলেছিল, কর্নেল-কর্তা ওকে ডেকে পাঠিয়ে নানান প্রশ্ন করেছিলেন। তাঁর রাজ্যে এতবড় দুঃসাহস কার হলো সেটা খুঁজে বার করতে চান তিনি। যাবতীয় তত্ত্বতালাস নিয়েছিলেন। এবং শেষমেশ পাঁঠার পুরো দামটা তাকে ধরে দিয়ে বলেছিলেন. 'তোর পাঁঠার জানটা আমি ফেরত দিতে পারব না রে কলিম, কিন্তু আমার রাজ্যে এই যে অন্যায়টা ঘটল—পুলিশ কিছুই করতে পারল না—এটা আমার জরিমানার টাকা! তুই নিলে আমার কলজেটা ঠাণ্ডা হবে।"

বাসু বলেন : আজব মানুষ! অজ্ঞাত অপরাধীর জন্য উনি অযাচিত প্রায়শ্চিত্ত করলেন!

দেবযানী বলল, এটাই তো ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য মামু। শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বে অকালমৃত্যু হলে অযোধ্যারাজকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো। কর্নেল কাকু ক্রিশ্চিয়ান। তবু ভারতবর্ষের সেই ট্র্যাডিশনটা মেনে চলেন। তাঁর বিশ্বাস সরকার জমিদারী কেড়ে নিক না নিক, তিনিই দেশের রাজা! প্রজার দুঃখ তাঁরই দুঃখ। প্রজার আর্থিক ক্ষতি তাঁকেই পূরণ করতে হবে।

দুই

হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল-চৌহদ্দির একান্তে হেডমাস্টার-মশায়ের কোয়ার্টার্স। ছোট্ট দ্বিতল বাড়ি। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সামনে ঢালাই লোহার গেট। সেখান থেকে লাল কাঁকর বিছানো রাস্তাটা আগন্তুককে পৌঁছে দেয় সদর দরজায়। দু-পাশে রজনীগন্ধা, দণ্ডকলস আর অ্যাকাসিয়া পামের ঝাড়। বাগানে আম, জাম, পেয়ারা তো আছেই তাছাড়া একটি সযত্ন-রক্ষিত পান্থপাদপ। দীনেশচন্দ্র ইতিহাসের অধ্যাপক, বটানির নয়। কিন্তু স্বভাবে বোধহয় তিনি বৃক্ষপ্রেমী। বাগানটাকে যত্ন নিয়ে সাজিয়েছেন। সবচেয়ে অবাককরা ওঁর বাগানে ঘাসের 'লন'। সপ্তাহান্তে স্বহস্তে লন-মোয়ার চালিয়ে ঘন-সবুজ আস্তরণের যেন টেনিস-কোর্ট বানিয়ে রেখেছেন।

ওদের ট্যাক্সিটা যখন দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল তখন হেডমাস্টারমশাই খালি গায়ে কী একটা গাছের গোড়া খুঁড়ে দিতে ব্যস্ত। গাড়িটা দোরগোড়ায় আসার পর উনি খুরপি হাতে উঠে দাঁড়ালেন। বাঁ হাতে চশমাটাকে স্বস্থানে স্থাপন করতে গিয়ে নাকে এঁটেল মাটির কাদা লাগালেন।

ওরা তিনজন একে একে ট্যাক্সি থেকে নামল। ডিকি থেকে স্যুটকেসগুলো নামাতে কৌশিক ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দেবযানী সুজাতার দিকে ফিরে বসে, ভুল করে বসবেন না সুজাতাদি। উনি আমার বাবা, বাগানের মালি নন।

সুজাতা ছদ্ম ভর্ৎসনা করে, তোমাকে পাকামো করতে হবে না। গোয়েন্দারা একনজরেই বুঝে নেয় কে মালি, কে হেডমাস্টারমশাই!

দীনেশচন্দ্র অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে ওদের দুজনকে নিয়ে গিয়ে বসালেন বৈঠকখানায়। বললেন, দেবী এস. টি. ডি. করে কাল রাত্রেই আমাকে জানিয়ে রেখেছিল আপনারা দুজন আসছেন। আমাদের এখানে বড় একটা কেউ তো আসে না। তাই অতিথি পেলে আমরা বর্তে যাই, কৌশিকবাবু।

কৌশিক জিজ্ঞাসু নেত্রে দেবযানীর দিকে তাকাল। সে ট্যাক্সি ফেয়ার মিটিয়ে সবে ঘরে ফিরেছে। একগাল হেসে বলল, কৌশিকদা, আমার একুশ বছরের জীবনে বাবাকে কোনোদিন কখনো মিছে কথা বলিনি। আমার তো মা নেই—উনিই আমার বাবা এবং মা।

কৌশিক জানতে চায়, বন্ধু? পিসিমা?

—সকলের কাছে আপনি অধ্যাপক সুব্রত মিত্র। সুজাতাদি হচ্ছেন সুস্মিতাদি। বাবা! তুমিও ওঁদের ওই নামেই ডেক। নাহলে...

—অল রাইট। অল রাইট!—এককথায় মেনে নেন হেডমাস্টারমশাই।

বঙ্কু তখনো স্কুল থেকে ফেরেনি। পিসিমা ঠাকুরঘরে।

সদর-দরজা বন্ধ করে দীনেশবাবু ওদের দ্বিতলে নিজের ঘরে নিয়ে এসে বসালেন। দেবযানী গেল চায়ের এন্তাজামে। দীনেশচন্দ্র বললেন, দেখুন আপনারা দুজন চেষ্টা করে। যদি কোনও সমাধান খুঁজে পান। আপনারা দুজন, আমাদের পরিবারে খুবই পরিচিত। দেবী যাবতীয় কাঁটা-সিরিজের বই কিনে আনে। আমি পড়ি, দিদি পড়েন, বঙ্কুও পড়ে।

—বঙ্কুর কোন ক্লাস?

—ক্লাস সেভেন। আমি বারণ করি না। টি.ভি-তে অবাস্তব টিসম্-টিসম্ এর চেয়ে আপনার রচনা অনেক বুদ্ধিদীপ্ত, তা কি বলে ভাল, আপনার মুখের উপরই বললাম।

প্রসঙ্গটা বদলাতে সুজাতা জানতে চায়, আপনার কী ধারণা মাস্টারমশাই? হিমু হঠাৎ এখন বিয়েতে গররাজি হচ্ছে কেন? সে কি অন্য কোনও মেয়ের প্রেমে পড়েছে?

—আমি জানি না, মা। নাহং বেদ। আই ডোন্ট নো!

—জানেন না। আন্দাজ তো করতে পারেন। ও তো আপনার ছাত্র ছিল এককালে।

—না। ভুল হলো তোমার। হিমু আমার ছাত্র ছিল না কোনোকালেই। আড়াই-তিন বছর বয়সে হতেই কর্নেল-সাহেব ওকে এ গ্রামেই মিস্ অ্যাগনেসের নার্সারী স্কুলে ভর্তি করে দেন। ওই গীর্জা সংলগ্ন ক্রিস্টিয়ান মন্টেসারি স্কুলে। সেখান থেকে সে সরাসরি চলে যায় দার্জিলিঙে। আমার স্কুলে সে কোনোদিন ভর্তিই হয়নি। তবে ছেলেটিকে আমি বড় ভালবাসতাম। দারুণ কৌতূহলী। ছুটিতে এখানে এলে আমার লাইব্রেরিতে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইংরেজি বই পড়ত। তাকে আমি ভালবাসতাম, বাসি। সেও আমাকে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে, ভালবাসে। সে আমার জামাই হলে আমি ধন্য হয়ে যেতাম। কিন্তু কী বলব, সুজাতা মা—আই মীন সুস্মিতা-মা। তা হবার নয়। হিমু বেঁকে বসেছে।

সুজাতা জানতে চায়—এটা কি ইটার্নাল ট্রায়াঙ্গেল হয়ে গেল মাস্টারমশাই? তৃতীয় কোনো সুন্দরী, গ্ল্যামারাস কুমারী—

কথার মাঝযখানেই দীনেশদন্দ্র বলে ওঠেন, বলেছি তো, নাহং বেদ! আমি জানি না। খবর পাইনি—

ঠিক সেই সময়েই একটা ট্রেতে চার কাপ কফি আর দু-প্লেট এগ-পাকোড়া নিয়ে রান্নাঘরের দিক থেকে এসে ঘরে ঢুকল দেবযানী। ট্রেটা সেন্ট্রাল টেবিলে নামিয়ে দিতে দিতে বললে, বাট আই নো! দ্য আনসার ইজ অ্যান এস্ফাটিক : নো।

কৌশিক বললে, বস তুমি। প্রথমে বল, এত নিশ্চিতভাবে তুমি কেমন করে জানলে? হিমু গত দু-তিন বছর যে মিলিটারি ক্যাম্পাস-এ ছিল, সেখানে তার সঙ্গে কোনো মেয়ের ঘনিষ্ঠ আলাপ হওয়া কি এতই অসম্ভব?

—হ্যাঁ। তাহলে হিমু সে-কথা আমাকে খোলাখুলি বলত। ফিরে আসার পর ও দিন দিন বদলে যাচ্ছে। মুখ-চোখের এক্সপ্রেশন পর্যন্ত। ওর গালে কেমন যেন লাল র‍্যাশ বেরিয়েছে। এখন যেন সে সর্বদাই একটা চাপা উত্তেজনায় অমন লাল হয়ে থাকে। ও খোলাখুলি আমাকে জানিয়েছে কেন সে বিয়ে করবে না। ওর ঠাকুর্দার সেই ভয়াবহ শেষ জীবনটা ওকে হন্ট করে ফিরছে। আমার আশঙ্কা হয়, ও যদি নিশ্চিত বুঝতে পারে যে, এই মর্মান্তিক দুর্ভাগ্য থেকে ওর পরিত্রাণ নেই, তাহলে...

কথাটা সে শেষ করতে পারল না। দীনেশবাবু বললেন, আপাতত ও কথা থাক, মা, সবাইকে কফি-টফি দে—

সুজাতা আর দেবযানী প্লেট আর কফি এগিয়ে দিতে থাকে।

হঠাৎ বেজে উঠল টেলিফোনটা। হেড়মাস্টারমশাই তুলে নিয়ে আত্মঘোষণা করলেন। বললেন, সুপ্রভাত ঘোষমশাই...আঁা? হ্যাঁ, এসেছে। আজ সকালেই। ওর সঙ্গে ওর কলেজের এক অধ্যাপকও এসেছেন। সস্ত্রীক।...আঁা? না, এমনি বেড়াতে।...আচ্ছা বলব। দেবযানীকে বলব ওঁদের দুজনকে আপনার দোকানে নিয়ে যেতে।...আমার শরীর ভালই আছে। আচ্ছা রাখি।

দেবযানী মুখ তুলে জানতে চাইল, বসন্তকাকা?

—হ্যাঁ, আজিমগঞ্জ থেকে একটা ট্যাক্সিতে তোকে বুঝি আসতে দেখেছেন। তুই কিনা কনফার্ম করে নিলেন।

কৌশিক পাকোড়া চিবাতে চিবাতে বললে, এই বসন্তকাকাটি কে? স্থানীয় ভদ্রলোক তা তো বোঝাই যায়। কী করেন? আপনাদের সঙ্গে সম্পর্কটাই বা কী?

দীনেশবাবু বসন্ত ঘোষের বিস্তারিত পরিচয় দিলেন। দেবযানীও নানান সংবাদ যোগান দিল। জানা গেল : এই বসন্তকুমার ঘোষ কর্নেল বিল্ পাঠকের বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী। শুধু তাই নয়, দুজনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। এই গ্রামেরই বাসিন্দা। সংসারে কেউ নেই। একেবারে একা মানুষ। বিয়ে-থা করেননি। স্টেশন রোড যেখানে বাজার রোডে পড়েছে সেখানে প্রকাণ্ড একটা স্টেশনারি স্টোরস। নাম :'গায়ত্রী ভাণ্ডার'। তিনতলা বাড়ি। একতলায় শোরুম ও দোকান। দোতলায় গুদাম। তিনতলায় দু'কামরা ফ্লাটে একটি কম্বাইন্ড হ্যান্ডকে নিয়ে কনফার্মড ব্যাচিলার বসন্তবাবু বাস করেন। কম্বাইন্ড হ্যান্ডের কাজ সামান্যই। কারণ দিনের বেলা 'পাঠক-প্যালেস' থেকে টিফিন-ক্যারিয়ারে ওঁর মধ্যাহ্ন আহার আসে। আর সন্ধ্যায় মেমসায়রের পাড়ে লম্বা একটা চক্কর মেরে বসন্তকাকু পাঠক-প্যালেসে উপস্থিত হন। দু-বন্ধুতে দু-তিন হাত দাবা খেলা চলে। দেশের রাজনীতি, শেয়ার বাজার, ভোটের বাজার ইত্যাদির হদ্দমুদ্দ করে দুই বন্ধুতে সায়মাসে বসেন। রাত নয়টা নাগাদ একটা পাঁচ সেলের টর্চ জ্বেলে বসন্তকাকু 'আফটার ডিনার ওয়াক আ মাইল' সারেন। বাঁধা জীবন। নিতান্ত নিরুপদ্রব। কর্নেল-সাহেবের অত্যন্ত বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য বয়স্য। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে কর্নেল কিছু করেন না।

সুজাতা দীনেশবাবুর কাছে জানতে চায়, তা কর্নেল পাঠকের এই ফ্রেন্ড, ফিলসফার অ্যান্ড গাইডটি হিমুর অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা বা সাইকিয়াট্রিস্টকে দিয়ে দেখানোর বিষয়ে কী বলেন?

দেবযানী উপরপড়া হয়ে বলল, তবেই হয়েছে। বসন্তকাকু একজন আউট অ্যান্ড আউট ফেটালিস্ট! আমি কতবার বলেছি—কিন্তু ওঁর সেই ভদ্রলোকের এককথা :'এ সব ভবিতব্য মা! 'ললাটঙ্ক লিখন'। হরিদ্বারে গুরুদেবকে লিখেছি। দেখি তিনি কী জবাব দেন!'

দীনেশবাবু বললেন, বসন্তবাবু অত্যন্ত দৈব-নির্ভর। তাঁর দশ আঙুলে আটটি গ্রহবারণ আঙটি। হরিদ্বারে ওঁর এক গুরুবাবা আছেন, তিনি যদি বলেন, ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করে নাকে কাঠি দিয়ে তিনবার হাঁচবে, তাহলে বালিশের পাশে কাঠি রেখে উনি ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে শোবেন। তিনবার হাঁচবেন। চতুর্থ হাঁচিটি থামাতে যদি তাঁর মৃত্যু হয় সো ভি আচ্ছা। আশ্চর্য মানুষ! শান্তি-স্বস্ত্যয়ন-গ্রহ-তাবিজ আর যজ্ঞভস্মে ঘি ঢালা।

—আর কর্নেল পাঠক?

—তিনি তো হ্যানিম্যানের হদ্দমুদ্দ করে ছেড়েছেন ছেলের চিকিৎসার জন্য। আজ

পালসেটিলা, তো কাল নাক্স ভমিকা, তার পরেই সালফার থাট্টি, বেলেডোনা টু হান্ড্রেড! হ্যানো ওষুধ নেই যা হিমুকে খাওয়াননি।

সুজাতা জানতে চায়, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হিসাবে ওঁর পশারটা কেমন?

—টাকার মাপকাঠিতে শূন্য। কারণ উনি ফী নেন না। তবে হ্যাঁ, স্বীকার করতেই হবে, ডক্টর বিল্ পাঠকের উপর গ্রামের মানুষের অগাধ বিশ্বাস। সকাল আটটা থেকে দশটা উনি বৈঠকখানায় বসে রুগী দেখেন। গোনাগুনতি একশোটি। ভোর রাত থেকেই সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার দুটি কারণ। এক : উনি একটি কপর্দকও নেন না, ফী বা ওষুধ বাবদ। সবই মানবহিতার্থে ওঁর দান। বাইরে একটা দরিদ্রভাণ্ডারের কৌটো আছে। তাতে যে-যা ইচ্ছে ফেলতে পারে। নাও পারে। দুই : ওঁর ওষুধ কথা বলে। সেদিক থেকে ধন্বন্তরি। একমাত্র ওঁর নিজের ছেলের চিকিৎসার ক্ষেত্রে উনি বোধহয় ব্যর্থ হয়েছেন!

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে কৌশিক বলে, আপনাদের গ্রামটার নাম, 'আদমগড়' না হয়ে হওয়া উচিত ছিল 'আজবগড়'।

—তা যা বলেছেন।

মেনে নিলেন হেডমাস্টারমশাই।

তিন

মফঃস্বল আধা-শহর অনুপাতে দোকানটি প্রকাণ্ড। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরস্। স্টেশনারি, জামা-কাপড়, বিছানাপত্র সব কিছুই একঠাঁই পাওয়ার ব্যবস্থা। দোকানে ঢুকে কৌশিকের মনে হলো—বসন্তকাকু একজন বিরাট ধনী লোক। এতবড় তিনতলা বাড়ির মালিক এবং এত প্রকাণ্ড দোকানের অধিকারী যখন। দেবযানী ওদের দুজনকে নানান গলিপথ দিয়ে দোকানের পিছন দিকে নিয়ে গেল। সেখানে একটা বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপ্রান্তে বসেছিলেন বসন্তবাবু। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। একহারা পাকানো চেহারা। প্রায় ছয় ফুটের কাছাকাছি। গৌরবর্ণ। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে তিনি বসেছিলেন। ওদের এগিয়ে আসতে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। যুক্তকরে নমস্কার করে বললেন, আসুন, প্রফেসর সাহেব। মা লক্ষ্মী, আপনিও বসুন ওই চেয়ারটায়।

তিনজনেই বসল ওঁর দর্শনার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারে। বসন্তবাবু বললেন, প্রথমেই বলুন, কী আনতে বলব? গরম না ঠাণ্ডা?

সুজাতা বলে, আমরা এইমাত্র দেবযানীদের বাড়িতে কফি আর জলখাবার খেয়ে এসেছি। আপাতত আর কিছু খেতে পারব না। তবে আমরা তো দিন-দুয়েক থাকছি। আবার যখন আসব—

—ঠিক আছে মা, তাই হবে। কিন্তু আদমগড়ে আপনারা কী দেখতে এলেন বলুন তো মশাই?

কৌশিক কৈফিয়ত দেয়, কলেজে ছেলেরা স্ট্রাইক করেছে। দিন-সাতেক ক্লাস-টাস্ হবে না। দেবযানী জানতে চাইল, আদমগড়ে যাবেন, স্যার? আমি তো যাব দিন-তিনেকের জন্য। ও বলল, এখানে 'পাঠক-প্যালেসে' অনেক দর্শনীয় কিউরিও আছে—

—তা আছে। আদমগড় একটি প্রাচীন জনপদ। 'আদম' নামে এক সাহেব এর পত্তন করেন। আগে নাম ছিল সুতীগ্রাম। পরে ওই আদম-সাহেবের নামেই গ্রামটার নাম হয়ে যায় আদমগড়।

কৌশিক জানতে চায়, আপনারা বোধহয় এখানকার অনেক দিনের বাসিন্দা?

—আরে না, না। দু-পুরুষের বাস। বিলুর জ্যাঠামশাই, আমার বাবাকে তাঁর সেক্রেটারি হিসাবে এখানে নিয়ে আসেন স্বাধীনতার পরের বছর। আমার জন্ম তার তিন বছর পরে।

—বিলু কে?—ন্যাকা সাজে কৌশিক।

—'বিলু' মানে বিল্, উইলিয়াম পাঠক। আমার বাল্যবন্ধু। সেই এখন পাঠক-কাস্‌ল্-এর মালিক। আমরা দুজনেই এখানকার স্কুলে একই ক্লাসে পড়েছি। তারপর বিলু মিলিটারিতে যোগ দেয়—

—এ দোকানটাও তাহলে দু-পুরুষের?

—এবারও আন্দাজে ভুল হলো আপনার। এ দোকানটা বিলুই তৈরি করেছে। আমি দেখভাল করি মাত্র। এটা বিলুর গড়া একটা তাজমহল। "গায়ত্রী ভাণ্ডার"! গায়ত্রী ওর স্ত্রীর নাম। মাত্র একুশ বছর বয়সে বেচারি মারা যায়। অপঘাতে। বিয়ের মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে।

—মিস্টার উইলিয়াম পাঠক তারপর আর বিয়ে করেননি?

—না। ও তো মিলিটারিতে চলে গেল। গায়ত্রীর মৃত্যুর সময় তার বাচ্চাটা নিতান্ত শিশু। তাকে মানুষ করে তোলে তার পিসিমা, বাতাসী। তারও এক বিরাট কাহিনী...

দেবযানী বাধা দিয়ে বলে, আমি জানি। বাতাসী পিসির গল্পটা আমি ওঁদের শুনিয়ে দেব'খন।

বসন্তবাবু যেন একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। জমাটি একটা কিস্‌সা বর্ণনার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে।

মধ্যাহ্ন আহারের সময় হয়ে এসেছিল। আরও খানিকক্ষণ এ-কথা সে কথার পর ওরা ফিরে এল হেডমাস্টার মশায়ের কোয়ার্টার্সে।

আজ আর দইমাছ বানানোর সময় পায়নি দেবযানী। গিরি পিসিমার নিরামিষ রান্নাই আহার করলেন ওঁরা তিনজন। দেবযানী কিছুতেই একসঙ্গে বসল না, বলল, আমি পিসির সঙ্গে খেয়ে নেব'খন।

আসলে সে পরিবেশনের দায়িত্বটা পিসির ঘাড় থেকে নামাতে চেয়েছে মাত্র।

সুজাতা আর কৌশিক ভদ্রতাসূচক প্রশংসা করল নিরামিষ রান্নার। আদমগড়ে ভাল রাঘবসাই পাওয়া যায়। ওপার-বাঙলা, সম্ভবত রাজসাহী বা নাটোর থেকে কেউ এসে মিষ্টির দোকান দিয়েছে। দই-রাঘবসাই দিয়ে উপসংহারটা জমল জবর।

আহারান্তে দেবযানী এসে জানতে চাইল, দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নেবেন নাকি?

কৌশিক বলে, দিবানিদ্রার অভ্যাস আমাদের দুজনের কারও নেই। তুমি বিলু কাকাকে জানিয়ে রেখেছ তো যে, আমরা বিকালে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে যাচ্ছি, আর কিউরিও দেখতে?

—হ্যাঁ রেখেছি। কিন্তু বিকালে নয়, সাড়ে চারটের সময়। আর সাড়ে চারটে মানে চারটে ত্রিশ মিনিট। বিল্ কাকুর একেবারে মিলিটারি-টাইমিং। চারটে পঁয়ত্রিশে গেলে হয়তো গিয়ে শুনবেন সাহেব এইমাত্র গাড়ি নিয়ে কোথায় যেন বেরিয়ে গেছেন। উনি ধরে নিয়েছিলেন যে আজ আপনারা আসবেন না।

কৌশিক বলে, ঠিক আছে। আমার হাতঘড়ি আই. এস. টি. দিচ্ছে। আমরা দুজন ঠিক চারটের মধ্যে তৈরি হয়ে নেব। চা-পর্বটা নিশ্চয় পাঠক-প্যালেসে হবে। তুমি বরং ওই বাতাসী পিসির গল্পটা শুনিয়ে দাও ততক্ষণ।

বাতাসীর জীবনটা বড় করুণ। ওর বাবা ছিলেন আলিনগরের একজন ধনবান বণিক। জাতিতে সাহা। প্রকাণ্ড মদের দোকান ছিল তাঁর। বাতাসী তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা। সুপাত্রে তার

বিবাহের ব্যবস্থাও করেছিলেন—মোটা নগদ পণ দিয়ে। আলিনগর গ্রামটা আদমগড়ের পশ্চিমে, মাইল পঁচিশ দূরে। সম্ভবত সিরাজউদ্‌দৌলার মাতামহের নামে। বাঙলা-বিহারের সীমান্তে। পশ্চিম বাঙলায়।

বিবাহরাত্রে বহু লোকের নিমন্ত্রণ ছিল। বস্তুত সাহামশাই আলিনগরের যাবতীয় ভদ্রসমাজকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। প্রবেশদ্বারের উপর রসুন চৌকি। সকাল থেকে সেখানে সানাই বাজছে। সাহামহাশয়ের বিরাট বাড়ি। প্রকাণ্ড বাগান। দু-প্রান্তে দুটি প্যান্ডেল। একটি বরাসন। সেখানে ফোল্ডিং চেয়ারে জমিয়ে বসেছেন বরযাত্রীদল। ও-পাশে বিরাটতর নৈশভোজনের প্যান্ডেল। পংক্তি ভোজনের আয়োজন। বিবাহ-লগ্ন একপ্রহর রাত্রে। পংক্তি ভোজন শুরু হয়ে গেছে। ভিতরে চকমিলানো বাড়ির উঠানে ছাঁদনাতলা। সেখানে পুরললনাদের সম্মিলিত হুলুধ্বনি আর শঙ্খনিনাদে স্ত্রীআচার সাড়ম্বরে শেষ হতেই কনেকে পিঁড়ির উপর বসিয়ে নিয়ে এল সাহাবাবুর পুত্র, ভাইপো প্রভৃতিরা। সাতপাক ঘুরিয়ে কনেকে আলপনা দেওয়া পিঁড়িতে বসিয়ে দিল তারা।

সালঙ্কারা কন্যা বসে আছে আলপনা-দেওয়া পিঁড়িতে। কনের জেঠামশাই সম্পদান করবেন। পুরোহিত মশাই ঘড়ি ধরে বসে আছেন—মাহেন্দ্র লগ্ন আসতে বিলম্ব নেই। বরযাত্রী-কন্যাযাত্রী মিলিয়ে বিবাহ মণ্ডপে তখন অন্তত শতখানেক মানুষ। এমন সময় রে-রে করে এসে পড়ল দুই জিপ ভর্তি সশস্ত্র ডাকাতের দল। তাদের হাতে বন্দুক নয়, সদ্য-আমদানি অটোমেটিক স্টেনগান : খ্যাটা-খ্যাটা-খ্যাটা-খ্যাটা করে মিনিটে পঞ্চাশজনকে জমি সই-সই করে দিতে পারে। সাহাবাবুর পাইক-বরকন্দাজেরা প্রতিবাদের সূচনা করতেই ওরা শুরু করে দিল—খ্যাটা-খ্যাটা-খ্যাটা-খ্যাটা...

দুদ্দাড়িয়ে পালাল সকলে—যে যেখানে পারে। তবে ডাকাতরা ভদ্র। দু-পাঁচজন মহিলার গলার হার, হাতের চুড়ি, কান ছিঁড়ে টেঁড়ি ঝুমকো কেড়ে নেওয়া ছাড়া সর্বসমক্ষে কারও শ্লীলতাহানি করেনি। সাহামশাই যে নগদ পণ দিয়েছিলেন সেটা দর্শনধারী করতে রৌপ্যমুদ্রায় পিতলের কলসিতে ভর্তি ছিল। ডাকাতরা সেটা উঠিয়ে নিয়ে গেল।...আর উঠিয়ে নিয়ে গেল সালঙ্কারা হবু নববধূকে।

এই হৈ চৈ-এর মধ্যে বোধহয় মাহেন্দ্রক্ষণটা এসেছে এবং চলেও গেছে। বিবাহমণ্ডপে নেমে এসেছে শ্মশানের স্তব্ধতা। পুলিশ কিছুই করতে পারেনি। খুঁজেই পায়নি ডাকাতদের আস্তানা। বিল্ পাঠক—তখন তিনি কর্নেল নন, মেজরও নন,—ক্যাপ্টেন পাঠক, তাঁর নিজস্ব গুপ্তচর বাহিনীর মাধ্যমে সন্ধান পেলেন ডাকাতদের গোপন আস্তানার। সেটা ওই আলিনগরের উত্তরে একটা ঘন জঙ্গলের ভিতরে। জঙ্গলটার নাম 'কঙ্কালীতলা'। ক্যাপ্টেন উইলিয়াম পাঠক তখনো ছিলেন এলাকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। মাত্র সাতজন দুঃসাহসী কমান্ডো অনুচরকে নিয়ে তিনি হানা দিলেন ডাকাতদলের আস্তানায়। অপারেশন 'নববধূ উদ্ধার'। ওরা অপ্রস্তুত ছিল। এ আক্রমণের আশঙ্কাই করেনি। অধিকাংশ প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল—তিনজন প্রাণ দিয়েছিল প্রতিবাদ করতে গিয়ে। নগদ বা গয়না উদ্ধার করতে পারেননি; কিন্তু বন্দিনী নববধূকে উদ্ধার করে আনতে পেরেছিলেন।

আনন্দের কথা : পুলিশ ক্যাপ্টেন পাঠকের বিরুদ্ধে নরহত্যার চার্জ ফ্রেম করেনি। তেমনি দুঃখের কথা : বাতাসীকে কোনোপক্ষই ফিরিয়ে নিতে রাজি হলো না। না পিতৃপক্ষ, না শ্বশুরবাড়ি। বাতাসী কাঁদতে কাঁদতে এসে আশ্রয় নিল পাঠক-প্যালেসে।

বাতাসীর দুঃখের কাহিনীর পরিণতি সেই গ্রাম্য ছড়াটিতে বিধৃত : 'সুন্দরীরে বিয়ে দিলেম ডাকাত দলের মেলে।' ছড়া শেষ হলেও জীবন চলতে থাকে। বিল্ পাঠক একদিন হঠাৎ

জানতে পারলেন : ডাকাতদলের বন্দিদশা থেকে যে হতভাগিনীকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিলেন, সে তার পেট-কোঁচড়ে নিজের অজান্তে নিয়ে এসেছিল একটি অজাত ভ্রূণ!

কী কেলেঙ্কারি!

তখনো বিল্ পাঠক বিবাহ করেননি।

বাতাসী আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। দৃঢ়মুষ্টিতে তাকে বাধা দিয়েছিলেন পুরুষসিংহ উইলিয়াম পাঠক। না! বাতাসী আত্মহত্যা করলে তাঁর চরম পরাজয়। উনি পরামর্শ করলেন ওঁর বাল্যবন্ধুর সঙ্গে। ফ্রেন্ড, ফিলসফার অ্যান্ড গাইড বসন্ত ঘোষের সঙ্গে। বসন্তকুমার নাকি বলেছিলেন—দেবযানী অবশ্য সন্দেহাতীতভাবে জানে না, তবে এটাই গ্রামের সকলের বিশ্বাস : বসন্তকুমার বন্ধুকে বলেছিলেন, তুমি যদি চাও তাহলে আমি ওই বাতাসীকে হিন্দু ধর্মমতে বিবাহ করতে প্রস্তুত। ওর সন্তানকে আমার সন্তান বলেই পরিচয় দেব আমি।

বিল্ পাঠক স্বীকৃত হননি। তিনি একজন বিহারী পাত্রকে ধরে আনলেন। সে লোকটা স্বীকার করল সামাজিক বিবাহে সে মন্ত্রপাঠ করবে, বরপণটা নগদ গুণে নেবে এবং ফুলশয্যার লোভনীয় আকর্ষণকে দমন করে চিরকালের মতো হাওয়া হয়ে যাবে। বরপণটা সে নিচ্ছে—বাতাসীর অজাত সন্তানকে বৈধতা দান করতে। তাকে একটি পিতৃপরিচয় দিতে। এইমাত্র। ক্যাপ্টেন পাঠক তাকে জনান্তিকে ডেকে বলেছিলেন, নগদ টাকা গুণে নিয়ে তুমি তোমার ছাপ্‌ড়া জিলার গ্রামে ফিরে যাও। বিয়ে-সাদি করো। ঘর-সংসার পাত। যদি কোনোদিন শুনি তুমি ধর্মপত্নীর সন্ধানে এখানে ঘুরঘুর করছ আমি কিন্তু তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।

লোকটা গরুড়-পক্ষীর মতো জোড়হস্তে মহাবীরজির নামে শপথ করেছিল, য়্যাদ রহেগা, সরকার! ম্যয় কভি নেহি লটুঙ্গা।

সত্যিই সে কোনোদিন ফিরে আসেনি আর। বাতাসীর সন্তান—হিমুর প্রায় সমবয়সী সে—পিতার উপাধিটা পেয়েছিল এভাবে : শরৎকুমার পাণ্ডে।

হিমুর নামটা হেমন্ত—ওই শরতের সঙ্গে মিলিয়ে। শরৎ মানুষ হয়েছে এই পাঠক-কাস্‌লেই।

তার তথাকথিত পিতৃদেব বোধকরি তাঁর মাথার খুলির মায়ায় আর কোনোদিন এ গ্রামে ফিরে আসেননি।

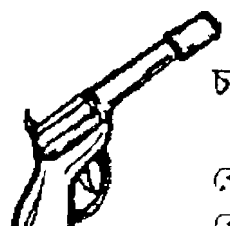

চার

ভারতীয় সময় বিকাল চারটে সাতাশ মিনিটে পাঠক-প্যালেসের কল-বেল-এ আঙুল ছোঁয়াল কৌশিক। ভিতরে বহুদূরে একটা সুরেলা মিষ্টি গানের রেশ বাজতে শুরু হতেই সদর দরজা গেল খুলে। একজন প্রৌঢ় মতো লোক দ্বারের ওপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। নিচু হয়ে নমস্কার করে বলল, আসুন বাবু, আসুন মাঠান। সাহেব আমারে জানিয়ে রেখেছিলেন, আপনারা সাড়ে চারটের সময় আসপেন। আসুন—এবাগে—এই বোঠকখানা ঘরে।

কৌশিক, দেবযানী আর সুজাতা চওড়া করিডোর পার হয়ে একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। প্রৌঢ় লোকটা দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে দু'হাত চিতিয়ে এমন ভঙ্গি করল যার আক্ষরিক অভিধা : আস্তে আজ্ঞা হোক।

দেবযানী জানতে চাইল, ভাল আছো তো বটুকদা?

—আছি, দিদিমণি। তবে খোকার মায়ের শরীর গতিকটা ভাল যাচ্ছে না।

—কী হয়েছে বৌদির?

—কী যে হয়েছেন তা কেমন করে বুঝব বলুন? কলেরা হলেও সাদাসাদা বড়ি, সাপে কামড়ালেও তাই। এ তল্লাটে কীজাতের চিকিচ্ছে হয় তা তো আপনে ভালই জানেন।

—হাঁটতে চলতে পারে? তাহলে ওকে একবার শ্রীধর জেঠুর কাছে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখিয়ে আনো না? সন্ধ্যাবেলা, সাহেব যখন দাবায় বুঁদ হয়ে থাকেন?

বটুক দু-হাতে নিজের দুই কর্ণমূল স্পর্শ করে বললে, আমার ঘাড়ে একটাই মাতা, দিদিমণি।

তারপর কৌশিকের দিকে ফিরে বললে, সাহেবরা এখনি আসপেন। আমি খপরটা দে-আসি।

—'সাহেবরা' মানে?—জানতে চায় সুজাতা।

—কাকাবাবুও আজ সকাল-সকাল এসে গেছেন। বসেন আপনেরা—

বটুক ঘর ছেড়ে নিষ্ক্রান্ত হতেই কৌশিক জানতে চায়, কাকাবাবু নিশ্চয়ই সেই মিস্টার ঘোষ, কিন্তু শ্রীধর জেঠুটি কে?

—আদমগড়ের একমাত্র অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার। বৃদ্ধ। নেভিল দাদুর আমল থেকে এখানে প্র্যাকটিস্ করছেন! বিল্‌কাকু তাঁকে আদমগড় থেকে বিতাড়িত করেননি।

—তা, তাঁকে দিয়েই হেমন্তকে একবার দেখানো যায় না?—ওই তোমার বিল্‌কাকু যখন বসন্তকাকুর সঙ্গে দাবায় বুঁদ হয়ে থাকেন?

দেবযানী হেসে বললে, আমার ঘাড়েও একটাই 'মাতা', স্যার।

তখনই ফিরে এল বটুক। বললে, সাহেব 'টয়লেটে' গেছেন, এক্ষুণি এসে পড়বেন।

তারপর একটু ইতস্তত করে কৌশিককে বললে, আপনি...মানে, আমারে চিনতে পারলেন না বাবু? আমারে আপনি একদিন ব্যারিস্টার-সাহেবের ঘর থিকে খ্যাদায়ে দেছিলেন, মনে নেই? আমি...ইয়ে, বটুক মণ্ডল...তারাতলার সন্তোষী-মা যখন খাড়া হচ্ছিলেন তখন ওখানে আমার একটা পানের দোকান ছিল।

কৌশিক এতক্ষণে ওকে লক্ষ্য করে দেখে। হ্যাঁ, লোকটাকে তাই প্রথম থেকে চেনা-চেনা লাগছিল। 'কৌতূহলী কনের কাঁটা'-কেসে আদালতে সাক্ষী দিয়েছিল লোকটা। ওর সাক্ষ্য দেবার আগের দিন বাসু-সাহেবের চেম্বারে এসে মিথ্যে-সাক্ষ্য দেবার একটা তির্যক-প্রস্তাব দিতে গিয়ে বাসু-সাহেবের কাছে ধমক খায়। এতক্ষণে সব কথা মনে পড়েছে কৌশিকের। কিন্তু সে-কথা অস্বীকার করে বলে, না! তারাতলার সন্তোষী-মা অ্যাপার্টমেন্টে আমি তো কোনোদিন যাইনি।

—আজ্ঞে না, আপনে যাননি। গেছিলেন তো আপনার মামা, সেই ব্যারিস্টার-সাহেব।

কৌশিককে জবাব দিতে হলো না, কারণ সেই মুহূর্তেই করিডোরে যুগল পদশব্দ শ্রুত হলো। আর তৎক্ষণাৎ বটুক সুরুৎ করে সরে পড়ল। বৈঠকখানায় ঘড়িতে ঢং করে সাড়ে চারটে বাজল।

উইলিয়াম পাঠকের পরনে সাদা পায়জামা, ঊর্ধ্বাঙ্গে একটি সিল্কের গাউন। হাতে চুরুট। শ্যামবর্ণ, কিছুটা খর্বকায়, তবে অত্যন্ত বলিষ্ঠ দেহাবয়ব। দাড়ি কামানো, চোখে বাহারে চশমা, আর নাকের ডগায় একজোড়া মিলিটারি সূচ্যগ্র গোঁফ। ঘরে প্রবেশ করতে করতেই বলছিলেন, গুড আফটারনুন, গুড আফটারনুন, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলমেন!

পিছন-পিছন এলেন বসন্তবাবু, তাঁর দীর্ঘ সুগৌর দেহাবয়ব নিয়ে। পরিধানে ধুতি-পাঞ্জাবি। দু-হাতে আধডজন গ্রহবারণ অঙ্গুরীয়। ওঁরা এসে বসেছেন-কি বসেননি চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে হাজির হলো একজন অবগুণ্ঠনবতী। তার পিছন-পিছন আর একজন ভদ্রমহিলা। প্রথমজনের সাজপোশাকে বোঝা যায় যে, সে ভৃত্যশ্রেণীর; কিন্তু পশ্চাৎবর্তিনী আভিজাত্যমণ্ডিত। বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ। ইনিও শ্যামবর্ণা, কিছুটা স্থূলকায়া, কিন্তু মুখটি ভারি মিষ্টি। যৌবন এখনো বিদায় নেয়নি তাঁর দেহমন থেকে। সবাইকে সমবেতভাবে যুক্তকরে নমস্কার করলেন। দেবযানী বলে , কেমন আছেন পিসিমা?

বাতাসী-পিসি সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, তুমি এমন অসময়ে চলে এলে যে? কলেজ-কামাই হবে না?

—না। ছাত্ররা স্ট্রাইক করেছে। শরৎদা কোথায়?

—ও এখন কলকাতায়। গেস্টকিন উইলিয়ামসে একটি চাকরি পেয়ে গেছে!

—ওমা, তা তো জানতাম না! কবে? ওর টেলিফোন নাম্বারটা দেবেন। কলকাতায় ফিরে যোগাযোগ করব। তাহলে তো আপনার কাছে একটা জব্বর খাওয়া পাওনা হয়েছে—তাই না পিসিমা?

—তা তো হয়েইছে। কাল দুপুরেই সেটা হতে পারে। তাহলে এঁদের দুজনকেও নিয়ে এস। হেডমাস্টার-মশাইকেও। গিরি-পিসিমা তো আমার হাতে খাবেন না—

সুজাতা বলে, এ তো ভারি মজার কথা! আপনার সঙ্গে ভাল করে আলাপ হবার আগেই নেমন্তন্নের অফার?

বসন্ত ঘোষ বলে ওঠেন, এটাই পাঠক-প্যালেসের ট্র্যাডিশান। আদমগড়ে নবাগত কেউ এলেই তার নিমন্ত্রণ হয়। আলাপ-পরিচয়টা হয় আহারের টেবিলে। কী বল বিলু?

উইলিয়াম পাঠক বলেন, আমাকে তো কথা বলার কোনও সুযোগই দিচ্ছ না তোমরা। মধ্যাহ্ন আহার তো পরের কথা, আপাতত কে চা নেবেন, কে কফি, কে চিনি খান আর কার 'র'-লিকার তাই তো স্থির হয়নি এখনো।

সুজাতার নজর পড়ল টেবিলের দিকে। অবগুণ্ঠনবতী ততক্ষণে কাপ-ডিশ, টী-পট, কফি-পট, দুধ-চিনির পাত্র সাজিয়ে ফেলেছে। ওই সঙ্গে একটা প্লেটে তিন-চার রকমের বিস্কুট আর ফিশ্-ফিঙ্গার। সুজাতা নিজের জন্য এক কাপ চা ঢেলে নিল। কৌশিক বলল, আমারটা র-কফি। অবগুণ্ঠনবতীর বাকিটা জানা ছিল। কর্তামশাই এবং কাকাবাবু চায়ে কে কতটা চিনি নেন তার হিসাব। দেবযানীর দিকে ফিরে ফিস্‌ফিস্ করে জানতে চায়, আপনারে কী দেব, দিদিমণি? দেবযানী তার দিকে ফিরে বললে, আমি নিজেরটা বানিয়ে নিচ্ছি, তোমাকে ভাবতে হবে না। কিন্তু কী হয়েছে গো তোমার? বটুকদা বলল, তোমার নাকি অসুখ করেছে। কী অসুখ?

বটুকের স্ত্রী জবাব দেবার সুযোগ পেল না। কারণ তার আগেই কর্নেল বলে ওঠেন, ওই তোমাদের দোষ, দেবি! মানুষের শরীরে নানাজাতের উপসর্গ হয়, তার নিরাময়ের ব্যবস্থা করতে হয়। উপসর্গগুলিকে একত্র করে এক-একটা অ্যালোপ্যাথিক অসুখের তকমা সেঁটে দেওয়া হচ্ছে প্রাচীন চিন্তাধারা। সৌদামিনীর কী জাতীয় উপসর্গ আর তার নিরাময়ের জন্য কত পোটেনশিয়ালের কোন ওষুধ দিয়েছি তা শুনলে কিছু বুঝবে?

কৌশিক প্রসঙ্গটা পরিবর্তন করে জানতে চায়, হেমন্তবাবুকে দেখছি না যে? সে কি বাড়ি নেই?

কর্নেলের স্পষ্টতই ভ্রূকুঞ্চন হলো। কৌশিকের দিকে ফিরে বললেন, হিমুর কথা দেবযানী আপনাদের বলেছে দেখছি। হ্যাঁ, সে বাড়িতেই আছে। তবে তার শরীরটা আজ ভাল নেই। নিজের ঘরে শুয়ে আছে। ঘুমোচ্ছে।...তারপর, এখানে কতদিন থাকছেন? আমার কিউরিও কালেকশান যদি দেখার ইচ্ছে থাকে তাহলে আলো থাকতে থাকতে এখনি উঠে পড়তে হবে। সন্ধ্যার ঝোঁকে প্রায়ই লোডশেডিং হয় আজকাল।

স্পষ্টই বোঝা গেল হিমুর প্রসঙ্গ তিনি আলোচনা করতে অনিচ্ছুক।

চা-পানান্তে কর্নেল-সাহেব ওদের গোটা বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখালেন।

দ্বিতল প্রাসাদ। সামনের দিকে একসার ডোরিক স্তম্ভ সোজা দোতলা পর্যন্ত উঠে গেছে। তার উপর নানা কারুকার্যখচিত এন্টাব্লেচার। পঙ্খের কাজ করা। দু-প্রান্তে 'কর্নুকোপিয়া'-হাতে দুটি ডানা-মেলা পরী। মার্বেলের নয়, চুনসুরকির কাঠামোতে পঙ্খের কাজ।

একতলায় প্রবেশপথের এক-এক পাশে দুটি করে প্রকাণ্ড হল-কামরা। এখানে বাস করে না কেউ। প্রতিটি ঘরের দরজায় কোলাপসেবল গেটে ভারী তালা। প্রথম কামরাটি বোধহয় সে-কালে নাচঘর ছিল, পরে বিলিয়ার্ড-রুম। ইদানীং সেটি কিউরিও রুম। তার পাশেরটি অস্ত্রাগার। করিডোরের বিপরীতে প্রথম কামরাটি মিউজিয়াম আর তার পাশেরটি চিত্রশালা। বাড়ির বয়স আন্দাজ করা শক্ত। তবে শতখানেকের বেশিই হবে। পিছন দিকে কিছু আউট হাউস। সেখানে দ্বারপাল, ড্রাইভার, ঠাকুর, চাকরদের বাস। এপাশে একটু দূরে, যেটা এককালে অশ্বাবাস ছিল, সেটি ভেঙে ফেলে বানানো হয়েছে মটোর গ্যারেজ। কর্নেল-সায়েবের গাড়িখানা আদমগড়ের সরু রাস্তার তুলনায় নিতান্ত বেমানান : সিডানবডি সেকেলে ব্যুইক। তার পাশেই রাখা আছে হিমুর হিরোহন্ডা। আর শরতের মারুতি-সুজুকি।

কর্নেল-সাহেব ওদের প্রথমেই নিয়ে গেলেন অস্ত্রশালায়। দু-আড়াই শত বছরের পুরাতন নানান মারণাস্ত্র সার দিয়ে সাজানো। নবাবী আমলের গাদাবন্দুক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্টেনগান পর্যন্ত। এই সংগ্রহশালাটি নাকি সযত্নে গড়ে তোলেন ব্রিগেডিয়ার পাঠক। একটি কাচের শো-কেসে রাখা আছে বংশের আদিপুরুষ মেজর অ্যাডম্‌সের ব্যক্তিগত তলোয়ারটি। বাঁকা নবাবী তরবারি নয়, ভিক্টোরিয়া-যুগের 'ডব্‌ল্‌-এজেড স্ট্রেট সোর্ড'। তার মুঠে হাতির দাঁতের কাজ করা। নানান জাতের একনলা, দোনলা বন্দুক, রাইফেলের ভিড়ে সেটিকে রাখা হয়েছে একটা উঁচু পাদপীঠের উপর। তেমনি বিশেষভাবে প্রদর্শিত হয়েছে আর একটি রিভলভার। এটিও মণিমুক্তা খচিত শৌখিন মৃত্যুদূত। কাচের শো-কেসের নিচে পিতলের প্লাক-এ ইংরেজিতে খোদাই করা আছে :

"ক্যাপ্টেন হোরেস কিল্‌প্যাট্রিকের ব্যক্তিগত রিভলভার।"

কৌশিক সুযোগটা ছাড়ল না। জানতে চাইল, আপনাদের আদিপুরুষ ছিলেন 'অ্যাডাম্‌স্', তারপর 'কিলপ্যাট্রিক' হলেন কী করে?

কর্নেল জবাব দিলেন না। তাকিয়ে দেখলেন বন্ধুবর বসন্তের দিকে। বসন্ত বললেন, বিস্তারিত আপনারা জানতে পারবেন হেডমাস্টার-মশাইয়ের কাছে। সংক্ষেপে বলতে পারি : প্রায় শতখানেক বছর ধরে আদি পাত্তনিদার অ্যাডাম্‌স্-সাহেবের বংশপুরুষরা এই আদমগড়ের জমিদার ছিলেন। শুনেছি, পঞ্চম পুরুষের কোনও পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁর একমাত্র কন্যা বিবাহ করেছিল ওই ক্যাপ্টেন হোরেস কিল্‌প্যাট্রিককে। সেটা নীলকর-সাহেবদের আমল। কিল্‌প্যাট্রিক এখানে নীলের চাষ শুরু করেন। কিন্তু দু-এক পুরুষের মধ্যেই নীল-চাষের ব্যবসায় মন্দা পড়ে যায়। জার্মানিতে 'সিন্থেটিক নীল' আবিষ্কৃত হবার পর। কিলপ্যাট্রিকদের রবরবা কমে যায়। তাঁরা ধানের জমি কিনে চাষবাসে মন দেন। পরে—অনেক পরে, বিলুর

জেঠা রবিন কিল্‌প্যাট্রিক এফিডেফিট করে কিল্‌প্যাট্রিক থেকে ভারতীয় 'পাঠক' উপাধি গ্রহণ করেন। দীনেশবাবু বলতে পারবেন, 'রবিন-নামটা উনি 'রবীন্দ্রনাথ'-এর নামের খাতিরে পরিবর্তন করেন কিনা। আর বঙ্কিমচন্দ্রের ভবানী 'পাঠকের' উপাধিটা 'প্যাট্রিকের' ধ্বনিসাযুজ্যের খাতিরে উনি লেখকের বদলে পাঠক হতে চেয়েছিলেন কিনা।

দ্বিতীয় হল-কামরাটা যাদুঘরের অনুকরণে। সেটাতে নানান জাতের জীবজন্তু, পশুপাখি, পোকা-মাকড়, প্রজাপতি ও সরীসৃপ 'স্টাফ' করে সাজানো। কাঠবেড়ালী, বনবিড়াল, হরিণ, বাঘ—পাখির মধ্যে ময়ূর, বেনেবউ, হুঁড়িচাচা, হাড়গিলে, ধনেশ। একটি কাচের শো-কেস কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা দেওয়া ছিল। সুজাতা জানতে চায় : এটায় কী আছে?

কর্নেল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। ধীর পদে তিনি যাদুঘরের বাইরের করিডোরে গিয়ে দাঁড়ালেন চুরুট ধরাতে। যাদুঘরের ভিতর ধূমপান নিষেধ।

বসন্তবাবু নিচু হয়ে কালো কাপড়ের ঢাকাটা সরিয়ে দিলেন।

দেখা গেল : একটা সাপ। কৃত্রিম গুহা থেকে বিঘৎখানেক মাথা বার করে আছে। মাথাটা ত্রিকোণাকৃতি, তাতে একটা সাদা তীরচিহ্ন। ধূসর পাটলবর্ণের দেহাবয়ব। তার কিনার দিয়ে ইংরেজি V-অক্ষরের আলিম্পন। সুজাতা জিজ্ঞেস করল, কী সাপ এটা? ঢাকা দিয়ে রাখা ছিল কেন?

বসন্তবাবু আড়চোখে বন্ধুবরকে দেখে নিয়ে নিম্নস্বরে বললেন, আজ থেকে তেইশ বছর আগে ওই বিষধর সাপটির দংশনেই গায়ত্রী মারা যায়।

সুজাতা নিজের অজান্তেই প্রশ্ন করে বসে, সর্পদংশনে? কোথায়?

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল বসন্তবাবুর। বললেন, বিস্তারিত পরে বলব। আসুন, বিল বাইরে অপেক্ষা করছে।

সুজাতা তবু বলে, কী জাত এই সাপটার?

বসন্তবাবু বললেন, বাঙলা নাম 'বঙ্করাজ'। ইংরেজি নামটা মনে থাকে না। ওই পেতলের প্লাকে লেখা আছে। আসুন—

কৌশিক আগেই নেম্‌প্লেটটা লক্ষ্য করেছে। স্মরণশক্তির উপর আস্থা না রেখে নোটবুকে চট করে টুকে নিয়েছে, 'স-স্কেল্‌ড্‌ ভাইপার—*একিস কারিনাটুস*'।

করিডোরের ও-পাশে চিত্রশালা। লম্বাটে ঘর। তাতে শুধুই পূর্বপুরুষদের চিত্র। কিছু তৈলচিত্র, কিছু পেন-অ্যান্ড-ইংক, শেষ যুগেরগুলি ফটোগ্রাফ। হলঘরের এক প্রান্তে মেজর অ্যাডাম্‌সের একটি তৈলচিত্র। মোটা সোনালী কাজ করা লাক্ষার বর্ডার দিয়ে বাঁধানো। অশ্বারোহী মূর্তি। সামরিক সজ্জায় সজ্জিত। পশ্চাৎপট গাঢ় কালিমায় লিপ্ত, অশ্বটি ফেনগুভ্র। অ্যাডাম্‌স্‌-এর পরিধানে কোম্পানি আমলের মিলিটারি পোশাক। কোমরবন্ধে ঋজু তরবারি, পিঠে আগ্নেয়াস্ত্র, হাতে একটি বাইনোকুলার।

এই চিত্রের বিপরীত প্রাচীরে প্রলম্বিত আছে ক্যাপ্টেন হোরেস কিল্‌প্যাট্রিকের একটি 'এচিং'। ইনিও অশ্বারোহী, তবে যুদ্ধের পোশাক নয়, শিকারীর। তাঁর দুপাশে চার-পাঁচটি শিকারী কুকুর। সম্ভবত 'পয়েন্টার'। এই দুটি বিপরীত চিত্র প্রাচীরে পরস্পরের মুখোমুখি। আকারে চিত্রশালার বৃহত্তম চিত্রত্রয়ীর দুটি। তৃতীয়টি প্রবেশপথের বিপরীতে। এটিও প্রকাণ্ড। ক্যানভাসের উপর তেলরঙে আঁকা। চওড়া কারুকার্যখচিত লাক্ষার উপর সোনালী কাজ করা বর্ডার। অপরূপ সুন্দরী একটি ষোড়শীর আবক্ষ আলেখ্য। আবক্ষ ঠিক নয়, জানুর উপর তার হাত দুটিও আঁকা হয়েছে। বাম তালুর উপর দক্ষিণ করতালটি স্থাপন করে সে শিল্পীর দিকে তাকিয়ে রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসছে। হাসিটা তার ওষ্ঠপ্রান্তে নয়, চোখের কোণে। আশ্চর্য! শিল্পী

ল্যুভ-চিত্রশালার সর্ববিখ্যাত বিশ্ববন্দিত আলেখ্যর ভঙ্গিতে মেয়েটিকে ধরেছেন। রহস্যময়ীর আলেখ্যে একটা তারিখ আছে। শিল্পীর স্বাক্ষর নেই কিন্তু।

সকলেই নির্বাক মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ছবিখানির দিকে। বলা শক্ত সে মুগ্ধতার জন্য কতখানি দায়ী যুবতীর ঈশ্বরদত্ত সৌন্দর্য আর কতখানি রূপদক্ষের ঈশ্বরদত্ত বর্ণিকাভঙ্গ। নীরবতা ভঙ্গ করে প্রথম কথা বলল দেবযানী, গায়ত্রী কাকিমা!

সেটা আন্দাজ করা গিয়েছিল প্রথমেই। সুজাতা জানতে চায়, এটা কি ওঁর কুমারী জীবনে আঁকা? নাকি বিবাহের পর?

বসন্তবাবু জবাব দিলেন না। কর্নেল বললেন, এটুকু বলতে পারি আমি কোনও প্রফেশনাল চিত্রকরকে অর্থমূল্যে বিনিয়োগ করিনি।

—তার মানে, এটি ওঁর কুমারী জীবনের পোট্রেট?

—তার মানে কি তাই? আমি বরং একটা প্রতিপশ্ন করি : ছবিতে কিন্তু একজন নয়, দুজন আছে। আপনাদের নজরে পড়ছে?

দুজন? অসম্ভব! গোয়েন্দা-দম্পতি রীতিমতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেও দ্বিতীয় কোনও প্রাণীর সন্ধান পেল না।

স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কর্নেল-সাহেবই রহস্যটা সহাস্যে ভেদ করে দিলেন : গায়ত্রীর এ আলেখ্যটি যখন আঁকা হয় তখন সে ছিল অন্তঃসত্ত্বা। তার দেহের অভ্যন্তরে প্রাণবন্ত হচ্ছিল একটি অজাত ভ্রূণ। মাত্র দু'-মাস বয়স তার : হেমন্ত। শিল্পী তা নিশ্চয় জানতেন না, জানত গায়ত্রী নিজে।

সুজাতা বলে, বোধকরি তাই ওঁর মোনালিজা-মার্কা মাতৃত্বের হাসিটি!

কৌশিক প্রতিবাদ করে, আর য়ু শ্যিওর? মোনালিজা হাসিতে শুধু মাতৃত্বের ব্যঞ্জনা? লেঅনার্দো যখন তার ছবি আঁকেন তখন মোনালিজা কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা ছিল না।

কর্নেল বলেন, মোনালিজার কথা থাক। গায়ত্রী তাই ছিল। ওর ওষ্ঠপ্রান্তে—না, ওষ্ঠে নয়, চোখের কোণায় যে হাসির আভাস তা হচ্ছে তার আসন্ন মাতৃত্বের।

কৌশিক বলে, এটা এই চিত্রশালার কোনও স্মরণাতীত কালের শিল্পকর্ম নয়। প্রফেশনাল অর অ্যামেচার—শিল্পীর নামটি কী?

কর্নেল বলেন, শিল্পী যে তাঁর নিজের নামটি গোপন রাখতে চান সেকথা সহজেই বোঝা যায়—চিত্রে তাঁর কোনও স্বাক্ষর না থাকায়। এটুকু শুধু জানাতে পারি যে, সৃষ্টির আনন্দেই শিল্পী এই অনবদ্য তৈলচিত্রটি এঁকেছিলেন এবং আরও জানাতে পারি : এই তৈলচিত্রটিই শিল্পীর জীবনে সর্বশেষ শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস।

—সর্বশেষ শিল্পসৃষ্টি! তার মানে? এর পরে তিনি আর কোনও ছবি আঁকেননি? কেন? কোনও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু?

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বসন্তবাবু আলোচনার যবনিকাপাত ঘটালেন। বন্ধুর দিকে ফিরে বললেন, বিলু, তুমি একবার দোতলায় যাও! হিমু অনেকক্ষণ একা-একা পড়ে আছে।

এদের দিকে ফিরে বলেন, আসুন আপনারা। আমরা বরং বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে বসি।

ওঁরা চিত্রশালা থেকে নির্গত হয়ে করিডোর ধরে এগিয়ে যান। খিদমদ্‌গারেরা কোল্যাপসিবল্ গেটে তালা লাগাতে থাকে। সুজাতা বসন্তবাবুকে প্রশ্ন করে, কৌশিকের প্রশ্নের জবাবটা কিন্তু মূলতুবি আছে—ওই ছবিখানা আঁকার পরেই আকস্মিক দুর্ঘটনায় কি শিল্পীর মৃত্যু হয়েছিল?

বসন্তবাবু একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, হ্যাঁ। শিল্পীর, শিল্পের এবং শিল্পের বিষয়বস্তুর।

সুজাতা জানতে চাইছিল, তার মানেটা কি? কিন্তু সে প্রশ্ন করার আগেই দেবযানী অন্য একটা কথা বলে ওঠে। কর্নেল হনহনিয়ে দ্বিতলে উঠে যাচ্ছিলেন; তাঁর পিছন-পিছন প্রায় দৌড়ে ছুটে গেল দেবযানী। শোনা গেল তার উদ্‌গ্রীব কণ্ঠস্বর : আঙ্কেল?

সিঁড়ির ল্যান্ডিঙে দাঁড়িয়ে পড়েছেন কর্নেল। দেবযানী তাঁর কাছাকাছি এসে অনুচ্চস্বরে কী যেন অনুমতি চাইল। কথাগুলো শোনা গেল না।

কিন্তু বোঝা গেল। কারণ তারপর ওঁরা দুজন একসঙ্গে দ্বিতলে উঠে গেলেন।

পাঁচ

বৈঠকখানায় ফিরে এসে সকলে জমিয়ে বসার পর বসন্তবাবু জানতে চাইলেন, আর এক রাউন্ড চা-কফি হবে নাকি? প্রফেসর মিত্র যদি ইচ্ছে করেন, তাহলে ড্রিংসের ব্যবস্থাও করা যায়। কর্নেলের সব রকম আয়োজনই আছে।

কৌশিক বলে, সে-সব থাক। আপনি বরং বলুন, কীভাবে গায়ত্রী দেবী সর্প-দংশনে মারা গেলেন। ঘটনাটা কোথায় ঘটেছিল?

বসন্ত জানলা-পথে দূর দিগন্তে দৃষ্টি মেলে বললেন, এ বাড়িতেই। বিশে সেপ্টেম্বর, ছিয়াত্তর সাল। সেটা ছিল সে বছরের দুর্গপূজার বিজয়া দশমীর দিন। সন্ধ্যাবেলা। বাড়ির প্রায় সবাই গেছে মেম-সায়রে বিসর্জন দেখতে। বাড়িতে ছিলেন কর্নেল সস্ত্রীক, আর বাতাসী। সে বস্তুত ছিল গায়ত্রীর সহচরী---ইংরেজিতে যাকে বলে 'কম্প্যানিয়ান'। কর্নেল বাড়ির পিছনের বাগানে বেতের পোর্টেবল চেয়ার পেতে সান্ধ্য চায়ের আসরে বসেছিলেন। বাতাসী রান্নাঘর থেকে বিস্কিট আনতে গেছে, কর্নেল পট থেকে কাপে চা ঢালছেন এমন সময় গায়ত্রী চিৎকার করে উঠল : উঃ! আমাকে কিসে যেন কামড়াল!

লাফিয়ে উঠলেন কর্নেল। টেবিলের উপর ছিল একটি পাঁচ-সেল বড় টর্চ। মাটিতে আলো ফেলতেই দেখতে পেলেন সাপটা এঁকে-বেঁকে লতিয়ে-লতিয়ে ঝোপ-ঝাড়ের দিকে লুকিয়ে পড়তে চাইছে। কর্নেল অকুতোভয়ে লাফ দিয়ে পড়লেন তার উপর। টর্চের প্রচণ্ড আঘাতে থেঁতলে দিলেন তার মেরুদণ্ডটা। প্রতিবর্তী-প্রেরণায় সাপটা মাথা ঘুরিয়ে দংশন করল ওঁর বাঁ-হাতের কব্জিতে। কিন্তু ছোবলটা আংশিকভাবে পড়ল ওঁর ঘড়ির মেটাল-ব্যান্ডের উপর। তাছাড়া গায়ত্রীকে দংশন করার ঠিক পরেই সাপটার বিষভাণ্ডে যথেষ্ট গরল সঞ্চিত হয়নি। ফলে কর্নেলের কিছুই হলো না। উনি স্ত্রীর দিকে পিছন ফিরে দেখলেন, গায়ত্রী নেতিয়ে পড়েছে। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। কর্নেল দেখলেন, গায়ত্রীর বাঁ-পায়ে 'কাফ-মাসল'-এ দুটি দংশন ক্ষত। চিৎকার করে উনি বাতাসীকে ডাকলেন। পকেট থেকে রুমাল বার করে দংশন-ক্ষতের একটু উপরে 'টর্নিকয়েট' বেঁধে দিলেন। বাতাসী একটা গামছা নিয়ে এসেছিল। সেটা কর্নেল গায়ত্রীর উরুতেও বেঁধে দিলেন। টেলিফোন করলেন বসন্তবাবুকে। আর আদমগড়ের একমাত্র ডাক্তার শ্রীধর ধরকে।

বসন্তের মতে গায়ত্রীর মৃত্যুযোগ ছিল অবধারিত। বসন্তবাবু একটু পরেই এসে পড়লেন বটে, কিন্তু শ্রীধর সপরিবারে গেছেন বিসর্জন দেখতে। বসন্ত যখন এসে পৌঁছান তখন গায়ত্রীর জ্ঞান ছিল। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বার হচ্ছিল। কথা বলতে পারছিল না। তবু কী-যেন

একটা কথা সে বলতে চাইছিল—বসন্তের ধারণা—সে হিমুকে দেখতে চাইছিল। হিমু আর শরৎ দুজনেই দারোয়ানের সঙ্গে মেম-সায়রে বিসর্জন দেখতে গেছে। গায়ত্রী ঠিক কী বলতে চায় তা বসন্তবাবুর শোনা হলো না; কর্নেলের পরামর্শ মতো তিনি সাইকেলে চেপে তৎক্ষণাৎ বার হয়ে পড়লেন ডাক্তার ধরের সন্ধানে।

শ্রীধর এসে পৌঁছালেন রাত দশটা নাগাদ। অর্থাৎ সর্পদংশনের প্রায় চার ঘন্টা পরে। তিনি বললেন, এর একমাত্র প্রতিষেধক 'অ্যান্টিভেনাম' ইনজেকশান। আদমগড়ে তা নেই। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে ছুটল আজিমগঞ্জে। মৃত্যুযোগ অনিবার্য ছিল গায়ত্রীর। আজিমগঞ্জেও তা পাওয়া গেল না। বহরমপুর থেকে 'ভেনাম'-ইনজেকশান নিয়ে ড্রাইভার যখন ফিরে এল রাত তখন আড়াইটে! প্রয়োজন ছিল না। গায়ত্রীর সব যন্ত্রণার অবসান হয়েছে তার আগেই।

দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করতে করতে বসন্তবাবু কেমন যেন উদাস হয়ে গেলেন। বারে বারে চোখ থেকে চশমাটা খুলে কাচ দুটি মুছে নিতে হচ্ছিল তাঁকে। কিন্তু থামলেন না তিনি। বললেন, বিসর্জনের পরদিন আবার বিসর্জন হলো। সারা আদমগড় ভেঙে পড়ল পাঠক-প্যালেসে।

ধর্মে ওঁরা রোমান ক্যাথালিক। গায়ত্রীকে তাই দাহ করা হলো না। প্রাসাদের পিছনে ওদের বংশের সিমেটারি। সেখানেই শুয়ে আছেন গায়ত্রী। ছোট্ট কিন্তু সুন্দর একটি শ্বেতমর্মরের কবরে।

সুজাতা জানতে চায়, তখন হেমন্তের বয়স কত হবে?

—মাত্র চার। শরৎ ওর চেয়ে দশ মাসের বড়।

কর্নেল একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। পাঁচ-সাতদিন অন্নগ্রহণ করেননি। এমনকি ওঁর তখন একটা আত্মহত্যার পরিকল্পনাও বোধহয় ছিল। জীবনে হার স্বীকার করা তাঁর ধাতে নেই। বসন্তবাবু তখন দিবারাত্র ওঁকে চোখে-চোখে রাখতেন। বাতাসী আগলে রাখত দুটি শিশুকে। সে একটা দিন গেছে বটে!

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। ঘরে যেন সেই শোকাহত দিনগুলো আবার ফিরে এসেছে। শেষে সুজাতাই প্রশ্ন করে, কর্নেল পাঠক তো আপনার বাল্যবন্ধু। গায়ত্রী দেবীকে আপনি কতদিন ধরে চিনতেন?

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল আবার বসন্তের। বললেন, ওর বিয়ের পর থেকে।

—আপনিও গায়ত্রী দেবীকে খুব ভালবাসতেন, তাই নয়?

বসন্ত সুজাতার চোখে-চোখে তাকালেন। ম্লান হাসলেন। সেই হাসিতেই মিশে ছিল ওঁর প্রশ্নের উত্তর।

একটু নীরবতা। এবার কৌশিক স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলে, একটা প্রশ্নের জবাব কিন্তু এখনো আমরা পাইনি। গায়ত্রী দেবীর ছবিটা এঁকেছিলেন কে?

বসন্ত সরাসরি জবাব দিলেন না। বললেন, আমরা দুজন এখান থেকে হায়ার-সেকেন্ডারি পাস করে কলকাতায় যাই। বিলু খুব ভালভাবে পাস করেছিল। সে ভর্তি হলো মেডিকেল কলেজে। আমার রেজাল্ট তত ভাল হয়নি। তাই আমি ভর্তি হয়েছিলাম সরকারি আর্ট স্কুলে।

—তার মানে গায়ত্রী দেবীর অয়েলিংপেন্টিংটা আপনার হাতের কাজ?

—ওটাই আমার আঁকা শেষ ছবি। আমার যাবতীয় স্কেচ-খাতা,রঙ-তুলি সব ওর কফিনে ফেলে দিয়েছিলাম।

—সে কি? কেন? কেন?—জানতে চায় কৌশিক।

—মিসেস্ মিত্র কিন্তু কারণটা জানেন!

সুজাতা আর কৌশিক পরস্পরের দিকে তাকায়।

—ওদের বিয়ে হয়ছিল ফাল্গুন মাসে। একাত্তর সাল। আদমগড়ে সে কী প্রচণ্ড আনন্দ উৎসব। সারা শহরটাই মেতে উঠেছিল। বিলুর বয়স তখন কুড়ি। গায়ত্রীর ষোলো। কিন্তু মাসখানেকের ভিতরেই পাশের রাজ্যে ঘনিয়ে এল দুর্যোগের মেঘ। বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান্‌কে বন্দী করল ইয়াহিয়া খান। শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। পরের মাসে সেনাবিভাগ থেকে ডাক পেয়ে বিলুকে জয়েন করতে হলো। প্রথম কয়েক সপ্তাহ সে ছিল ফোর্ট উইলিয়ামে। তখন ছুটি নিয়ে মাঝে-মাঝে আদমগড়ে এসেছে। তারপর ইন্দিরা গান্ধী মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসায় বিলু হয়ে গেল গড়-ঠিকানার মানুষ। বিলুর অনুরোধে নিজের ডেরা-ডাণ্ডা গুটিয়ে আমাকে চলে আসতে হলো পাঠক-প্যালেসে। ওদিকে পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। তেশরা ডিসেম্বর পাকিস্তান সরাসরি আক্রমণ করে বসল ভারতকে। বিলু তখন একটা মিলিটারি হাসপাতালের সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড। সতেরই ডিসেম্বর শেষ হলো সেই যুদ্ধ। তার তিনদিন পরে ইয়াহিয়া খান ইস্তফা দিলেন পাক-রাষ্ট্রপতির পদ থেকে। খবর পাওয়া গেল এবার বিলু ফিরে আসবে। তাই এল। ক্রিস্টমাস-ঈভ্-এ। গোটা আদমগড় সেদিন তাদের হিরো ক্যাপ্টেন বিল্ পাঠককে যুদ্ধবিজয়ীর সম্মান দিয়েছিল। রাস্তায় সারি-সারি তোরণ। গায়ত্রীর নির্দেশে পাঠক-প্যালেসকে টুনি-বাল্ব দিয়ে আমরা সাজিয়ে দিয়েছিলাম আলোক মালায়।

অতীতের স্মৃতিচারণে চোখ দুটি আবেশে বুজে আসে বসন্ত ঘোষের। স্তব্ধ হয়ে যান তিনি।

সুজাতা প্রশ্ন করে, মিসেস্ পাঠকের ওই পোট্রেটটা কি সেই একাত্তর সালে আঁকা?

ম্লান হাসলেন বসন্তবাবু। চোখ থেকে চশমাটা খুলে কাচ দুটি আবার কোঁচার খুঁটে মুছতে মুছতে বললেন—ছবির নিচেই তো তারিখটা লেখা আছে, দেখেননি? কি জানেন, সময় তো কাটতে চাইতো না—না বিলের বন্ধুর, না তার প্রোষিতভর্তৃকা প্রিয়ার। তাই ওই ছুতোয় সময়টা কাটানোর প্রচেষ্টা। শিল্পীর আর মডেলের।

কৌশিক জানতে চায়, বাতাসী পিসি কি তার আগে এ বাড়িতে আসেননি?

বসন্ত ঘোষ জবাব দেবার সুযোগ পেলেন না। তার আগেই দ্বিতল থেকে নেমে এলেন ওঁরা দুজন।

কৌশিক আর সুজাতা উঠে দাঁড়ায়।

কর্নেল পাঠক বলেন, উঠছেন যে? কাল মধ্যাহ্নে তাহলে এখানেই দুটি...আমি হেডমাস্টারমশাইকে ফোন করে দেব।

কৌশিক বললে, সরি, স্যার। আমরা হয়তো কাল দুপুরের ট্রেনেই ফিরে যাব।

—সে কি? কেন?

—দুপুরবেলা কলকাতা থেকে একটা এস. টি. ডি. টেলিফোন পেয়েছি, তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে।

—কারও অসুখ-বিসুখ করেনি তো?

—না, না। সাংসারিক প্রয়োজন। তবে হয়তো কাজটা মিটিয়ে আমরা আবার একবার আসব। জায়গাটা আমাদের ভাল লেগেছে।

সুজাতা বললে, হেমন্তের শরীর এবেলা কেমন দেখলেন?

—অনেকটা ভাল। ঠিক আছে, আবার আসবেন আদমগড়ে।

পিছন থেকে বাতাসী পিসি বললেন, শনি-রবিবারে হলেই ভাল হয়, তাহলে ওই সময় শরৎকেও আসতে বলব।

ছয়

ছোট্ট শহর আদমগড়। সাইকেল রিক্‌শা আছে। কিন্তু দূরত্ব বেশি নয়। আসার সময় পায়ে হেঁটেই এসেছিল। এখন একটু রাত হয়েছে, এই যা! আশঙ্কিত লোড-শেডিং কিন্তু হয়নি। বড় টর্চ সঙ্গে ছিল। হেঁটেই ফেরার সিদ্ধান্ত নিল ওরা। শুক্লপক্ষ, আকাশে চাঁদও ছিল। কৌশিক দেবযানীর কাছে জানতে চায়, কেমন দেখলে হিমুকে?

—একই রকম। বরং আরও ডিপ্রেস্‌ড। আসলে শরীর খারাপ-টারাপ কিছু নয়, আপনাদের অ্যাভয়েড করবার জন্যই ও নিচে নেমে আসেনি। মানুষজনের সঙ্গে ও দেখা করতে চায় না আজকাল।

পথে চলতে চলতে কথা হচ্ছিল। সুজাতা বলে, তোমার কি মনে হলো বিল্‌কাকু তোমাকে আগলে রাখলেন, যাতে হেমন্তবাবুর সঙ্গে তোমার জনান্তিকে কোনও কথাবার্তা না হয়?

—হ্যাঁ, তাই। কিন্তু সেটা এমন দৃষ্টিকটুভাবে করলেন...

মাঝরাস্তায় চলতে চলতে সে-সব কথা আলোচনা করা চলে না। দেবযানী মনে মনে ঘটনাটা আবার পর্যালোচনা করতে থাকে। হেমন্ত মাঝে একবার বলেছিল, 'ড্যাডি তুমি নিচে গিয়ে বস। সেখানে গেস্টরা তোমার অপেক্ষা করছেন।' কর্নেল তার জবাবে বলেছিলেন, 'বসন্তকে তাই বসিয়ে রেখে এসেছি। কিন্তু আমি বলি কি হিমু—তোদের এ সব জনান্তিকে আলাপ-টালাপ আমার আর ভাল লাগছে না। তোদের বিয়েটা যে হওয়া সম্ভবপর নয়, তা তুইও জানিস আমিও জানি। দেবযানী নিজেও তা এতদিনে বুঝেছে। ফলে...'

এই সময় দেবযানী চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'ঠিক আছে, চলুন। আমিও নেমে যাচ্ছি। আপনাকে পাহারা দিতে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।' কর্নেল ওর পিঠে হাত দিয়ে বলেছিলেন, 'তোমাদের দুজনের ভালর জন্যই বলছি। যা হবার নয়, তা হবে না। অহেতুক বন্ধন বাড়িয়ে কী লাভ, দেবি?

কৌশিক হঠাৎ প্রশ্ন করে, কর্নেল পাঠক কি পাস-করা ডাক্তার?

—পাস-করা কি না জানি না। তবে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার তো বটেই।

—না, সে কথা নয়। বসন্তবাবু কথা প্রসঙ্গে দু'বার ইঙ্গিত দিয়েছেন— নিজের অজান্তে কি না জানি না—যে উইলিয়াম পাঠক অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার। একবার তিনি বলেছিলেন, আদমগড় থেকে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে ওঁরা কলকাতায় গিয়েছিলেন কলেজে পড়তে। বিল্‌ ভর্তি হলেন মেডিকেলে, উনি আর্ট স্কুলে। দ্বিতীয়বার উনি বলেছিলেন একাত্তর সালে ক্যাপ্টেন পাঠক অ্যাটাচ্‌ড্‌ ছিলেন একটি মেডিকেল হাসপাতালে। মিলিটারি ডাক্তারেরাও তো মেজর বা কর্নেল হয়, জানতে চাইছি।

দেবযানী বললে, ওঁর নেমপ্লেটে বা লেটার হেডে কখনো কোনো মেডিকেল ডিগ্রির উল্লেখ দেখিনি। তবে আদমগড়ে অনেকে ওঁকে 'ডাক্তারবাবু' বলে উল্লেখ করেন—যেহেতু উনি বিনা-পয়সার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন।

সুজাতা জানতে চায়, তুমি বসন্তবাবুর আঁকা কোনও ছবি কখনো দেখেছ?

—না। শুনেছি উনি খুব ভাল ছবি আঁকতেন। গায়ত্রী কাকিমার অপঘাত মৃত্যুর পর উনি সব ছবি নষ্ট করে ফেলেন। ওই একখানাই বেঁচে গেছে। বিল্‌কাকুর হেপাজতে থাকায়।

হঠাৎ বাঁ-দিকের একটা দ্বিতল বাড়ি দেখিয়ে দেবযানী বলে, ওইটা হচ্ছে শ্রীধর জেঠুর বাড়ি।

—চেম্বার? না ওখানে থাকেন উনি?

—একতলাটা চেম্বার। দোতলায় সপরিবারে থাকেন।

—তাহলে চল! দেখা করে যাই।

সুজাতা জানতে চায়, ডাঃ ধরের সঙ্গে আবার কী দরকার?

কৌশিক জবাবে বলে, মনে নেই? মামু বলেছিলেন, 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই।'

চেম্বারটা দু-কামরার। সামনে রিসেপশান। একটি ভৃত্যশ্রেণীর লোক বসে আছে। এখনো ডাক্তারবাবুর অপেক্ষায় একজন মধ্যবয়সী দর্শনার্থী রুগী এঘরে বসে আছেন।

ছেলেটি বলে, আপনারা একটু বসুন। ওই ওঁর হয়ে গেলেই—

এ-প্রান্তের দর্শনার্থী বললেন, দেবযানী যে! তোমার আবার কী হলো?

দেবযানী তাঁর দিকে ফিরে বলেন, না, কেশবকাকা, আমার কিছু হয়নি। এঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছি শুধু।

ঠিক তখনই ডাক্তারবাবুর চেম্বার থেকে একজন রুগী বার হয়ে গেলেন। কেশববাবুর ডাক পড়ল ভিতরে।

তারও খানিক পরে, কেশববাবুর প্রস্থানে সুজাতা-কৌশিককে নিয়ে দেবযানী প্রবেশ করল ডক্টর ধরের চেম্বারে।

—কী ব্যাপার দেবযানী? কবে এলে? আর অসুখটা কার? তোমার, না এঁদের কারও?

দেবযানী বলল, আমরা সবাই সুস্থ আছি জেঠু। আমি এঁদের দুজনকে আপনার সঙ্গে আলাপ করাতে নিয়ে এসেছি। ফর য়োর ইনফরমেশন, জেঠু, আপনার আজকের শেষ ভিজিটার ছিলেন কেশবকাকা।

—ইজ দ্যাট সো?—পর্দা সরিয়ে ও ঘরটা এক নজর দেখে নিলেন ডক্টর ধর। তারপর ওঁর রিসেপশানিস্ট ছেলেটিকে বললেন, নিতাই, তুই এবার সদর দরজা বন্ধ করে উপরে যা। আজ আর রুগী দেখব না। একটু পরে এসে খোঁজ নিস। দেখি, এঁরা চা খাবেন না কফি।

বোঝা গেল—নিতাই ওঁর রিসেপশানিস্ট-কাম-গৃহভৃত্য।

ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসলেন। বললেন, আপনারা যে আদমগড়ের বাসিন্দা নন তা বলতে হবে না। নাহলে চিনতে পারতাম।

দেবযানী বলে, তা সত্ত্বেও ওঁরা দুজন আপনার চেনা—খুবই পরিচিত।

ডাক্তার আবার সুজাতা-কৌশিককে খুঁটিয়ে দেখে মাথা নাড়লেন। দেবযানী বলে, কাঁটা-সিরিজের এত এত বই আমার কাছ থেকে নিয়ে পড়েও আপনি 'সুকৌশলী'কে চিনতে পারলেন না!

—মাই গড! মিস্টার কৌশিক অ্যান্ড সুজাতা মিত্র। আমি তো স্বপ্নেও ভাবিনি!

কৌশিক দেবযানীর দিকে ফিরে বলল, কিন্তু শর্ত ছিল তুমি আমাদের পরিচয়টা আদমগড়ের কাউকে জানাবে না।

দেবযানী বলে, কিন্তু ব্যতিক্রমই তো নিয়মের পরিচায়ক, কৌশিকদা। বাবা একজন ব্যতিক্রম। তাঁকে আগেই বলেছি। ডাক্তারজেঠুও তাই! রুগীর গোপন কথা উনি পাঁচজনকে বলে বেড়ান না।

ডাক্তারবাবু সায় দেন, সে-কথা একশো বার। আপনাদের দুজনকে...

বাধা দিয়ে কৌশিক বলে, 'আপনি' নয়, 'তুমি'! আমরা দুজন আপনার পুত্র-পুত্রবধূর বয়সী।

—দ্যাটস কারেক্ট! এতক্ষণে আন্দাজ করেছি, তোমরা দুজন কেন এসেছ আদমগড়ে। অর্থাৎ দেবযানীর বিয়েটা যাতে ভেস্তে না যায়। তাই না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! এ বিষয়ে আমরা আপনার সাহায্যপ্রার্থী।

—প্রফেশনাল এথিক্সে না আটকালে আমি তোমাদের সব রকম সাহায্য করতে রাজি! দেবি আমার মেয়ের মতন। তাকে দারুণ ভালবাসি। তেমনি ভালবাসি হেমন্তকেও। কিন্তু তার আগে বল কী খাবে?

সুজাতা বলে, চা-কফি কিছু নয়। শুধু 'সন্দেশ'! যা চিবিয়ে খেতে হয় না—কানে শুনতে হয়।

হো হো করে হেসে উঠলেন ডাক্তারবাবু।

ডক্টর ধরের কাছ থেকে জানা গেল, আদমগড়ে হায়ার সেকেন্ডারি আবাসিক স্কুল থাকা সত্ত্বেও একাধিক অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার নেই। শ্রীধরকে নিয়ে এসে বসিয়েছিলেন কর্নেল পাঠকের পিতা—তাই একমাত্রই তিনিই টিকে আছেন। এখানে একটি প্রাইমারি হেল্‌থসেন্টার আছে বটে, কিন্তু অব্যবস্থার জন্য বিশেষ কেউ সেদিকে ভেড়ে না। ফলে, ডাক্তার-নার্স-কর্মীরা আসে-যায়। মাসান্তে মাহিনা নেয়। এরপর কৌশিক জানতে চায়, কর্নেল পাঠক কি মেডিকেল কলেজে পড়েছিলেন? উনি কি অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার?

একটু ইতস্তত করে ডক্টর ধর বললেন, কথাটা আমার কাছ থেকে জেনেছ এ-কথা প্রচার হলে আমার ক্ষতি হবার আশঙ্কা। হ্যাঁ, ভর্তি হয়েছিল। চার বছর পড়েও ছিল। পাস করতে পারেনি।

—পরের বছর পরীক্ষা দেননি কেন?

—ও টোকাটুকি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। রাস্‌টিকেটেড হয়েছিল। তাই পরে মিলিটারিতে জয়েন করে।

—বুঝলাম। আপনি কি পাঠক-প্যালেসের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান?

—আদৌ না। বাড়ির লোকদের সব চিকিৎসা বিল্ নিজেই করে।

—হোমিওপ্যাথি?

—ব্যতিক্রম ক্ষেত্র বাদ দিলে।

—ব্যতিক্রম ক্ষেত্র? যেমন গায়ত্রী দেবীর সর্প-দংশন?

—না। আমাকে সেবার ডেকে পাঠানো হয়েছিল চিকিৎসা করতে নয়। অ্যান্টিভেনাম ইন্‌জেকশনের রিকিউজিশনটা দিতে। সেটা ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপশান ছাড়া পাওয়া যায় না।

—তাহলে ব্যতিক্রম ক্ষেত্র বলতে কী বোঝাচ্ছেন?

এবার ডক্টর ধর দেবযানীর দিকে ফিরে বলেন, আমার মনে হয় সব কথাই আমার খুলে বলা উচিত, দেবযানী-মা! তোমরা যে আমার কাছ থেকে জানতে পেরেছ, সেটা প্রকাশ না পেলেই হলো।

ডক্টর ধর যে তথ্যটা জানালেন তা রীতিমতো বিস্ময়কর।

বাস্তবে বিল্ পাঠক তাঁর পুত্রকে প্রাণাধিক ভালবাসেন। অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় তাঁর যে আপত্তি, দৃঢ় অবিশ্বাস, সেটা একটা সাইকলজিক্যাল অবসেশান থেকে। বিলের চেয়ে ডক্টর ধর বছর দশেকের বয়োজ্যেষ্ঠ। বিল যখন মেডিকেল কলেজে পড়তেন তখন ছুটিছাটায় আদমগড়ে এলে ডক্টর ধরের কাছে মেডিকেল বই নিয়ে পড়তে আসতেন। সে হিসাবে উনি ওঁর গুরুস্থানীয়। বিল্ পাঠক ছাত্র ছিলেন ভালই। ফাইনাল ইয়ারে টোকাটুকি করতে গিয়ে ধরা না পড়লে তিনি অনায়াসে ভালভাবে পাস করে যেতেন। রাস্‌টিকেটেড হওয়ায় তাঁর একটা মানসিক বিপর্যয় ঘটে যায়। আদমগড়ের প্রাচীন বাসিন্দারা জানেন—অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি মেডিকেল পড়া ছেড়ে দেন। আসল কথাটা ওঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু বসন্ত—

পর্যন্ত জানেন না। বোধকরি আদমগড়ে ডক্টর ধরই একমাত্র ব্যক্তি যিনি প্রকৃত তথ্যটা জানেন। বিল্ পাঠক হোমিওপ্যাথি পড়ে তারই প্র্যাকটিস শুরু করেন। কিন্তু হিমুর ক্ষেত্রে তাঁর বিচিত্র ব্যতিক্রম হলো। হোমিওপ্যাথিতে যখন উনি হালে পানি পেলেন না তখন গোপনে এসে দেখা করেছিলেন ডক্টর ধরের সঙ্গে। আদ্যোপান্ত সব কথা খুলে বলেছিলেন। কলিমুদ্দিন মিঞার বাড়ি থেকে উনি একটা রক্তমাখা ক্ষুর উদ্ধার করে এনেছিলেন। তাতে ঘাতকের আঙুলের ছাপ ছিল। বিল্ পাঠক ডক্টর ধরের মাধ্যমে দুটি ফিঙ্গার-প্রিন্ট কলকাতার ফরেনসিক ল্যাবরেটারিতে পাঠিয়ে নিঃসন্দেহে হয়েছিলেন—অপকীর্তিটি হিমুরই। তার 'সোমনাম্‌বোলিজ্‌ম্' ডেভেলপ করেছে। ঘুমের ঘরে সে বাড়ি থেকে ক্ষুর হাতে বার হয়ে কলিমুদ্দিনের ঝোপড়ায় যায়। পাঁঠার গলা কেটে ক্ষুরটা সেখানেই ফেলে রেখে বাড়ি ফিরে আসে। হাতটাত না ধুয়েই রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন সকালে ওকে রক্তমাখা অবস্থায় দেখে বিল্ পাঠক স্বয়ং তদন্তে যান, আর ক্ষুরটা কুড়িয়ে আনেন। কলিমুদ্দিনকে পাঁঠার দামটা মিটিয়ে দেন, কিন্তু প্রচণ্ড আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সেদিনই ডক্টর ধরের সঙ্গে দেখা করেন। সকালে ঘুম ভেঙে নিজের জামা-কাপড়ে রক্ত দেখে হিমুও প্রচণ্ড খাবড়ে যায়। কলিমুদ্দিনের পাঁঠার কাহিনী তখন গ্রামসুদ্ধ লোকে জানে। সেও শিক্ষিত মানুষ। বুঝতে পারে ঘুমের ঘোরে সে নিজেই এই অপকর্মটি করেছে। কর্নেল পাঠক ওকে মিলিটারির কমিশন পদ থেকে পদত্যাগ করতে বলেন। হিমু এককথায় রাজি হয়ে যায়। কারণ যে দুর্ঘটনা ছুটিতে থাকাকালীন বাড়িতে ঘটেছে সেটা ওদের মিলিটারি ব্যারাকে ঘটলে কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত হতো। পাঁঠার বদলে ডর্মিটারিতে পাশের খাটে ঘুমন্ত কোনও সহকর্মীর গলায় ক্ষুরটা বসালে 'মার্ডার' না হোক 'হোমিসাইড' চার্জে তার কোর্ট-মার্শাল হতো। প্রচণ্ড অবসাদে হিমু ভেঙে পড়ে।...এরপর কাউকে কিছু না জানিয়ে কর্নেল পাঠক ও ডক্টর ধর হিমুকে নিয়ে কলকাতা চলে আসেন। একজন প্রখ্যাত সাইকিয়াট্রিস্ট ডক্টর রায়চৌধুরীর শরণ নেন। তাঁর মতে অসুখটা বংশানুক্রমিক হতে পারে। তিনি ওষুধপত্রের ব্যবস্থা দেন—দু'দিন অন্তর একদিন একটা ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশনের ব্যবস্থাও করেন। দু'দিন অন্তর ডক্টর ধরের পক্ষে পাঠক-প্যালেসে আসা ভাল দেখায় না, তাই কর্নেল পাঠক নিজেই দায়িত্বটা গ্রহণ করলেন। চার বছর মেডিকেল কলেজে পড়া ছাত্রের পক্ষে ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশান দেওয়া কোনো শক্ত কাজ নয়। দিন-পনেরো ভালই কাটল। তারপর আবার ঘটল একটা দুর্ঘটনা। এবার প্যালেসের ভিতরেই। প্যালেস-কম্পাউন্ডের পিছন দিকে আছে ওঁর পোলট্রি। শেষরাত্রে সেখান থেকে মুর্গির মরণান্তিক আর্তনাদ অনেকেই শুনেছে। কিন্তু তখন প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল বলে ঠাকুর-চাকর বা দারোয়ানরা সরেজমিন তদন্তে যায়নি। কিন্তু বিল্ পাঠক স্থির থাকতে পারেননি। বিনা ছাতা বা বর্ষাতিতে ছুটে গিয়েছিলেন অকুস্থলে। গিয়ে দেখেন, পোলট্রির খাঁচা খোলা। মুর্গিগুলো বৃষ্টির মধ্যে সারা বাগানে দাপাদাপি করছে। আর একটা রক্তমাখা ভোজালি হাতে দাঁড়িয়ে আছে হিমু। তিনটে মুর্গির গলা কাটা হয়ে গেছে। হিমুর হাতে মুর্গির নখের বীভৎস ক্ষত। উনি গিয়ে ওকে জাপটে ধরতেই হিমুর জ্ঞান ফিরে আসে।

উপসংহারে ডক্টর ধর বলেন, সেদিন বিকালেই তুমি ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে, দেবি। আর তখনই ও তোমাকে বলেছিল যে, সে তোমাকে বিয়ে করতে অস্বীকৃত!

—তারপর আর ওকে ডক্টর রায়চৌধুরীর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়নি?

—না। বাপ-বেটা দুজনেই চরম ফ্রাস্ট্রেশনের শিকার হয়ে পড়লেন। আমি বারে-বারে বলেও ওদের কাউকে রাজি করাতে পারিনি।

এরপর নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে আসে। দেবযানী আঁচলে চোখ দুটি চাপা দেয়। ডক্টর ধর উঠে এসে ওর পিঠে একখানা হাত রেখে বললেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও দেবি। তোমাদের বিয়ের

পরেও তো এ রোগের আক্রমণ হতে পারত, কিন্তু ততক্ষণে তো তুমি ওর সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে। হয়তো তোমাকেই—

দেবযানী টেবিলের উপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

সাত

টেলিফোনের একটানা আওয়াজটা শুনেই বুঝতে পারেন এটা এস. টি. ডি., বাইরের কল। শিভ্যাস রিগ্যালের গ্লাসটা টি-পয়ে নামিয়ে রেখে টেলিফোনের কথামুখে বললেন : বাসু স্পিকিং...

—মামু, আমি কৌশিক, আদমগড় থেকে বলছি।

—কোনো টেলিফোন বুথ থেকে? না, দীনেশবাবুর বাড়ি থেকে? ঘরে আর কেউ আছে কি? যাতে আমাকে...

—না, মামু, ঘরে সুজাতা ছাড়া আর কেউ নেই। অনেক খবর জমেছে, একে-একে বলি শুনুন।

সারা দিন নানান সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের চুম্বকসার দাখিল করে। একটি কাগজে প্রধান 'পয়েন্টস্'গুলো টুকে নিয়ে রেখেছিল।

বাসু জানতে চাইলেন, হিমুকে দেখে কী মনে হলো? ডিসব্যালেন্সড?

কৌশিক কুণ্ঠিত স্বরে জানায় যে, হিমুকে ওরা এখনো দেখেইনি!

বাসু বললেন, বুঝেছি! 'সুকৌশলী'র দ্বারা হবে না এটাই বলতে চাইছ তো? অর্থাৎ আমাকেই যেতে হবে। শোন, আগামীকাল দুপুরের তিস্তা-তোর্সা ধরে সন্ধ্যা নাগাদ আমি আজিমগঞ্জে পৌঁছাব। একটা গাড়ি নিয়ে স্টেশানে থেক। তখন কথা হবে।

কৌশিক কুণ্ঠিতভাবে বলে, কিন্তু মামিমা ওখানে একা...

—সেটুকু কর্তব্যবোধ তোমার মামার আছে।

লাইনটা কেটে দিতেই রানী বলেন, কাল তুমি আদমগড়ে যাচ্ছ?

—উপায় কী বল? তুমি একবার টেলিফোনে নিখিল অথবা কাকলিকে ধর তো?

একটু পরেই নিখিল দাশকে ধরা গেল। বাসু বললেন, নিখিল, একটা বিশেষ কাজে কাল দুপুরের তিস্তা-তোর্সা ধরে আমাকে একবার আজিমগঞ্জে যেতে হবে। তোমাদের ওই ভি.আই.পি কোটায় আমার একখানা টিকিট কেটে দিতে পার?—এ.সি/ফার্স্ট ক্লাস যা পাওয়া যায়। না পেলে সেকেন্ড ক্লাস বার্থ। আপার বার্থ হলেও আপত্তি নেই।

নিখিল দাশ বর্তমানে কলকাতা পুলিশের মেজ-কর্তা। অর্থাৎ অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট। বাসু-সাহেবের পরম ভক্তদের একজন। সে জানতে চাইল না, বাসু-সাহেব হঠাৎ কেন আজিমগঞ্জে যাচ্ছেন। বললে, কাল সকালেই আমার লোক আপনাকে টিকিট পৌঁছে দিয়ে আসবে। একখানা তো? কৌশিক-সুজাতা...

—তারা ওখানেই আছে। আমাকে রিসিভ করবে।

—সেকি! তাহলে মামিমা কার হেপাজতে থাকবেন?

—কাকলির। তাকে কাল পৌঁছে দিয়ে যেও। দু-তিন দিনের মধ্যেই ফিরে আসব আমি। অথবা ওরা দুজন। কাকলি অনেকদিন বাপের বাড়ি আসেনি তো, তাই এই ব্যবস্থা করলাম। বউকে রেখে যেতে তোমার অসুবিধা হবে না তো?

—এটা কী বলছেন, স্যার? তাই হবে। আর কিছু।

—হ্যাঁ। তোমাদের ডি.আই.জি. নর্দানা-রেঞ্জ এখন কে? তাঁর নাম আর টেলিফোন নাম্বারটা চাই—

নিখিল বলে, বর্তমানে ডি.আই.জি. নর্দার্ন রেঞ্জ আপনার বিশেষ পরিচিত এবং গুণগ্রাহী—বিকাশ রায়চৌধুরী, মানে আপনার কাছে যার পরিচয় : 'বাচ্চু'।

—বাচ্চু নর্থ বেঙ্গলে বদলি হয়েছে? কবে? এই তো সেদিন চিনসুরায় ছিল, বার্ডওয়ান রেঞ্জে। ওর টেলিফোন নাম্বারটা দিতে পার? রেসিডেন্সের!

একটু পরে বিকাশ রায়চৌধুরী, ওরফে 'বাচ্চু'কে তাঁর বাড়িতে পাকড়াও করা গেল। তিনি বিস্মিত হলেন শুনে যে, বাসু-সাহেবকে আদমগড় যেতে হচ্ছে সরেজমিন তদন্ত করতে—ভায়া আজিমগঞ্জ। জানতে চাইলেন, আদমগড়ে কোনও খুন-টুন হয়েছে বলে শুনিনি তো?

—আদমগড়ের কাউকে চেন তুমি?

—আলবাৎ! আমাদের খবর আগামীবার ওখানকার প্রাক্তন জমিদার কর্নেল উইলিয়াম পাঠক পার্টি-নমিনেশনে বিধানসভার ইলেকশনে দাঁড়াবেন। তা ওখানে থাকবেন কোথায়? হোটেল বা ডাকবাংলো আছে বলে তো শুনিনি। থাকলেও সে তো আপনার পোষাবে না।

—না, বাচ্চু, হোটেল না, আমি ওই কর্নেলের পাঠক-প্যালেসেই উঠব। দু-একদিনের ব্যাপার তো।

—কিন্তু ওখানে কোনও খুন হয়েছে বলে তো—

—না, হয়নি। হতে চলেছে। হতে পারে। সেটাকে রুখতেই যাওয়া।

মুহূর্তমধ্যে ডি.আই.জি নর্দার্ন রেঞ্জ-এর কণ্ঠস্বর থেকে রসিকতার শেষ বাষ্পটুকুও উপে গেল। অত্যন্ত সিরিয়াসলি বললেন, শুড আই কাম ডাউন, অ্যাজ ওয়েল, স্যার?

—না, না, তুমি এসে কী করবে? তাহলে আততায়ী সাবধান হয়ে যাবে। তুমি বরং আজিমগঞ্জের এস.ডি.পি.ও.কে একটা টেলিফোন অথবা ফ্যাক্স করে দাও, আগামীকাল সন্ধ্যায় আজিমগঞ্জে তিস্তা-তোর্সা অ্যাটেন্ড করতে। আমি টিকিট হাতে পাইনি এখনো। কোন ক্লাসে যাব তা জানি না। সে যেন ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে আমার জন্য অপেক্ষা করে। আর আমার পরিচয়টা তাকে জানিয়ে রেখ। পুলিস-রুলস্ ভায়োলেট না করে সে যেন আমাকে যেটুকু সম্ভব সাহায্য করে। দু-চারটে মিথ্যে কথা হয়তো তাকে বলতে হবে।—তা, পুলিসের এথিক্যাল-কোডে তো "সদা সত্য কথা বলিবে"—এ রকম কোনো নির্দেশ নেই, কী বল?

—আজ্ঞে না, নেই। বরং ইঙ্গিত আছে, উদ্দেশ্য মহৎ হলে 'মিথ্যাং ব্রুয়াৎ, অনৃতং ব্রুয়াৎ, মা ব্রুয়াৎ সত্যক্ষতিকারকবাক্যম্!

—কারেক্ট। তাহলে আরও একটা কাজ কর। আগামীকাল রাত আটটা নাগাদ আদমগড়ে ওই কর্নেল পাঠককে এস.টি.ডি. করে জানিয়ে দিও যে, আমি ভারতীয় নিরাপত্তার কারণে একটা গোপন তদন্তে আদমগড় যাচ্ছি 'অ্যাজ এ স্পেশাল অফিসার অফ দ্য হাইকোর্ট। ব্যাপারটা চূড়ান্ত গোপন। কেমন? সেটা সম্ভব?

—অতি সহজেই।

—থ্যাংক য়ু!

—য়ু আর ওয়েলকাম, স্যার।

আজিমগঞ্জে তিস্তা-তোর্সা যখন পৌঁছাল তার আগেই দিনান্তের ক্লান্ত সূর্য অস্ত গিয়েছেন। বাতি জ্বলে উঠেছে প্লাটফর্মে। বাসু-সাহেব দরজা খুলে দাঁড়িয়ে ছিলেন. ছোট সুটকেস হাতে। চলন্ত গাড়ি থেকেই দেখতে পেলেন কৌশিক-সুজাতা প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে একজন য়ুনিফর্মধারী পুলিশ অফিসার। বোঝা গেল, সে ওয়েটিং রুমে বসে থাকেনি। হয়তো 'সুকৌশলী'কে চেনে।

boiboi.net

বাসু-সাহেব নেমে পড়তেই সেই পুলিশ অফিসারটি এগিয়ে এসে নমস্কার করে বললে, আমি স্যার, আজিমগঞ্জ-সাব্‌ডিভিশানের এস.ডি.পি.ও. মুস্তাক আহমেদ।

বাসু তার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, গ্ল্যাড টু মীট য়ু অফিসার! তুমি কি আমাকে চিনতে?

আহ্‌মেদ মৃদু হাসল—জবাবটা বাহুল্য বোধে।

বাসু বললেন, কিছু আলোচনা করার আছে। চল, সকলে প্রথমে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসি।

সকলে ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসলেন। এস.ডি.পি.-ওর নির্দেশে একজন পুলিশ ছুটল রেলওয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে চা-কফির ব্যবস্থা করতে, আর একজন পাহারায় থাকল ভেজানো দরজার সামনে। ওপাশে।

বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ। অন্যান্য ফার্স্টক্লাস টিকিটধারীরা এ দিগড়ে ভিড়লেন না।

বাসু সরাসরি তাঁর বক্তব্যে এলেন। বললেন, বাচ্চু, আই মীন, বিকাশ, নিশ্চয় তোমাকে জানিয়ে দিয়েছে যে, আমি এখান থেকে সোজা আদমগড় যাব। ওখানকার পাঠক-প্যালেসের ভিতর বিশ্রী একটা ষড়যন্ত্র ঘনিয়ে উঠছে। একজনের খুন হয়ে যাবার আশঙ্কা। সম্ভাব্য ভিকটিম্‌টি কে এবং কে, কীভাবে, কেন তাঁকে খুনের চেষ্টা করছে, তা-ও আমি আন্দাজ করেছি। তবে আমার হাতে যথেষ্ট এভিডেন্স নেই যাতে সেই সম্ভাব্য আততায়ীকে এখনই অ্যারেস্ট করাতে পারি। আমি ওখানে ছুটে যাচ্ছি সেই হত্যাকাণ্ডটি রুখতে!...বাই দ্য ওয়ে, আহ্‌মেদ, তুমি এঁদের দুজনকে চেন তো?

—ভালভাবেই চিনি, স্যার। বলুন কী বলছিলেন?

—তোমার সাহায্য আমার প্রয়োজন দুটি বিষয়ে। প্রথম কথা, কিছু ইনফরমেশন। প্রায় ত্রিশ বছর আগে—1968 থেকে 1970-এর ভিতরে বাঙলা-বিহার সীমান্তের গঞ্জ শহর আলিনগরে একটা ডাকাতি হয়েছিল। সাম মিস্টার সাহার বাড়িতে। সাহার একটি ফরেন লীকার শপের দোকান ছিল। মস্ত বড়লোক। ঘটনা ঘটে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা বাতাসীর বিবাহ রাত্রে। ডাকাতেরা জীপে চেপে এসেছিল, স্টেনগান হাতে। প্রচুর অর্থ ছাড়াও সালঙ্কারা নববধূকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। তার পক্ষকালের মধ্যে ওই আদমপুরের কর্নেল বিল্ পাঠক—তখন তিনি ক্যাপ্টেন—নিজের জীবন বিপন্ন করে মেয়েটিকে উদ্ধার করে আনেন। এ কেসটার কথা তুমি জান?

—সে ঘটনা তো স্যার এ অঞ্চলের 'লিভিং লিজেন্ড'! বাতাসী দেবী আজও জীবিতা। শুনেছি, ওই পাঠক-প্যালেসেই আছেন। আরও শুনেছি, কর্নেল পাঠক তাঁর সঙ্গে একজন বিহারী পাত্রের বিবাহ দিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করেন।

—কারেক্ট। আমি যতদূর জানি, মেয়েটিকে উদ্ধার করা হয় আলিনগরের উত্তরে একটা জঙ্গল থেকে। জঙ্গলটার নাম 'কঙ্কালীতলা'। আলিনগরের থানায় পুরনো রেকর্ডে কী পাওয়া যায়, দেখ। আমি জানতে চাই, ওই এনকাউন্টারে যে তিনজন ডাকাত মারা যায় তাদের নাম এবং তারিখটা। রাত্রে আলিনগর থানার ও.সি.র সঙ্গে কথা বল, সাহাদের মদের দোকানেও নিশ্চয় ফোন আছে। আমি আজ রাতটা থাকব আদমগড়ের হেডমাস্টারমশায়ের বাড়িতে। তাঁর নাম, ঠিকানা আর টেলিফোন নাম্বারটা এঁদের কাছ থেকে জেনে নাও। কাল সকাল সাড়ে ছয়টায়-সাতটায় আমাকে একটা টেলিফোন করে জানিও তুমি কতদূর কী জানতে পারলে। কোনও প্রশ্ন আছে এ ব্যাপারে?

—না স্যার, আর কোনও নির্দেশ?

—ইয়েস। আমি কাল সকাল আটটা নাগাদ কর্নেল পাঠকের বাড়িতে যাব। তুমি অ্যারাউন্ড সাড়ে-আটটায় এস। ওঁর সঙ্গে টেলিফোনে কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে। আমার মূল উদ্দেশ্য : কর্নেল পাঠকের বেডরুমটা—বিশেষ করে ওই ঘরে বা সংলগ্ন বাথরুমে কোনও মেডিসিন-ক্যাবিনেট থাকলে সেটা সার্চ করে দেখা। কোনও 'আনকমন' ওষুধ, ট্যাবলেট বা আম্পুল দেখতে পেলে তার নামটা সংগ্রহ করা। আয়োডিন, ডেটল, বোরোলিন জাতীয় ওষুধ নয়। অচেনা কোনও ওষুধ—

আহমেদ কুণ্ঠিত হয়ে বললে, সেটা কেমন করে সম্ভব হবে স্যার? তাহলে তো সার্চ-ওয়ারেন্ট করিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

—না, আহমেদ, তার দরকার হবে না। তুমি সাড়ে-আটটা নাগাদ পাঠক-প্যালেসে এস। ধড়াচূড়া পরে, দুজন বুদ্ধিমান সহকারীকে নিয়ে। সেখানে ড্রইংরুমে আমাকে পাবে। দেখবে, আমি এমন একটা আষাঢ়ে গল্প কর্নেল-সাহেবকে শোনাব যে, তিনি নিজে থেকেই তোমাকে তাঁর ঘরটা সার্চ করে দেখতে বলবেন।

—এনিথিং মোর, স্যার?

—নো থ্যাংকস্। এবার তাহলে ওঠা যাক।

ঠিক সেই সময়েই আহমেদের এন্তাজামে রেলওয়ে রেস্তোরাঁ থেকে চা-কফি-বিস্কিটের প্লেট নিয়ে ঘরে ঢুকল তক্‌মাধারী খিদমদগারেরা।

পরদিন সকাল ঠিক আটটার সময় বাসু-সাহেব একাই এসে পৌঁছালেন পাঠক-প্যালেসের দোরগোড়ায়। কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করেই। কলবেল বাজানোর একটু পরে একটি পরিচারিকা এসে দোর খুলে দিয়ে মাথায় ঘোমটা তুলে দিল। বাসু আন্দাজ করলেন সেটি বটুকের স্ত্রী সৌদামিনী। বললেন, তোমার সাহেবকে এই ভিজিটিং কার্ডখানা দেখাও।

অবগুণ্ঠনবতী বললে, আপনে ওই বৈঠকখানায় বসেন, আমি উপরে খপর দে-আসি।

বৈঠকখানা ঘরটি প্রকাণ্ড। মাঝে একটা সেন্টার-টেব্‌ল। তার চারপাশে ঘিরে আরামদায়ক সোফা-সেটি। একান্তে—জানলার ধারে একটি ইজিচেয়ার। ঘরের কেন্দ্রস্থলে সিলিঙ থেকে ঝুলছে একটি ঝাড়বাতি। সাবেকী-অনুকরণে। বাস্তবে তার ভিতর আছে একাধিক ইলেকট্রিক বাল্ব। পেলমেটের নিচে প্রতিটি জানলায় গোপন ফ্লুরেসেন্ট লাইট। দেওয়ালে নিসর্গ-চিত্র। অধিকাংশই তেলরঙে আঁকা। কোনও প্রতিকৃতি-চিত্র নজরে পড়ল না বাসু-সাহেবের। কারণটা অনুমান করলেন উনি। এমন সাবেকী জমিদার বাড়িতে প্রতিকৃতি-চিত্র প্রত্যাশিত। কিন্তু এ বাড়িতে তা বিশেষ চিত্রশালায় সুসজ্জিত।

মিনিট-খানেকের ভিতরেই ব্যস্ত-সমস্তভাবে কর্নেল নেমে এলেন, বাসু-সাহেবের সঙ্গে করমর্দন করে ইংরেজিতে বললেন, কী ব্যাপার বলুন তো? কাল রাত্রেই ডি.আই.জি. আমাকে ফোন করে জানিয়েছেন কী একটা জরুরী কাজে আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। 'জরুরী' মানে ব্যাপারটা কী?

বাসু বললেন ব্যস্ত হবার কিছু নেই। বসুন। অনেক কথা আছে। বাই দ্য ওয়ে—আপনি কি আমার নাম আগে শুনেছেন?

—নো, আয়াম সরি। ডি.আই.জি. বললেন, আপনি হাইকোর্টের একজন সিনিয়র ব্যারিস্টার—ক্রিমিনাল সাইডের। কী ব্যাপার মশাই?

—বলছি। তার আগে আমাকে কিছু তথ্য সরবরাহ করুন দেখি। বছর ত্রিশেক আগে আপনি কি আলিনগরের উত্তরে 'কঙ্কালীতলা' নামে একটা জঙ্গল থেকে একটি বন্দিনীকে

উদ্ধার করে এনেছিলেন? ডাকাতদের কবল থেকে? আর সেই এন্‌কাউন্টারে তিনজন ডাকাত মারা যায়?

—তা যায়। কিন্তু সে সব তো সত্যযুগের গল্প মশাই। আজ তা নিয়ে নতুন করে কথা উঠছে কেন?

—প্লিজ ডোন্ট আস্ক মি কোশ্চেনস নাউ। আপনার সব কৌতূহল আমি মিটিয়ে দেব। প্রথমে বলুন, সেই এন্‌কাউন্টারে ডাকাতদলের সর্দার আবদুল রেজ্জাক নিহত হয়েছিল?

—আমি জানি না। ইন ফ্যাক্ট ডাকাতদলের সর্দারের নামই জানি না। কে কে মারা গিয়েছিল তাও জানি না। তবে হ্যাঁ, সে-আমলে শুনেছিলাম, জনাতিনেক ডাকাত ওই এনকাউন্টারে মারা যায়। থ্যাঙ্ক গড্। এজন্য পুলিশ আমার বিরুদ্ধে কোনও চার্জ আনেননি—এনিথিং মোর?

—হ্যাঁ। তারিখটা আপনার মনে আছে?

—মনে নেই, লেখা আছে। দেখে এসে বলব?

—প্লিজ, স্যার!

কর্নেল দ্বিতলে গিয়ে কোনো রোজ-নামচা বা ডায়েরি দেখে এসে বললেন, তারিখটা : শনিবার, সাতই মার্চ, 1970।

—তার মানে প্রায় উনত্রিশ বছর আগেকার কথা। এবার বলুন, গত সাতদিনের মধ্যে আপনার অপরিচিত কেউ কি কোনো ছুতোয়—ভেন্ডার হিসাবে অথবা মার্কেট-সার্ভেয়িং করতে পাঠক-প্যালেসে এসেছিল? বাড়ির ভিতরে ঢুকেছিল?

একটু ভেবে নিয়ে কর্নেল বলেন, না। আমার তো মনে পড়ে না।

—কোনো বেগানা ছুতোর, প্লাম্বার বা রাজমিস্ত্রি...

—জাস্ট আ মিনিট! হ্যাঁ একজন ইলেকট্রেশিয়ান এসেছিল বটে। বাড়ির সব আলো ফিউজ হয়ে যাওয়ায়। ঘণ্টা দুয়েক কাজ করেছিল। কেন বলুন তো?

হাত দিয়ে মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে বাসু যেন প্রশ্নটা উড়িয়ে দিলেন। উল্টে কর্নেলকেই জিজ্ঞেস করেন, সে আপনার অনেকদিনের চেনা মিস্ত্রি? লোকাল ইলেকট্রিশিয়ান?

—ন্‌না! আমার চেনা নয়। সচরাচর যে মিস্ত্রি পাঠক-প্যালেসে কাজ করে তাকে না পেয়ে আমার কাজের লোক ওকে ধরে এনেছিল। বোধহয় তার চেনা লোক, নিশ্চয়ই।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তার চেনা লোক, বোধহয়! তা ডাকুন তো আপনার কাজের লোকটিকে।

কর্নেল কলবেল বাজানোতে গরুড়পক্ষীর মতো জোড়হস্তে এসে দাঁড়াল বটুক। তাকে আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বাসু বললেন, তোমার নাম বটুক না? তারাতলায় এককালে তোমার একটা পানের দোকান ছিল! তাই না?

একগাল হাসিতে বটুক দুটো প্রশ্নেরই জবাব দিয়ে ওঁর পায়ের ধুলো নিল।

—ভীম এখন কোথায়? জেলের ভিতরে না বাইরে?

বটুক আঁৎকে ওঠে। বলে, আজ্ঞে, কার কথা বললেন, হুজুর?

—তোমার শ্বশুরের নাম ভীমা কৈবর্ত নয়? সেই যার ডাকাতি কেসে সাত বছরের মেয়াদ হয়ে যায়?

বটুক মরমে মরে যায়। ঘাড় চুলকে বলে, তাঁনি সগ্যে গেছেন, ছার!

—অ। তা এখন যা জানতে চাইছি তার সঠিক জবাব দাও তো। কদিন আগে তুমি একজন ইলেকট্রিক-মিস্ত্রিকে ডেকে এনেছিল। তাকে তুমি চেন? কী নাম? কোথায় থাকে?

বটুক ঢোক গিলে বলে, আজ্ঞে ভালোনামটা জানি না। সবাই তারে ডাকে 'কাল্লুমিস্ত্রি' বলে। 'বাতি-মহল'-এ ঠিকা কাজ করে। বোধহয় বাতি-মহলের মালিক তারে চিনবে নিশ্চয়।

বাসু বললেন, আমারও তাই মনে হয়। নিশ্চয়ই বাতিঘরের মালিকের চেনা লোক,

বোধহয়। তা তুমি যাও, এক্ষুণি কাল্লুমিস্ত্রিকে ডেকে নিয়ে এস। বলবে, পাম্পটা চলছে না, ছাদের ট্যাঙ্কে জল উঠছে না—খুব জরুরী ব্যাপার!

বটুক বলে, পাম্প তো খারাপ হয়নি ছার?

—হয়নি বুঝি? তাহলে তো মুশকিল! তুমি তো আবার মিছে কথা বলতে পার না। সেবার কাঠগড়ায় উঠে মিথ্যে সাক্ষী...

কথাটা তাঁর শেষ হয় না। তার আগেই বাইরের দরজায় কলবেল বেজে ওঠে। বটুক পালাবার পথই খুঁজছিল। এই সুযোগে বলে ওঠে, কাল্লুরে এখনি ধরে আনছি, ছার। দেখি আবার কে এল সাতসকালে।

ঘরে এলেন এস.ডি.পি.ও মিস্টার আহমেদ। কর্নেল তাঁকে সাদরে আহ্বান জানালেন। আহমেদ দুজনকে নমস্কার করে বাসুকে বললেন, আপনি আমার আগেই পাঠক-প্যালেসে পৌঁছে গেছেন দেখছি!

বাসু একটু বিস্মিত হবার অভিনয় করে বলেন, আমি কিন্তু আপনাকে ঠিক প্লেস করতে পারছি না—

কর্নেল পরিচয় করিয়ে দেন, উনি হচ্ছেন মিস্টার এম. আহ্‌মেদ, আমাদের আজিমগঞ্জের এস.ডি.পি.ও।

বাসু উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দন করে বললেন, গ্ল্যাড টু মীট য়ু। আপনি আমাকে চেনেন তা বুঝতে পারছি কিন্তু আমি যে আজ কর্নেল পাঠকের সঙ্গে দেখা করতে আসছি এটা জানলেন কেমন করে?

—স্যার, মানে ডি.আই.জি নর্দার্ন রেঞ্জ, মিস্টার রায়চৌধুরী, আমাকে এস. টি. ডি. করে জানিয়েছেন। আপনার কোনো পুলিশের সাহায্যের প্রয়োজন হলে যাতে আমি সজাগ থাকি। তাই সাতসকালেই আমি চলে এসেছি—

—কিন্তু আমি কোন ব্যাপারে এখানে এসেছি তা কিছু বলেননি?

—বলেছেন। অতি সংক্ষেপে। সেই 'কঙ্কালীতলার'র কেসটা নয় কি?

—হ্যাঁ তাই। কর্নেল পাঠক এখনো কিছুই জানেন না। তাই সবটাই ওঁর কাছে হেঁয়ালি মনে হচ্ছে। প্রথমে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ওঁকে বুঝিয়ে বলা দরকার।

বাসু-সাহেব অতঃপর তাঁর চিরাচরিত প্রথায় একটি নিপাট আষাঢ়ে গপ্পো ফাঁদলেন। শুধু কর্নেল-সাহেব নয়, আহ্‌মেদও মুগ্ধ হয়ে গেল। তারও মনে হচ্ছিল সে একটি বাস্তব কাহিনী শুনছে।

কঙ্কালীতলায় ডাকাতদলের সর্দার আবদুল রেজ্জাক নিহত হবার পর দলটা ভেঙে যায়। কেউ যায় মেয়াদ খাটতে। কেউ পালিয়ে। সেই দলের ছিন্নবিচ্ছিন্ন ডাকাতেরা আবার এতদিনে ওই কঙ্কালীতলাতেই একটি দল পাকিয়েছে। বিহারে অনেকগুলি ট্রেন ডাকাতি করেছে। পশ্চিমবঙ্গেও। বর্তমানে সেই দলের নেতা হচ্ছে আবদুল রেজ্জাকের বেটা 'মামুদ'। পিতার মৃত্যুর সময়ে সে ছিল নিতান্ত বালক। নেপাল সীমান্ত দিয়ে সম্প্রতি পাকিস্তানের আই.এস.আইয়ের একটি জঙ্গী দল ওই মামুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। প্রচুর অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র তারা যোগান দিয়েছে বহরমপুর-অঞ্চলে একটা বড় রকম হাঙ্গামা পাকাবার জন্য। ভোটের আগেই। মামুদের কোনও এজেন্ট এখানে একটা টাইম-বম্ব প্লান্ট করে যাবে। সেটা বিস্ফোরিত হবার আগেই ডাকাতেরা গোপনে পাঠক-প্যালেস ঘিরে ফেলবে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে যখন প্যালেসের একাংশ উড়ে যাবে তখন এ. কে. 47-ধারীরা আক্রমণ করবে সমবেত জনতাকে। তাতে বহু লোক হতাহত হবে নির্ঘাৎ এবং একই সঙ্গে পাঠক-প্যালেসের বিখ্যাত অস্ত্রাগারটিও লুণ্ঠিত হবে। একজন ধরা-পড়ে-যাওয়া ডাকাতের স্বীকারোক্তি থেকে ডি.আই.জি নর্দার্ন রেঞ্জ

আগেভাগেই সে কথা জানতে পেরেছেন। সেনা-বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি কালীতলায় অতর্কিত আক্রমণ প্রতিরোধের আয়োজন করছেন। একই সঙ্গে বাসু-সাহেবকে অনুরোধ করেছেন, এদিকটা সামলাতে।

সব কথা শুনে কর্নেল গম্ভীর হয়ে গেলেন। খুব যে ভয় পেয়েছেন তা মনে হলো না। তিনি বরং একটি সঙ্গত প্রশ্ন পেশ করলেন, সেক্ষেত্রে কোনো ছদ্মবেশী গোয়েন্দা-অফিসারকে না পাঠিয়ে আপনার মতো একজন সিনিয়ার কোর্ট অফিসারকে আমার কাছে পাঠালেন কেন?

বাসু বললেন, না, তিনি আমাকে পাঠাননি। সরকারী গোয়েন্দা পাঠালে ডাকাতেরা কিছু আন্দাজ করতে পারে, এই আশঙ্কা করে তিনি একটি ডিটেকটিভ এজেন্সিকে এমপ্লয় করেছিলেন, গোপনে খোঁজ নিয়ে দেখতে যে, আপনার শৌখিন অস্ত্রশালায় কী জাতের ব্যবহার্য অস্ত্রশস্ত্র আছে। আর যাতে এ প্যালেসে কেউ অতর্কিতে কোনো টাইম-বম্ব না রেখে যেতে পারে। সেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি আপনার অগোচরে এখানে অষ্টপ্রহর পাহারার বন্দোবস্ত করেছে। আপনার অস্ত্রশালার সংগ্রহও তারা দেখে গেছে।

—আমার অজ্ঞাতসারে?

—নো, কর্নেল। আপনি কি নিজেই তাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব কিছু দেখাননি? যাদবপুরের প্রফেসর মিত্র আর মিসেস্ মিত্রকে?

কর্নেল গুম মেরে গেলেন।

বাসু এদিকে ফিরে বললেন, মিস্টার আহ্মেদ, আপনি কর্নেল-সাহেবকে নিয়ে উপরে যান। সার্চ করে দেখুন কাল্লুমিঞা কোনো কিছু প্লান্ট করে গেছে কি না। সিঁড়ির নিচে মিটার-ঘরটা বিশেষ করে দেখবেন। ওটা সচরাচর লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে তো।

কর্নেল বললেন, দোতলায় ওঁর সঙ্গে আমার যাবার কোনও প্রয়োজন নেই। আমি বাতাসীকে ডেকে দিচ্ছি। সেই আপনাকে ঘরগুলি ঘুরিয়ে দেখাবে। উপরে পাশাপাশি পাঁচটা ঘর। একমাত্র তৃতীয় ঘরটিতে এখন আছে আমার ছেলে। বাকি ঘর তালাবন্ধ। বাতাসী খুলে দেবে।

বাসু ঝুঁকে পড়ে বলেন, আপনার ছেলে? কী নাম? কত বয়স?

কর্নেল সংক্ষেপে হেমন্তের নাম আর বয়সটা জানালেন। সে যে বর্তমানে অসুস্থ এটুকু স্বীকার করলেন, কিন্তু অসুখের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা স্পষ্টতই এড়িয়ে গেলেন। এ প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্যই বোধহয় এতক্ষণে হঠাৎ বাসুকে জিজ্ঞেস করে বসলেন, আপনি এখানে উঠেছেন কোথায়?

বাসু বললেন, না, উঠিনি কোথাও। কোনো হোটেল-মোটেল খুঁজে নেব। আমি একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে সোজা এসেছি।

কর্নেল আপত্তি করেন, তা কি হয়? এখানে সে রকম হোটেল বা রেস্টহাউস নেই। তাছাড়া আপনি তো মশাই আমার গেস্ট। হোটেলে উঠবেন মানে? আপনার লাগেজ নিশ্চয় গাড়িতেই আছে। সেটা আমার কাজের লোক...বাই দ্য ওয়ে...বটুককে আপনি চিনলেন কেমন করে?

—লোকটা তারাতলায় থাকত। একটা মার্ডার-কেস-এ সাক্ষী দিতে এসেছিল।

—ওর শ্বশুর সেই ভীমা কৈবর্তের কেস?

—না, না। ভীমা কৈবর্তকে আমি চিনিই না, দেখিনি কখনো।

এই সময়েই ফিরে এল বটুক। নিতান্ত কুণ্ঠিত হয়ে জানাল যে, কাল্লুমিঞার হদিস পাওয়া যায়নি। সে নাকি দেশে গেছে—মানে বাতি-মহলের মালিক তাই বললেন, দেশের ঠিকানা ওঁরা জানেন না।

বাসু বললেন, আমার তখনই মনে হয়েছিল বাতি-মহলের লোকেরা কাল্লুমিঞার হক-হদিস নিশ্চয় জানে অথবা জানে না বোধহয়!

বটুক মাথা চুলকাল।

কর্নেল বললেন, বাইরের ট্যাক্সিতে ব্যারিস্টার-সাহেবের ব্যাগ-স্যুটকেস আছে। সব নিয়ে আয়। উনি দোতলার দক্ষিণ-পুব কোনার গেস্ট-রুমটায় থাকবেন। সৌদামিনীকে বল, চাদর-টাদর পালটে দিতে। আর ও হ্যাঁ, ওই ট্যাক্সি-ড্রাইভারটাকেও ডেকে নিয়ে আয়। বাসু-সাহেব ওর বিলটা এবার মিটিয়ে দেবেন।

বাসু-সাহেব ওঁর দিকে ফিরে ইংরেজিতে বলেন, ট্যাক্সিটা থাক। আমি চাই না আপনার গাড়িতে এখানে ঘোরাঘুরি করতে। আপনার-আমার অলক্ষ্যে হয় তো পাঠক-প্যালেসে এখন অনেকেই নজর রাখছে।

বটুক গেল ট্যাক্সি থেকে মালপত্র নামিয়ে আনতে। কর্নেল তাকে আরও বললেন, ওই ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বলে দিস এখানেই দুপুরে দুটি খেয়ে নেবে। হোটেল খুঁজতে না যায় যেন।

বটুক নিষ্ক্রান্ত হলে কর্নেল-সাহেব টেলিফোনটা তুলে নিয়ে একটা লোকাল নাম্বার ডায়াল করলেন। ও-প্রান্তে দেবযানী সাড়া দিতেই বললেন, প্রফেসর মিত্রকে একটু ডেকে দাও তো, দেবযানী।

দেবযানী বললে, আয়াম সরি আঙ্কল, ওঁরা কলকাতায় ফিরে গেছেন।

—ওঁরা দু'জনেই? প্রফেসর অ্যান্ড মিসেস মিত্র?

দেবযানী কুণ্ঠিত স্বরে বলে, একটা কথা আঙ্কল। আপনার কাছে আমার কিছু কনফেশান আছে। ওঁরা দু'জন আমাদের কলেজের...

তাকে মাঝপথে থামিয়ে কর্নেল বলে ওঠেন, আই নো! ওঁরা দুজন একটা প্রাইভেট-ডিটেকটিভ এজেন্সির লোক। এই তো? কিন্তু তুমি আমার কাছে ওঁদের মিথ্যা পরিচয় দিলে কেন ওভাবে?...

দেবযানী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, বিশেষ কারণ ছিল, আঙ্কল! আমার উপর সেই রকমই ইন্সট্রাক্শন ছিল। আপনার মঙ্গলের জন্যই। আমি এখনই আসব আপনার ওখানে? ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে?

কর্নেল দৃঢ়স্বরে বললেন, নো! আমি এখন ব্যস্ত আছি। পরে তোমার সঙ্গে এ নিয়ে কথা হবে। তোমার বাবার সঙ্গেও কথা বলতে হবে। তিনি কি জানতেন যে, তুমি মিথ্যা পরিচয় দিয়ে দু'জন অচেনা লোককে পাঠক-প্যালেসে নিয়ে আসছ? আমাকে লুকিয়ে?

বাসু চিন্তিত হলেন। হেডমাস্টারমশাই এক্সটেনশানে আছেন। স্কুলের গভর্নিং-বডির প্রেসিডেন্ট একটি কলমের খোঁচায়—

দেবযানী কি যেন বলল। কর্নেল তার জবাব দিলেন না। সশব্দে রিসিভারটা ক্র্যাডেলে নামিয়ে রাখলেন।

ঠিক তখনই দ্বিতল থেকে নেমে এল মিস্টার আহ্মেদ, তাঁর দুই সহকারীকে নিয়ে। ওঁরা জানালেন, দ্বিতলে সন্দেহজনক কোনও কিছুই পাওয়া যায়নি। কাল্লুমিঞার হক-হদিস পাওয়া যাক বা না যাক, সে কোনও টাইম-বম্ব প্লান্ট করে যায়নি।

পাঠক-প্যালেসের অতিথি-বৎসলতার কোনো ত্রুটি হলো না। সৌদামিনী যথারীতি চা-খাবার নিয়ে এসে পুলিশ-সাহেবদের আপ্যায়ন করল। কর্নেল সৌদামিনীকে বললেন, বাইরে ট্যাক্সিতে ড্রাইভার আছে, আহমেদ-সাহেবের ড্রাইভারও আছে। বটুককে বল, ওদের চা-টা দিয়ে আসতে।

এস.ডি.পি.ও এবং তাঁর দুই সঙ্গীকেও কর্নেল পাঠক মধ্যাহ্ন আহারে নিমন্ত্রণ করলেন।

আহ্‌মেদ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে বলল, লোকাল থানার ও.সি. হাজরা আগেই আমাদের দুপুরে খাবার নিমন্ত্রণ করেছে। আর তাছাড়া আপনার এখানে তো এলেই পাত পাড়ি...

তারপর বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বললে, আপনি এখন কী করবেন স্যার? দু-চার দিন থাকবেন এখানে?

—দু-চার দিন নয়, তবে দু-একদিন হয়তো থাকতে হবে। কর্নেল-সাহেবের কালেকশানও তো এখনো দেখা হয়নি। আদমগড় ছেড়ে যাবার আগে তোমাকে টেলিফোনে জানাব। কঙ্কালীতলায় রেইড হলে হয়তো তুমি ব্যস্ত থাকবে।

আহ্‌মেদ বলে, আপনি কি স্যার, আমার সঙ্গে একবার লোকাল থানায় আসতে পারবেন? হাজরার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিতাম। আর আপনাকে তাহলে থানার লোকেরা চিনে রাখতে পারতো।

বাসু বলেন, ঠিক আছে, তুমি রওনা দাও। একসঙ্গে যাওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়। আমার গাড়ি আছে। আধঘন্টা পরে স্নানটা সেরে একটু ফ্রেশ হয়ে আমি থানায় আসছি। কর্নেলের সঙ্গে কিছু কথাও বাকি আছে।

আহ্‌মেদ সদলবলে প্রস্থান করার পর কর্নেল বাতাসীকে ডেকে পাঠালেন। বাসু-সাহেবের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, এর নাম বাতাসী। আমার স্ত্রী যখন মারা যান তখন হিমুর বয়স মাত্র চার বছর। এই বাতাসী পিসিই তাকে মানুষ করে তোলে।

বাতাসী বাসু-সাহেবকে প্রণাম করে বলল, আপনাকে সৌদামিনী ঘরটা দেখিয়ে দেবে। আপনি স্নানটান সেরে নিন। গীজার আছে, আর সুইচ-বোর্ডে 'কলবেল'ও আছে। কোনো প্রয়োজন হলে বেল বাজিয়ে আমাদের ডাকবেন, দাদা। ও—আর একটা কথা। আপনার দুপুরের খাবারের কোনো রেসট্রিকশান আছে?

—তা আছে। আমি দিনের বেলা স্বল্পাহারী। একটা চিকেন-স্টু, সালাড আর হাতে গড়া খান দুই রুটি খাব, ব্যস্।

কর্নেল বলেন, দই, পুডিং বা মিষ্টি? এখানকার রাঘবসাই কিন্তু খুব বিখ্যাত।

বাসু বললেন, সে-সব ডিনারে হবে। তবে স্নান সেরে এসে আমি এক কাপ 'র'-কফি পেলে খুশি হব, দুধ-চিনি ছাড়া।

বাতাসী ঘর ছেড়ে যাবার পর বাসু প্রশ্ন করেন, একেই কি আপনি বছর ত্রিশেক আগে কঙ্কালীতলা থেকে...

বাসু-সাহেবের মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে কর্নেল বলেন : এক্‌জ্যাক্টলি!

আট

আদমগড়ের থানা-অফিসার হাজরা এবং সেকেন্ড-অফিসারের সঙ্গে বাসু-সাহেবের আলাপ হলো। আহ্‌মেদ জনান্তিকে জানায় পাঠক-প্যালেসের দ্বিতলের ঘরগুলি সার্চ করার সময় সে তিনটি অপরিচিত ওষুধের সন্ধান পেয়েছিল কর্নেল-সাহেবের স্নানাগার-সংলগ্ন মেডিসিন-ক্যাবিনেটে। ওষুধগুলি সে যথাস্থানেই রেখে এসেছে। তবে নামগুলো টুকে এনেছে। একটির নাম ট্র্যাজালিন 25 mg, একটি রোজিয়াডাল 1 mg, তৃতীয়টি প্যাসিটন। তিনটি ওষুধই কিন্তু অব্যবহৃত। সদ্য কেনা। প্রতিটি পাতায় দশটা করে ট্যাবলেট।

—এনিথিং এলস্?

—ইয়েস স্যার। ওঁর ছেলে হেমন্তবাবুর ঘরে একটা ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে কয়েকটি—ইনফ্যাক্ট তিনটি—ইনজেকশনের ব্যবহৃত নীড্‌ল্ পেয়েছি। সেগুলি আমি নিয়ে এসেছি। আপনার কি কাজে লাগবে?

বাসু বলেন, ইনজেকশন দেবার পর ব্যবহৃত সুঁচগুলো ফেলে দেওয়াই বর্তমানের রীতি। এতে আশ্চর্য হবার কী আছে?

—আমি কিন্তু স্যার, অবাক হয়েছি অন্য কারণে। আদমগড়ের মানুষের ধারণা : কর্নেল-সাহেব অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার ঘোর বিরোধী। এটা অনেকটা বোষ্টমের আখড়ায় মুর্গি-ডিমের খোলা হয়ে গেল না?

বাসু স্বীকার করেন, সেদিকটা আমার খেয়াল হয়নি। ঠিক আছে, নীড্‌ল্‌গুলো তুলোর প্যাকেটে জড়িয়ে দাও। স্যুটকেসে তুলে রাখি। ...তা তোমাদের এস.পি.-র হেড কোয়ার্টার্স তো বহরমপুর? এখন কে এস. পি.?

হাজরা আগ বাড়িয়ে জানাল, মিস্টার অসীমকুমার মিত্র।

বাসু আহ্‌মেদের দিকে ফিরে বলেন, তিনি নিশ্চয় এতক্ষণে জেনেছেন যে, তুমি-আমি কর্নেল পাঠককে কী জাতের আষাঢ়ে গল্প শুনিয়েছি?

আহ্‌মেদ বাধা দিয়ে বলে, না স্যার, আপনি একাই গল্পটা ফেঁদেছেন। কপিরাইট আপনার। আমি শুধু 'সম'-এর মাথায় 'ধা' দিয়ে গেছি। আর তাঁকে তো বলতেই হবে সব কথা। এস.পি. আমার 'বস'; তাঁর 'বস'-এর হুকুম তামিল করার আগে প্রপার চ্যানেলে আমার 'বস'কে জানিয়ে রাখতে হবে না?

—তা বটে! তা মিস্টার মিত্র নিশ্চয় আমাকে চেনেন?

—পশ্চিমবঙ্গে কোন গেজেটেড পুলিশ-অফিসার আপনাকে চেনে না?

—অতটা কমপ্লিমেন্টস্ দিও না আহ্‌মেদ। বেলুন ফেটে যাবে শেষমেশ। তা ধর দেখি তোমার এস.পি. সাহেবকে টেলিফোনে।

অচিরেই যোগাযোগ হলো। এস.পি. দপ্তরে ছিলেন। সৌজন্য বিনিময়ের পর বাসু-সাহেবের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানালেন ডি.আই.জি মারফৎ তিনি জেনেছেন যে, বাসু-সাহেব আদমগড়ে এসেছেন কী একটা বিশেষ মিশনে। আহ্‌মেদের কাছ থেকে কঙ্কালীতলার ডাকাতদলের সম্বন্ধে যে রূপকথার 'গপ্পোটি' ফাঁদা হয়েছে সে-সম্বন্ধেও তিনি ওয়াকিবহাল।

বাসু জানতে চাইলেন এস.পি-সাহেবের সারাদিনের প্রোগ্রামটা কী? মিস্টার মিত্র জানালেন তাঁকে ঘণ্টাখানেক পরে একবার জিয়াগঞ্জ যেতে হবে। একটা তদন্তে। ফিরে আসবেন রাত আটটা নাগাদ।

বাসু বলেন, উড য়ু ডু মি ত্র ফেভার, দেন?

—বলুন স্যার?

—পাঠক-প্যালেসে একটা ফোন করুন। কর্নেল পাঠককে জিয়াগঞ্জে চলে আসতে বলুন। এখনই। জিয়াগঞ্জে দেখা হলে বলবেন, কঙ্কালীতলার ডাকাতদলের বেশ কিছু লোক ধরা পড়েছে, আর কিছু পালিয়ে গেছে। মোট কথা, পাঠক-প্যালেস আক্রান্ত হবার কোনও আশঙ্কা এখন নেই।

—সেটার জন্য তাঁকে জিয়াগঞ্জে আসতে হবে কেন? টেলিফোন করে তাঁকে এখনি তো তা জানিয়ে দিতে পারি।

—পারেন; কিন্তু আমার উদ্দেশ্যটা তাতে সফল হবে না। আমি কর্নেলহীন ফাঁকা ময়দানে কয়েকটা গোল দিতে চাই। লোকটা তার অ্যাম্বিশাস গোঁফ জোড়া নিয়ে আমাকে গোলের দিকে এগুতেই দিচ্ছে না। খাড়া পাহারা দিচ্ছে!

—আই ফলো, স্যার। আমি এখনি তাঁকে ফোন করে জিয়াগঞ্জে পি. ডাবলু.ডি রেস্ট হাউসে ডেকে পাঠাচ্ছি। ঘণ্টা চার-পাঁচ আপনি ফাঁকা মাঠে ক্রমাগত গোল দিতে পারবেন। ধরুন বারোটা—

—না, না, অতগুলো গোল দেব না। সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

—আজ্ঞে না, আমি বলেছিলাম : বেলা বারোটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা...

—থ্যাঙ্কু, স্যার।

থানা থেকে বাসু এলেন হেডমাস্টার-মশায়ের ডেরায়। তাঁকে বললেন, আদমগড়ের ইতিহাস নিয়ে একটা জবর গবেষণা আপাতত আস্তিনের তলায় লুকিয়ে রেখে তিনি আগে আর্জেন্ট কাজগুলো সেরে ফেলতে চান। দেবযানীর মাধ্যমে ডাক্তার শ্রীধর ধরকে ধবলেন। ডাক্তার ধর বাসু-সাহেবকে উপন্যাসের পাতায় চেনেন। সাক্ষাতে আলাপ করার আগ্রহ দেখালেন। দেবযানীকে উঠিয়ে নিয়ে বাসু এলেন ডাক্তার ধরের চেম্বারে। সৌজন্য বিনিময়ের পর বাসু-সাহেব ওঁর কাছে জানতে চাইলেন সেই তিনটি ওষুধের পরিচয়। ডাক্তার ধর বললেন, ট্রাজালিন হচ্ছে ট্রজোডোন হাইড্রোক্লোরাইড। রোজিয়াডাল হচ্ছে রিস্পেরিডন টাইটেনিয়াম ডায়োক্সাইড, আর প্যাসিটন হচ্ছে ট্রাইহেক্সিফেনিডিলহাইড্রো...

বাসু বলেন, থামুন, থামুন। আপনি শুধু আমাকে বলুন, এ ওষুধে কী হয়? 'অপুত্রের পুত্র হয়, নির্ধনের ধন?'

ডক্টর ধর বলেন, প্লিজ ডোন্ট মেক জোকস্ অন মেডিকেল সায়েন্স, স্যার! আমি জানি, আপনি এই ওষুধগুলোর সম্বন্ধে কেন কৌতূহলী। এই ওষুধ আপনি দেখেছেন হিমুর ঘরে। হ্যাঁ, এই ওষুধগুলিই সাইকিয়াট্রিস্ট ডক্টর রায়চৌধুরী প্রেসক্রাইব করেছিলেন।

বাসু বললেন, আই ওয়াজ নট জোকিং অন মেডিকেল সায়েন্স, ডক্টর। আমি শুধু বলতে চাইছিলাম ওইসব অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির নামগুলো আমার কাছে গ্রীক। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন—এগুলো হেমন্তের ঘরেই পাওয়া গেছে। সে যাহোক, আপনি এই বাতিল সুঁচগুলো একটু দেখুন তো।

অ্যাটাচি-কেস থেকে বোরিক-কটনে জড়ানো তিনটি ব্যবহৃত সূঁচ বার করে দেখান। বলেন, রিজেকটেড নীড্‌লস্। কিন্তু প্রত্যেকটিতেই ট্রেসেস অফ মেডিসিন রয়েছে। কাছাকাছি ফরেনসিক রিসার্চ ল্যাব কোথায় আছে? আমি জানতে চাই, ইনজেকশানগুলো কিসের।

ডক্টর ধর বললেন, প্রত্যেকটি সিলিন্ডারেই একটু-একটু ওষুধের ট্রেস রয়ে গেছে। কোনো ফরেনসিক ল্যাবেরটারিতে যেতে হবে না। আমার নিজস্ব প্যাথলজিকাল ল্যাব-এ পরীক্ষা করে বলে দেওয়া যায় কী ছিল ইনজেকশানটা। ট্রেড নাম নয়, কেমিক্যাল নেম। হয়তো তা আপনার কাছে মনে হবে গ্রীক। কিন্তু এগুলি যদি ওই হিমুর ঘর থেকেই পেয়ে থাকেন, তাহলে পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই। এগুলোও সেই ডাক্তার রায়চৌধুরীর প্রেসক্রাইব করা ইনজেকশান। নামটা আমার মনে নেই, তবে প্রেসক্রিশানখানা আমার ফাইলেই আছে। দেখে বলে দিতে পারব।

বাসু বললেন, না, না। পাঠক-প্যালেসে এগুলো পাওয়া যায়নি। আপনি ল্যাবরেটারিতে পরীক্ষা করে কী রেজাল্ট পেলেন আমাকে পাঠক-প্যালেসে টেলিফোন করে কাইন্ডলি জানাবেন। আর একটি কথা, ডক্টর। মিসেস্ পাঠক, আই মীন গায়ত্রী দেবীর মৃত্যুসময় আপনি কি উপস্থিত ছিলেন?

—ছিলাম। কেন বলুন তো?

—আপনার কি মনে হয়েছিল সর্প-দংশনের সিম্পটন স্পষ্ট?

—নিশ্চয়ই। সর্প-দংশনের সিম্পটন বলতে কী বোঝাতে চাইছেন?

—'স-স্কেলড ভাইপোর' হচ্ছে '*একিস কারিনাটুস*'। তার বিষে এমন একটি উপাদান থাকে যা মূলত 'এমনজাইমধর্মী', তার নাম আপনি জানেন—Haemolysin রক্তকণিকার সংস্পর্শে এসে সেই এনজাইম হিমোগ্লোবিনকে স্থানচ্যুত ও স্বধর্মচ্যুত করে। ফলে রক্তকণিকা অক্সিজেন গ্রহণে অসমর্থ হয়ে পড়ে। রোগীর প্রথমে শুরু হয় শ্বাসকষ্ট, ক্রমে শ্বাসরোধ। মস্তিস্কে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। প্রতিটি স্টেজের সিম্পাটন বিভিন্ন। ড্যাম ইট—আপনি নিজেই জানেন, আমি কী বলতে চাইছি। ইন ফ্যাক্ট আমার চেয়ে আপনি এ বিষয়ে বেশিই জানেন।

ডক্টর ধর বললেন, ইয়েস ব্যারিস্টার-সাহেব। এসব আমাদের পড়তে হয়েছে। এইসব লক্ষণই ফুটে উঠেছিল গায়ত্রী-মায়ের সর্বদেহে। ন্যাচারালি! কারণ সে সর্পদংশনেই মারা যাচ্ছিল। সাপটা—আপনি জানেন—'বঙ্করাজ'। সেটা মারাও পড়েছিল। এখানে স্টাফড্ হয়ে পড়ে আছে পাঠক-প্যালেসে।

—ইয়েস, ইয়েস। আই নো। গায়ত্রীর কি পোস্ট-মর্টম হয়েছিল?

—পোস্ট-মর্টাম! গুড গড! কেন? পোস্ট-মর্টাম হতে যাবে কেন?

—অ্যাকসিডেন্টাল ডেথ তো?

—সো হোয়াট? সে যে সর্পাঘাতে মারা গেছে এতে তো কোনো সন্দেহ ছিল না।

—তা বটে!

বেলা একটা নাগাদ বাসু ফিরে এলেন পাঠক-প্যালেসে। দেবযানীও ওঁর সঙ্গে এল। কর্নেল-আঙ্কেল তার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তাই সে দেখা করতে এল দুপুরেই। কিন্তু দেখা হলো না। কর্নেল একটা চিরকুট রেখে বেরিয়ে গেছেন জিয়াগঞ্জের দিকে—কী একটা জরুরী কাজে। বাসু-সাহেবকে লিখে রেখে গেছেন হঠাৎ জরুরি দরকারে তাঁকে জিয়াগঞ্জে যেতে হচ্ছে। বাসু-সাহেব যেন আহারাদি সেরে বিশ্রাম করেন। সন্ধ্যার পর তিনি ফিরে আসবেন। কাল সকালে সংগ্রহশালা দেখা যাবে।

বাতাসী বলল, দেবযানী, তুমি এখানেই দুটি খেয়ে নাও। অনেক বেলা হয়ে গেছে।

দেবযানী বলে, না পিসি, বাড়িতে ওঁরা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি বিশেষ কারণে আঙ্কলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। তিনি ফিরে এলে বলে দেবেন। আমি বরং একটু হিমুদার সঙ্গে দেখা করে আসি।

দেবযানী দ্বিতলে উঠে গেল। বাতাসী জানতে চাইল, বাসু-সাহেবের জন্য টেবিলে খাবার সাজাবার ব্যবস্থা করবে কি না।

বাসু প্রতিপশ্ন করেন, তুমি আর হেমন্তও তো আমার সাথে একসঙ্গে খাবে, না কি?

বাতাসী বলে, দেবযানী ফিরে আসুক, তারপর হিমুকে জিজ্ঞেস করব, সে নিচে এসে খাবে না তার খাবার উপরে পাঠিয়ে দেব।

বাসু বলেন, তাহলে এখানে বস। তোমার কাছ থেকেই কিছু খবর সংগ্রহ করি। কর্নেল-সাহেবকে তো এবেলায় আর পাওয়া যাবে না।

বাতাসী বসল ওঁর সামনে। বাসু ধীরে ধীরে নানান কথাবার্তার মাধ্যমে তার আড়ষ্টতা ভাঙবার চেষ্টা করতে থাকেন। বাতাসীর পূর্বজীবন—কঙ্কালীতলার প্রসঙ্গ ইত্যাদি আদৌ তুললেন না। শরৎ ও হেমন্তর বাল্যকালের প্রসঙ্গই আলোচিত হলো। বাতাসী স্বীকার করল, দেবযানীকে তার খুব পছন্দ। হিমুর সঙ্গে তার বিয়ে হলে রাজযোটক হতো; কিন্তু তা তো হবার নয়।

বাসু এবার সুযোগ বুঝে হেমন্তের প্রসঙ্গে এলেন। বাতাসীর মতে হিমুর অস্বাভাবিকতাটা অনস্বীকার্য। সে একটা মানসিক অসুখে ভুগছে, এতে সন্দেহ নেই। লোকজনের সঙ্গে মেলমেশা করতে চায় না। দিনরাত নিজের ঘরে স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে পড়ে থাকে। টি.ভি. দেখে না, বই পড়ে না। সপ্তাহের মধ্যে মাত্র দু-একদিন নিচে নেমে আসে। তবে এই অস্বাভাবিকতাটা তার নিতান্ত সাম্প্রতিক কালের। ছেলেবেলায়, কৈশোরে সে ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, প্রাণচঞ্চল। মিলিটারি চাকরি থেকে রিজাইন করার পর থেকেই সে এই মানসিক বিপর্যয়ে পড়েছে। না—বাল্যে বা কৈশোরে ঘুমের ঘোরে সে কখনো বিছানা ছেড়ে বাইরে বার হয়ে যায়নি। এবারই হঠাৎ একদিন...

কথার মাঝখানেই বাতাসী থেমে যায়।

বাসু বলেন, আমি শুনেছি, কর্নেল আমাকে বলেছেন। সেই কলিমুদ্দিন মিঞার পাঁঠার গলা-কাটার ব্যাপারটা তো?

বাতাসী যখন শুনল যে কর্নেল-এ বিষয়ে বাসুর সঙ্গে ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছেন, তখন সে আরও খোলামেলা কথাবার্তা বলতে শুরু করে। অনেক তথ্য সরবরাহ করল। না, হিমুর সঙ্গে আর কোনো মেয়ের ভাবসাব হয়নি। দেবীকে হিমু আজও ভালবাসে। বিবাহে তার অনিচ্ছার একমাত্র হেতু ওই একটাই। তার নিজের ধারণা, সে ধীরে ধীরে উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে। বংশানুক্রমিক ব্যাধিতে।

বাসু হঠাৎ প্রসঙ্গটা বদল করে জানতে চান, গায়ত্রী দেবীকে যখন সাপে কামড়ায় তখন বাতাসী কি বাগানেই ছিল?

বাতাসী বলে, না! আমি তখন বাড়িতে ছিলাম না। শরৎ আর হিমুকে নিয়ে দারোয়ানের সঙ্গে মেম-সায়রে বিসর্জন দেখতে গেছিলাম। গায়ত্রীকে সাপে কামড়ায় সূর্যাস্তের আগে, আর বাড়ির চাকর গিয়ে আমাদের ধরে নিয়ে আসে রাত সাতটা নাগাদ। ততক্ষণে গায়ত্রী একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। ভাল করে কথা বলতে পারছে না।

বাসু সোজা হয়ে উঠে বসলেন। আশ্চর্য! বসন্তবাবুর জবানবন্দি অনুসারে গায়ত্রীকে যখন সর্প দংশন করে তখন বাতাসী ছিল বাড়িতেই। সে নাকি বিস্কুট আনতে রান্নাঘরের দিকে গিয়েছিল। অনেকদিন আগেকার কথা। ভুল হতেই পারে। কিন্তু কার স্মৃতিশক্তি ভুল করেছে? নাকি, দু'জনের একজন সজ্ঞানে মিছে কথা বলছে? কেন?

এই সময় দ্বিতল থেকে নেমে এল ওরা দু'জন। দেবযানী বলল, বাসু-মামু। হিমুদাকে জোর করে নিয়ে এলাম।

হিমু রীতিমতো সুপুরুষ। ফর্সা একহারা দীর্ঘদেহ। একটু যেন বিষণ্ণ।

বাসু বললেন, বেশ করেছ! এস হিমু। তোমার কথা অনেক শুনেছি। আলাপ করার আগ্রহ ছিল। কিন্তু তুমি যে উপরতলা থেকে নিচে নামতেই রাজি নও।

হিমু এসে প্রণাম করল ওঁকে। বাতাসীকেও। বললে, আপনার কথা অনেক পড়েছি কাঁটা-সিরিজে। চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য এতদিনে হলো। কিন্তু আমার ধারণা ছিল আপনার ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আছে, মামু!

—মামু?

—বাঃ, কৌশিকদা-সুজাতাদিও তো আপনাকে 'মামু' ডাকে। দেবীও তাই ডাকে দেখছি। আমাকেই বা ভাগ্নে বলে মেনে নিতে আপনার আপত্তি হবে কেন?

—হবে না। আমার ভাগ্নেকুল দিন-দিন বর্ধিত হোক।

বাতাসী তাগাদা দেয়। এবার লাঞ্চ সার্ভ করতে বলি?

আহারাদি সেরে বাসু তাঁর দ্বিতলের ঘরে এসে পাইপ ধরিয়ে খবরের কাগজটা খুলে বসেছেন। দেবযানী ফিরে গেছে বাড়িতে। বাতাসী তার একতলার ঘরে দিবানিদ্রা দিতে গেছে। হঠাৎ খোলা-দরজায় কেউ নক করায় বাসু চোখ তুলে চাইলেন। দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে হেমন্ত। বলে, দুপুরে কি আপনি একটু ঘুমিয়ে নেন?

—না, এস, ভিতরে এসে বস। শাস্ত্র বলেছেন : দিবা মা শাপ্সি।

হেমন্ত এসে বসল একটি চেয়ারে। বাসু বলেন, আমি এখানে কেন এসেছি সে-কথা কি তোমার বাবা তোমাকে জানিয়েছেন?

—না, ড্যাড কিছু বলেনি। আজকাল সে আমার সঙ্গে কথাই বলতে চায় না। আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে।

—কেন বল তো?

—ড্যাড আমাকে প্রচণ্ড ভালবাসে। আমার এই অসুখটা হওয়ায় ড্যাড একেবারে মুষড়ে পড়েছে। এটা সহ্য করতে পারছে না। তাই পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। আপনি বিশ্বাস করবেন, বাবা আমাকে নিয়ে কলকাতা গেছিল। ডাক্তার জেঠুকে সঙ্গে করে। তার আজন্মের অ্যালোপ্যাথি-বিদ্বেষ বিসর্জন দিয়ে সে আমাকে অ্যালোপ্যাথ-ওষুধ খাওয়ায় লুকিয়ে লুকিয়ে। ইনজেকশানও দেয়। এ কথা পিসি বা বসন্তকাকুও জানে না।

—তাহলে আমি কেন এসেছি তা তুমি জানো না?

—তা তো বলিনি আমি। বলেছি, ড্যাড সেকথা আমাকে বলেনি। কিন্তু আমি জানি। আপনি এসেছেন দেবযানীর ডাকে। সে আমাকে সব কথা খুলে বলেছে।

—তাহলে কৌশিক-সুজাতার সঙ্গে তুমি দেখা করনি কেন?

—কী লাভ? ওঁরা এ সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারবেন না। আর তাছাড়া ওঁরা তো এসেছিলেন ছদ্মপরিচয়ে। আমার সমস্যার কথা তো তাঁদের বলতেই পারতাম না ড্যাড-এর উপস্থিতিতে। আমি প্রতীক্ষায় বসে ছিলাম আপনার পথ চেয়ে। আপনিই পারবেন দেবযানীকে বাঁচাতে!

—কী ভাবে?

—ওকে বুঝিয়ে বলুন, আমাকে সে ভুলে যাক। আমার মেয়াদ তো আর বছরখানেক। বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবার আগেই আমি একদিন একতলার আলমারিতে বন্দুকগুলোয় তেল দিতে যাব—বরাবরই ওটা আমার কাজ। বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাচ্ছি এটা বুঝতে পারলে হঠাৎ হয়তো অ্যাক্সিডেন্টালি আমার হাতের একটা রাইফেল থেকে—

—পাগলামি কর না, হিমু!

—পাগলামি! আমি করছি? আমাকে দিয়ে করাচ্ছেন যে ব্যক্তিটি তিনি তো পরমকরুণাময়। তিনি আপনার-আমার নাগালের বাইরে। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি কিছু বিষাক্ত 'জিন্‌স্' পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার রক্তকণিকায়। দায়ী কি আমি?

বাসু ওকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে জানতে চাইলেন—হেমু কেন মনে করছে যে, সে ক্রমশ পাগল হয়ে যাচ্ছে। কী কী সিম্‌টম্ সে লক্ষ্য করেছে?

হেমন্ত অকপটে সব কথা খুলে বলল। তার সাম্প্রতিক 'সোম্‌নামবোলিজম্'-এর কথাও। কলিমুদ্দিনের পাঁঠার গলা কাটা। নিজেদের প্রাসাদে মুর্গিবধ। তাছাড়াও ওর মাঝে মাঝে সাময়িক আক্রমণ হয় দিনের বেলাতেও। জাগ্রত অবস্থায়। প্রত্যক্ষ বস্তু হঠাৎ দ্বিত্বলাভ করে। একটা মানুষকে সে দুটো করে দেখতে পায়। হঠাৎ অন্ধকার ঘনিয়ে আসে প্রখর রৌদ্রের মধ্যেই। তাছাড়া মধ্যরাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখে ওর ঘুম ভেঙে যায়। প্রচণ্ড তৃষ্ণা, অথচ জলপান

করতে পারে না। গলা দিয়ে জল নামতে চায় না। জলের গ্লাসে ও দেখতে পায় শুধু রক্ত—রক্ত আর রক্ত!

হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে বাসু-সাহেবের হাত দুটি চেপে ধরে বলে, আপনি দেবীকে রাজি করান। ও শরৎকে বিয়ে করুক। আমার তো আর বছরখানেকের মেয়াদ। তারপর শরৎদাই হবে এই বিশাল সম্পত্তির যুবরাজ। পিসি দেবীকে খুব ভালবাসে, ড্যাডও। সে এ বাড়ির বধূ হলে সবাই সুখী হবে। দেবী নিজেও। শরৎদা লোক খুব ভাল।

—শরৎ তোমার চেয়ে বয়সে কত বড়?

—মাস দশেকের। আপনি দেবযানীকে রাজি করাবেন তো?

বাসু জবাব দেবার আগেই বটুক ঢুকল ঘরে। বলল, কাকাবাবু এয়েছেন। তিনি বললেন দেখে আসতে যে, আপনারা ঘুমাচ্ছেন কি না।

বাসু হেমন্তের দিকে ফিরে বলেন, কাকাবাবুটি কে? বসন্ত ঘোষ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। উনি নিশ্চয় আপনার আসার খবর পেয়ে দেখা করতে এসেছেন। ওঁকে উপরে ডেকে আনব? না কি আমরাই নিচে নেমে যাব?

বাসু বটুকের দিকে ফিরে বললেন, ওঁকেই উপরে আসতে বল।

দীর্ঘদেহী সুদর্শন বসন্তকুমার ঘরে এসে যুক্তকরে বাসু-সাহেবকে নমস্কার করে বললেন, বিলু জিয়াগঞ্জে রওনা হবার আগে আমাকে টেলিফোনে জানিয়েছে যে, আপনি এসেছেন। তাই ছুটে চলে এলাম। বিলু বাঙলা বই-টই পড়ে না, তার কাছে আপনি শুধুমাত্র একজন স্বনামধন্য ব্যারিস্টার। আমি কিন্তু আপনার সব পরিচয়ই জানি। দেবী-মায়ের কাছ থেকে নিয়ে একটা একটা করে কাঁটা-সিরিজের সব বইই আমি পড়ে ফেলেছি।

বাসু বললেন, আপনার পরিচয়ও আমি দেবযানীর মাধ্যমে মোটামুটি জেনেছি। কিন্তু আমি হঠাৎ কেন আদমগড়ে এসেছি, সে কথা কি কর্নেল সাহেব আপনাকে জানিয়েছেন?

—না, সে বলেনি। কিন্তু আমি আন্দাজ করেছি ঠিকই। দেবযানী আপনাকে 'মুশকিল-আসানে'র ভূমিকায় অভিনয় করতে ধরে এনেছে।

—তাহলে এখন ফাঁকা বাড়িতে সে কথাই আলোচনা করা যাক। হিমুর সঙ্গে সেই আলোচনাই এতক্ষণ হচ্ছিল। আপনি কি মনে করেন ও ধীরে ধীরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে?

—আমার মনে করা-করির কী আছে? সেটা তো এখন সূর্যোদয়ের মতো স্পষ্ট। হিমু নিজেও তা উপলব্ধি করেছে। আর হবে নাই বা কেন? মাস তিনেক আগে থেকে ওর যে শনির দশা শুরু হয়েছে। একটা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করা খুবই উচিত ছিল। কিন্তু বিলু এসবে একবারে বিশ্বাস করে না। তার ঘোরতর আপত্তি। কিছুতেই রাজী হলো না।

বাসু বলেন, কিন্তু হিমু বলছিল, শুধু হিমু কেন, বাতাসীও বলল যে বাল্যে, কৈশোরে ওর এ-সব উপসর্গ তো কিছুই ছিল না। এখন হঠাৎ—

বাধা দিয়ে বসন্ত বলে ওঠেন, সে-কথাই তো বলছি মশাই। মাত্র তিন মাস হলো ওর শনির দশা শুরু হয়েছে। চলবে পাক্কা একটি বছর।

—তাহলে এক বছর পরে ও দেবযানীকে বিয়ে করলে সুখী দাম্পত্য জীবন কাটাতে পারবে?

—আলবাৎ। আমি দুজনেরই কোষ্ঠি বিচার করে দেখছি। একেবারে রাজযোটক, মশাই। ষষ্টাষ্টক মিলন হবে, অর্থাৎ মিত্র-ষড়াষ্টক-যোটক। বর্ণশুদ্ধি, তারাশুদ্ধি, যোনিকূট-মিলন শুভ থাকায়। এছাড়া দু'জনের কারও ভৌমদোষ নাই।

বাসু-সাহেবের মনে হলো, এর চেয়ে ডক্টর ধরের অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির ব্যাখ্যাগুলি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য ছিল।

হিমু হঠাৎ জানতে চায়, শরৎদার সঙ্গে ওর কোষ্ঠিবিচার করে দেখেছেন কাকু?

বসন্তবাবু একটু চমকে ওঠেন। বলেন, শরৎদা? কেন? শরতের সঙ্গে তো দেবীর কোনও বিবাহ-প্রস্তাব ওঠেনি? কোনো পক্ষ থেকেই—

হেমন্ত বলে, ধরুন এই দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে যদি আমার সঙ্গে দেবীর বিয়েটা না হয়, তখন...মানে, দেবযানীর একটি সম্ভাব্য সৎপাত্র হিসাবে...তাছাড়া পিসিও ওকে খুব ভালবাসে।

ঘোষমশাই মাথা নেড়ে বললেন, শরতের কোনো জন্মপত্রিকা নেই। ওর জন্মস্থান জানি: কাশী; জন্ম তারিখ জানি : একাত্তর সালের চৌঠা এপ্রিল; কিন্তু জন্মসময়টা জানি না।

বাসু জানতে চান, কেন? বেনারসে কেন?

—আদমগড় ছোট্ট জায়গা; তাই গর্ভলক্ষণ ভাল করে ফুটে ওঠার আগেই বিলু বাতাসীকে কাশীতে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে বাঙালিটোলায় পাঠকদের একটা মোকাম আছে। শরতের জন্ম সেখানেই। সঠিক জন্মসময়টা কেউ লিখে রাখেনি।...কিন্তু শরতের সঙ্গে দেবীর বিয়ে হতে যাবে কেন? তুমি ঠিক ভাল হয়ে যাবে।

বাসু একেবারে অন্যদিক থেকে হঠাৎ আক্রমণ করে বসলেন। বসন্তবাবুকে বললেন, একটা কথা বলুন তো? আপনি কি 'প্ল্যানচেট'-এ বিশ্বাস করেন, ঘোষমশাই?

বসন্তবাবু প্রথমটায় একটু থতমত খেয়ে যান। তারপর সামলে নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, করি! 'আত্মাবতরণ', ওই যাকে আপনি 'প্লানচেট' বললেন, তা আমার একাধিক বার প্রত্যক্ষকরা ঘটনা। আমি পারি না, কিন্তু আমার গুরুদেবকে (উদ্দেশ্যে যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করালেন) বহুবার করতে দেখেছি। কিন্তু সে-কথা কেন?

বাসু বলেন, দেখুন, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করতে পারলে ভাল হতো মানছি। কিন্তু সে ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপারে কর্নেল বাধা দিচ্ছেন—

বসন্তও বাধা দিয়ে বলেন, না, ব্যয়ের জন্য নয়, সে এসব বিশ্বাসই করে না। বলে, তার বাড়িতে ওসব করতে দেবে না।

—বেশ তো, যজ্ঞ-টজ্ঞ নাই হলো, আমরা একটা ঘরোয়া-আসরে যদি গায়ত্রী দেবীর ওই 'আত্মাবতরণ' করি, তাতে গৃহস্বামীর আপত্তি হবে কেন? মায়ের চেয়ে ছেলেকে কে বেশি ভালবাসে বলুন? হয়তো গায়ত্রী দেবীর আত্মাই বলে দিতে পারবে, কী-ভাবে হিমুর রোগমুক্তি হতে পারে। পারে না?

বসন্ত গম্ভীরস্বরে বলেন, পারে। আলবাৎ পারে! এমন অলৌকিক কাণ্ড-কারখানা আমি গুরুদেবের (যুক্তকরে প্রণাম করে) আশ্রমে স্বচক্ষে ঘটতে দেখেছি। স্বর্গত ব্যক্তি আত্মাবতরণ-মঞ্চে নেমে এসে জাগতিক পরামর্শ ও বিধান দিয়ে গেছেন। অসংখ্যবার। তাতে চোর ধরা পড়েছে, হারতে বসা মামলা জেতা গেছে, দুরারোগ্য অসুখ...

বাসু বললেন, আপনি শুধু আপনার বন্ধুকে সামলান।

হিমু হঠাৎ জোর দিয়ে বলে উঠল, কাকাবাবু কেন? সামলাব আমি। ড্যাড কিছু এ বাড়ির ডিকটেটার নয়। আমরা সবাই মিলে একটা ঘরে একান্তে বসে এ বাড়ির এক প্রায়াতা পূণ্যশ্লোকাকে স্মরণ করব, তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করব, এতে ড্যাড বাধা দেবে কেন? দিলেই বা আমরা শুনতে যাব কেন?

বসন্ত বলে ওঠেন, সে কথা একশোবার। গায়ত্রীর আত্মাকে নামাতে পারলে সে হয়তো রোগ-নিরাময়ের একটা পথ বাৎলাতে পারে। কিন্তু প্ল্যানচেট জানা লোক কেউ আদমগড়ে আছে বলে তো জানি না।

বাসু গম্ভীরভাবে বললেন, সে ভার আমার উপর ছেড়ে দিন, ঘোষমশাই। লাগবে একটা তে-পায়া টেবিল। এছাড়া কিছু ধূপকাঠি, ধুনোর আয়োজন, ফুল—সেসব বাতাসীই ব্যবস্থা করতে পারবে মনে হয়।

বসন্ত ঘোষ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, আত্মাবতরণ-পদ্ধতি আপনি জানেন?

—না-হলে এ প্রস্তাব রাখব কেন? তবে গায়ত্রীকে জীবিতাবস্থায় চাক্ষুষ দেখেছে, এমন তিনজন লোককে চাই।

বসন্ত বলেন, সেটা কোনো সমস্যাই হয়। বিলু, বাতাসী আর আমি।

হিমু আবার বলে ওঠে, ড্যাডি প্ল্যানচেটে বসতে রাজি হবে না। না হোক। আমার স্পষ্ট মনে আছে মা-কে। তখন আমার চার বছর বয়স।

বসন্ত বললেন, আজ রাতেই তাহলে হয়ে যাক। আজ তিথিটাও ভাল : অমাবস্যা।

বাসু বলেন, কৃষ্ণা চতুর্দশী পার হয়ে অমাবস্যা কখন পড়ছে?

—রাত দশটা কুড়িতে। গুপ্তপ্রেস মতে।

—দ্যাটস ফাইন! আপনি শুধু একটা তে-পায়া টেবিলের যোগাড় দেখুন।

ঠিক সেই সময়ে একটা কর্ডলেস টেলিফোন হাতে বটুক এসে হাজির। বাসু-সাহেবের দিকে সেটা এগিয়ে ধরে বলে, আপনার ফোন।

বাসু যন্ত্রটার 'কথামুখে' আত্মঘোষণা করা মাত্র ও প্রান্তবাসী বলে ওঠেন, দিস ইজ ডক্টর ধর।

বাসু উঠে দাঁড়ান। দ্বারের দিকে চলতে চলতে বলেন, কাজটা কি শেষ হয়েছে?

—হয়েছে। কিন্তু ওই ইনজেকশানের বাতিল সূঁচগুলো আপনি কোথায় পেলেন ব্যারিস্টার-সাহেব? আদমগড়ে?

বাসু ততক্ষণে ঘর ছেড়ে করিডোরে। বটুক সিঁড়ির ল্যান্ডিঙের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তার বিপরীত দিকে হাঁটতে হাঁটতে উনি অম্লান বদনে বলতে থাকেন, আরে না, না; কলকাতায়, কাঁকুড়গাছিতে। এক বৃদ্ধ ব্যবসায়ীর মৃত্যুর কারণ স্লো-পয়েজিং কি না পুলিশ তা খতিয়ে দেখতে চায়। কলকাতাতেই ওটা কোনো ফরেনসিক ল্যাব-এ টেস্ট করতে দিয়ে আসার কথা ছিল। ভুলে আমার স্যুটকেসে থেকে গেছে। সে যাই হোক— সামান্য তলানি থেকে কি আন্দাজ করা গেছে ইনজেকশানটা কী ছিল?

—আন্দাজ নয়, স্যার। আমার স্থির সিদ্ধান্ত : ইট ওয়াজ অ্যাট্রোপিন সাল্‌ফেট!

—সাদা-বাঙলায় যাকে বলা হয়, 'বেলেডোনার মাদার-টিঞ্চার'?

—ইয়েস স্যার। বায়োকেমিক ওষুধ। নাইটশেড গ্রুপের গাছ থেকে তৈরি হয়। চোখের ডাক্তারেরা চোখের পাওয়ার দেখার আগে যে অ্যাট্রোপিন ড্রপ্ দেন তাও ওই একই জিনিস। কিন্তু এটা যদি পরিমাণ মতো ধীরে ধীরে কোনও মানুষের শরীরে...

—আই নো ডক্টর, আই নো। এটা আমার কাছে আর গ্রীক নয়। ক্রিমিনোলজির অংশ। কাল সকালে গিয়ে রিপোর্টটা সংগ্রহ করে আনব। কিপ ইট আন্ডার য়োর শ্লিভস্ ওভারনাইট।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু সাক্ষ্য দিতে কি আমাকে কলকাতা দৌড়াতে হবে নাকি। সেই কাঁকুড়গাছির হত্যামামলায়।

—ইয়েস ডক্টর। প্রসিকিউশানের খরচে। কিন্তু এটা আপনার কর্তব্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ডাক্তার হিসেবে এবং ভারতীয় নাগরিক হিসেবে।

—কারেক্ট। তাহলে কাল সকালে দেখা হচ্ছে।

বাসু ঘরে ফিরে আসতেই বসন্ত প্রশ্ন করেন, কার ফোন? বিলু করেছিল নাকি?

সত্যাশ্রয়ী সত্যান্বেষী আবার অম্লান বদনে বলেন, না। কলকাতার এক ক্লায়েন্ট।

তারপর হিমুর দিকে ফিরে বলেন, বাড়িতে টাইপ-রাইটার আছে নিশ্চয়ই। কর্নেল-সাহেবের স্টাডিতে? ওটা আমার আজ রাত্রে প্রয়োজন হবে—রাত জেগে একটা রিপোর্ট টাইপ করতে হবে। কাল-পরশুর মধ্যে হাইকোর্টে জমা দেওয়া দরকার।

হিমু বলে, ড্যাডির যন্ত্রটা ভারী। আমার একটা ছোট পোর্টেবল্ টাইপরাইটার আছে। পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর কিছু?

—হ্যাঁ, একটি ম্যানিলা এনভেলাপ, কিছু কাগজ-কার্বন, সীল করার গালা আর মোমবাতি। দেশলাই লাগবে না। আমার কাছেই আছে।

নয়

কর্নেল পাঠক যখন ফিরে এলেন রাত তখন নটা। পথে ছোটখাটো একটা ব্রেকডাউন হয়েছিল। তাতেই এতটা দেরি হয়েছে। কর্নেল এসেই সংবাদ পেলেন, রাত্রে এখানে প্ল্যানচেটের আয়োজন হয়েছে। শুনেই ক্ষেপে গেলেন তিনি : ওসব বুজরুকি পাঠক-প্যালেসে চলবে না। যতসব বাঙ্কাম-বল্ডারড্যাশ্!

তাঁকে রুখে দিল হিমুই। যুক্তি দিয়ে বোঝাল, প্রাসাদের একান্তে যদি গুটি তিন-চার মানুষ একটি প্রয়াত আত্মাকে স্মরণ করে, তাঁর কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করে, তাতে গৃহস্বামীর আপত্তি হবে কেন? তিনি যদি এতে যোগ দিতে না চান, তফাতে থাকুন। টি.ভি. দেখুন, বই পড়ুন।

কর্নেল দুটোর একটাও করলেন না। লীকার-ক্যাবিনেট থেকে একটা স্কচের বোতল বার করে নিজের শয়নকক্ষে অর্গলবদ্ধ ঘরে জমিয়ে বসলেন। বাসু-সাহেবের সঙ্গে একটিও বাক্যালাপ করলেন না।

টেলিফোনে খবর পেয়ে দেবযানীও এসে জুটেছে। রাত সাড়ে দশটায় প্লানচেট শুরু হবে, কে জানে হয়তো শেষ হবে মধ্যরাত্রে। তাই সে বাড়িতে বলেই এসেছে পাঠক-প্যালেসেই রাতটা কাটিয়ে ভোরবেলা ফিরে যাবে। এ ব্যবস্থাতেও ঘোরতর আপত্তি ছিল কর্নেলের। কিন্তু হেমন্তের জেদাজেদিতে এটাও মেনে নিতে হলো তাঁকে। স্থির হলো, প্ল্যানচেট মিটে গেলে সে বাসু-সাহেবের পাশের ঘরে সিংগল-বেড খাটে শোবে। এটি এককালে ছিল গায়ত্রীর শয়নকক্ষ। বাসু-সাহেবের ঘরের সঙ্গে একটা কমুনিকেটিং-ডোর আছে। বাসু-সাহেবের জন্য নির্দিষ্ট ঘরটা—দক্ষিণপুবের বড় ঘরটা—এককালে ছিল কর্নেল-সাহেবের মাস্টার্স-রুম। স্ত্রীবিয়োগের পর থেকে তিনি আর এঘরে শয়ন করেন না।

সকাল-সকাল ডিনার সেরে ওঁরা রাত দশটার মধ্যে এসে বসলেন প্ল্যানচেট-টেবিলে। প্রথমে স্থির হয়েছিল তৃতীয় ঘরটিতে, অর্থাৎ হেমন্তের শয়নকক্ষে আসরটা বসবে; কিন্তু হিমুই সেটা বদল করল। বলল, না, আমরা প্ল্যানচেটে বসব একতলার চিত্রশালায়। মায়ের ছবিখানার ঠিক সামনে।

সেই মতোই আয়োজন হয়েছে। বাতাসীর ব্যবস্থাপনায় একটা সাদা পদ্মফুলের মালা পরানো হয়েছে ছবিটায়। গায়ত্রী নাকি পদ্মফুল খুব ভালবাসতো। মেম-সায়রের সাদা পদ্মফুল। ধুপধুনো নানান ব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি রাখতে দেয়নি বাতাসী।

প্ল্যানচেট টেবিলে বসেছেন বসন্তবাবু, বাতাসী আর হিমু। একটু দূরে পাশাপাশি দুটি চেয়ারে বাসু-সাহেব আর দেবযানী। অমাবস্যা শুরু হতে তখনো মিনিট-কুড়ি দেরি। হেমন্ত ঘড়ি দেখে বলল, দেবী, শুরু হতে এখনো কিছু দেরি আছে। তুমি খালিগলায় একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাও ততক্ষণ। অনেকদিন তোমার গান শুনিনি।

দেবযানী বলে, গান গাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছি, হিমুদা।

—তা হোক। এ তো কোনো আসরে গাইছ না। ঘরোয়া বৈঠক।

দেবযানী রাজি হলো। সে গান শুরু করল। ভারি মিষ্টি গলা ওর :

"তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে
যতদূরে আমি ধাই—
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু,
কোথা বিচ্ছেদ নাই!..."

হিমু একদৃষ্টে তার মায়ের ছবিখানার দিকে তাকিয়ে বসে রইল। বসন্তবাবু বার বার রুমাল বার করে চশমার কাচ দুটো মুছতে থাকেন।

রাত প্রায় বারোটা পর্যন্ত চলল প্ল্যানচেটের আসর। কিন্তু কাকসা পরিবেদনা। গায়ত্রী দেবীর আত্মার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

বাসু বললেন, আর চেষ্টা করে লাভ নেই। যে কোনো কারণেই হোক, উনি মর্ত্যে নেমে আসতে রাজি হলেন না।

বসন্তবাবু মাথা নেড়ে বললেন, আমি জানতাম। দুটি হেতুতে। প্রথম কথা অপঘাতে যাঁর মৃত্যু হয় তাঁর 'আত্মাবতরণ' করা যায় না। গুরুদেব বলেছিলেন। দ্বিতীয়ত গায়ত্রীর আত্মা হয়তো সপ্তমস্বর্গের শেষ স্তর অতিক্রম করে বিষ্ণুলোকে পৌঁছে গেছে। সেখানে জাগতিক কোনো বন্ধনের রেশ আর থাকে না। কোনো আবেদন পৌঁছায় না।

বাসু বললেন, তাই হবে হয়তো। কী জানি!

ওঁরা যে-যার ঘরে শুতে গেলেন। বাতাসী চলে গেল তার একতলার ঘরে।

বসন্তবাবু আশ্রয় নিলেন দ্বিতলে। করিডোরের একেবারে অপরপ্রান্তের ঘরটিতে। হিমু তার নিজের তিন নম্বর শয়নকক্ষে। বাসু দেবযানীকে নিয়ে দ্বিতলে এসে দেখলেন, সিঁড়ির মাথায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন গৃহস্বামী। তাঁর এক হাতে হুইস্কির গ্লাস, অপর হাতে চুরুট। চোখাচোখি হতেই কর্নেল দৃঢ়স্বরে বলে ওঠেন, লুক হিয়ার ব্যারিস্টার-বাসু, আপনি আমার অতিথি। তা সত্ত্বেও আপনাকে অনুরোধ করছি, কাল সকালেই আপনি দয়া করে কলকাতায় ফিরে যাবেন। আপনি এখানে কেন এসেছিলেন, তা আমি সবিশেষ জানতে পেরেছি। আমার ছেলের সঙ্গে যাতে দেবযানীর বিয়েটা হয়, সেটা পাকা করতে। তাই না? ওসব কঙ্কালীতলার গল্প ইজ—বলডারডাশ্।

বাসু গম্ভীর হয়ে বললেন, অলরাইট ! কাল সকালে বেড-টী সার্ভ করার আগেই আমি এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। থ্যাংক্স্ ফর য়োর কর্ডিয়ালিটি। যে উদ্দেশ্যে আমি এসেছিলাম—দেবযানী আর হেমন্তের বিয়েটা পাকা করা—সেটা কিন্তু সুসম্পন্ন হয়েছে। একটি রিপোর্টে আমি তা লিখে রেখেছি। যাওয়ার আগে সেটা আপনাকে দিয়ে যাব। আপনার সৌজন্যের বিনিময়ে।

—আই ডোন্ট নীড ইট !

—বাট য়ু ডু নীড ইট, কর্নেল। কারণ রিপোর্টের একটা কপি যে আবার আমার কাছে থেকে যাবে। লীগ্যাল ডকুমেন্ট ! ওটা পড়া থাকলে আপনার সুবিধা হতো। লীগ্যালি!

কর্নেল আগুনঝরা দৃষ্টিতে কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে দেখলেন বাসু-সাহেবকে। তারপর দেবযানীর দিকে ফিরে বলেন, দেবযানী! তুমি খুবই অন্যায় করেছ। মিথ্যা পরিচয়ে দু'জন গোয়েন্দাকে আমার প্যালেসে ঢুকিয়ে দিয়েছ। সে বোঝাপড়া আমি তোমার বাবার সঙ্গে করব। তোমাকে বরং বলে রাখছি. মানে.—আই ওয়ার্ন য়ু—এ প্যালেসে তুমি আর কোনোদিন মাথা

গলাবে না। সেটা হয়ে যাবে 'ট্রেসপাসিং'। তাছাড়া টেলিফোনেও তুমি হিমুর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করবে না। বুঝেছ?

দেবযানী মাথা খাড় রেখেই প্রত্যুত্তর করে, না, বুঝিনি, আঙ্কল। বাড়িটা আপনার, আপনি বারণ করে দিচ্ছেন, আমি এ বাড়িতে আর নিশ্চয় আসব না। কিন্তু হিমুদা আপনার নাবালক পুত্র নয়। আমিও অ্যাডাল্ট ! আপনি আমাদের সাংবিধানিক অধিকারে হাত দেন কোন যুক্তিতে ?

কর্নেল গর্জে উঠলেন, ইজ দ্যাট সো? তাহলে তুমি নিচে নেমে এস, তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি। এরপর একটা রাতও...

কথাটা তাঁর শেষ হলো না। তিন নম্বর ঘরের দরজাটা খুলে গেল। করিডোরে বার হয়ে এসে হিমু দৃঢ়স্বরে বললে, ড্যাডি! আই থিংক য়ু আর থরলি ড্রাঙ্ক! দেবী রাতটা এখানেই থাকবে! য়ু বেটার গো ডাউনস্টেয়ার্স!

কর্নেল সকলের মুখে পর্যায়ক্রমে একবার তাকিয়ে দেখলেন। দেবযানী পাথরের মূর্তি। বাসু নির্বিকার। হিমু দু'পা ফাঁক করে নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও কিছু নেই কর্নেল তাঁর হাতের কাচের গ্লাসটা ছুঁড়ে মারলেন দেওয়ালে। টুকরো টুকরো কাচ আর হুইস্কি ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। কর্নেল অস্ফুটে গর্জন করে ওঠেন : ড্যাম ইট!

টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলেন তিনি। দেবযানী নিঃশব্দে বারান্দার ওপ্রান্ত থেকে একটা ওয়াইপার-ব্রাশ নিয়ে কাচের টুকরোগুলো নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দিতে থাকে বাসু এ-পাশ ফিরে হিমুকে বললেন, এবার তুমি শুতে যাও হিমু। রাত অনেক হয়েছে দেবযানীর বাহুমূল ধরে তিনি তাকে নিয়ে এলেন নিজের ঘরে। দরজাটা ভিতর থেকে ছিটকিনি বন্ধ করে দেবযানীকে বললেন, তুমি ওই খাটে উঠে বস। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। অত্যন্ত জরুরী এবং বিশেষ গোপনীয়।

নিজেও বসলেন একটা চেয়ারে। দেবযানী নতনেত্রে বলে, কথার আর বাকি কী রইল বাসু-মামু? হিমুদার সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক তো শেষ হয়ে গেল।

বাসু পাইপটা ধরাতে ব্যস্ত ছিলেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, নো! অ্যান এম্ফাটিক নো! কিছুই শেষ হয়নি। ইন ফ্যাক্ট, নতুন করে একটা চ্যাপ্টার আজ রাতে শুরু হলো। শোন দেবযানী! হেমন্তর অসুখটা 'ফেক'—অবাস্তব, হয়নি। ওকে স্লো-পয়েজিং-এ ক্রমশ পাগল করে তোলা হচ্ছিল। এখন, মানে এই মুহূর্ত থেকে সেটা বন্ধ হলো। আই অ্যাশিওর য়ু : হেমন্ত কোনো বংশানুক্রমিক ব্যাধিতে আদৌ ভুগছে না।

দেবযানীর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেছে। বললে, কে হিমুদাকে স্লো পয়েজিং করবে? কেনই বা করবে? আর কী করে আপনি আন্দাজ করছেন যে, ওর অসুখটা বংশানুক্রমিক নয়?

বাসু বললেন, তুমি তিনটি প্রশ্ন করেছ। প্রথম দুটির জবাব কাল সকালে দেব। তৃতীয়টার জবাব এখনই দিয়ে দিচ্ছি : যেহেতু হেমন্তের দেহে অভিশপ্ত পাঠক-পরিবারের একবিন্দুও রক্ত নেই।

দেবযানী জবাব দিল না। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল শুধু।

বাসু বললেন, তুমি এতদিনেও আন্দাজ করতে পারনি? হিমুর মা গায়ত্রী, তাঁর ধমনীতে কোনো অভিশপ্ত রক্ত ছিল না। কেমন? আর ওর বাবা—তুমি কি জান না?

দেবযানী যেন পাথরে-গড়া মূর্তি। নির্বাক নিস্পন্দ।

—জান না দেখছি। হিমু নিজেও জানে কি না জানি না। ওর বাবা হচ্ছেন : বসন্তকুমার ঘোষ! গায়ত্রীর বিবাহের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল যুদ্ধে চলে যান। তোমার বসন্তকাকা আসেন এ প্যালেসে, সদ্য বিবাহিতার দেখ্‌ভাল করতে। সান্ত্বনা দিতে। শিল্পীর প্রতি মেয়ে মনের একটা আকর্ষণ থাকেই। বসন্তকুমার দীর্ঘদেহী. সুদর্শন, চার্মিং পারসোনালিটি! গায়ত্রীর বিয়ে হয়েছে

বিশে মার্চ একাত্তর সালে, আর হিমুর জন্ম সাতই ফেব্রুয়ারী বাহাত্তর সালে। এদিকে কর্নেল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেছেন হেমন্তর জন্মের মাত্র দু-মাস আগে। তিনি মাঝে মাঝে হয়তো ছুটিছাটায় এসেছেন। স্ত্রীর সঙ্গে রাত্রিবাসও করেছেন; কিন্তু হেমন্তর চেহারা দেখছ না? কর্নেল শ্যামবর্ণ, খর্বকায়, অথচ হেমন্ত গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহী—ঠিক বসন্তবাবুর মতো।

দেবযানী রুখে ওঠে, এসব কী বলছেন, মামু? শুধুমাত্র চেহারার সাদৃশ্য থেকে আপনি এতবড় কথাটা বলতে পারলেন?

বাসু দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, না, দেবযানী! এ কোনো আন্দাজে বলা নয়। আমি নানান দিক বিবেচনা করে স্থির-নিশ্চয় বুঝতে পেরেছি। হিমু কোনও বংশানুক্রমিক ব্যাধিতে ভুগছে না।

সমান তেজের সঙ্গে দেবযানী বলে, হিমুদা যে একটা কঠিন মানসিক ব্যাধিতে ভুগছে এটা প্রত্যক্ষ সত্য! তার হেতুটাও ডাক্তারবাবুরা বলছেন : বংশানুক্রমিক জিন্‌সের প্রভাবে। আপনি কি ডাক্তারবাবুদের ডায়াগ্‌নোসিস্‌টাকেও উড়িয়ে দিতে চান?

—হ্যাঁ চাই। কারণ ডায়োগ্‌নোসিসটা বিজ্ঞানসম্মতভাবে দাঁড়াতেই পারে না, যদি হিমুর ধমনীতে পাঠক বংশের রক্ত না থাকে।

—কিন্তু সেটা তো আপনার আন্দাজ। অথচ তার পাগলামিটা প্রত্যক্ষ বাস্তব। কলিমুদ্দিন চাচার পাঁঠার গলা সে কাটবে কেন? সাময়িকভাবে পাগল না হয়ে গেলে? বাড়ির মুর্গিগুলো...

বাসু বাধা দিয়ে বললেন, না দেবযানী, না। ফর য়োর ইনফরমেশনস্ তাদের মৃত্যুর জন্য তোমার হিমুদা আদৌ দায়ী নয়!

—আপনি জানেন না, মামু। ডাক্তার জেঠু আমার কাছে স্বীকার করেছেন যে ছোরার বাঁটে রক্তের উপর হিমুদার আঙুলের স্পষ্ট ছাপ পড়েছিল। কর্নেল কাকু এক্সপার্টস দিয়ে সেটা পরীক্ষা করিয়ে জেনেছেন যে, সে আঙুলের ছাপ হিমুদারই।

বাসু বাধা দিয়ে আবার বলে ওঠেন, না, আর কোনো কথা নয়। যেটুকু শুনেছ—বিশ্বাস করতে পার আর নাই পার—তাতেই আজ রাতে তোমার ঘুম হবে না। সব এক্সপ্লানেশান এখনি দেওয়া যাবে না। চল, তোমাকে বরং ওঘরে পৌঁছে দিই। না, ওদিকে দিয়ে নয়, এই মাঝের ইন্টারকমুনেটিং দরজাটা দিয়ে।

দু-ঘরের মাঝখানে যে দরজাটা আছে সেই পথে বাসু-সাহেব দেবযানীকে পৌঁছে দিলেন তার নির্দিষ্ট শয়নকক্ষে। ওর ঘরের যে প্রধান প্রবেশ পথ, করিডোরের দিকের দরজাটা ছিটকিনি বন্ধ করে ফিরে এসে আবার বললেন, শোন দেবযানী, এঘরে সংলগ্নে টয়লেট আছে, টেবিলে খাবার জলও আছে। কোনো কারণেই আজ রাতে তুমি ওই করিডোরের দিকের দরজাটা খুলবে না। যদি মনে হয় কেউ সেদিকের দরজা ধাক্কাচ্ছে তাহলে তুমি এই মাঝের দরজা দিয়ে আমার ঘরে চলে আসবে। আমাকে ডেকে তুলবে। এ দরজায় আমার দিকে ছিটকিনি বন্ধ থাকবে না। তুমি তোমার দিকের ছিটকিনি বন্ধ করে শোবে। বুঝেছ?

দেবযানী অবাক হয়ে বলে, কেন মামু?

—আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, আমরা নাটকের যবনিকা-মুহূর্তের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি। সেই সিক্সথ সেন্সের নির্দেশেই আমি এখানে ছুটে এসেছি। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আজকের রাতটা একটা ক্রিটিক্যাল রাত্রি।

—আপনি তো এখানে এসেছেন আমার ডাকে। হিমুদা কেন আমাকে প্রত্যাখান করছেন সেটা খুঁজে বার করতে।

—না দেবযানী! শুরুটা সেভাবেই হয়েছিল বটে, কিন্তু ক্রমশ ঘটনাটা মনে হচ্ছে অন্য

খাতে বইছে। আমি ছুটে এসেছি—তুমি হয়তো অবাক হবে শুনলে—একটা মৃত্যুকে প্রতিহত করতে। একটা হত্যাকাণ্ড ঠেকাতে।

বজ্রাহত দেবযানীর ওষ্ঠাধর শুধু উচ্চারণ করল বাসু-সাহেবের শেষ শব্দটা : হত্যাকাণ্ড ?

—হ্যাঁ, দেবযানী। আমার আশঙ্কা হয়েছিল যে, এখানে একজন আততায়ী কোনো একজনকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছে। সেটা ঠেকাতেই আমি ছুটে এসেছি। কে, কেন, কাকে খুন করতে চায় তা এখনি তোমাকে জানাতে পারছি না, বিশেষ কারণে। কিন্তু এটাই আমার স্থির আশঙ্কা। এবার শুয়ে পড় তুমি।

গ্রীবাভঙ্গিতে সম্মতি জানাল মেয়েটি।

বাসু বললেন, গুড নাইট। বাট ডোন্ট ফরগেট মাই লাস্ট ইনস্ট্রাকশান। বাড়িতে আগুন লাগলেও তুমি ওই করিডোরের দরজাটা খুলবে না। মাঝের দরজাটা খুলে আমার ঘরে চলে আসবে। কেমন?

দেবযানী ধীরে ধীরে খাটে উঠে বসল।

বাসু নিজের ঘরে ফিরে এলেন।

টাইপ করার কাজ তখনো কিছুটা বাকি ছিল। বিশেষ কারণে উনি আজ রাত্রেই টাইপ করে ফেলতে চান। তাই বটুকের মাধ্যমে এক ফ্লাস্ক র-কফি বানিয়ে রেখেছিলেন। তার শেষ তলানিটুকু কাপে ঢেলে জানলার দিকে সরে এলেন। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলেন।

অমাবস্যার ঘনান্ধকারে গ্রাম্যপ্রকৃতি সুষুপ্তিমগ্ন। বহুদূরে অন্ধকারে এক সারমেয়-আর্তনাদ! আর সেই করুণ আবেদনের মূর্ছনা স্তব্ধ প্রকৃতির বক্ষপঞ্জরে যেন অনুরণিত হতে থাকে। গাছ-গাছালির ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে সে আর্তনাদ যেন এগিয়ে আসছে এই নিদ্রামগ্ন প্রাসাদের দিকে। কেউ সে কথা জানে না, কেউ আশঙ্কা করেনি। শুধুমাত্র এক বৃদ্ধ সত্যান্বেষীর মস্তিস্কে 'গ্রে-সেল'-এর তন্ত্রীতে তার রেসনেন্স মন্দ্রিত হয়ে উঠেছে। পৈশাচিক পরিকল্পনাটা উনি বুঝতে পেরেছেন। যাবতীয় এভিডেন্স সংগ্রহও করা গেছে—হত্যাকাণ্ডটা অনুষ্ঠিত হবার পূর্বেই। কিন্তু এ শত্রুদুর্গে কীভাবে সেটা বিশ্বাসযোগ্যরূপে উপস্থাপিত করবেন তাই যেন স্থির করে উঠতে পারছেন না। দেবযানী তো শত্রপক্ষের নয়; অথচ সেও ওঁকে বিশ্বাস করতে চাইল না। মেনে নিতে পারল না ওঁর যুক্তি।

ফিরে এলেন জানলা থেকে টেবিলের দিকে। বসলেন তাঁর রিপোর্টের শেষ দুটি পৃষ্ঠা টাইপ করতে। রাত্রির নৈঃশব্দ সেই রুদ্ধদ্বার কক্ষে যেন বার বার বিচূর্ণ হতে থাকে।

তাঁর টাইপের কাজ যখন শেষ হলো তার ঘন্টাখানেক আগেই ওঁর হাতঘড়ির কাঁটা দুটো ওঁকে যুক্তকরে প্রণাম করেছে। জানিয়েছে—তারিখটা পালটে গেল!

দশ

রাত তখন কত খেয়াল নেই। মনে হলো কে যেন তাঁকে ঠেলা দিচ্ছে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন বাসু। বেড-সুইচটা জেলে দিতে সমস্যাটা আলোকিত হয়ে গেল। বললেন, কী হয়েছে দেবযানী?

দেবযানীর মুখটা সাদা হয়ে গেছে। বলে, আমার ভীষণ ভয় করছে, মামু!

—ভয় করছে! ওমা, সে কী কথা? খামোকা ভয় করতে যাবে কেন?

—না, খামোকা নয়। আপনি শুনতে পাননি? একটা টিয়াপাখির মরণান্তিক আর্তনাদ?

—না শুনিনি তো। তাতে এতো ভয় পাবার কী আছে? জঙ্গলে কোনো টিয়াপাখিকে হয়তো প্যাঁচায় ধরেছে।

—না মামু! জঙ্গলে নয়! এ বাড়িতে। এই দোতলাতেই। সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ একটা টিয়াপাখির খাঁচা ছিল দেখেননি?

—তুমি কী করে জানলে যে, মরণান্তিক আর্তনাদটা সেই পোষা টিয়াপাখিটারই?

—শব্দটা যে সেদিক থেকে এল। তাছাড়া টিয়াপাখির আর্তনাদটা থেমে যাবার পরই কে যেন আমার ঘরের দরজায় দুম দুম করে ধাক্কা দিতে শুরু করল।

—ধাক্কা দিতে শুরু করল! করিডোরের দিকের ওই দরজাটায়? যেটা আমি খুলতে বারণ করেছিলাম তোমাকে?

—একজ্যাক্টলি! তাই তো আমি মাঝের দরজা খুলে এঘরে চলে এলাম। আপনাকে ঠেলে তুললাম।

—ঠিকই করেছ! দ্যাট ওয়াজ মাই ইনস্ট্রাকশন্‌স্। ওয়েল, লেট্‌স্ গো টু য়োর রুম। চল, তোমার ঘরে গিয়ে দেখা যাক কে দরজা ধাক্কাচ্ছিল। আমি এসব কিছুই জানি না। ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়েছি তো।

দেবযানীকে নিয়ে মাঝের দরজা দিয়ে ও-ঘরে পৌঁছানোর পরমুহূর্তেই বাসু-সাহেবের ঘরের দরজায় কে-যেন একই রকম দুমদাম শব্দ করতে থাকে। বাসু ঘুরে দাঁড়ালেন। দেবযানীকে বললেন, তুমি তোমার খাটের উপর বসে থাক! আগন্তুক মনে হচ্ছে তোমার ঘরের দরজা খুলতে না পেরে আমার ঘরে হানা দিয়েছে। আমি দেখছি।

উনি ফিরে এলেন নিজের ঘরে। মাঝের দরজাটা খোলাই পড়ে রইল। বাসু তাঁর ঘরের দরজাটা খুলে দেখলেন করিডোরের বাতিটা জ্বলছে। আর তাঁর দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে দুই প্রৌঢ় বাল্যবন্ধু—বসন্তবাবু ও কর্নেল। বসন্ত ঘোষের মুখ পাণ্ডুর। তাঁর পরনে একটা পায়জামা, উর্ধ্বাঙ্গে ফতুয়া। কর্নেলের পরিধানে স্লিপিং স্যুট। কর্নেল বেশ যেন ধমকের সুরে চাপা গর্জন করে ওঠেন, নাউ কাম আউট মিস্টার ব্যারিস্টার! আসুন! নিজে চোখে দেখে যান আপনার কীর্তিটা!

—আমার কীর্তিটা?

কর্নেল তর্জনী-সঙ্কেতে দেবযানীর ঘরের সামনে কী একটা দ্রষ্টব্যের দিকে ইঙ্গিত করলেন। বাসু-সাহেব সেদিকে এগিয়ে যান। নজরে পড়ে দেবযানীর রুদ্ধদ্বারের সামনে উপুড় হয়ে পড়ে আছে হেমন্ত। পরনে ঢিলা পায়জামা—সেটা রক্তে মাখামাখি—উর্ধ্বাঙ্গে হাতকাটা গেঞ্জি। ওর নিশ্বাসের গতি সামান্য দ্রুত। জ্ঞান নেই তার। ডান হাতটা মাথার উপর ছড়ানো। সে হাতে একটা রক্তাক্ত ছোরা। আর—কী বীভৎস! ওর বাঁ হাতের মুঠোয় বাড়ির পোষা টিয়াপাখিটার কর্তিত মুণ্ড। তা থেকে এখনো রক্ত ঝরছে।

কর্নেল চাপা গর্জন করে ওঠেন আবার, এ জন্যই আমি কাল সন্ধ্যারাত্রে দেবযানীকে তার বাড়িতে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। বুঝলেন স্যার? আমার আশঙ্কা ছিল : আজ রাত্রেই পাগলটা একটা কিছু কেলেঙ্কারি কাণ্ড করবে। থ্যাংক গড! দেবযানী তার দরজা খুলে দেয়নি।

বাসু চট্ করে বসে পড়লেন হেমন্তর পাশে। ওর বাঁ-হাতে থেকে টিয়াপাখির মুণ্ডুটা বার করে নিয়ে মণিবন্ধের নাড়ির গতিটা দেখতে গেলেন।

আবার গর্জে ওঠেন কর্নেল। এবার উচ্চৈঃস্বরে, প্লিজ, ডোন্ট টাচ হিম। যা করণীয় তা গৃহকর্তাকেই করতে দিন!

—ওর...ওর হাতে এত রক্ত কেন?

প্রশ্নটা করেছে দেবযানী। সে বাসু-সাহেবের নির্দেশটা মানেনি। দুরন্ত কৌতূহলে মাঝের দরজা দিয়ে এ ঘরে এসে এখন বার হয়ে এসেছে করিডোরে। দাঁড়িয়েছে সবার পিছনে।

কর্নেল আগুন-ঝরা চোখে তার দিকে একবার দৃকপাত করলেন। তারপর বসে পড়লেন হেমন্তর পাশে। খর্বকায় হলেও গরিলার মতো অসীম বলশালী তিনি। অনায়াসে পাঁজকোলা করে হিমুর মূর্ছিত দেহটা তুলে নিলেন দু'হাতে। ধীর দৃঢ় পদক্ষেপে চলে এলেন তার শোবার ঘরে। শুইয়ে দিলেন খাটে।

ওঁরা তিনজনও নিঃশব্দে অনুগমন করলেন কর্নেলকে।

ইতিমধ্যে খবরটা রটে গেছে। বটুক ও সৌদামিনী গিয়ে নিচ থেকে ডেকে এনেছে বাতাসীকে। হেমন্তর ঘরে সমবেত হলেন সবাই। হিমুর মুখে কয়েকবার জলের ঝাপটা দেবার পর তার জ্ঞান ফিরে এল। বোধকরি বোধের উন্মেষ তখনো হয়নি। সে বিহ্বল দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকিয়ে দেখল। কী হয়েছে, সে কোথায় শুয়ে আছে, যেন বুঝে নেবার চেষ্টা করছে। বাসু এগিয়ে গিয়ে ঘরের পুবদিকের জানলাটা খুলে দিলেন। সূর্যোদয়ের দেরি আছে। পুব-আকাশ ক্রমশ ফর্সা হয়ে আসছে। অমাবস্যায় আকাশভরা তারা যেন এসে মুখ লুকাচ্ছে আসন্ন দিনের আগমনীতে। একটা ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। গাছে গাছে পাখ-পাখালির কলতান তখনো শুরু হয়নি। ভুল্কো তারাটা তখনো জ্বলজ্বল করছে পূর্বদিগন্তে।

ধীরে ধীরে বোধশক্তি ফিরে এল হেমন্তের। সে একটা নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন পেশ করল রুদ্ধঘরের আবহাওয়াকে : আমি কি আবার কিছু কেলেঙ্কারি করে বসে আছি?

সবার আগে জবাব দিল বাতাসী : না-রে। সব ঠিক আছে। তুই বরং আর একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর।

হঠাৎ নিজের হাতের দিকে নজর পড়ায় হিমু প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, এ কী! আমার হাতে আবার এত রক্ত এল কোথা থেকে? এ কার...কার রক্ত?

এবারও সবার আগে বাতাসীই জবাব দিল, না, না, রক্ত কোথায়? এ তো দোয়াতের লাল-কালি। কই দেখি তোর হাত দুটো...

আঁচল দিয়ে ওর হাতের রক্তটা মুছে নেয়। বেসিনে গিয়ে আঁচলটা ভিজিয়ে এনে ঘষে ঘষে ওর রক্তাক্ত হাত দুটো পরিষ্কার করে দিল।

দেবযানী তখন ওর খাটের বাজু ধরে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ হিমু বাতাসীর কাছে জানতে চায়, দেবী...দেবী কোথায়? সে কেমন আছে? তাকেই কি আমি...

দেবযানী ওর কথাটা শেষ হতে দেয় না। সে দাঁড়িয়ে ছিল হিমুর মাথার দিকে। হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে হিমুর ভিজা হাতটা নিজের মুঠিতে তুলে নিয়ে বলে, না হিমুদা! এই তো আমি! আমার কিছু হয়নি। এই দেখ—

হিমু ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে ওর দিকে তাকায়। বোধকরি ওর দৃষ্টিতে কিছু একটা আবরণ পড়েছে। চিনে নিতে একটু দেরি হলো। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বলে, হ্যাঁরে দেবী, আমি তোর ঘরের দরজায় খুব জোরে জোরে ধাক্কা মারছিলাম। তাই না?

দেবযানী কী জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারে না।

—তুই খুব বুদ্ধিমতীর মতো কাজ করেছিস। দোর খুলে দিলেই...আচ্ছা আমার হাতে একটা ভোজালি ছিল না? সেটা কোথায় গেল...

এবারও জবাব দিল বাতাসী, না তো! ভোজালি কোথায় পাবি তুই?

হিমু তার ডান হাতটা তুলে দেখল। না, তার হাতে বাস্তবে কোনো ভোজালি নেই। এবার সে নিশ্চিন্ত হয়ে দু-চোখ বুজল।

স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল ঘরে।

কর্নেল বসন্তের দিকে ফিরে বললেন, হি নীড্‌স্ রেস্ট! ওকে এখন কিছুক্ষণ ঘুমতে দেওয়া উচিত। আপনারা বরং পাশের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করুন।

'আপনি' সম্বোধনে বোঝা গেল গৃহস্বামী তাঁর বাল্যবন্ধুর দিকে ফিরে কথাটা বললেও নির্দেশটা দিয়েছেন এ প্রাসাদের অবাঞ্ছিত অতিথিটিকেই।

বাসু বিনা বাক্যব্যয়ে এগিয়ে গেলেন দ্বারের দিকে। বসন্তবাবু তাঁর পিছু পিছু। দেবযানী ওঁদের অনুগমন করবার উপক্রম করতেই হিমু যেন তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে সেটা বুঝে ফেলল। চোখ-বোজা অবস্থাতেই বলে ওঠে, না! দেবী এ ঘরে থাকবে! তুমিও চলে যেও না দেবী।

দেবী থমকে থেমে পড়ে।

হিমু আবার বলে, আমার মাথার কাছে ব'স। আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেবে?

কর্নেলের মুখ বেজার হলো। হয়তো তিনি কিছু বলতেন, কিন্তু তার আগেই বাতাসী বলে, তুই এখানটায় বস, দেবী।

দেবযানী আদেশটা পালন করে।

হিমু বাতাসীকে বলে, আমাকে একটু জল দেবে, পিসি?

কিন্তু জলের গ্লাসটা হাতে নিয়েও সে পান করতে পারল না।

একটু জল মুখে টেনে নিল বটে, কিন্তু গিলতে পারল না। থু থু করে ফেলে দিল। উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল তারপরে। দেবযানী ধীরে ধীরে ওর চুলের মধ্যে বিলি কাটাতে থাকে।

কর্নেল একটা চুরুট ধরালেন।

বাসু বসন্তবাবুর হাত ধরে টেনে নিয়ে এলেন নিজের ঘরে।

বললেন, বসুন, স্থির হয়ে, কথা আছে।

বসন্ত বসলেন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে। বললেন, নতুন কথা আর কী শোনাবেন ব্যারিস্টার সাহেব? এ সমস্ত ভবিতব্য। আমি তো করিডোরের ওপ্রান্তে ছিলাম, কিছুই টের পাইনি। কিছুই বুঝতে পারিনি। না টিয়াপাখির মরণান্তিক আর্তনাদ, না হিমুর দোর-ধাক্কানো। আপনি শুনতে পেয়েছিলেন?

বাসু তখন তাঁর সুটকেসে ওঁর জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলতে ব্যস্ত। কথা দিয়ে রেখেছেন রাত্রি প্রভাত হলেই তিনি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন। বলেন, টিয়াপাখিটার মুণ্ডুটাই শুধু দেখলাম, তার বাকি ধড়টা কোথায়?

—সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ। বিলুই আমাকে ঘুম থেকে টেনে তুলল, তার আগেই ঘুম ভেঙে গেছিল। আমাকে টেনে নিয়ে এসে পাখিটাকে দেখাল—হিমুকেও। সে তখন উপুড় হয়ে পড়ে আছে দেবযানীর দোরের সমুখে। মা তারা রক্ষা করেছেন। দেবযানী দোর খুলে দেয়নি। দিলে যে কী হতো ভাবতেই গায়ে কাঁটা দেয়।

বাসু জবাব দিলেন না। আপন মনে স্যুটকেস গুছিয়ে চলেছেন।

বসন্তবাবুই আবার বলেন, একটা কথা কিন্তু আমার মাথায় ঢুকল না। হিমু যখন টিয়াপাখিটাকে খাঁচা থেকে বার করে গলা কাটতে গেল তখন পাখিটা ওর হাতে আঁচড়ে-কামড়ে দিল না কেন?

বাসু নিজের কাজ করতে করতেই বলেন, ওটা তাড়াহুড়োয় একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে।

—ভুল হয়ে গেছে! মানে? কার ভুল? পাখিটার?

—না, না, পাখিটার নয়। যে ওর গলাটা কেটেছে। আর ভুলটা হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। এই ক্রিটিক্যাল রাত্রে অতটা হুইস্কি খাওয়া ঠিক হয়নি।

বসন্তবাবু এবার কী বলবেন তা বুঝে উঠতে পারেন না।

বাসু নিজে থেকেই বলেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন ঘোষমশাই। হিমু অজ্ঞান হয়ে যাবার পর ওর হাতে ছোরা দিয়ে কিছু কাটা-দাগ এঁকে দেওয়া উচিত ছিল! মানে—পাখির আক্রমণের চিহ্ন। ইয়েস! এটা একটা বিশ্রী এবং মারাত্মক এভিডেন্স। হেতুটা তো আগেই বলেছি : অতিরিক্ত মদ্যপান!

বসন্ত নিজেকে গুছিয়ে এতক্ষণে বলেন, আপনার কোনো কথাই আমি বুঝতে পারছি না ব্যারিস্টার-সাহেব!

বাসু এবার এদিকে ফিরলেন। বললেন, পাখিটাকে যে হত্যা করেছে তার হাতে পরা ছিল ক্রিকেট খেলার উইকেট-কীপিং গ্লাভস। এখনি বাড়িটা যদি সার্চ করা যেত তাহলে সেটা পাওয়া যাবে। গ্লাভস্ পরে প্রথমে টিয়াপাখিটার ঘাড় মটকে দেওয়া হয়েছে। পাখিটা মরে যাবার পর তার গলাটা বিচ্ছিন্ন করে ধড়টা সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। এবার বুঝলেন?

—আজ্ঞে না! পাখিটাকে কে মেরেছে? হিমু নয়, বলতে চান?

বাসু এবার এসে ওঁর মুখোমুখি বসলেন। বলেন, আপনি মশাই তখন থেকে এক নাগাড়ে প্রশ্ন করে চলেছেন। কেন? আমি কি কাঠগোড়ায় উঠে সাক্ষী দিচ্ছি? এবার আপনি আমার একটা প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিন তো?

—কী প্রশ্ন?

—আপনি কি এতদিনেও হিমুকে তার পিতৃপরিচয়টা জানিয়ে দিতে পারেননি?

বসন্তবাবু স্থিরদৃষ্টিতে পুরো বিশ সেকেন্ড ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর কোনোক্রমে বললেন, মানে?

—আমি জানি, ঘোষমশাই। কাল রাত থেকে দেবযানীও জানে : হিমুর পিতৃপরিচয়। আমি শুধু জানতে চাইছি হিমু নিজে সেটা জানে কি না।

বসন্ত আম্‌তা-আম্‌তা করে বলেন, কী বলছেন? হিমুর বাবা কে?

বাসু বললেন, আপনি তা জানেন! তবু যদি আমাকে দিয়েই বলাতে চান তো বলি : হিমুর বাবার নাম বসন্তকুমার ঘোষ। সেটা সত্য কিনা একথা আমি জানতে চাইছি না। আমি শুধু জানতে চাই— এই দীর্ঘ সাতাশ বছরের ভিতরে আপনি সাহস করে হিমুকে সে-কথা জানাতে পারেননি! আশ্চর্য!

ধীরে ধীরে মাথাটা নিচু হয়ে গেল বসন্ত ঘোষের।

বাসু বলেন, প্রচণ্ড ভুল করেছেন। ইন ফ্যাক্ট অন্যায় করেছেন।

বসন্ত চমকে ওঠেন। এবার চোখ তুলে শুধু বলেন, অন্যায়?

—নয়? ভেবে দেখুন—এ তথ্যটা জানা থাকলে হিমু নিজেই বুঝতে পারত তার অসুখটা বংশানুক্রমিক নয়, হতে পারে না। ইট্‌স্ সায়ান্টিফিক্যালি, বাইওলজিক্যালি আবসার্ড! কারণ বসন্ত ঘোষ বা গায়ত্রী দেবীর কোনও পূর্বপুরুষ পাগল ছিলেন না। এই তথ্যটা জানা থাকলে সে সাবধান হতে পারত। আত্মরক্ষায় সচেতন হতে পারত।

এতক্ষণে ঘোষমশাই তথ্যটা স্বীকার করে নিলেন। অনুতপ্তকণ্ঠে বললেন, তা ঠিক! জানি না আপনি কেমন করে এটা আন্দাজ করলেন। আমার বিশ্বাস ছিল একমাত্র গায়ত্রী ছাড়া এ' গোপন কথাটা আর কেউ জানতে পারেনি। আশঙ্কাই করেনি।

বাসু বলেন, সেটাও আপনার হিমালয়ান্তিক ভ্রান্তি, বসন্তবাবু। কর্নেল তথ্যটা জানতেন। তেইশ বছর ধরে সেটা গোপন রেখেছেন।

—তেইশ বছর?

—গায়ত্রীর মৃত্যুদিন থেকে। সম্ভবত বাতাসীও সেটা জানে। আপনি কি বুঝতে পারেননি—সর্প-দংশনে গায়ত্রীর মৃত্যু হয়নি!

—মানে?

—বিসর্জনের দিন নির্জনতার সুযোগে হতভাগিনীকে নানাভাবে দৈহিক আর মানসিক পীড়ন করে প্রকৃত তথ্যটা জানতে পেরেছিল কর্নেল। হয়তো আপনাদের ঘনিষ্ঠতায় সন্দেহ জেগেছিল তার। হয়তো মেডিক্যাল অ্যানালিসিস্ করে সে বুঝতে পেরেছিল গায়ত্রীর গর্ভে যে ভ্রূণ সে তার সন্তান হতে পারে না। সেই বিসর্জনের দিন গায়ত্রী ভেঙে পড়ে, স্বীকার করতে বাধ্য হয়! তার আগেই অবশ্য কূটচক্রী কর্নেল যাবতীয় ব্যবস্থা করে রেখেছিল। হয়তো গায়ত্রীকে সে কিছু সিডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। তারপর ঘুমন্ত হতভাগিনীর পায়ে একটা ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশান দিয়ে দেয়। বঙ্করাজ সাপের বিষ!

—কিন্তু...মানে...সে বিষ ও কোথায় পাবে?

—টাকার বিনিময়ে। 'পাকুড়-কেস'-এ প্লেগ ইন্সটিট্যুট থেকে 'ব্যুবনিক প্লেগের', অতি দুর্লভ জীবাণু কীভাবে সংগৃহিত হয়েছিল তা জানেন না? অবশ্য এটা আমি প্রমাণ করতে পারব না। কারণ সেবার তো কর্নেল মাত্রাতিরক্ত মদ্যপান করেনি। তাই মৃত স্ত্রীর পায়ে নির্দিষ্ট দূরত্বে সে সাপের দংশন-চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল। আবার বলছি ঃ এটা নিছকই আমার অনুমান। তা আমি প্রমাণ করতে পারব না। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, কর্নেল জানে—হিমু তার বংশের কেউ নয়। আর সেজন্যেই হিমুকে সে সারাজীবন সহ্য করতে পারেনি। দূরে দূরে রেখেছে। দার্জিলিং-এ কনভেন্টে রেখে পড়িয়েছে। অথচ শরতের প্রতি তার প্রগাঢ় দুর্বলতা। তার হেতুটা নিশ্চয় আপনি জানেন! জানেন না?

বসন্ত বিহ্বলভাবে বললেন, আজ্ঞে না। জানি না। সেটা কেন?

—সহজ যুক্তি। কঙ্কালীতলা থেকে বাতাসীকে কর্নেল উদ্ধার করে আনেন, শনিবার সাতই মার্চ 1970 ; এবং শরতের জন্মতারিখ—আপনিই বলেছেন—চৌঠা এপ্রিল 1971; তাই না? অর্থাৎ ডাকাতদলের আস্তানায় যদি বাতাসী গর্ভবতী হয়ে থাকে, তাহলে ভ্রূণের গর্ভবাসকাল পাক্কা তের মাস। সেক্ষেত্রে তার উল্লেখ পাওয়া যেত 'গ্যিনেস্ বুক অব রেকর্ডস'-এ।

বসন্তবাবু অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলেন না। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, কিন্তু আমার উপর প্রতিশোধ নিয়ে ও এভাবে হিমুকে পাগল করে তুলছে? ও আসলে...কী চায়?

—বৈরিনির্যাতন! হিমুকে তিল তিল করে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করা। গায়ত্রীকে হত্যা করে বোধকরি ওর প্রতিশোধস্পৃহা তৃপ্ত হয়নি। হিমুর ধমনীতে নেই, কিন্তু ওর রক্তে আছে সেই অত্যাচারী নীলকর-সাহেবদের রক্ত! ও আপনাকে পুত্রশোক দিতে বদ্ধপরিকর। পৈশাচিক পদ্ধতিতে! আমার আশঙ্কা : তবুও ওর তৃপ্তি হবে না। এরপর সে আপনাকে পাগল করে তুলবে। গায়ত্রী স্টোর্স থেকে আপনাকে তাড়িয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করবে। খুব সম্ভবত তহবিল তছরুপের অভিযোগে! আপনি ও-বাড়ির ভাড়াটে পর্যন্ত নন। কর্নেলের এমপ্লয়ীও নন। ইনফ্যাক্ট, আপনাকে ও তাড়িয়ে দিতে চাইলে রুখে দাঁড়াবার মতো কোনো লীগ্যাল স্ট্যাটাস নেই আপনার। আমি জানি না—আন্দাজ করছি—বৃদ্ধ বয়সের কথা ভেবে আপনি হয়তো সঞ্চয়ও করেননি কিছু! ধনকুবের বাল্যবন্ধুর ফ্রেন্ড-ফিলসফার হয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন হয় তো। আয়াম সরি টু সে—আপনাকে পথের ভিখারি করে ওর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চাইছে কর্নেল! আপনাকে তাড়িয়ে ও নিজের সন্তানকেই পাঠক-প্যালেসের মালিক বানিয়ে যেত...

এই সময় বটুক এসে জানাল, সাহেব আপনাদের দু'জনকে ওঘরে ডাকছেন, আসেন।

ওঁরা দুজন চলে এলেন এ ঘরে। বাসু কিন্তু ঘরে প্রবেশ করলেন না। দ্বারের বাইরে করিডোরে দাঁড়িয়ে থাকেন।

হেমন্ত এতক্ষণে অনেকটা সুস্থ হয়েছে। সে খাট থেকে নেমে মাটিতে দাঁড়িয়েছে। দেবযানীকে সে বলছিল, আমার কিন্তু কিছুই মনে পড়ছে না। ঘুমের ঘোরে কেনই বা আমি মিঠুকে ওভাবে মারলাম, আর কেনই বা তোমার দরজায় ওই রকম অসভ্যের মতো ধাক্কালাম। অথচ ঘটনাটা ঘটেছে। আমিই করেছি। কারণ আর সবাই তা শুনেছে। তুমিও মিঠুর আর্তনাদ স্বকর্ণে শুনেছ বললে, আর...আর...মিঠুও সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ মরে পড়ে আছে!...কী বীভৎস! আমি...আমি...ঘুমের মধ্যে কেন এমন সব কাণ্ড করি...

কর্নেল এপাশ থেকে বলে ওঠেন, ওসব কথা নিয়ে এখন অহেতুক চিন্তা করিস না, হিমু। ভুলে যাবার চেষ্টা কর...

হিমু ধমকে ওঠে, ভুলে যাব কী করে ড্যাড? আমি তো অতীত নিয়ে ব্রুড করছি না। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করছি। ভেবে দেখ তো, দেবী যদি দরজাটা খুলে দিত...

কর্নেল বাধা দিয়ে বলেন, কিন্তু তা তো ঘটেনি। দেবযানী বুদ্ধিমতী। তাই দোর খুলে দেয়নি।...শোন্! তুই কি এখন একটু গরম চা খাবি অথবা এক গ্লাস গরম দুধ?

—গিলতে পারছি কই? দেখছ না আমি ঢোক গিলতে পারছি না? এ আমার কী যে হলো...

—তবু একটু চা খাবার চেষ্টা কর, সিপ দিয়ে দিয়ে।

—নো ড্যাডি, চা-টা এখন কিচ্ছু খেতে ইচ্ছে করছে না। আমার এখন একটা লম্বা ঘুমের দরকার। খুব লম্বা একটা টানা ঘুম। তুমি যাই বল ড্যাড, দেবযানী আজ রক্ষা পেয়েছে শুধুমাত্র মায়ের আশীর্বাদে। কাল সন্ধ্যাবেলায় মা-কে সে যে গানটা শুনিয়েছিল...তোমার চাবির থোকাটা একটু দাও তো। আমি নিচে গিয়ে মায়ের ছবিটায় একটা প্রণাম করে এখনি ফিরে আসব। তারপর আমি ঘুমাব। খুব লম্বা টানা একটা ঘুম।

কর্নেল বললেন, চাবি? সে তো তোর কাছে। কাল রাতে তোরা কীসব প্ল্যাঞ্চেট-ম্যাঞ্চেট করলি না রাত বারোটা পর্যন্ত? আমি তো তার অনেক আগেই...

—ও ইয়েস। চাবির থোকাটা আমার কাছেই আছে।

বালিশের তলা থেকে চাবির গোছাটা সে উঠিয়ে নিল।

কর্নেল বললেন, আর্মারির চাবিটা রিং থেকে খুলে দে। তুই তো যাবি শুধু পিকচার-গ্যালারিতে।

—না, ও চাবিটা থাক। বন্দুকগুলোয় অয়েলিং করা হয়নি অনেকদিন। মরচে ধরে যাচ্ছে—

বসন্ত ধমক দিয়ে ওঠেন, বেশ তো, সেটা কালকে করিস! আজ তোর অসুস্থ শরীরে সে কাজটা নাই করলি?

হিমু বলে, না কাকু। কাজটা সেরে আসি। কাজের মধ্যেই আমি তবু নিজের অসুখের কথাটা ভুলে থাকি।

বাতাসী বাধা দেয়, কিন্তু তুই যে এখন বললি, টানা একটা ঘুম দিতে হবে তোকে।

কোথাও কিচ্ছু নেই হঠাৎ হিমু বাতাসীকে একটা প্রণাম করল। বাতাসী অবাক হয়ে বলে এটা কি হলো?

ম্লান হাসল হিমু। বলল, জ্ঞান হবার পর থেকে তোমাকেই তো 'মা' জেনে এসেছি। গর্ভধারিণীকে প্রণাম করতে যাচ্ছি। তোমাকেও না-হয় একটা করে গেলাম।

দেবযানী আকুলভাবে বলল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব হিমুদা?

হিমু জবাব দেবার আগেই কর্নেল বলে ওঠেন, না! ওকে একটু একলা থাকতে দাও, দেবযানী। নিজের মনের সঙ্গে ও একটা বোঝাপড়া করতে চাইছে। না হলে আমিই ওর সঙ্গে যেতাম।

হিমু সামলে নিল। সকলের উপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে ধীর পদক্ষেপে সে ঘর ছেড়ে বার হয়ে গেল।

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে গেলেন জানলার দিকে। পুবের জানলা। দু-হাতে জানলার দুটি রড ধরে সবে ফর্সা-হয়ে ওঠা পুব-আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েকটা নিস্পন্দ মুহূর্ত।

বাতাসী ওপাশ থেকে বলে ওঠে, ওর মন-মেজাজ ভাল নেই, এখন ওর হাতে বন্দুক-ঘরের চাবিটা দেওয়া কি ঠিক হল?

কর্নেল এ-পাশ ফিরলেন না। দূর দিগন্তের দিকে দৃষ্টিমেলা অবস্থাতেই বললেন, শুনলে না, ও বলল কাজের মধ্যেই ও নিজের অসুখের কথাটা ভুলে থাকে।

বসন্তবাবু উঠে দাঁড়িয়েছেন। বলেন, তা তো বুঝলাম, কিন্তু ওর বর্তমান মানসিক অবস্থায় বন্দুক নিয়ে নাড়াচড়া করাটা কি ঠিক?

দেবযানী এতক্ষণে বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। হঠাৎ উঠে বসে। আর্ত কণ্ঠস্বরে বসন্তবাবুকে বলে, আপনি ওকে রুখে দিন কাকু! ও...ও নিশ্চয় কিছু একটা ভালমন্দ করতে যাচ্ছে।

কর্নেল এতক্ষণে এ-পাশে ফিরলেন। হঠাৎ চমকে ওঠেন তিনি। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে আপনমনেই বলে ওঠেন, বাট...বাট...হোয়্যার্স দ্যাট হামবাগ অব এ ব্যারিস্টার?

না, বাসু-সাহেব ত্রি-সীমানার মধ্যে তখন নেই।

এগারো

চিত্রশালার দরজাটা এখন হাট করে খোলা। হেমন্ত বোধকরি তার শেষ সিদ্ধান্তে আসার পর ইতিপূর্বেই মায়ের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে জীবনের অন্তিম প্রণামটা সেরে নিয়েছে। ধীর কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে সে চলে এসেছে পাশের সংগ্রহশালায়। অস্ত্রাগারে।

দারোয়ানরা এখন কেউ নেই। কাল রাত্রে মালিককে চাবি বুঝিয়ে দিয়ে যে-যার আউট-হাউস কোয়ার্টার্সে ফিরে গেছে। বাইরে বাগানের দূরপ্রান্তে অবশ্য বন্দুকধারী প্রহরী পাহারায় আছে। সেখানে অতন্দ্র প্রহরায় তিন-সিফ্‌টে নিরাপত্তার ব্যবস্থা।

অস্ত্রাগারের তালা খুলে হিমু ঘরে ঢুকল। ঘরের ভিতরটা তখনো অন্ধকার। সুইচ টিপে আলো জ্বালল। সারি-সারি বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল, রিভলভার। বেছে বেছে ওর প্রিয় ডাবল্-ব্যারেল রাইফেলটা টেনে নিল। ভাঁজ করে চেম্বারে একজোড়া টোটা ভরতে যাবে, হঠাৎ কে পিছন থেকে ওর কাঁধে হাত রাখল।

হিমু ঘুরে দাঁড়ায়। স্পষ্টতই বিরক্ত হয়। অমন একটা চরম সিদ্ধান্তের পর ও জাতীয় বাধায় কে না বিরক্ত হবে? ঝাঁঝালো-স্বরে উষ্মা প্রকাশ করে বলে, আহ্! এখানেও এসেছেন আপনি?

শান্ত কণ্ঠে বাসু বললেন, রাইফেলটা আমার হাতে দাও। পাগলামি কর না।

একেবারে ক্ষেপে ওঠে হিমু : পাগলামি! পাগলামি! শুনতে শুনতে আমার কান পচে

গেছে। হ্যাঁ, আমি পাগলামি করি, করব! আপনি জানেন না : কেন আমি পাগলামি করি? এ তো আপনাদের সেই পরমকরুণাময়টির অহৈতুকী আশীর্বাদ। তিনি তো আমাদের নাগালের বাইরে। তাই নয়?

বাসু দৃঢ়মুষ্টিতে রাইফেলটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিলেন। বললেন, তোমার কথাটা অর্ধসত্য, হেমন্ত। শেষ বক্তব্যটা বাদে। যিনি তোমাকে পাগল করে তুলেছেন তিনি আদৌ তোমার-আমার নাগালের বাইরে নন, হিমু! টেক ইট ফ্রম মি, হেমন্ত : তুমি পাগল নও! বংশানুক্রমিক ব্যাধিতে তুমি পাগল হয়ে যাচ্ছ না, যাবে না। যেতে পার না! দ্যাটস্ আ বায়োলজিক্যাল অ্যাবসার্ডিটি! দিস্ ইজ দ্য ট্রুথ!

—কিন্তু সাময়িক ভাবে আমি যে পাগল হয়ে যাই, পাগলামি করি—দ্যাটস্ অলসো ইজ ট্রু!

—মানছি! কিন্তু তার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। যুক্তিনির্ভর—

—কী যুক্তি? বলুন, কেন আমি মিঠুকে ওভাবে মারলাম?

—তুমি মেরেছ? কিন্তু টিয়াপাখি প্রাণীটাকে কি তুমি চেন না? খাঁচার ভিতর হাত ঢুকিয়ে কেউ যদি একটা জ্যান্ত টিয়াপাখিকে বার করে আনে, তার গলায় কোপ মারতে যায়, তাহলে পাখিটা তাকে বাধা দেবে না? আত্মরক্ষার চেষ্ট করবে না? আঁচড়ে-কামড়ে তাকে রক্তাক্ত করে তুলবে না? ঠোঁটের জোরে টিয়াপাখি আখরোটের খোলা ভেঙে যায়, এ-কথা কি তুমি জান না? ও-ভাবে খালি হাতে তুমি একটা টিয়াপাখিকে মারতে পার, নিজে সম্পূর্ণ অক্ষত থেকে।

হিমু থমকে যায়। তার হাত দুটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। বলে, এর মানে?

—একটাই মানে হয়। তুমি মিঠুকে ওভাবে হত্যা করনি।

—তাহলে? কে হত্যা করেছে? আর কী করে করল? কারও হাত তো ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়নি?

এ-পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল, কে মেরেছে আমরা জানি না, কিন্তু তার হাতে পর ছিল ক্রিকেট খেলার উইকেট-কীপারের গ্লাভস্। বাড়িটা সার্চ করলে এখনি তা খুঁজে পাওয়া যাবে।

হিমু চোখ তুলে দেখে বক্তা : বসন্তকাকু।

নিঃশব্দে প্রবেশ পথের সামনে এতক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছেন বসন্তবাবু, বাতাসী, দেবযানী আর সবার পিছনে—চিরকাল যিনি সামনের সারিতে থাকেন : কর্নেল পাঠক।

বাসু হিমুর হাতটা বজ্রমুষ্টিতে ধরে বললেন, এখন এসব কথা থাক, হিমু। চল তুমি, নিজের ঘরে চল। তুমি মেন্টালি টায়ার্ড। এখন তোমার একটা লম্বা ঘুমের দরকার। অবশ্য যে অর্থে তুমি তখন বলছিলে, সে অর্থে নয়।

প্রায় জোর করেই হাত ধরে ওকে অস্ত্রাগারের বাইরে নিয়ে এলেন। সদলবলে সকলে এগিয়ে যায় সিঁড়ির দিকে। হঠাৎ থমকে থেমে পড়েন বাসু। পিছন ফিরে বলেন, আপনি আসবেন না কর্নেল। অস্ত্রাগারের তালাটা বন্ধ করা হয়নি। আগে ওটা বন্ধ করে আসুন।

কর্নেল জবাব দিলেন না। পিছন ফিরে একবার দেখে নিলেন—হ্যাঁ, অস্ত্রাগারের কোল্যাপসিব্‌ল গেটটা তালাবন্ধ নয়। তালার গায়ে চাবির থোকাটা ঝুলছে।

কর্নেল জবাব দেন না। কৌতূহলী দৃষ্টিতে বাসুর দিকে একবার তাকিয়ে দেখেন।

বাসু পকেট থেকে একটা মুখবন্ধ ম্যানিলা খাম বার করে ওঁর দিকে বাড়িয়ে ধরেন। বলেন, আমার সেই প্রতিশ্রুত রিপোর্টখানা। সব সমস্যার যুক্তিপূর্ণ সমাধান। এটা এখানেই বসে পড়ে নিন। পড়া শেষ হলে আর্মারিতে তালা দিয়ে বরং বৈঠকখানায় চলে আসুন। আমরা সেখানেই

আপনার জন্য প্রতীক্ষা করব। ফর সাব্‌সিকোয়েন্ট লীগ্যাল অ্যাকশন্‌স্। সেগুলো আপনার পরামর্শ অনুসারেই করা হবে।

কর্নেল সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেলে বলেন, কী বিষয়ে লীগ্যাল পরামর্শ?

—সেটা আমার ওই রিপোর্টখানা পড়লেই বুঝতে পারবেন।

কর্নেল কী-একটা কথা বলতে গিয়েও বললেন না। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেন অস্ত্রাগারের দিকে। এঁরা গেলেন বিপরীত দিকে। প্রথমেই দ্বিতলে উঠলেন না। সবাই এসে বসলেন বৈঠকখানায়। হিমুকে শুইয়ে দিলেন একটা 'সেটি'তে। বটুক চায়ের ট্রে হাতে এল ঘরে। দেবযানী প্রথম কাপটা বাড়িয়ে ধরল হেমন্তর দিকে। বাসুকে এক কাপ চা দেবার উপক্রম করতেই তিনি বলে ওঠেন, সরি দেবী! আমি আমার প্রতিশ্রুতি ভাঙতে পারি না।

—প্রতিশ্রুতি? কিসের প্রতিশ্রুতি!

—তোমার মনে নেই? কাল সন্ধ্যারাতে আমি কর্নেলকে কথা দিয়েছিলাম, সকালের 'বেড-টী' সার্ভ করার আগেই আমি পাঠক-প্যালেস ছেড়ে চলে যাব।

বসন্তবাবু বলেন, হেতুটা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু পদ্ধতিটা কী ছিল?

বাসু-সাহেব অপেক্ষা করলেন বটুকের প্রস্থান পর্যন্ত। তারপর বটুক চলে যেতেই দেবযানীকে বললেন, দরজাটা বন্ধ করে দাও দেবযানী। তোমাদের কিছু গোপন এবং জরুরী কথা বলার আছে।

দেবযানী দরজাটা বন্ধ করতে গেল। বাসু টেলিফোনটা তুলে নিয়ে একটা লোকাল নম্বর ডায়াল করলেন। ও-প্রান্তে সাড়া জাগতেই বলেন, গুড মর্নিং ডাক্তারসাহেব। বাসু বলছি, পাঠক-প্যালেস থেকে। এখানে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছে। আপনার একবার আসার দরকার। ...হ্যাঁ, এখনি। জরুরী প্রয়োজন।...কী? হ্যাঁ, মেডিক্যাল ব্যাগটা সঙ্গে করেই আনবেন। আর সেই সঙ্গে কাঁকুড়গাছির ফোরেনসিক রিপোর্টখানা।...হ্যাঁ আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কলকাতা ফিরে যাচ্ছি।...থ্যাংকস্!

টেলিফোনটা ক্র্যাডেলে নামিয়ে রাখতেই বসন্ত বলেন, আপনি কী যেন জরুরী আর গোপন কথা বলবেন বলছিলেন?

বাসু বলেন, হ্যাঁ, বলছি। আমি এখনি কলকাতায় ফিরে যাব। যে-কাজ করতে এসেছিলাম তা সুসম্পন্ন হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস : হেমন্ত এবার রাজি হয়ে যাবে দেবযানীকে বিবাহ করতে...না না। তোমরা এখনি কোন কথা বল না। আমার গোটা বক্তব্যটা আগে শোন। প্রথম কথা : হেমন্ত কোনো বংশানুক্রমিক ব্যাধিতে ভুগছে না, ভুগতে পারে না। সেটা সায়েন্টিফিক্যালি অ্যাবসার্ড। তবে হ্যাঁ, সে একটা মানসিক ব্যাধিতে ভুগছে—ইন ফ্যাক্ট তাকে ঔষুধ প্রয়োগে ওই ব্যাধিতে ভুগতে বাধ্য করা হচ্ছে। আপনারা কেউ জানেন না—হিমু জানে, দেবযানীও জানে—কর্নেল কিছুদিন আগে হেমন্তকে নিয়ে কলকাতায় যান। গোপনে একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে দিয়ে তাকে পরীক্ষাও করান। কিন্তু ডাক্তারবাবুর প্রেসক্রাইব করা ওষুধ কর্নেল ওকে খাওয়াননি। প্রথম কেনা ওষুধগুলোর একটা ট্যাবলেটও খরচ হয়নি। সবই ওঁর ওষুধের ক্যাবিনেট-বক্সে অস্পর্শিত পড়ে আছে। ডাক্তারবাবু হিমুকে একদিন-অন্তর একটা ইনট্রাভেনাস ইনজেকশানও দিতে বলেন। কর্নেল তা দেননি। তার পরিবর্তে হিমুর দেহে ইনজেক্ট করে গেছেন বেলেডোনার মাদার-টিঞ্চার। এসবের তর্কাতীত প্রমাণ আমার কাছে আছে। বেলেডোনার ওভার-ডোজ হলে রোগীর ওই সব লক্ষণ দেখা যায়। মুখটা 'ফ্লাস' হয়ে যায়, লালচে দেখায়। সে ডবল্-ইমেজ দেখে, তার ঢোক গিলতে কষ্ট হয়, সে জলপান করতে পারে না। মাঝে মাঝে তার চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকার হয়ে যায়।

বসন্ত বাধা দিয়ে বলেন, আর ওই 'সোমনামবোলিজম্'? মানে ঘুমের মধ্যে হাঁটা?

—না, হিমুর সে রোগলক্ষণ আদৌ দেখা দেয়নি। কলিমুদ্দিনের পাঁঠার গলা যে কেটেছে, মুর্গিগুলোকে যে মেরেছে সেই ষড়যন্ত্রকারীই আজ ভোররাত্রে টিয়াপাখিটাকে মেরেছে। বারে বারে হিমুর হাতে বা জামা-কাপড়ে রক্ত মাখিয়েছে।

বসন্ত আবার বলে ওঠেন, কিন্তু আমি শুনেছি কলিমুদ্দিনের পাঁঠাকে যে ছোরা দিয়ে মারা হয়েছে তাতে হিমুর ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে—

—কারেক্ট! কিন্তু শুনেছেন কার কাছে? সেই ব্যক্তিই তো ষড়যন্ত্রটা পাকাচ্ছে। সেই তো রক্তমাখা ছোরায় ঘুমন্ত অবস্থায় ওর ফিঙ্গারপ্রিন্ট তুলে নিয়ে এক্সপার্টকে পরীক্ষা করতে পাঠিয়েছিল!

হিমু হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসে। বিহ্বলের মতো বলে, বাট হোয়াই? কেন? ড্যাডি কেন এভাবে আমাকে পাগল করে তুলবে? কী তার স্বার্থ?

—যাতে সহ্যের শেষ সীমান্তে পৌঁছে তুমি নিজে-হাতে নিজেই—

—কিন্তু সেটাই বা কেন? দিস্ ইজ্ প্রিপসটারাস্। আটার্লি অ্যাবসার্ড! আমাকে মেরে ফেলার কী উদ্দেশ্য?

বাসু বললেন, বিশ্বাস কর হিমু, আমি যা বলছি—তা সত্য, পূর্ণ সত্য! হেতুটা কী তা সময়মতো তোমাকে বুঝিয়ে দেবেন তোমার বসন্তকাকু। তাঁকে আমি সেকথা বলেছি।

হিমু তার বসন্তকাকুকে বলে, সত্যি কথা কাকু? আপনি জানেন?

বসন্ত মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে বললেন, জানি! তোমাকে পরে আমি বুঝিয়ে বলব।

বাসু বলেন, তুমিও কারণটা আন্দাজ করতে পেরেছ। তুমিও তা জান, না বাতাসী?

বাতাসী জবাব দিতে পারল না। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সে কাঁদতে থাকে।

বাসু বলেন, তোমার অসহায় অবস্থাটা আমি বুঝতে পারি, বাতাসী! কী করবে তুমি? তিনকুলে তোমার তো কেউ নেই—

বাতাসী মুখ থেকে আঁচলটা সরিয়ে দেয়। বলে, না, দাদা। এতদিন ছিল না। এখন আমার একটা আশ্রয় হয়েছে। আমি এ নরককুণ্ডে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। মাসখানেকের ভিতরেই আমি শরতের কাছে চলে যাব। কলকাতায়।

—কিন্তু শরত কি তার নিজের কথাটা জানে? তুমি কি সেটা তাকে বলেছ?

থমকে গেল বাতাসী।

বিহ্বল হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। তবে সে খুব বুদ্ধিমতী। বুঝে নিল যে, বাসু-সাহেব তার গোপনতম কথাটাও জেনে ফেলেছেন। কেমন করে জেনেছেন তা ও জানে না। তাই, বললে, না, দাদা, জানে না। এবার জানবে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই অস্ত্রাগারের দিক থেকে শোনা গেল প্রচণ্ড একটা ফায়ারিং-এর শব্দ!

লাফ দিয়ে উঠে পড়ে সবাই, হুড়মুড়িয়ে সেদিকে ছুটতে থাকে।

একমাত্র ব্যতিক্রম বৃদ্ধ ব্যারিস্টারটি। তাঁর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। এই শব্দটার প্রতীক্ষাতেই ছিলেন তিনি। ধীরে-সুস্থে পকেট থেকে পাইপ আর পাউচটা বার করে পাইপে তামাক ঠেশতে থাকেন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই কলকণ্ঠে জেগে উঠল গাছ-গাছালিতে পাখপাখালি। কিন্তু সেটা কি রাইফেলের আকস্মিক মৃত্যু-সংকেতে?

না কি পূর্ব-দিগন্তে নূতন সূর্যের আগমন বন্দনায়?

boiRboi.net

ইস্কাপন-বিবির কাঁটা

রচনাকাল :
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি 2001
প্রচ্ছদশিল্পী : বিজন কর্মকার
উৎসর্গ : শ্রীমতী পাপড়ি কুণ্ডু ও
শ্রীবাসব নারায়ণ কুণ্ডু

তিন দিন টানা বৃষ্টিতে কলকাতা ভেসে যাবার উপক্রম। আজও মনে হচ্ছে বৃষ্টিটা থামবে না। বাড়ি ছেড়ে কেউ বের হতে পারবে না। আজও ভোর রাত থেকে ক্রমাগত বৃষ্টি হয়ে চলেছে। বাসু-সাহেবের প্রাতর্ভ্রমণ তাই আজ বন্ধ। বিশে বাজার যেতে পারেনি। গেলেও লাভ ছিল না কিছু। বাজার বসেইনি। ফুট্‌কি তাই আজ খিচুড়ির আয়োজন করেছে। আলুভাজা, পাঁপরভাজা আর অমলেট।

ওঁদের প্রাতরাশ সদ্য সমাপ্ত। কাগজগুলোও নাড়াচাড়া করা শেষ হয়েছে। রানুদেবী আসন্ন শীতের জন্য এখনি একটা প্রস্তুতি নিয়েছেন। তাঁর হাতে নিটিং-কাঁটা। নাতনির জন্য একটা উলের সোয়েটার বুনে চলেছেন। বাসু-সাহেবের হাতে একটা ইংরেজি থ্রিলার। কৌশিক কাগজে খেলার পাতাটা শেষ করে বলে ওঠে, এমন বর্ষার দিনে একটা জমাটি গল্প শোনান মামু। রাখুন তো আপনার বইটা।

বাসু একটা পেজ-মার্ক দিয়ে বইটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। বলেন, কিসের গল্প এমন বর্ষার দিনে জমবে তা আগে বল? প্রেমের না ভূতের?

সুজাতা বলে, না না। ও দুটোর একটাও নয়। আপনার কোনো পুরানো কেস হিস্ট্রি। অনেক-অনেক দিন আগেকার একটা সত্য ঘটনা। যা এই বৃষ্টিভেজা দিনে স্মৃতির উজানপথে আপনাকে একবারে প্র্যাকটিসের প্রথম যুগে নিয়ে যাবে। আমরাও সেই হারিয়ে যাওয়া অতীতটা আস্বাদন করতে পারব। এমন একটা 'কেস' যা আমাদের অজানা। আর আপনার নিজস্ব স্টাইলে হঠাৎ গল্প থামিয়ে একসময় বলে বসবেন :বল এবার, কে— কেন খুনটা করেছে?

কৌশিক বলে ওঠে, আমার একটা সাজেশান আছে। মানে, সুজাতার প্রস্তাবটার একটা সামান্য মডিফিকেশন।

বাসু জানতে চান, সেটা কী জাতীয়?

—হাইকোর্ট পাড়ায় একটা গুজব চালু আছে শুনেছি যে, আপনি কখনো কোনো খুনের মামলায় হারেননি। এ কথাটা কি সত্যি?

বাসুর হাত পকেটে চলে গেল—তামাক-পাউচের খোঁজে। পাউচ থেকে তামাক বার করতে করতে বললেন, না, সত্যি নয়। একটি মাত্র কেসের কথা মনে পড়ছে যেখানে আমার টেক্‌নিকাল ডিফীট হয়নি, মর‍্যাল ডিফীট হয়েছিল।

কৌশিক বলে, অত প্যাঁচালো ভাষা বুঝি না। সোজা কথায় বলুন, আপনি যে আসামীটার কেস নিয়ে লড়েছিলেন সে আদৌ 'গিল্‌টি' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল কি? ফাঁসির দড়ি থেকেই ঝুলুক অথবা জেল-জরিমানা?

—না, তা অবশ্য মনে পড়ে না। আমি এ পর্যন্ত যেসব মক্কেলের কেস নিয়ে লড়েছি—আই মীন খুনের মামলায়, তারা কেউই সাজা পায়নি। সবাই বেকসুর খালাস হয়েছিল।

—তাহলে আপনার মর‍্যাল ডিফীট হলো কী করে?

—সেটাই তো বোঝাতে চাইছিলাম। তুমি রাজি হলে না। বললে, তুমি নাকি প্যাঁচালো-ভাষা বোঝ না!

সুজাতা আগ বাড়িয়ে বলে, ও-কেসটা আমাদের জানা! আপনি একদিন বলেছিলেন সবিস্তারে।

বাসু-সাহেব একটু অবাক হয়ে বলেন, আমি বলেছিলাম? কই মনে পড়ছে না তো?

—হ্যাঁ, একেবারে প্রথম দিনই।

—প্রথম দিন! মানে? কিসের প্রথম দিন?

—আপনার সঙ্গে আমার পরিচয়ের। মনে পড়ছে?

বাসু পাঁচ-সেকেন্ড চোখ বুঁজে স্মৃতিচারণ করলেন। তারপর বলে ওঠেন, ও ইয়েস! এতক্ষণে মনে পড়েছে। বিপুলের ড্রইংরুমে। সেই তোমরা বসে রিহার্সাল দিচ্ছিলে—

কৌশিক বলে, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না নিশ্চয়। আমার আদৌ সে কেসটা মনে পড়ছে না। আমাকে অন্তত শোনান। মামীও নিশ্চয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

রানু এতক্ষণে আলোচনায় যোগ দেন। বলেন, না, আমি সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলাম না ঠিকই, তবে কেসটা আমার জানা। তোমাদের মামা কেস জিতে এমন মনমরা কখনো হয়নি। আর তোমারও তো তা অজানা থাকার কথা নয়, কৌশিক। সে-ঘটনার কথা তো তুমি তোমার কাঁটা-সিরিজের 'ট্রায়াল' বলে লিখেওছো—*নাগচম্পায়*।

কৌশিক বলে, এটা হতেই পারে না। লিখলে আমার নিশ্চয় মনে থাকত। বিপুলবাবুর বৈঠকখানায় যখন রিহার্সাল চলছে, আমি তখন বাইরে বসেছিলাম। আমি তো তখন সুজাতার ড্রাইভার। সুতরাং আমি কেসটা শুনিনি। লিখিওনি।

রানু বলেন, তখন শোননি, পরে নিশ্চয় শুনেছিলে। কারণ *নাগচম্পা* যখন সিনেমা হয় তখন আমি তা দেখেছিলাম। কী নাম হয়েছিল মনে নেই।

সুজাতা বলে, আমার মনে আছে। রূপালী পর্দায় *নাগচম্পা হয়ে যায় যদি জানতেম*।

—হ্যাঁ, যদি জানতেম। আমার স্পষ্ট মনে আছে ঘটনাটা।

কৌশিক বলে, তাহলে সেটা আমার লেখা নয়, যিনি স্‌ক্রিপ্ট লিখেছেন তিনি ঢুকিয়েছেন।

মোট কথা সে কেস-হিস্ট্রিটা আমার মনে নেই। বলুন, মামু, কেস জিতেও কেন আপনি মনমরা হয়ে পড়লেন?

বাসু বললেন, বিস্তারিত বলব না। কারণ তোমার পাঠক-পাঠিকার স্মরণক্ষমতা তোমার স্মৃতিশক্তির চেয়ে বেশি। তাই সংক্ষেপে বলছি :

একবার এক সদ্যবিধবা তাঁর ভাই এবং পুত্রবধূকে সঙ্গে করে আমার চেম্বারে এসে হাজির। বিরাট জামিদারের বিধবা। স্বামী খুন হয়েছেন সপ্তাহ-খানেক আগে। তখনো শ্রাদ্ধশান্তি মেটেনি! আর পুলিসে অশৌচ অবস্থায় ধরে নিয়ে গেছে তাঁর একমাত্র পুত্রকেই—বাপ্‌কে খুন করার চার্জে। মৃত ভদ্রলোকের একটি বন্দুকের লাইসেন্স ছিল। তাতেই গুলিবিদ্ধ হয়েছেন তিনি। ঘটনাচক্রে ওঁর ছেলেটি জড়িয়ে পড়েছে। কারণ বৃদ্ধ খুন হয়েছিলেন দ্বিতলে তাঁর শয়নকক্ষে। বাড়িতে তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূ ছাড়া ছিল কিছু চাকর-বাকর শ্রেণীর লোক। রাত তখন এগারোটা। বন্দুকের শব্দ শুনে সবাই দ্বিতলে ছুটে আসে। সে সময় ঘরে পিতাপুত্র ছাড়া আর কেউ ছিল বলে প্রমাণ করা যাচ্ছে না। ঠাকুর-চাকরেরা তাদের জবানবন্দিতে স্বীকার করেছে যে, কর্তাবাবুর সঙ্গে ছোটকর্তার কী নিয়ে যেন কথা-কাটাকাটি হচ্ছিল। বিধবার বক্তব্য : তাঁর পুত্র এমন কাজ করতেই পারে না। করার কোনও হেতুও সত্যই নেই। ওঁদের একমাত্র পুত্রটিই তাঁর মৃত স্বামীর ওয়ারিশ। সে কেন বাপকে খুন করবে?

কৌশিক জানতে চায়, আসামীর কী বক্তব্য? তার কোনো অ্যালেবাঈ ছিল?

—না, ছিল না। সে স্বীকার করেছিল যে, দুর্ঘটনার সময় সে ঘরের ভিতর ছিল। কিন্তু তার জবানবন্দি অনুসারে সে তার বাবার ঘরে ঢোকার আগেই কেউ একজন অচেনা লোক তাঁর শয়নকক্ষে উপস্থিত ছিল। ও নিজে ঘরে ঢোকার আগেই লোকটা আলমারির পিছনে আত্মগোপন করে। ও কথাও সে স্বীকার করেছে যে, বাপের সঙ্গে তার একটা কথা-কাটাকাটি হয়েছিল। মনোমালিন্যের হেতুটা কী, তা সে সবিস্তারে জানিয়েছিল। ইন ফ্যাক্ট, মৃতের স্ত্রী এবং পুত্রবধূর জবানবন্দি থেকেও তথ্যটা প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাপারটা সামান্য : ছেলেটি সস্ত্রীক দেশ দেখার অছিলায় বিলাত বেড়াতে যেতে চাইছিল—তার বাবা তাতে রাজি হচ্ছিলেন না। ওদের অর্থের অভাব নেই। জমিদারের একমাত্র পুত্র যদি সস্ত্রীক বিদেশভ্রমণে কয়েক লক্ষ টাকা ওড়ায় তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু জমিদারমশাই এই অহৈতুকী অর্থব্যয়ে স্বীকৃত হচ্ছিলেন না। হঠাৎ আলমারির ওপাশ থেকে কেউ ফায়ার করে। বৃদ্ধ বুকে গুলির আঘাত খেয়ে লুটিয়ে পড়েন। ছেলে বাপের দিকেই ছুটে আসে। কিন্তু সে টের পায় আলমারির ওপাশ থেকে আত্মগোপনকারী আততায়ী বন্দুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাথরুমের দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে যায়। লোকটাকে সে দেখেছে। মাঝবয়সী একজন পুরুষ। খেটো ধুতি পরা, গায়ে তার কালো আলোয়ান জড়ানো ছিল। যেহেতু পিছন থেকে দেখেছে, তাই তার দৈহিক বর্ণনা সে প্রায় কিছুই দিতে পারেনি। লোকটার পিছনে ধাওয়া না করে সে বাপের দিকে এগিয়ে আসে।

কৌশিক জানতে চায়, আর কেউ তাকে দেখেনি?

—দেখেছে। বাড়ির দারোয়ান। রাত এগারোটার সময় সে বাগানের গেটে বল্লম হাতে পাহারা দিচ্ছিল। জমিদারমশায়ের শোবার ঘর থেকে বন্দুকের শব্দ শুনে সে ছুটে আসে। সদর দরজা খোলাই ছিল। সিঁড়ি দিয়ে সে উপরে উঠে আসে। বড়কর্তার ঘরে ঢুকে দেখে গৃহস্বামী গুলিবিদ্ধ অবস্থায় চিৎ হয়ে পড়ে আছেন। মেজের অনেকটা অংশ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ছোট-সাহেব ঝুঁকে পড়ে বড়কর্তার নাড়িটা দেখছেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সে কাউকে দেখতে পায়নি। বাড়ির আর সবাই তখন একতলায়। দারোয়ানের চিৎকারে সবাই হুড়মুড়িয়ে দ্বিতলে উঠে আসে। দারোয়ানের লক্ষ্য হয় যে, সাহেবের বাথরুমের দরজাটা খোলা। সে চট করে সে

ঘরে ঢুকে দেখে যে, বাথরুমের পিছন দিকে যে ম্যাথর-খাটার স্পাইরাল সিঁড়িটা আছে—সেটা বেয়ে একজন বেগানা লোক খুব তাড়াতাড়ি নেমে পালাচ্ছে। দারোয়ান চিৎকার করে ওঠে, 'রুখ যাও!' লোকটা শোনে না। স্পাইরাল সিঁড়ি বেয়ে সে নিচে নামতে থাকে। লোকটার মুখ সে দেখতে পায়নি; কিন্তু তার পরনে ছিল ধুতি, গায়ে কালো চাদর জড়ানো। দারোয়ান ছুটে চলে আসে ঘরের ভিতরে। বন্দুকটা তুলে নেয়। আবার স্নানঘরে ফিরে এসে পিছনের দরজা দিয়ে দেখে লোকটা ততক্ষণে বাগানটা পার হয়ে গেছে। বাগানের পিছন দিকের পাঁচিল টপকাচ্ছে। বন্দুকটা ছিল ডবল্-ব্যারেল থ্রি-নট-থ্রি—শিকারের বন্দুক। তাতে দ্বিতীয় একটা টোটা ভরাই ছিল। দারোয়ান তৎক্ষণাৎ ফায়ার করে। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়। খুনীটা পাঁচিল টপকিয়ে ওদিকের রাস্তায় লাফিয়ে নামে। এই হলো মোটামুটি কেস। তা বিধবার সনির্বন্ধ অনুরোধে আমি কেসটা নিয়েছিলাম। হাজতে গিয়ে আসামীর সঙ্গে দেখা করি। সে ওই একই কথা বলে যায়। তার মা যে-কথা বলেছিল। প্রসিকিউশান জমিদারপুত্রকে অ্যারেস্ট করেছিল বটে কিন্তু হত্যার কোনো মোটিভ দেখাতে পারেনি।

কৌশিক আবার প্রশ্ন করে, দ্বিতীয়বার ফায়ারিঙের শব্দ বাড়ির অন্য কেউ শুনেছিল?

-হ্যাঁ. সদ্যবিধবা এবং পুত্রবধূ দুজনেই তাঁদের সাক্ষ্যে সেকথা স্বীকার করেন। শুধু তাই নয়, বিধবা তাঁর এজাহারে বলেন যে, তিনি যখন একতলা থেকে উঠে এসে ঘরে ঢুকছেন. তখন দেখতে পান দারোয়ান মোহন থাপা বন্দুকটা উঁচিয়ে নিয়ে বাথরুমের দিকে ছুটে যাচ্ছে। তখনো তিনি জানেন না, ঘরের ভিতরে কী কাণ্ড হয়েছে। হঠাৎ দেখতে পেয়ে, তিনি তাঁর মৃতস্বামীর দিকেই ছুটে আসেন—কিন্তু বাথরুমের ভিতর দ্বিতীয়বার একটা ফায়ারিঙের শব্দ তিনি স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলেন। আসামীর স্ত্রী অকুস্থলে পৌঁছেছিল আরও মিনিট খানেক পরে। সে নিচে রান্নাঘর থেকে প্রথমবারের ফায়ারিঙের শব্দ শোনে। দারোয়ানের চিৎকারও শোনে। শাশুড়িকে ছুটে দোতলায় উঠতে দেখে। তারপর কোনো কিছু বুঝতে না পেরে সেও ছুটে যায়। সে যখন সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং-এ তখন দ্বিতীয়বার একটা ফায়ারিঙের শব্দ শোনে। অথচ বাড়ির ঠাকুর-চাকর এবং ঝি ঠিকমতো বলতে পারেনি যে, তারা পর পর দুটো ফায়ারিঙের শব্দ শুনেছে।...পুলিস এসে পৌঁছায় ঘণ্টাখানেক পরে। জমিদারমশাই তার অনেক আগেই মারা গেছেন। পুলিস সকলের জবানবন্দি নেয়। পুলিশী তদন্তে দেখা যায়—বন্দুকে শুধু দারোয়ানের ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে, আসামীর নেই। দ্বিতীয় কোনও আঙুলের ছাপ—অর্থাৎ আততায়ীর ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যায়নি। তবে দারোয়ান-নির্দিষ্ট স্থানে পাঁচিলে একটা গুলি আবিষ্কৃত হয়। নিঃসন্দেহে সেটা ওই বন্দুক থেকে নিক্ষিপ্ত বুলেট!

কৌশিক আবার জানতে চায়, পুলিশ অন্য কোনও সম্ভাব্য খুনীকে চিহ্নিত করতে পারেনি?

—না। তবে জমিদারমশাই ছিলেন অত্যাচারী। অনেকের ভিটে-মাটি উচ্ছেদ করেছেন তাঁর অসংখ্য শত্রু ছিল। পাশের জমিদারের সঙ্গে জমিজমা সংক্রান্ত তাঁর একটা বিরাট মামলা বহুদিন ধরেই চলছিল। লোয়ার কোর্টে হেরে সে মামলা তখন হাইকোর্টে। ওই প্রতিবেশী জমিদারটি ধোয়া তুলসীপাতা ছিলেন না। তাঁর কুকীর্তিও পর্বতপ্রমাণ। কিন্তু তিনি কোনো প্রফেশনাল মার্ডারারকে নিযুক্ত করেছেন এমন তথ্যও প্রমাণ করা যায়নি। নিহত জমিদারমশাই-এর চরিত্র ভালো ছিল না, একথা আগেই বলেছি। তাঁর একটি বাগানবাড়ি ছিল। তাতে একজন রক্ষিতাও থাকত। মাঝে মাঝে জমিদারমশাই সেই বাগানবাড়িতে রাত কাটাতে যেতেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় প্রচুর মদ্যপানও করতেন। বাড়িতে এবং বাগানবাড়িতে। বেশ কিছু সন্দেহজনক চরিত্রের ইয়ারলোস্তও ছিল তাঁর।

—শেষ পর্যন্ত আসামী বেকসুর খালাস হয়ে গেল?

—তা গেল।

—তাহলে আপনার 'মর্যাল-ডিফীট'টা হলো কীভাবে?

—কেস ডিস্‌মিস্ হবার পরে। মামলা-জিতে, ছেলেটি এক হাঁড়ি মিষ্টি নিয়ে আমার ফী মেটাতে এল। কিন্তু আমার নায্য ফী-টা আমি নিতে পারলাম না, কৌশিক!

—কেন?

—আনন্দের উচ্ছ্বাসে সে আমার কাছে রুদ্ধদ্বার কক্ষে আদ্যোপান্ত স্বীকার করে বসল : খুনটা সে নিজে হাতেই করেছে। বাপকে! দারোয়ান মোহন থাপাকে সে মোটা বক্‌শিশ দিয়ে মিথ্যে সাক্ষী দিতে বাধ্য করেছিল। ওর মা এবং স্ত্রীও সজ্ঞানে আদালতে দাঁড়িয়ে মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে গেছেন!

—কিন্তু কেন? হত্যার উদ্দেশ্যটা কী?

—ওর বাবা মত্তাবস্থায় পুত্রবধূর শ্লীলতাহানি করেছিলেন। ওর মায়ের সামনেই। সেই ব্যাপারেই বাপের সঙ্গে একটা ফয়শালা করতে গিয়েছিল সে। উত্তেজনার মুহূর্তে সে বন্দুকটা তুলে নিয়ে নিজের হাতে বাপকে গুলি করে!

মিনিট-খানেক কেউ কথা বলতে পারে না। বাসুই বলেন, আমি তিন-চার দিন এমন অশান্তির ভিতর কাটিয়েছি যে, বলার নয়। আসামী আমার ক্লায়েন্ট। সে আমার কাছে যে স্বীকারোক্তি করেছে তা 'প্রিভিলেজড্-কম্যুনিকেশান'। যদিও সেটা আমি জানতে পারি কেস জিতে যাবার পরে। শেষ পর্যন্ত আমি আমার সিনিয়ারের কাছে সবটা খুলে বলি—

—আপনার 'সিনিয়ার' মানে ব্যারিস্টার এ. কে. রে?

—হ্যাঁ, তখনো তিনি রিটায়ার করেননি। তাঁর কাছে পরামর্শ চাই—এখন আমার কী করা উচিত। তিনি সংক্ষেপে বলেছিলেন, নাথিং। হোয়াট কান্ট বি কিওর্ড মাস্ট বি এন্ডিয়োর্ড!

রানী বলেন, মনে আছে আমার, সে দিনগুলোর কথা। তোমাদের মামুর প্রায় সাতদিন লেগেছিল ধাক্কাটা সামলে উঠতে।

সুজাতা বলে, এত বিস্তারিত নয়, তবে এ গল্পটা আপনি সেদিন বলেছিলেন—সেই আমাদের রিহার্সালের ঘরে। সেটা তুমি *নাগচম্পায়* লিখেও ছিলে, কৌশিক।

কৌশিক দৃঢ় প্রতিবাদ করে, হতেই পারে না! বই খুলে দেখাও।

সুজাতা বলে, তা সে যাই হোক। এটা আমাদের জানা গল্প। আর তাছাড়া আমি তো এ জাতীয় কেস শুনতে চাইনি। আমি শুনতে চাইছিলাম—আপনার জীবনে এমন কোনো কেস হয়েছে কি না, যেখানে আপনি জ্ঞাতসারে প্রকৃত অপরাধীকে পালিয়ে যাবার সুযোগ দিয়েছেন। খুনীকে চিহ্নিত করেও পুলিশে জানাননি।

—এ কেসটা তো তাই।

—না! টেক্‌নিক্যালি নয়। এ কেসে আপনি অপরাধীকে শনাক্ত করেছেন মামলা শেষ হয়ে যাবার পর। সে বেকসুর খালাস হয়ে যাবার পরে। দ্বিতীয়ত এ-কেসটা তো আপনি নিজে ডিটেক্ট করেননি। কেস মিটে যাবার পর আসামী আপনাকে নিজেই জানিয়েছিল। আমি জানতে চাই, এমন কেস কি কখনো হয়েছে যে, মামলা মিটে যাবার আগেই আপনি খুনীকে শনাক্ত করেছেন, অথচ তাকে ধরিয়ে দেননি।

—না! সেটা এথিক্যালি সম্ভবপর নয়। অ্যাজ অ্যান অফিসার অব দ্য হাইকোর্ট সেটা আমি পারি না।

রানী বলেন, এথিক্স-টেথিক্স বুঝি না; কিন্তু এমন কাণ্ড তুমি একাধিকবার করেছ।

—একাধিকবার? কী বলছ রানু?

রানু নিটিং-কাঁটা তাঁর কোলে নামিয়ে রাখেন। বলেন, একটু আগে তুমিই বলেছিলে না যে, কাঁটা-সিরিজের পাঠক-পাঠিকার স্মৃতিশক্তি কৌশিকের চেয়ে বেশি। তা আমি বাপু ওই পাঠক-পাঠিকার দলে। আমি অনেক কিছু পারি না। তার মধ্যে একটা হচ্ছে : অতীতকে ভুলতেও পারি না। তুমি রবিকে অপরাধী জেনেও পুলিশে ধরিয়ে দাওনি। মনে পড়ে?

—রবি? কোন রবি?

—*ঘড়ির কাঁটার* রবি। লটারি-জেতা ইন্সপেক্টার রবি। যে-কেসের শেষে তুমি বলেছিলে, "কারণ রবি জানে যে, আমি জানি যে, রবি জানে যে, আমি জানি।" কী স্যার? মনে পড়েছে?

বাসু লজ্জা পেয়ে বলেন, ওটা একটা একসেপ্‌শান!

কৌশিক বলে, কিন্তু মামী যে বললেন, একাধিক কেস?

রানী বলেন, হ্যাঁ। আরও একটা কেস-এর কথা আমার মনে আছে। সেটা অনেক-অনেকদিন আগেকার কথা। ইন ফ্যাক্ট তখনো আমাদের বিয়েই হয়নি। কেসটা সে হিসেবে আমার কাছে 'হেয়ার-সে'। তোমাদের মামার কাছেই শোনা। এমনি এক বাদলা দিনে।

বাসু অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, নো, আই ডোন্ট রিমেম্বার!

—বাট আই ডু!—নিটিং-এর কাঁটা দুটো তুলে নিয়ে বললেন রানু।

—কোন কেস? একটু ক্লু দাও?

—সেই ইস্কাপনের বিবির নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া?

আস্তে আস্তে যেন বিস্মৃতির একটা যবনিকা সরে গেল ওঁর চোখের সামনে থেকে। হেসে বললেন, আ-ইয়েস! নাউ আই রিমেম্বার! *ইস্কাপনের বিবির কাঁটা*!

সুজাতা, কৌশিক দুজনে একযোগে আক্রমণ করে বসে, তাহলে সেই গল্পটাই বলুন, মামু!

বাসুর পাইপটা নিভে গিয়েছিল। আবার সেটা ধরিয়ে নেন।

এদিকে বৃষ্টিটাও ঝেঁপে নামল আবার।

দুই

সেটা সম্ভবত প্রাক-স্বাধীনতা যুগের কথা। না, ভুল হলো—ভারত তখন সদ্য স্বাধীন। মহাত্মাজি যেবার শহিদ হয়ে যান! বাসু সবে ফিরে এসেছেন বিলেত থেকে। ব্যারিস্টারি পাশ করে। রে-সাহেবের জুনিয়ার হিসাবে সবে কাজ শুরু করেছেন। রানী দেবীর সঙ্গে তখনো তাঁর আলাপই হয়নি।

রে-সাহেবের চেম্বারটা ছিল ধর্মতলায়। তিনি সে-আমলে কলকাতা 'বার'-এর সবচেয়ে পশার-ওয়ালা ক্রিমিনাল-সাইড ব্যারিস্টার। রে-সাহেবের চেম্বারে চারখানি ঘর। গর্ভগৃহে রে-সাহেবের চেম্বার। তার সংলগ্ন ল-লাইব্রেরি। সামনের দিকে ল-অফিস। চার-পাঁচজন জুনিয়ার সেখানে কাজ করেন। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছেন ওই তরুণ বয়স্ক ব্যারিস্টার : প্রসন্নকুমার। একপাশে স্টেনো-টাইপিস্ট ক্রমাগত টাইপ করে চলে। ডাক পড়লে ভিতরে যায় ডিক্টেশন নিতে। একেবারে সামনের দিকে 'রিসেপশন রুম' বা প্রতীক্ষাগার। মক্কেলরা সেখানে অপেক্ষা করে। একে একে তাদের ডাক পড়ে ভিতরে।

রে-সাহেব কেস-হিস্ট্রি শোনেন। মক্কেলের ভিড় দেখলে কখনো বা জুনিয়ারদের মধ্যে মক্কেলদের বন্টন করে দেন। তারাই জবানবন্দি নেয়। সুবিধামতো রে-সাহেবের কাছে খাতাপত্র দাখিল করে।

একদিন সকালে রে-সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এলেন একজন সুদর্শন যুবাপুরুষ।দেখলেই বোঝা যায় সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। পরনে থ্রি-পিস্ গ্রে রঙের স্যুট। বয়স আন্দাজ ত্রিশ-বত্রিশ। টকটকে ফর্সা গায়ের রঙ। মাথার চুল ব্যাকব্রাশ করা। গোঁফদাড়ি কামানো।

মুহুরিবাবুকে একটা আইভরি-ফিনিশড ভিজিটিং কার্ড দিয়ে বললেন, তিনি ব্যারিস্টার-সাহেবের সাক্ষাৎপ্রার্থী। মুহুরিবাবু তাঁকে বসিয়ে রেখে ভিতরে খবর দিতে গেল। একটু পরেই রে-সাহেবের খাস-বেয়ারা এসে তাঁকে ভিতরে ডেকে নিয়ে যায়। প্রসন্নকুমার দেখলেন, ভদ্রলোক খুবই বিচলিত। তাঁর হাতে একটা পোর্টম্যান্টো ব্যাগ।

একটু পরেই রে-সাহেবের পিয়ন এসে ওঁকে ডেকে নিয়ে গেল। উনি ভিতরে যেতেই রে-সাহেব বললেন, বস। এঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এঁর নাম মিস্টার সুরেশচন্দ্র চৌধুরী। ইনি একটা মার্ডার-কেস-এ তামাকে এনগেজ করতে চান।

কথা বলতে বলতে রে-সাহেব সেই আইভরি-ফিনিশ ভিজিটিং কার্ডখানা বাড়িয়ে ধরেন বাসু-সাহেবের দিকে। বাসু একনজর দেখে নিয়ে সেটা টেবিলে নামিয়ে রেখে দিলেন।

রে-সাহেব তাঁর চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, মিস্টার চৌধুরী, এ আমার জুনিয়ার, পি. কে. বাসু বার-অ্যাট-ল। নাউ স্টার্ট টকিং। বলুন কেস-হিস্ট্রিটা।

সুরেশচন্দ্র নড়ে-চড়ে বসলেন। ইতস্তত করে বললেন, স্যার, কেসটা আমার তরফে নিতান্ত কনফিডেন্‌শিয়াল। আমি শুধু আপনাকেই তা জানাতে এসেছি।

রে-সাহেব তাঁর পাইপটা ধরাতে-ধরাতে বললেন, আপনার এ প্রশ্নের জবাব তো আগেই দিয়েছি, মিস্টার চৌধুরী। ইনি আমার জুনিয়ার, আমার অ্যাসিস্টেন্ট। আমাকে যা বলবেন, তা আমি ওকে বলতে বাধ্য হব। আমার হয়ে সে নিজেই কেসটার প্রাথমিক তদন্ত করবে। আমাকে যা বলবেন, তা ওর সামনেই বলতে হবে।

তবু আগন্তুক নীরব হয়ে নখ খুঁটতে থাকেন।

রে-সাহেব ওঁর ভিজিটিং কার্ডটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেন, আমাকে এনগেজ করলে আমার শর্তেই তা করতে হবে। আপনার তাতে আপত্তি থাকলে, আয়াম সরি। অন্য কোনো লীগ্যাল অ্যাডভাইসারের সন্ধানে আপনাকে উদ্যোগী হতে হবে।

সুরেশচন্দ্র মনস্থির করে বললেন, না স্যার। পারলে আপনিই আমাকে বাঁচাতে পারবেন। বেশ, আমি আপনাদের দুজনের সামনেই সব কথা খুলে বলব। কিন্তু কথা দিন, আমার সব কথা শোনার পর যদি আপনি কেসটা না নেন, তাহলে আমার এসব কথা গোপন থাকবে?

রে-সাহেব একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, আপনার বোধহয় ইতিপূর্বে কোনো ল-ইয়ারের সঙ্গে কারবার করার দুর্ভাগ্য হয়নি। তাই নয়?

—আজ্ঞে।

—আপনি যে-কথা বললেন তা তো রুডিমেন্টারি লীগ্যাল এথিক্স। আপনার কেস আমি নিই বা নিই, কেস-হিস্ট্রি যদি আমি শুনি তবে সেটা সম্পূর্ণ গোপন থাকবে। এ বিষয়ে নতুন করে প্রতিশ্রুতি দেবার কী আছে? আইদার স্টেট যোর কেস অর কুইট!

রে-সাহেবের ছিল এই রকম কাটা-কাটা কথা। শুনলে প্রথমে মনে হতো ভদ্রলোক খুব রূঢ়। বাস্তবে তিনি ফালতু কথা একদম বরদাস্ত করতেন না। ক্ষুরধার বুদ্ধির মাটির-মানুষ তিনি।

সুরেশচন্দ্র বোধহয় সেটা প্রণিধান করলেন। তাঁর কেসটা সবিস্তারে বলতে শুরু করেন : খুন হয়েছেন একজন প্রৌঢ় জমিদার : জনার্দন জানা। বর্ধমানের জমিদার। হত্যাকাণ্ডটা

ঘটেছে দিন-দুয়েক আগে। জনার্দনের নিজের বাগানবাড়িতে। সন্ধারাত্রে। ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়েছেন শশিমুখী দেবী নামে এক ভদ্রমহিলা,—যাঁর তরফে সুরেশচন্দ্র রে-সাহেবকে অগ্রিম-রিটেইন করতে চান।

রে-সাহেব বিবৃতিতে বাধা দিয়ে বলেন, ওই শশিমুখী দেবীটি আপনার কে হন?

সুরেশচন্দ্র একটু রাঙিয়ে উঠে বললেন, আজ্ঞে না, আমার কেউ হন না। জাস্ট পরিচিত...

—অ! তাহলে তাঁর তরফে হঠাৎ এভাবে পড়ি-তো-মরি করে আমার কাছে ছুটে এসেছেন কেন?

—বাঃ! একটি অসহায় যুবতী—

—যুবতী? অবিবাহিতা?

—আজ্ঞে।

—বয়স কত হবে? ষোলো থেকে আঠারো?

—আজ্ঞে না। আমার চেয়ে বছর-পাঁচেকের ছোট হতে পারে। তার একজ্যাক্ট বয়সটা আমার জানা নেই। আন্দাজে বলছি।

—আপনার একজ্যাক্ট বয়সও আমার জানা নেই। আন্দাজে বলছি, বছর ত্রিশেক? আন্দাজটা মোটামুটি সঠিক হলে শশিমুখীর বয়স বর্তমানে পঁচিশ! কেমন?

—তাই হবে মনে হয়।

রে-সাহেব সোজা হয়ে বসলেন। বলেন, দেখুন মশাই। ঝেড়ে কাশতে যে অসমর্থ তার 'কেস' আমি নিই না। আপনি মনস্থির করুন : আমাকেই রিটেইন করতে চান তো?

—না হলে এই বিপদে এভাবে আপনার কাছে ছুটে আসব কেন?

—আরে মশাই, সেটাই তো আমার জিজ্ঞাস্য! যেভাবে আপনি আমার কাছে ছুটে এসেছেন তা থেকে ডিডিয়ুস করছি যে, শশিমুখী দেবী একটি সুন্দরী মহিলা, আপনি তাকে ভালোবাসেন এবং সে রাজি হলে তাকে বিবাহ করতেও সম্মত। তা সে-কথা যদি আমার কাছে খোলাখুলি স্বীকার করতে না পারেন তা হলে আমি কীভাবে কেসটা হাতে নিই?

সুরেশচন্দ্র অধোবদন হলেন। আবার দু-একটি মুহূর্ত চিন্তা করে নিয়ে বললেন, আমি কি সেসব কথা অস্বীকার করেছি?

—করেননি। কিন্তু আপনি তো 'উইটেহস্ ফর দ্য প্রসিকিউশন' নন যে, ক্রমাগত আপনার পেটে খোঁচা মেরে মেরে আমাকে প্রকৃত তথ্যটা জেনে নিতে হবে। তা বেশ, ওই শশিমুখীর সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ? সে কি আপনার 'প্রপোজাল' অ্যাকসেপ্ট করছে না? না করলে কেন করছে না? আপত্তিটা কার? শশিমুখী না তার অভিভাবকের?

আবার বিহ্বল হয়ে সুরেশচন্দ্র বলে ওঠেন, মার্ডার কেসের সঙ্গে এসব প্রশ্ন কি রেলিভেন্ট?

রে-সাহেব স্পষ্টই বিরক্ত। বললেন, কিছু মনে করবেন না সুরেশবাবু। আপনি কাইন্ডলি আমার এই তরুণ বয়স্ক শাগরেদটির সঙ্গে পাশের লাইব্রেরিরুমে চলে যান। আমি লোকটা বড়ই অধৈর্য। এভাবে খোঁচা মেরে মেরে ক্লায়েন্টের বক্তব্য শোনা আমার ধাতে নেই। তার চেয়ে এই ভালো। ও আপনার কাছে কেস-হিস্ট্রিটা প্রথমে শুনবে। তারপর ওর মুখ থেকে আমি বরং সেটা শুনে নেব। যথেষ্ট আকর্ষণীয় মনে হলে কেসটা আমি নেব, শশিমুখীকে বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা করব। সে-ক্ষেত্রে আমি আপনার রিটেইনার গ্রহণ করব, তবে শশিমুখীর তরফে।

সুরেশ বলেন, সে তো একই কথা।

—আজ্ঞে না। মোটেই এক কথা নয়। আমি টাকাটা নিচ্ছি আপনার কাছে

থেকে—শশিমুখীর তরফে। অর্থাৎ আমার ক্লায়েন্ট হবে শশিমুখী, আপনি নন। বুঝেছেন? আর সবটা ইতিহাস শুনে যদি আমার মনে হয় শশিমুখীই বাস্তবে অপরাধী, অথবা যদি মনে হয় কেসটা যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং নয়, তাহলে আপনার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করব না। সেক্ষেত্রে হান্ড্রেড নয়, টু-হান্ড্রেড-পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে রাখছি যে, আপনার প্রেমকাহিনী এই চার-দেয়ালের বাইরে যাবে না। অ্যাম আই ক্লিয়ার?

সুরেশচন্দ্র বলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি তাতেই রাজি। আমি শশির তরফে আপনাকে এম্‌প্লয় করব।

—অর্থাৎ কেসটা যদি আপনার বিরুদ্ধে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমি শশিমুখীকেই রক্ষা করব। আপনাকে নয়, কেমন তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! আমি ওই খুন-জখমের ধারে-কাছে নেই!

—ভেরি গুড! এবার তাহলে ওর সঙ্গে পাশের ঘরে চলে যান। প্রসন্ন তুমি ওঁকে লাইব্রেরি-রুমে নিয়ে যাও। চা-টা খাওয়াও। কেস-হিস্ট্রিটা বিস্তারিত শোন। কাল সকালে না-হয় আমাকে সবটা জানিও।

বাসু অবাক হয়ে বলে ওঠেন, কাল সকালে, স্যার?

—আমার তাই অনুমান। একটা দিন আর একটা রাত তোমার কেটে যাবে মিস্টার চৌধুরীর পেটে ক্রমাগত বোমা মেরে গোটা কেসটা উদ্ধার করতে। তুমি তো জানই, ক্লায়েন্টের বিষয়ে সব কথা না জেনে আমি কোনো কেস হাতে নিই না! সো প্লিজ এক্সকিউজ মি, মিস্টার চৌধুরী। আপনি পাশের ঘরে গিয়ে ওঁকে জবানবন্দিটা দিয়ে ফেলুন। আমি বরং দেখি, নেক্সট ক্লায়েন্ট কে আছে—

তিন

সুরেশচন্দ্র নিজে না হলেও তাঁর পিতৃদেব আচার্য জগদানন্দ চৌধুরী একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। আদি ব্রাহ্মসমাজের একজন একনিষ্ঠ নেতা। তাঁর পিতামহ ছিলেন ইংরেজ আমলের একজন নামী স্টিভাডোর। জাহাজের ব্যবসায়ে অগাধ সম্পত্তি সঞ্চয় করে যান। সে সম্পত্তির পরিমাণ এত বেশি যে, তাঁর অধস্তন তিন পুরুষ ঘোড়ার খুরে-খুরে অথবা 'ম'-কারান্ত মালের বেসাতি করে তা শেষ করতে পারতেন না। জগদানন্দের পিতৃদেব সে চেষ্টা করেওছিলেন। অশ্বখুরে এবং মকারান্ত অন্যান্য দ্রব্যের নিত্য ব্যবহারে অল্পবয়সেই লিভারটি পচিয়ে ফেলেন। তাঁর বিধবা স্ত্রী—জগদানন্দের জননী কিন্তু ছিলেন অদ্ভুত দৃঢ়চেতা মহিলা। ব্রাহ্মসমাজের আলোকপ্রাপ্তা। সে আমলের বেথুনে-পড়া গ্র্যাজুয়েট। অকালবৈধব্যে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েননি। দুই পক্ষপুটে একমাত্র সন্তানটিকে ব্রাহ্মসমাজের কঠোরতার মধ্যে মানুষ করে তোলেন। জগদানন্দ ইতিহাস এবং দর্শনে দু'-দুবার ফার্স্ট-ক্লাস পেয়ে এম.এ পাশ করেন। স্যার আশুতোষের স্নেহধন্য হয়ে পড়েন। প্রথম জীবনে অধ্যাপনা করতেন। শেষ জীবনে কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে ওঠেন। তাঁরও একটিমাত্র সন্তান, ওই সুরেশচন্দ্র। সে কিন্তু পিতামহের রক্তের প্রভাবেই পড়ে যায়। উচ্ছন্নে যায়নি অবশ্য: কিন্তু পড়াশুনায় তার মন ছিল না। কোনোক্রমে পাস-কোর্সে বি.এ. ডিগ্রিটা নিয়ে সে ব্যবসার দিকে ঝুঁকল। জগদানন্দের ঘোরতর আপত্তি ছিল। ব্যবসায়ি-বৃত্তিটার জন্য নয়, তার প্রকারভেদে। সুরেশচন্দ্র ছায়াছবির জগতে নাক গলালেন।

সে আমলে নিউ-থিয়েটার্স-এর দারুণ রমরমা। প্রমথেশ, সাইগল তখন বাজার গরম করে

আছেন। সঙ্গীতজগতে এইচ. এম. ভি একচ্ছত্র অধিপতি। সেখানেও পঙ্কজ মল্লিক, সাইগল, লালচাঁদ বড়াল, কানাকেষ্টর কদর। সুরেশচন্দ্র অবশ্য অভিনেতা বা সঙ্গীতকেশরী হতে চাননি। চেয়েছিলেন প্রডিউসার হতে। পরিচালনাও নয়। প্রযোজনা।

জগদানন্দের ঘোরতর আপত্তি ধোপে টিকল না। তার মূল হেতু: জগদানন্দের জননী তাঁর একমাত্র নাতিটির জন্য একগোছা কোম্পানির কাগজ রেখে সাধনোচিত ধামে প্রয়াতা হয়েছিলেন। সুরেশ তারই জোরে নামল সিনেমার ব্যবসায়।

পিতাপুত্রে মতান্তর হলো। ক্রমে মনান্তর। সুরেশচন্দ্র টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়ায় একটা বাসাবাড়ি ভাড়া করে উঠে এসেছিলেন। জগদানন্দ তাঁকে ত্যাজ্যপত্র করেননি স্ত্রীর মুখ চেয়ে—কিন্তু সেদিন থেকে তাঁর একমাত্র পুত্রটির আর মুখদর্শনও করতেন না।

এ-হেন সুরেশচন্দ্র একদিন পঙ্কের মাঝখানে আবিষ্কার করে বসলেন একটি শতদল পদ্ম : শশিমুখী!

সে তখন এক বাইজির হেপাজতে কন্যার মতো পালিত হচ্ছিল। বাগবাজারে এক ধনীবন্ধুর বাড়িতে গানের জলসায় চারচক্ষুর প্রথম মিলন। সে আজ আট বছর আগেকার কথা। শশিমুখী তখন সপ্তদশী। সুরেশচন্দ্রের বয়স বাইশ। কলেজ থেকে সদ্য-পাশ। তখনো সে ব্যবসায় নামেনি। শশিমুখীর গান শুনে একেবারে বাওরা হয়ে গেল সুরেশ। তার যাতায়াত শুরু হলো বাইজির আস্তানায়। একান্ত নিষ্ঠায় কী না হয়? ক্রমে একদিন আলাপ হলো মেয়েটির সঙ্গে। ঘনিষ্ঠ আলাপ নয়। বাইজি এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক।

মাস ছয়েকের ঘোরাঘুরি করার পর সুরেশচন্দ্র বাইজির কাছে প্রস্তাব রাখল : সে শশিমুখীর একটি লঙ-প্লেইং রেকর্ড বানাতে চায়। এইচ. এম. ভি. থেকেই। যাবতীয় খরচ-খরচা সে মিটাবে। বাইজি কস্তুরীবাঈ প্রৌঢ়া। লক্ষ্ণৌ ঘরানার। তবে এখন কলকাতারই পাকাপাকি বাসিন্দা। অনেক ঘাটে জল খেয়েছে সে। বড়লোকের বাড়ির এইসব কাপ্তেনবাবুদের চিনতে তার বাকি নেই। বছর ঘুরে গেল কস্তুরীবাঈয়ের বিশ্বাস উৎপাদন করতে। বাইজি সম্‌ঝে নিল—বাবুটির কোনো বেলেল্লাপনা নেই, কোনো কুমতলবও নেই। সত্যিই সে ওর পালিতা কন্যার কিছু গান রেকর্ড করতে চায়। শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেল বাইজি।

ওরা দুজনেই যে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, এটা অভিজ্ঞ বাইজির নজর এড়ায়নি, কিন্তু সে বুঝে উঠতে পারেনি যে, বাবুজি তার পালিতা কন্যাকে বিবাহ করতে উদ্‌গ্রীব! রক্ষিতা হিসাবে পুষতে নয়। বাইজিবাড়ি বিবাহ করা সে যুগে ছিল প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

শশিমুখীর রেকর্ড বার হলো। কিন্তু বাজারে কাটল না। খালি-গলায় তার স্বর যতটা সুমিষ্ট লাগে, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাকে বন্দী করলে সে মিষ্টতা আর থাকে না। কী আশ্চর্যের কথা! সে আমলে আঙুরবালা, কাননদেবীকে ছাপিয়ে শশিমুখী বাজার দখল করতে পারল না।

ইতিমধ্যে পিতাপুত্রে বিচ্ছেদ হয়েছে। সুরেশচন্দ্র বাসাবাড়ি ভাড়া করে টালিগঞ্জে উঠে এসেছে।

এভাবেই কেটে গেল কয়েকটা বছর। সুরেশ সিনেমাপাড়ায় ঘোরাঘুরি করে। অনেক শিল্পী, ক্যামেরাম্যান, টেকনিশিয়ানের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। দোস্তি হয়েছে। কিন্তু জুতসই একটা ফিল্ম বানাবার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারছিল না। অর্থের অভাবে নয়। কাহিনীও সে চয়ন করেছে। কিন্তু জুতসই একটি নায়িকা যোগাড় করতে পারছে না। কাননবালা, চন্দ্রমুখী আর উমাশশী পুরোপুরি নিউ থিয়েটার্সের কব্জায়। সুরেশ নতুন মুখ খুঁজছিল। এই সময়ে ওর বন্ধু বিশু প্রামাণিক একদিন বুদ্ধি যোগাল। বললে, শশিমুখীকে দিয়ে হয় না?

সুরেশ চমকে ওঠে। বলে, শশী? কিন্তু তার গান তো ভালো রেকর্ডিং হলো না?

—গান নিয়ে কি ধুয়ে খাবি, সুরেশ? চন্দ্রমুখী কি গান গায়? আমি তো সিনেমায় অভিনয়ের কথা বলছি। ছবিতে গান থাকলে কাউকে দিয়ে প্লেব্যাকও করানো যাবে।

—কিন্তু ক্যামেরাতেও যদি ওর ছবি ভালো না আসে? রেকর্ডিং যন্ত্রের মতো?

—আরে বাবা, চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর মুখটা ফটোজিনিক। হাতে-পাঁজি-মঙ্গলবার। তুই চেষ্টা করে দেখ্ না একবার।

বিশু প্রামাণিক ক্যামেরাম্যান। তার নিজস্ব একটা ছোট ষোলো-এম. এম ক্যামেরাও আছে। কথাটা মনে ধরল সুরেশের। প্রস্তাবটা সে প্রথমে তুলল শশীর কাছে। শশী দারুণ উৎসাহিত হলো, কিন্তু তার আশঙ্কা হলো : দিদি হয়তো রাজি হবে না।

দিদি বলতে কস্তুরীবাঈ—বাঈজি—যার কাছে ও মানুষ।

সুরেশ বন্ধুবর বিশ্বনাথের বয়ানটাই শুনিয়ে দিল শশীকে, আরে বাপু, চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

চেষ্টা করা হলো। কস্তুরীবাঈ রাজি হলো না। বললে, নেহি বাবুজি! ম্যায়নে শুনি হ্যয়, পিক্চারলাইন বহুত খতরনাখ্।

সুরেশ সকাল-সন্ধ্যে কস্তুরীকে তোয়াজ করতে থাকে : আজকাল ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েরাও সিনেমায় নামছে। তাদের প্রচুর উপার্জন। তাদের গ্ল্যামারও ঈর্ষার যোগ্য। শশিমুখীর ছবি যদি একবার 'হিট' করে যায়, তাহলে তার আর চিন্তার কিছু থাকবে না। বাকি জীবনের মতো হিল্লে হয়ে যাবে।

শেষমেশ রাজি হয়ে গেল বাইজি। সুরেশ বললে, তাহলে আমার বন্ধু বিশু প্রামাণিককে নিয়ে আসব। প্রথমে পাঁচ-সাতটা ফটো তুলতে হবে, ফটো দেখে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলতে পারবেন সিনেমায় শশীর মুখখানা কেমন দেখাবে।

কস্তুরী আপত্তি করল না; কিন্তু আপত্তি করল বিশু। বলে, অনেক সময় ফটো দেখে ঠিক বোঝা যায় না রে। ফটো দেখে তুই ওকে হযতো নায়িকার পার্ট দিলি, তারপর সেলুলয়েডে দেখা গেল মুখের সে মাধুর্য আর নেই। কিন্তু ততদিনে তোর তো বেশ কয়েক হাজার টাকা গলে গেছে। এ ধাষ্টামো করিস না, সুরো।

সুরেশ প্রতিবাদ করে, ধাষ্টামো মানে? তুইই তো প্রথম প্রস্তাবটা তুলেছিলে। বলেছিলি, ফটো দেখে বোঝা যাবে ওর চেহারা 'ফটোজিনিক' কি না।

বিশু বলে, তুই আমার কথাটা বুঝতে পারছিস না। শোন, আমার তো একটা ছোট সিক্সটিন এম. এম ক্যামেরা আছে। তুই শশীমুখীকে আউট-ডোরে নিয়ে আয়। আমি বিশ-পঞ্চাশ ফুট 'মুভি' তুলি। সামনে থেকে, পাশ থেকে, বসে, দাঁড়িয়ে, চলন্ত অবস্থায়। তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে ওর ফিল্ম উৎরাবে কি না। সেই ফিল্ম দেখিয়ে তোর পার্টনারকে কনভিন্স করা সহজ হবে।

সুরেশ রাজি হলো। ইতিমধ্যে সে আর এক ধনীর দুলালকে তাতিয়ে একটা যৌথ-প্রযোজনার ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

এবার বিশুকে নিয়ে সুরেশ এল কস্তুরীর কাছে। সব কথা খুলে বলল। শশীও তার দিদিকে খুব পীড়াপীড়ি শুরু করল। কস্তুরী বলে, ঠিক হ্যায়। আপনারা ছাদে গিয়ে পিকটার তুলুন।

বিশু বলে, ছাদে সুবিধা হবে না। আশেপাশের বাড়ি থেকে ডিসটার্ব করবে। এত ঘিঞ্জি এলাকায় ওসব হয় না। আমরা ডায়মন্ডহারবারে গিয়ে ছবি তুলব। সকালে যাব, সন্ধ্যায় ফিরে আসব।

কস্তুরী জানতে চায়, কিসে যাবেন?

—সুরেশের একটা মরিস্ মাইনার গাড়ি আছে। তাতেই যাব আমরা তিনজনে। সুরেশ আর আমি, আমরা দুজনেই ড্রাইভ করতে জানি। একটি দিনের তো মামলা, সকালে যাব, সন্ধ্যায় ফিরে আসব।

—গ্যাসবাতি জ্বলে ওঠার আগেই তো?

—গ্যাসবাতি? ও হ্যাঁ, রাস্তায় বাতি জ্বলে ওঠার আগেই।

—ঠিক আছে। কিন্তু তিনজনে নয়, আপনারা চারজন যাবেন। রুক্মিনীকেও আমি সঙ্গে পাঠাব। সে বেচারিও তো বাড়ির বাইরে যাবার সুযোগ পায় না। যাক, একটু হাওয়া খেয়ে আসুক।

সুরেশ বুঝতে পারে ভিতরের কথাটা। রুকমিনীর জন্য বাইজির প্রাণ কাঁদছে না। সে শশিমুখীকে একলা-একলা ওদের দুজনের সঙ্গে পাঠাতে সাহস পাচ্ছে না। রুক্মিনী মধ্যবয়সী, যদিও দেখলে মনে হয় তরুণী। সে সঙ্গে থাকলে বাইজি কিছু ভরসা পায়। দুজন পুরুষের সঙ্গে একা শশীকে পাঠানো ঠিক নয়।

পরের সপ্তাহেই ওরা চারজন রওনা হলো ক্যামেরা নিয়ে। ডায়মন্ডহারবারের দূরত্ব বেশি নয়। মাইল পঞ্চাশ। তবে সেখানে দোকানপাট কী আছে জানা নেই। তাই বড় টিফিনক্যারিয়ারে পরোটা-গোস্-সবজি আর মিঠাই দিয়ে দিল কস্তুরী।

মুক্ত-প্রকৃতির একটা আলাদা মোহ-বিস্তারের ক্ষমতা আছে। বেহালা-অঞ্চল ছাড়িয়ে ফাঁকা রাস্তায় পড়েই গাড়ির গতিবৃদ্ধি করে দিল সুরেশ। দু-ধারে ধানক্ষেত। রাস্তার পাশে পাশে বড় গাছ। শিরিষ, পাকুড়, অশ্বথ, আর রেন-ট্রী। মাঝে মাঝে দু-পাশের গাছ রাস্তা টপকিয়ে যেন পরস্পরকে ছুঁতে চায়। সেখানে, দূর থেকে মনে হয়, কে যেন ওদের বরণ করতে গাছ-গাছালির তোরণ বানিয়ে রেখেছে।

শশী খালি গলায় গান ধরল। রুক্মিনীও যোগ দিল তার সঙ্গে। বাইজির কাছে মানুষ, গান-না-জানা অপরাধ।

বিশু অ্যাটাচি-কেসটা টেনে নিয়ে সানন্দে সঙ্গত করতে শুরু করল।

রুক্মিনী বললে, বাবুজি! আপ্‌কো ঠেকা বন্ধ কিজিয়ে। বহ্ বিলকুল গলৎ হ্যয়।

সুরেশ অট্টহাসে ফেটে পড়ে।

বিশু থেমে যায়। অস্ফুটে বলে, আয়াম সরি!

ডায়মন্ডহারবারে ছোট-ক্যামেরায় শশিমুখীর নানান নড়াচড়া, শোয়া-বসার ছবি ওঠানো হলো—দূর থেকে, সেমি-ক্লোজআপ, ক্লোজআপ। স্থির ক্যামেরাতেও অনেক ছবি নেওয়া হলো। রুক্মিনীর ফটো তোলার প্রয়োজন ছিল না, তবে সে বেচারির ফটো তো কেউ তোলে না। তাই বিশু তারও কিছু স্টিল ফটো তুলে নিল। রুক্মিনী কৃতজ্ঞ হলো বিশুর প্রতি।

সন্ধ্যায় ওরা ফিরে এল ডায়মন্ডহারবার থেকে।

সেদিনই নির্জনতার সুযোগে সুরেশ শশিমুখী সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে ফেলে। তার বালিকা জীবনের কথা, কৈশোরের ইতিকথা—

এইখানে সুরেশের জবাবন্দিতে বাধা দিয়ে প্রসন্নকুমার প্রশ্ন করেছিলেন, নির্জনতার সুযোগ মানে? আপনারা তো ছিলেন চারজন। শশিমুখী তার বাল্যকৈশোরের কথা হড় হড় করে বিশুবাবুর সামনে বলে গেল?

—না, না! ছবি ওঠানোর পরও আমাদের হাতে অনেক সময় ছিল। রুক্মিনী আর বিশু নদীর ধার ধরে-ধরে অনেকটা দূরে চলে গেছিল। আমরা দুজন তখন গঙ্গার ধারে একেবারে নির্জনে বসেছিলাম।

বাসু-সাহেব বললেন, এই জায়গাটা আর একটু বিস্তারিত করে বলুন তো সুরেশবাবু। আপনি হঠাতই ওকে জিজ্ঞেস করে বসলেন : তোমার ছেলেবেলার গল্প বল?

—না! মানে...ঠিক হঠাৎ নয়। একেবারে নির্জন মুহূর্তে মানুষের মনের দরজা তো খুলে যায়। সেই সুযোগটাই নিয়েছিলাম আমি। ও একটু অভিভূতও হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কেমন যেন নেতিয়ে পড়ে। ওর মানসিক বিহ্বলতাটা কাটাতে আমি ওর বাল্য-কৈশোরের প্রসঙ্গ তুলেছিলাম।

—জাস্ট আ মিনিট। আপনি প্রথমে বললেন, 'একেবারে নির্জন মুহূর্তে মানুষের মনের দরজা খুলে যায়।' তারপর নাকি আপনি একটা 'সুযোগ' নিয়েছিলেন। এবং তারপর বললেন, 'মেয়েটি অভিভূত হয়ে পড়ে, নেতিয়ে পড়ে—' তাই নয়?

—আজ্ঞে হাঁ, তাই তো বলেছি।

—কিন্তু কার্য-কারণ সম্পর্কটা খুলে বলছেন না কেন?

—কার্য-কারণ সম্পর্ক মানে?

—কী আশ্চর্য! শশী হঠাৎ কেন 'নেতিয়ে' পড়ল? আপনি নির্জনতার কী 'সুযোগ' নিয়েছিলেন? শশিমুখী কেন অভিভূত হয়ে পড়ে?—এইসব কার্য-কারণ সম্পর্ক?

সুরেশচন্দ্র রুখে ওঠে; আপনি ঠিক কী জানতে চাইছেন বলুন তো মশাই?

—বলছি। আমি জানতে চাইছি একেবারে নির্জন মুহূর্তের সুযোগে আপনি কি শশীমুখীর মুখচুম্বন করেছিলেন? জীবনে প্রথম? আর তাতেই কি সে অভিভূত হয়ে নেতিয়ে পড়ে?

কোথাও কিছু নেই সুরেশ উঠে দাঁড়ায়। বলে, আপনার কৌতূহলের একটা সীমা থাকবে তো মিস্টার বাসু? এর সঙ্গে মার্ডার-কেস-এর কী সম্পর্ক?

বাসু বলেন, গুরুর মতো আমারও ধৈর্যটা কম। আমার যা জিজ্ঞাস্য আছে তা আমাকে জেনে নিতে হবে। আপনার আপত্তি থাকলে আমি বরং চলে যাই। আমাদের স্টেনোগ্রাফারকে পাঠিয়ে দিই। সে কোনো প্রশ্ন করবে না। তার অসীম ধৈর্য। কৌতূহল বিন্দুমাত্র নেই। না হয় হপ্তাখানেক ধরে ধীরে ধীরে আপনি আপনার জবানবন্দিটা দেবেন! স্যার বলেছিলেন, 'একদিন', আমার মনে হচ্ছে পুরো এক হপ্তা লাগবে!

সুরেশ স্থিরদৃষ্টিতে বাসু-সাহেবের দিকে সেকেন্ড-বিশেক তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ বলে বসে, অলরাইট স্যার! আই কনফেস! আই কিস্‌ড হার। অ্যান্ড ইয়েস, ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন আওয়ার লাইভস্!

—থ্যাঙ্কু স্যার। প্লীজ প্রসীড! শশীদেবী তার বাল্য-শৈশবের কথা কী জানালো?

শশীমুখীর জন্ম রেঙুনে। বর্মা মুলুকে। যুদ্ধের হাঙ্গামায় বর্মার প্রবাসী ভারতীয়রা—বাঙালীই বেশি—হাঁটাপথে বর্মা থেকে কলকাতা ফিরে আসেন। শশী তার বাবা আর মায়ের সঙ্গে—ও ছিল তাদের একমাত্র সন্তান—সেই দুর্গম অরণ্যপথে রেঙুন থেকে কলকাতায় পালিয়ে আসে। পথে নানান কষ্ট, নানান বিপর্যয়। তার মধ্যে একরাত্রে ওদের উদ্‌বাস্তু শিবিরে বর্মী-ডাকাতের দল হানা দেয়। টাকা-পয়সা, হাতঘড়ি, মেয়েদের অলঙ্কার সব কিছু ছিনিয়ে নেয়। সে রাত্রেই ওর বাবা গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান, আর মা—তখন তাঁর বয়স হবে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ—ডাকাতেরা তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। শশী তখন নিতান্ত বালিকা—ফ্রক পরে। সে অজ্ঞান হয়ে যায়। জ্ঞান ফিরলে দেখে সে শুয়ে আছে একটা আশ্রয় শিবিরে। হাতফিরি হতে হতে ওই অনাথা মেয়েটি তারপর কস্তুরী বাঈয়ের ছত্রছায়ার আশ্রয় পায়। কস্তুরীও রেঙুন থেকে পালিয়ে আসছিল। শশীকে সে মানুষ করে তোলে। গান শেখায়। শশী গায়িকা হয়ে ওঠে। প্রথমে ওরা ছিল লক্ষ্ণৌতে। তারপর উত্তর কলকাতার এক সঙ্গীতপ্রিয় ধনী ব্যক্তির বাঁধা বাইজি হিসাবে কস্তুরী পাকাপাকিভাবে কলকাতায় চলে আসে। রুক্মিনী আর

শশিমুখীও আসে তার সঙ্গে। সে আজ বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। ইতিমধ্যে কস্তুরী বাইজি কলকাতার ঠুংরি আর গজলের বাজারে বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে।

এই হলো ওর বাল্য-কৈশোরের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

সে-যাই হোক, ডায়মন্ডহারবারে গিয়ে ছবি তোলার ঘটনা বেশি দিন আগেকার নয়। ইতিমধ্যে বিশু প্রামাণিক পরীক্ষা করে দেখেছে যে, শশীমুখীর চেহারা 'ফটোজিনিক'। নায়িকার চরিত্রে তার সাফল্য কামনা করা যেতে পারে। সুরেশের পার্টনার রাজি। সব ব্যবস্থাপনা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে তখন সুরেশচন্দ্র একদিন বেমক্কা শশিমুখীকে বিবাহ করার প্রস্তাব তুলে বসে।

আবারও বাধা দিয়ে বাসু বলেন, কার কাছে? প্রথমে কে? শশিমুখী না কস্তুরী?

আবার রুখে ওঠে সুরেশ : আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই! আপনি মার্ডার কেস শুনতে চান, না কি 'সুরেশ-শশী' প্রেমকাহিনী নিয়ে একটা বাঙলা-ফিল্ম বানাতে চান?

পি. কে. বাসু জবাব দিলেন না। স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ক্লায়েন্টের দিকে। সুরেশচন্দ্রই শেষমেষ অধৈর্য হয়ে বলে ওঠে, অলরাইট, অলরাইট স্যার! আমি প্রথমে শশীকেই প্রস্তাবটা দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, সে রাজি থাকলে ফিল্মে নামার আগেই আমি তাকে রেজিস্ট্রি মতে বিবাহ করতে চাই। বাড়িতে না জানিয়ে, গোপনে। আর ও হ্যাঁ, ইতিমধ্যে আমি হয়তো বার পঞ্চাশ তার মুখচুম্বন করেছি। তবে একসঙ্গে কখনো রাত কাটাইনি, এক বিছানায় শুইনি। আর য়ু স্যাটিসফায়েড?

—থ্যাঙ্কু সার। এবার আপনি জানা-মশায়ের প্রসঙ্গে আসতে পারেন।

—জানা! জানা-মশাইটা কে?

—কী আশ্চর্য! জানাকে অজানা মনে হচ্ছে? জনার্দন জানার মার্ডার কেস-এই তো আপনি স্যারের কাছে এসেছেন?

—ও হ্যাঁ। জনার্দন জানা! দ্যাট বাস্টার্ড অব আ জমিন্দার!

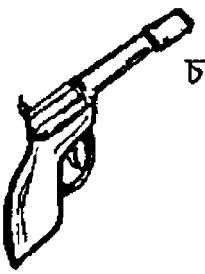

চার

সমস্ত বৃত্তান্তটা শুনে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল বাইজি।

বলে, সচ বাৎ? শশীকে সাদি করে নিয়ে যাবেন আপনি? রখেলি নয়?

সুরেশ অবাক হয়ে বলেছিল, 'রখেলি'! রখেলি কাকে বলে?

—ওই যাকে বাঙ্গালিবাবুরা বলে কি 'রক্ষিতা'। বড়লোকের পোষা ময়না। সোনার দাঁড়ে শিকল পরিয়ে যাকে বাগানবাড়িতে রাখা হয়, শুনেননি?

সুরেশ দৃঢ় প্রতিবাদ করেছিল, এসব কী বলছেন আপনি? আমি ওকে প্রথমে রেজিস্ট্রি মতে বিবাহ করব। তারপর আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব কালীঘাটের মন্দিরে। আপনার সমুখেই আমি ওর সিঁথিতে সিঁদুর দেব, হাতে নোয়া-শাঁখা পরাব। শশী রাজি আছে, আপনি অনুমতি দিলেই—

আনন্দে কেঁদে ফেলেছিল প্রৌঢ়া বাইজি। সুরেশের হাত দুটি ধরে বলেছিল, শিউজি আপনার ভালো করবেন বাবুজি। লেকিন, আপনি খানদানি ঘরের ছেলে। আপনার পিতাজি-মাতাজি ওকে ঘরে নিবেন তো?

—তা আমি জানি না, দিদি।

—'দিদি'! দিদি ডাকলেন আমাকে?

—আপনি অনুমতি দিলে তাই বলেই তো ডাকতে হবে বাকি জীবন। শশী আপনাকে 'দিদি' বলে না?

বাইজি চোখে আঁচল দিল। তারপর একটু সামলে নিয়ে বলে, আপনি ওর বদনসিবীর সব কথা জানেন? ও হতভাগী কি আপনাকে সব কথা বলতে পেরেছে?

—সব কথা নয়। তবে অনেক কিছুই বলেছে। ওর জন্ম রেঙুনে। বার্মা ইভ্যাকুয়েশনের সময় ওদের ছাউনিতে বর্মী ডাকাত হানা দেয়। ওর পিতাজি মারা যান, মাতাজিও...

—জী হ্যাঁ, সচ বাৎ! আমি ছিলাম সেখানেই। ডাকাত পড়েছে শুনে জঙ্গলের ভিতর সারারাত সিঁটিয়ে বসেছিলাম। সকালবেলা আজাদ-হিন্দ ফৌজদের পুকার শুনে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসি। শশী তখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

—কত বয়স হবে তখন ওর?

—কত আর হবে? দশ-বারা! তখন সে ফ্রক পরে। সেই তখন থেকেই ও আমার কাছে মানুষ। ওকে লক্ষ্ণৌ নিয়ে গেলাম। গানা শিখালাম। তারপর আমরা চলে এলাম কলকাত্তায়।

—ওর বাপের নাম, বা পরিচয় শশী আমাকে বলেনি। আপনি জানেন?

—জানতাম ভাইসাব। লেকিন এতদিন পরে তা আর য়্যাদ নেই। সে-কথা তো ওকে বারবার জিজ্ঞাসা করা যায় না। সে কিস্‌সার কথা উঠলেই ও কান্না শুরু করে দেয়। সেই বদনসিবীর দিনগুলো তো ও ভুলে থাকতে চায়, না? তবে ওর পিতাজির নাম ছিল 'মুখার্জি-সাব'। পুরো নামটা আমার ইয়াদ নেই; রেঙুনে একটা কাঠ-চেরাই কারখানার ম্যানেজার ছিলেন তিনি। ঘরওয়ালী আর ওই চুন্নিমুন্নি লেড়কি ছাড়া তাঁর আর কেউ ছিল না।

—শশী তাহলে বামুনের মেয়ে? ধর্মে হিন্দু?

—হ্যাঁ, ভাইসাব। বিলকুল হিন্দু! মুখার্জি-সাব বরামভন ছিলেন বৈকি।

—তাহলে আপনি অনুমতি দিচ্ছেন তো, দিদি?

—না হলে তোমাকে 'ভাইসাব' বলে ডাকব কেন সুরেশ? এতদিন তো 'বাবুজি' বলে ডেকেছি, সুরেশবাবু বলে বাৎচিৎ করেছি।

—তাহলে কবে বিয়ের এন্তাজাম করব আপনিই বলুন?

—শুন ভাইসাব! সাত রোজ তোমাকে রুখে যেতে হবে। সাদির আগে শশীকে একটা জবর কাম করতে হবে। ওই যাকে তোমরা 'প্রায়শ্চিত্ত' বল। ওকে একবার 'বরধোমান' যেতে হবে।

—বর্ধমান! কেন বর্ধমানে যেতে হবে কেন?

—এটা ওর বদনসিবীর খোয়াড় ! তোমাকে সব কথাই খুলে বলব সুরেশভাই। ও তোমার ঘরওয়ালী হতে চলেছে। তাই এত কথা বলছি। না হলে বলতাম না। এই সাত রোজ তুমি শশীর সঙ্গে দেখা করবে না। ও 'বরধোমান' থেকে ওয়াপস্ এলে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোমাদের সাদি দেব।

—বেশ, আমি তাতেই রাজি। ওকে কী প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আমাকে খুলে বলুন।

কস্তুরীবাঈ সব কথা ওকে খুলে বলেছিল।

প্রায় বছর দশেক আগেকার কথা। ওরা তখন লক্ষ্ণৌতে থাকত। শশিমুখী তখন পঞ্চদশী। লক্ষ্ণৌয়ে বিভিন্ন মুজরোয় কস্তুরীবাঈ শশীকে নিয়ে যেত। ওই বয়সেই দারুণ সুনাম হয়েছিল শশীর। কৈশোর অতিক্রমণে সে তখন সদ্য প্রস্ফুটিতা পঞ্চদশী। ওই সময় এক আসরে শশীকে দেখে এক বাঙালী রহিস্ আদমী একেবারে মোহিত হয়ে যান। তিনি ওকে 'রখেল' করার প্রস্তাব দেন। সেই বাবুজি বরধোমানের একজন জমিন্দার। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তাঁর দু-দুটি বিবি। অনেকগুলি বাল-বাচ্চা। তবু উনি শশীকে কিনে নিতে চাইলেন। সে সময় কস্তুরীবাঈয়ের একটা অর্থনৈতিক দুর্যোগ চলছিল। কস্তুরীবাঈ জনান্তিকে সব কথা খুলে বলেছিল শশিমুখীকে। শশী অনেক কেঁদেছিল; কিন্তু সে বুঝমান মেয়ে। বলেছিল, দিদি, আমাকে তুমি খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করেছ। তুমি শুধু আমার দিদি নও, তুমি আমার মা। কিন্তু

এতদিনে আমি দুনিয়াদারির অনেক কিছুই বুঝতে শিখেছি। কোনো খানদানি ঘর তো দূরের কথা—কোনো সদ্‌বংশের গৃহস্থও তাঁর লেড়কার সঙ্গে আমার সাদি দিতে রাজি হবেন না। এটাই আমার নিয়তি। সর্বজনভোগ্যা বাজারের বেশ্যা হয়ে বাকি জীবন কাটানোর চেয়ে ওই বাবুজির 'রখেল' হয়ে থাকাই তো আমার পক্ষে ভাল! অন্তত প্রতি রাত্রে অজানা অচেনা কামার্ত রাক্ষসকে তো শান্ত করার বদনসিবী থেকে রক্ষা পেলাম। এতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তুমি রাজি হয়ে যাও!

নগদ পাঁচ হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে জমিদারমশাই লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। বলে এসেছিলেন, একটা বাসাবাড়ি বা বাগানবাড়ির এন্তাজাম করে উনি এসে শশিমুখীকে নিয়ে যাবেন। মাসখানেকের মধ্যে। কোথায় মাসখানেক? বছর ঘুরে গেল। বাবুজির পাত্তা নেই। তারপর এল তাঁর পূর্জা। কী একটা জমিদারী সংক্রান্ত মামলায় জানামশাই কেঁসে গিয়েছিলেন। সেজন্যই এতদিন তত্ত্বতালাস নিতে পারেননি। তা হোক, অগ্রিম তো তিনি দিয়েই রেখেছেন। শশিমুখীর উপর দখলীসত্ত্ব! পঞ্চদশী যদি সপ্তদশী বা অষ্টাদশী হয়ে যায় জনার্দন জানা আপত্তি করবেন না। তিনি সুযোগ মতো এসে ময়নাটিকে নিয়ে যাবেন। বাগানবাড়ি কেনা হয়ে গেছে। সোনার খাঁচাও তৈরি হয়েছে। সময় মতো তিনি লক্ষ্ণৌ আসবেন।

ইতিমধ্যে ঘটনাচক্রে বাইজির ভাগ্য ফিরে গেল। উত্তর কলকাতার এক সঙ্গীতপ্রিয় ধনী ব্যক্তির নজরে পড়ে গেল সে। তাঁরই ব্যবস্থাপনায়, তাঁর বাঁধা বাইজি—রক্ষিতা নয়, বাইজির পরিচয়ে ও পাকাপাকি কলকাতা চলে আসে। বর্ধমানের জমিদারমশাইকে সে সুদ সমেত তাঁর দেয় অগ্রিম পাঁচ হাজার টাকা প্রত্যর্পণ করতে চায়। কিন্তু জমিদারমশাই তা গ্রহণ করতে স্বীকৃত হলেন না। মাঝে-মাঝে তিনি হুমকি দিয়ে পাঠান। কস্তুরীবাঈ কী করবে স্থির করে উঠতে পারে না। এবার সেই জমিদারবাবু তাঁর পাঁচ হাজার টাকা ফেরত নিতে স্বীকৃত হয়েছেন কিন্তু একটি কঠিন শর্তে।

টাকাটা তিনি কস্তুরীবাঈয়ের কাছ থেকে ফেরত নেবেন না। নেবেন শশিমুখীর হাত থেকে। শুধু তাই নয়, টাকাটা শশিমুখী স্বহস্তে তাঁকে প্রত্যর্পণ করবে। তিনি শশিমুখীর জন্যে যে বাগানবাড়িটা সাজিয়েছেন সেখানে গিয়ে। নির্দিষ্ট দিনে শশীকে যেতে হবে। জনার্দন জানা একটা মুজরোর ব্যবস্থা করবেন। সান্ধ্য-আসরে ওঁর কিছু ইয়ার-দোস্ত আসবে। তাদের সবাইকে শশিমুখী গান শোনাবে। তবল্‌চি-সারেঙ্গীকে নিয়ে যেতে হবে না। সেসব এন্তাজাম জমিদার-মশাই নিজেই করবেন।

সুরেশ বজ্রাহত হয়ে যায়। বলে, এসব কী বলছেন দিদি? শশী একা যাবে সেই বাগানবাড়িতে?

—না, একেবারে একা নয়। সে কি একা-একা ট্রেনে চেপে বরধোমান যেতে পারে? আমি ওর সঙ্গে একজন পুরুষমানুষকে রক্ষী হিসেবে পাঠাব। সেই টিকিট-মিকিট কাটবে। স্টেশন থেকে ট্যাক্সি করে শশীকে বাগানবাড়িতে পৌঁছে দেবে। পাহারায় থাকবে। আবার মুজরো শেষ হলে ফিরিয়েও নিয়ে আসবে।

—কিন্তু শশী গিয়ে যদি দেখে 'মুজরো-টুজরো' সব ফাঁকা বুলি? সেই বদমাইশটা ওই ফাঁকা বাড়িতে একা আছে। এই সুযোগে সে যদি শশীর ধর্মনাশ করতে চায়?

—না, তা সে পারবে না।

—কেন পারবে না? কে তাকে রক্ষা করবে?

—যে তার রক্ষক হয়ে যাচ্ছে। সে আমার খুব বিশ্বস্ত লোক। দুর্ধর্ষ, বেপরোয়া আর ইমানদার!

BanglaBook.org

—সে কে? কী নাম তার?

—নামধাম জানতে চেও না ভাই। তবে এটুকু জেনে রাখ, সে দুর্ধর্ষ ডাকাত। পাঁচ-সাতটা মানুষকে ইতিপূর্বেই খুন করেছে! পুলিশের খাতায় তার নাম আছে ঠিকই। মামলাও ঝুলছে তার নামে। সে জামিনে খালাস আছে। তা হোক আমাকে সে 'মা' ডাকে। আমার সঙ্গে সে তঞ্চকতা করবে না।

সুরেশ নতনেত্রে কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললে, তাহলে আমাকেও সঙ্গে যেতে দিন, দিদিভাই। বাগানবাড়ি-তক আমি যাব না, কিন্তু কাছে-পিঠে কোথাও লুকিয়ে থাকব। শশীর চিৎকার শুনলেই ছুটে চলে যাব ওই শয়তানটার গুহায়।

—না, ভাইসাব, তা হয় না। কেন হয় না, তাও আমি তোমাকে বলতে পারব না।

—তাহলে আমাকে আর একটা কাজ করতে দিন?

—কী কাজ?

—আমার বড়ি-আব্বার একটা ছোট্ট শৌখিন পিস্তল ছিল। খুব ছোট্ট। মুঠোর মধ্যে ধরা যায়। কিন্তু মারাত্মক মরণাস্ত্র। সেটা এখন আমার হেপাজতে। আমিই তার লাইসেন্স-হোল্ডার। সেটা আমি শশীকে দেব। ও সেটা সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। এমন হতে পারে যে, গানের জলসা মিটে গেলে জমিদারবাবু নির্জন ঘরে শশীকে আক্রমণ করে বসতে পারে। হয়তো ওর রক্ষক তখন অন্যত্র। সেই নিতান্ত প্রয়োজনে শশী ওটা দিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারবে।

বাইজি বলে, ভাইসাব! ও বদনসিব জীবনে কি কখনো পিস্তল দেখেছে? ও কি পিস্তল চালাতে জানে?

—না, জানে না। আমি তাকে দু-ঘন্টার ভিতর সেটা শিখিয়ে দেব। কই, ডাকুন তো শশীকে।

কস্তুরীবাঈ রাজি হলো। তার আহ্বান শুনে শশী ঘরে এল। সুরেশ তাকে বলল, শোন শশী, দিদি রাজি হয়েছে। আমাকে বলেছে যে, তোমাকে একবার বর্ধমান যেতে হবে। একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সারতে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে তুমি গানের জলসায় 'মুজরো' নিয়ে যাচ্ছ। আমি কাল তোমাকে একটা পিস্তল এনে দেব, শশী। ঘণ্টা-খানেক নাড়াচাড়া করলেই তুমি বুঝে ফেলবে কী করে পিস্তল চালাতে হয়। আসলে পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়া কোনও ব্যাপারই নয়। বন্দুক, রিভলভার পুরুষমানুষের অস্ত্র; কিন্তু পিস্তল মেয়েদের। ওটা চালাতে একটা জিনিসেরই প্রয়োজন : সাহস! হিম্মৎ! শোন, দিদি তোমার জন্যে একজন দেহরক্ষীর ব্যবস্থা করেছে। সে বিশ্বস্ত লোক। তার হেপাজতেই যন্ত্রটা থাকবে ট্রেনে করে যাবার সময়। থাকবে একটা থলেতে। তাতে দিদির দেওয়া পাঁচ হাজার টাকার নোটের বান্ডিলটাও থাকবে। হয়তো জলসাঘরে সেই পুরুষ দেহরক্ষীকে ঢুকতেই দেওয়া হবে না। তাই জলসাঘরের ভিতরে, মানে ওই শয়তানের বাগানবাড়িতে ঢোকার আগেই তুমি থলিটা ওর হাত থেকে নিয়ে নিজের কাছে রাখবে। প্রয়োজনে নির্দ্বিধায় কুকুরটাকে গুলি করে মেরে ফেল। তুমি জান কি জান না, জানি না—শুনে রাখ, কোনো স্ত্রীলোক নিজের ইজ্জৎ বা নারীধর্ম রক্ষা করার প্রয়োজনে কাউকে গুলি করে মারলে সেটা তার অপরাধ বলে গণ্য করা হয় না।

শশী এতক্ষণ নিশ্চুপ শুনেছে। এবার বলল, আর আমি যদি গিয়ে দেখি—জলসা-টলসা বাজে কথা। বাগানবাড়িটা ভোঁ-ভাঁ?

—সেটাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে দেখবে যে, ওই পিশাচটা তোমার প্রতীক্ষায় একাই বসে আছে। হয়তো ওর দারোয়ান তোমার সঙ্গের লোককে রুখে দেবে—তোমাকে পৌঁছে দেবে ওর জলসাঘরে। সেক্ষেত্রে ওই থলিটা নিয়েই তুমি জলসাঘরে ঢুকে যাবে। দারোয়ান যদি জানতে চায় থলিতে কী আছে, তাহলে টাকার বান্ডিলটা বার করে দেখিয়ে দেবে। খুব সম্ভব

যেই তুমি সেই নির্জন ঘরে ঢুকবে অমনি বদমায়েশটা দরজা ভিতর থেকে ছিটকিনি বন্ধ করে দেবে। তাতে ভয় পেও না। তখন তুমি র‍্যাশন-ব্যাগ থেকে ওই দুটো জিনিস চট্ করে একই সঙ্গে বার করে নেবে—বাঁ হাতে টাকার ব্যান্ডিল, আর ডান হাতে পিস্তলটা। বুঝলে? সোজাসুজি জোর গলায় বলবে, 'এই নিন আপনার পাঁচ হাজার টাকা' বলেই বাঁ হাতে সেটা ছুঁড়ে মারবে ওর মুখে। আর একই সঙ্গে ডান হাতে পিস্তলটা উঁচিয়ে বলবে, আপনি নিজে হাতে দরজার ছিটকিনিটা খুলে দিন, মিস্টার জানা। আমার দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করবেন না, তাহলে আমি কিন্তু আপনার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব!—কী পারবে না বলতে?

শশী সংক্ষেফে শুধু বলে, পারব।

—পিশাচটা তখন হয়তো অনেক কথা বলবে। হয়তো বলবে, 'তোমার হাতটা কাঁপছে শশী। ওটা সরিয়ে নাও।' হয়তো বলবে, 'মানুষ খুন করলে তোমার ফাঁসি হয়ে যাবে।'

শশী জোর গলায় বলে, তখন আমি তাকে বলব, 'কিন্তু তুমি তো মানুষ নও, বাবুজি। কুকুর মারলে ফাঁসি হয় না। আমি তিন গুনব। তারমধ্যে যদি...'

সুরেশ আর নিজেকে সামলাতে পারে না। স্থান-কাল ভুলে কস্তুরীর সামনেই শশীকে বাহু-পাশে আবদ্ধ করে বলে, সাবাস!

এর পরের ঘটনা, অর্থাৎ বাস্তবে ঠিক কী ঘটেছিল তা আর জানে না সুরেশ। গত সোমবার, মানে তিন দিন আগে কস্তুরীর সরবরাহ করা সেই দেহরক্ষীকে নিয়ে শশিমুখী বর্ধমান চলে যায়। সকালের প্যাসেঞ্জার ট্রেনে। দুটো দিন দারুণ অশান্তিতে কেটেছে সুরেশ আর কস্তুরীর। কারণ ওদের দুজনের একজনও ফিরে আসেনি। কাল রাত্রে বর্ধমান থেকে সুরেশ একটা ট্রাঙ্ককল পায়। ফোনটা করেছিলেন বর্ধমানের একজন নামকরা অর্থোপেডিক সার্জেন। ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ মৈত্র। তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে সংক্ষেপে বলেন যে, মিস্ শশিমুখী মুখার্জির অনুরোধে তিনি ফোনটা করছেন। মিস্ মুখার্জি সুরেশবাবুকে জানাতে চায় যে, সে একটা ছোটাখাটো দুর্ঘটনায় আহত হয়ে শয্যাশায়ী। এজন্যই সে কলকাতায় ফিরে যেতে পারেনি।

সুরেশ আকুল হয়ে জানতে চায়, অ্যাক্সিডেন্ট! কী জাতীয়?

—উনি পা পিছলে পড়ে যান। আমি এক্স-রে করে দেখেছি, পেলভিথ-গার্ডেলে একটা সামান্য হেয়ার-ক্র্যাক হয়েছে। এজন্যই সে শয্যাশায়ী। আমার বাড়িতেই আছে। চিন্তার কিছু নেই। তবে দিন-সাতেক সে বিছানা থেকে নামতে পারবে না।

সুরেশ আকুল হয়ে বলে, আপনার অ্যাড্রেস কী? টেলিফোন নম্বর কত?

—না মিস্টার চৌধুরী। সে-কথা জানাতে আমাকে স্পষ্ট নিষেধ করেছেন মিস্ মুখার্জি। তিনি চান না আপনি বর্ধমানে আসেন। কী কারণে তাঁর আপত্তি তাও তিনি আমাকে বলেননি। তবে তিনি জানিয়েছেন যে, আপনি বা তাঁর দিদি যেন কোনোক্রমেই বর্ধমানে না আসেন। চিন্তার কিছু নেই। আমার নাম তো শুনেছেন। টেলিফোন ডাইরেক্টরি থেকে ঠিকানা বা টেলিফোন নাম্বার আপনি অনায়াসে পেয়ে যাবেন। কারণ বর্ধমানে আর কোনো অর্থোপেডিক ডাক্তার নেই। কিন্তু প্লিজ, আপনারা আসবেন না। মিস্ মুখার্জির সনির্বন্ধ অনুরোধ। আমি কাল সন্ধ্যার পর আবার আপনাকে একটা ফোন করে জানাব উনি কেমন আছেন। গুড নাইট!

বলেই তিনি টেলিফোনের লাইনটা কেটে দিলেন।

বাসু জানতে চান, তাহলে আপনি কোন সূত্রে জানলেন যে বর্ধমানের জমিদার জনার্দন জানা খুন হয়েছেন।

সুরেশচন্দ্র তাঁর পোর্টম্যান্টো-ব্যাগ খুলে তা থেকে একটা খবরের কাগজের কার্টিং বার করে দেখালেন। সেদিনেরই সংবাদপত্র। তাতে জর্নাদনের রহস্যময় মৃত্যু সম্বন্ধে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। স্থানীয় সংবাদদাতা মৃত্যুর রহস্যময়তার বিষয়ে সংযতবাক, অথচ মৃত ব্যক্তির কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে মুখর :

"বর্ধমান; ২৫শে জুলাই : গতকাল বৈকালে তারামাতলায় বর্ধমান পৌরসভার মাননীয় কাউন্সেলার প্রখ্যাত সমাজসেবী জনার্দন জানা মশায়ের রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হইয়াছে। ঘটনার সময় ওই বাড়িতে গৃহস্বামী ভিন্ন শুধুমাত্র দারোয়ান উপস্থিত ছিল। দ্বিপ্রহরে মধ্যাহ্ন-আহারান্তে গৃহস্বামী তাঁর শয্যায় শয়ন করেন। অপরাহ্নে দারোয়ান চা পরিবেশন করিতে আসিয়া তাঁহাকে মৃতাবস্থায় আবিষ্কার করে। মস্তিস্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার দুই সহধর্মিণী, তিন পুত্র এবং চারজন কন্যাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া যান। জনার্দন জানা এ অঞ্চলের এক স্বনামধন্য সমাজসেবী। উপর্যুপরি দুইবার পৌরসভার নির্বাচনে..." ইত্যাদি।

বাসু বললেন, জনার্দন জানা যে খুন হয়েছেন এমন কথা কিন্তু সংবাদপত্রে আদৌ ছাপা হয়নি। আপনার বান্ধবীর নামোচ্চারণ পর্যন্ত করা হয়নি। এক্ষেত্রে আপনি এতটা ঘাবড়ে গেলেন কেন বলুন তো?

—আমি একটা অমঙ্গলের ছায়া দেখতে পাচ্ছি, বাসু-সাহেব। শশী গেল পাঁচ হাজার টাকার খেসারত দিতে। ঘটনাচক্রে ঠিক সেই সন্ধ্যাতেই বুড়োটা রহস্যজনকভাবে মারা গেল। এদিকে শশী দুর্ঘটনায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। দুর্ঘটনাই যদি হয় তাহলে টেলিফোন করে সে আমাকে ঘটনাস্থলে যেতে বারণ করছে কেন? টাকা আর পিস্তলের সম্বন্ধে কোনো খবর নেই। এই ঘটনাচক্রের মধ্যে একটা বিচিত্র যোগসূত্র কি আপনার নজরে পড়ছে না?

—পড়ছে। আলবাৎ পড়ছে। কিন্তু এখানে বসে আমাদের যুগল লাঙ্গুল আন্দোলনে সে রহস্যের সমাধানে কিছুমাত্র সাহায্য করবে না। যদিও মিস্ মুখার্জি বারণ করেছেন তবু আমাদের দুজনকেই সরেজমিন তদন্ত করে দেখতে হবে। আপনি বরং প্রথমে পর্যায়ে আড়ালে থাকবেন। নেক্সট ট্রেনেই আমাদের দুজনকে বর্ধমানে যেতে হবে। দাঁড়ান। টাইমটেবল্‌টা আনাই।

—ট্রেনে কেন স্যার? আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি। গাড়িতে পুরো ট্যাঙ্ক পেট্রোল ভরে আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। গাড়িতে ওভারনাইট ব্যাগে যাবতীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে এসেছি। যথেষ্ট টাকাও সঙ্গে এনেছি। আপনি সিনিয়ার ব্যারিস্টার-সাহেবকে জানিয়ে একটা ব্যাগ নিয়ে আসুন। আমরা বিকেলের মধ্যেই বর্ধমানে পৌঁছে যাব। কিন্তু আমাদের প্রথম গন্তব্যস্থলটা কোথায়? যেখানে খুনটা হয়েছে, সেই তারামাতলা? নাকি ডক্টর মৈত্রের বাড়ি?

—দুটোর একটাও নয়। আমাদের প্রথমে যেতে হবে পুলিশ-স্টেশনে। খবর নিয়ে জানতে হবে পুলিশ এটা কী চোখে দেখছে। মস্তিস্কের রক্তক্ষরণটা কি কোনও সেরিব্রাল স্ট্রোকের হেমারেজ, নাকি সেটা আপনার নামে লাইসেন্স-করা একটা পিস্তলের গুলির অবদান?

—পুলিশ তা আপনাকে জানাবে?

—জানাবে। যদি আমরা ঠিকমতো কৌশল করতে পারি।

—যতই কৌশল করুন, স্যার। আপনি তো ডিফেন্স কাউন্সেল। পুলিশের বিপক্ষের লোক। আপনাকে আগ্‌বাড়িয়ে পুলিশ কিছু জানাবে কেন?

—দেখা যাক।

BanglaBook.org

পাঁচ

পুলিশ তা জানাল কিন্তু। অকপটে। বিশেষ কারণ ছিল।

বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ থানা-ইনচার্জ, আবদুল জব্বর-সাহেব বাসু-সাহেবকে সবান্ধবে অত্যন্ত সমাদর করে আপ্যায়ন করলেন। একাধিক হত্যা মামলায় তিনি রে-সাহেবের কেরামতি দেখেছেন। ফলে সেই রে-সাহেবের সাগরেদকে—বিশেষ, ইনিও বিলাতী ডিগ্রিধারী ব্যারিস্টার—ওঁর মনে হলো, আল্লাহ্‌তালা প্রেরিত এক বেহেস্তি মুবারকী! বাস্তবে এই খুনের কেসটা নিয়ে জব্বরের রাতের ঘুম ছুটে যাবার যোগাড়। বিভাগীয় বড়কর্তার নির্দেশ : অবিলম্বে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করতে হবে, খুনীকে চিহ্নিত এবং পাকড়াও করতে হবে; ওদিকে স্থানীয় রাজনৈতিক চাপ। মন্ত্রিমশায়ের কন্‌ফিডেনশিয়াল সেক্রেটারি সরাসরি থানায় টেলিফোন করে জব্বরকে জানিয়েছেন কেঁচো খুঁড়তে কোনোক্রমেই যেন সাপটা না বার হয়ে পড়ে। জানামশাই পার্টির এক হোমরা-চোমরা—তাঁর অত্যাচার আর ব্যভিচার সর্বজনবিদিত।

বাসু বললেন, দেখুন মিস্টার জব্বর, খবরের কাগজে যেটুকু ছাপা হয়েছে তাতে কোথাও বলা হয়নি যে, মস্তিস্কে রক্তক্ষরণের হেতু একটি সীসার গোলক!

—না স্যার। খবরের কাগজ কেন ও-কথা ছাপবে? কারণ বাস্তবেও তা হয়নি। এটা বুলেট-উন্ডের কেসই নয়।

—সেরিব্র্যাল থম্বোসিস?

—আজ্ঞে না, তাও নয়। মিস্টার জানা আদৌ বিছানায় শুয়ে শুয়ে ফৌত হননি। তাঁর লাশটা পাওয়া গেছে ঘরের মেঝেতে। পোস্ট-মর্টেম হয়নি, হবেও না—রাজনৈতিক কারণে—কিন্তু মৃত্যুর হেতু একটি লোহার ডাণ্ডা!

—লোহার ডাণ্ডা! মাথায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! সামনে কপালের দিকে নয়—পিছন দিকে—ওঁর সেরিবেল্লাম সে আঘাতে ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে। দেখুন স্যার—যতদুর আন্দাজ করা যাচ্ছে, ঘরে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না—

—তৃতীয়? তা দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কে? জনার্দন জানা ছাড়া?

—ওই যাঁর জন্যে আপনি বর্ধমানে হন্যে হয়ে ছুটে এসেছেন! আপনার ক্লায়েন্ট!

—বলেন কী! কী করে জানলেন?

—বলছি! কিন্তু তার আগে বলি : মিস্ মুখার্জির হাইট পাঁচ-দুই, আর জনার্দন পাঁচ-নয়। ত্রিসীমানায় কোনো লাঠি, ডাণ্ডা, হাতুড়ি জাতীয় কিছু পাওয়া যায়নি। গেলেও মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মিস্ মুখার্জি ওঁর সেরিবেল্লাম চৌচির করতে পারতেন না। সুদূর কল্পনাতেও তেমন পরিস্থিতির কথা ভাবা যায় না।

—মুখোমুখি দাঁড়িয়ে?

—সেটাই কি স্বাভাবিক নয়, স্যার? নির্জন ঘরে একটি পুরুষ যদি একটি মহিলার শ্লীলতাহানি করতে চায়, তাহলে সে কি পিছন ফিরে দাঁড়াবে? পিছন ফিরে আদর করে বলবে, 'আয় সোনামণি, আমার মাথায় ডাণ্ডা মার!' বিশেষ সে যদি দেখে মেয়েটির হাতে রয়েছে একটা স্লেজ-হ্যামার?

সুরেশ আঁৎকে ওঠে, স্লেজ-হ্যামার?

—আরে মশাই ওটা কথার কথা। ধরুন যদি সেটা মশারির লোহার ছত্রিই হয়, তাহলেও?

বাসু জানতে চান, আমার ক্লায়েন্ট এখন শয্যাশায়িনী। সে কি নজরবন্দি হয়ে আছে? উঠে দাঁড়াতে পারলেই কি আপনি তাকে অ্যারেস্ট করবেন? তাহলে অ্যান্টিসিপেটারি বেইল...

—না স্যার! আমি নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা মতো তাঁকে আদৌ অ্যারেস্ট করব না। আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছি। আমি স্থির নিশ্চয় যে, ওই বাইজি নিজে হাতে খুনটা করেনি। কারণ সেটা বাস্তবে সম্ভবপর নয়। কিন্তু আমার অনেক উপর-ওয়ালা আছেন। তাঁরা যদি হুকুমজারি করেন তাহলে মেয়েটাকে গ্রেপ্তার করতেই হবে।

বাসু বলেন, দেখুন মিস্টার জব্বর। যতক্ষণ না আপনি আমার মক্কেলকে আসামীরূপে চিহ্নিত করতে চাইছেন ততক্ষণ আপনি-আমি একই পক্ষে। আমাদের একটাই উদ্দেশ্য—রহস্যের জাল ভেদ করে প্রকৃত অপরাধীকে চিহ্নিত করা। সেক্ষেত্রে আপনি কি গোটা কেসটা—আপনি যতদূর জেনেছেন—তা আমাকে জানাবেন? তাহলে আমরা যৌথভাবে প্রকৃত অপরাধীকে...

জব্বর বাধা দিয়ে বলেন, আর বলতে হবে না, স্যার—আপনার এই অপ্রত্যাশিত আর্বিভাবকে আমি আল্লাহ্‌র 'দোয়া' হিসাবে মনে করছি। আমি গোটা কেসটাই আপনার সামনে তুলে ধরছি। দেখুন, আপনি কোনও হিল্লে করতে পারেন কি না। অর্থাৎ কে, কীভাবে, কেন নির্জন ঘরে জনার্দন জানার মাথার খুলি এভাবে স্টোন-চিপ্‌স্ বানিয়ে দুনিয়ার ভার কিছুটা লাঘব করে দিল। আগেই বলেছি—মিস্ মুখার্জি নন, তাঁর পক্ষে সেটা অসম্ভব; কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হত্যাকাণ্ডটা তাঁর চোখের সামনেই ঘটেছে। তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। অবধারিত ভাবে। স্টার উইটনেস!

—মিস্ মুর্খাজি কি এ কথা অস্বীকার করেছেন?

—আজ্ঞে না। অস্বীকার করেননি। আবার স্বীকারও করেননি। বস্তুত আমি এখনো পর্যন্ত তাঁর ভালরকম একটা জবানবন্দিই নিতে পারিনি। আন্ডার মেডিক্যাল অ্যাডভাইস! শুধু ঠ্যাঙের হাড় ভাঙাই নয়, মিস্ মুখার্জি একটা প্রচণ্ড মেন্টাল শক্‌ও পেয়েছেন। ডাক্তার মৈত্র ওঁকে জেরা করতে দিচ্ছেন না! ক্রমাগত ঝুলিয়ে রাখছেন। বলছেন, 'মেডিক্যাল-অ্যাডভাইস্ অগ্রাহ্য করে আপনি যদি ওকে জেরা করেন এবং আমার পেশেন্টের তাতে যদি ভালমন্দ কিছু হয়ে যায় তাহলে আপনি ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী থাকবেন।'

বাসু বললেন, আই সী!

জব্বর তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করেন, নো, য়ু ডোন্ট স্যার। আই মীন আমার সসেমিরা অবস্থাটা। এস.পি.-সাহেব বলছেন, 'আপনি যদি ওই মেয়েটিকে অবিলম্বে জেরা না করেন তাহলে বুঝব আপনি প্রেজুডিসড্!' তার মানে সাদা বাঙলায় : পার্টির কাছে টাকা খেয়েছেন। ওদিকে সিবিল-সার্জেন বলছেন, তিনি কোনও দায়িত্ব নিতে পারবেন না। আর রাজনৈতিক পার্টি বলছেন, আপনি ওই বাইজিকে জেরায় জেরবার করে দিন, আমরা আপত্তি করব না, কিন্তু খবর্দার 'জনসেবক' জানার কোঁচার পত্তনটা যেন ঠিক থাকে। ছুঁচোর কেত্তনটা যেন না জানাজানি হয়ে যায়।

বাসু বলেন, আপনি আদ্যোপান্ত খুলে বলুন তো কেসটা?

থানায় টেলিফোনটা আসে সন্ধ্যা পাঁচটা বত্রিশে। জব্বর-সাহেব নিজেই টেলিফোনে সাড়া দেন। ও-প্রান্তে ছিলেন ডঃ রবিন মৈত্র। সে আমলে বর্ধমানের বস্তুত একমাত্র অর্থোপেডিক সার্জেন। বিলাতী ডিগ্রিধারী। জব্বর-সাহেবের বিশেষ পরিচিত, কারণ তাঁর বড়ি-আব্বা যখন বছরখানেক আগে স্নানঘরে পা-পিছলে পড়ে পায়ের হাড় ভাঙেন তখন ডাক্তার মৈত্রই তাঁর চিকিৎসা করেছিলেন। সে যাই হোক, ডাক্তার মৈত্র টেলিফোনে জানালেন যে, তাঁর পাড়ায়, বস্তুত সামনের বাড়িতেই এক ভদ্রলোকের রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে। জব্বর-সাহেব যেন অবিলম্বে তদন্তের ব্যবস্থা করেন।

ডাক্তার-সাহেবের বাড়ি তারামাতলায়। এলাকাটার সম্বন্ধে জব্বর-সাহেব বিশেষভাবে পরিচিত। তিনি জানতে চান, কার বাড়ি ? লোকটি কে ?

ডাক্তার মৈত্র বলেন, আমার বাড়ির উল্টোদিকে জনার্দন জানা-মশায়ের যে বাড়িটা আছে—মানে 'জলসাঘর'—সেখানেই ঘটেছে দুর্ঘটনাটা।

জব্বর জানতে চান, কে মারা গেছেন? আপনি চেনেন?

ডাক্তারবাবু বলেন, মৃতদেহ আমি দেখিনি, যিনি দেখেছেন তিনি এখন আমার বাড়িতেই আছেন। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী মনে হচ্ছে মৃতদেহটা জনার্দন জানা মশায়েরই।

জব্বর সোজা হয়ে উঠে বসেন। বলেন, এ কী বলছেন মশাই! সেই প্রত্যক্ষদর্শীকে টেলিফোনটা একবার দিন তো, ডাক্তার-সাব।

—সরি! তিনি মারাত্বকভাবে অসুস্থ। মেন্টাল শক্! আমার চিকিৎসাধীনে আছেন। আপনি দেরি না করে এখনি চলে আসুন।

থানায় সবেধন একটিই নীলমণি-জিপ। সেটা নিয়ে জব্বরের অধীনস্থ ইন্সপেক্টার রোঁদে গেছেন। যেকোনো সময়ে ফিরে আসতে পারেন। জব্বর অতঃপর জনার্দন জানার বাড়িতে ফোন করেন—'জলসাঘরে' নয়, তাঁর ভদ্রাসনে। দেখা যায় ওঁরা ইতিপূর্বেই খবর পেয়েছেন। জনার্দনের বড় ছেলে নির্মল আর তার বড় মামা কেশববাবু সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র 'জলসাঘর'-মুখো রওনা হয়ে গেছেন।

জব্বর অকুস্থলে এসে পৌছান সন্ধ্যে সওয়া ছয়টায়। জলসাঘরের সামনে তখন রীতিমতো একটা জটলা। কেশবচন্দ্র পেশায় উকিল। বর্ধমান আদালতের। গেট খুলে তিনিই এগিয়ে এলেন জব্বর-সাহেবের দিকে।

জানা গেল, কেশববাবুকে খবর দিয়েছিল জলসাঘরের বেয়ারা-কাম-দারোয়ান কানাই। মৃতদেহটা নাকি সেই আবিষ্কার করে। বিকেলবেলা জানামশাইকে বৈকালিক জলখাবার আর চা পরিবেশন করতে গিয়ে। জলসাঘরে টেলিফোন আছে। কানাই তৎক্ষণাৎ বাড়িতে ফোন করে দেয়। তখন ঠিক কয়টা তা কেশববাবু বলতে পারলেন না, তবে তিনি অকুস্থলে এসে পৌছান মিনিট পনের আগে ছয়টা নাগাদ। কানাইয়ের নির্দেশ মতো দ্বিতলে উঠে গিয়ে মৃতদেহটি স্বচক্ষে দেখেন। এবং তৎক্ষণাৎ থানায় ফোন করেন। সেখান থেকে জানতে পারেন যে, পুলিশ ইতিপূর্বেই খবর পেয়েছে এবং তদন্ত করতে রওনা হয়ে গেছে। থানা কীভাবে এত শীঘ্র খবরটা পেল—মানে কেশবচন্দ্র মৃতদেহ আবিষ্কার করার পূর্বেই—এটা নিয়ে তিনি তখনো চিন্তিত। তিনি জানতে চান, থানায় খবরটা কে দিয়েছে? জব্বর সে কথার জবাব না দিয়ে প্রথমেই দ্বিতলে উঠে গিয়ে মৃতদেহটা পরীক্ষা করেন। মৃত্যু সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই—কারণ জানামশায়ের মাথার পিছন দিকটা একেবারে থেঁৎলে গেছে। জব্বর ঘরটা, বারান্দাটা, জানলা দিয়ে নিক্ষিপ্ত হয়ে যতদূর সম্ভব সেই দূরত্ব পর্যন্ত সন্ধান করে দেখলেন। জানার মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার মতো কোন ডাণ্ডা, মুগুর, লাঠি জাতীয় কিছু আবিষ্কার করতে পারেন না। নিঃসন্দেহে খুনী তার অস্ত্রটা সঙ্গে নিয়েই পালিয়েছে। কিন্তু কেন? রক্তমাখা অমন একটা অস্ত্র নিয়ে সে কেন পথে বার হলো? জব্বর এ প্রশ্নের কোনও সমাধানে আসতে পারেন না। জিপটা পাঠিয়ে তিনি অটপ্সি-সার্জেনকে ডেকে আনেন।

জলসাঘরটি দ্বিতল। একতলায় বড়-হল কামরা। পঞ্চাশ-ষাটজন বসতে পারে। ঝাড়-লণ্ঠন-ফরাস সবই সাবেকি ধরনের; তবে খাশগেলাসের বদলে টিউব-লাইট। তারামাতলায় বছর দুই হলো বিজলি এসেছে। দ্বিতলে একটিমাত্র কক্ষ— শয়নকক্ষই বলা চলে। সে ঘরে একটি ডবল-বেড পালঙ্ক, বড় একটা শ্বেতপাথরের টেবিল, খান চারেক ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত গদিমোড়া চেয়ার,

একটি বেতের আরাম-কেদারা। সে ঘরের সংলগ্ন একটি টয়লেট ও আছে। তার বাহিরের দিকে জমাদারের যাতয়াতের জন্য ঢালাই-লোহার স্পাইরাল সিঁড়ি।

সরেজমিন তদন্ত সেরে জব্বর-সাহেব কেশবচন্দ্রের কাছে জানতে চাইলেন, বাথরুম থেকে ওই লোহার সিঁড়িতে যাবার যে দরজাটা আছে তা তো এখন দেখছি ভিতর থেকে বন্ধ করা। আপনারা যখন আসেন—ছয়টা নাগাদ, তখনো কি ওই দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল?

কেশব বলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি সেটা পরীক্ষা করে দেখেছিলাম। ছিটকানি বন্ধ করা ছিল।

জব্বর এবার কানাইকে প্রশ্ন করেন, তুমি যখন বিকেলে জানা-সাহেবকে চা-খাবার দিতে এসেছিলে, তখনো কি ওই দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল?

—আজ্ঞে আমি তা যাচাই করে দেখিনি, হুজুর। আমার কি তখন মাথার ঠিক ছিল? তবে ও দরজাটা দিন-রাত্ তো বন্ধই থাকে। শুধু জমাদার যখন আসে তখনই আমি খুলে দিই। সে সাফ-সুতরো করে চলে গেলেই ভিতর থেকে বন্ধ করে দিই। ওটা নিশ্চয় বন্ধই ছিল।

জব্বর এরপর একে-একে জনান্তিকে সকলের জবানবন্দি নিতে থাকেন। প্রথমেই কানাই—যে মৃতদেহটা আবিষ্কার করেছিল।

কানাই তার এজাহারে বলে যে, সে সওয়া পাঁচটা নাগাদ—তার হাতঘড়ি নেই, সে সঠিক সময়টা বলতে পারছে না—সাহেবের জন্য চা-জলখাবার নিয়ে উপরে আসে।

চা-জলখাবার অস্পর্শিতভাবে শ্বেতপাথরের টেবিলটার উপরেই পড়ে আছে। সেদিকে এক নজর দেখে নিয়ে জব্বর জানতে চান, দুই প্লেট খাবার আর দু-কাপ চা রয়েছে দেখছি। তোমার সাহেব কি ঘরে একা ছিলেন না?

কানাই আমতা-আমতা করে বলে, আজ্ঞে না, হুজুর। সাহেবের কাছে বিকালের দিকে একজন মেহ্মান এসেছিলেন। তাই দু-কাপ...

—মেহ্মান! কে তিনি? তুমি চেন তাঁকে? কখন এসেছিলেন?

—আজ্ঞে চিনি না, হুজুর! তিনি সাড়ে চারটে নাগাদ এসেছিলেন। একটা ট্যাক্সি নিয়ে। আমি আগে কখনো তাঁকে দেখিনি।

—আগে তাকে কখনো দেখনি? বয়স কত হবে?

—আজ্ঞে বিশ-পঁচিশ হবে, আমি ঠিক আন্দাজ পাইনি।

—চোখে চশমা ছিল? গোঁফ-দাড়ি কামানো?

কানাই আরও কুণ্ঠিত হয়ে বলে, আজ্ঞে তিনি পুরুষমানুষ নন, হুজুর, আর চশমাও চোখে ছিল না।

—পুরুষ নয়! বিশ-পঁচিষ বছরের যুবতী? ট্যাক্সি করে একা এসেছিল?

—আজ্ঞে, একা এসেছিলেন একথা তো আমি বলিনি হুজুর। ট্যাক্সিতে আর একজন ষণ্ডামার্কা লোক ছিল। সে লোকটারও চোখে চশমা ছিল না। তার দাড়ি-গোঁফ দুইই কামানো। ঈ-য়া দশাসই চেহারা। সে ছিল ট্যাক্সি-ড্রাইভারের পাশের সিটে। তার হাতে ধরা ছিল একটা র‍্যাশন ব্যাগ। লোকটা ট্যাক্সি থেকে নেমে ব্যাগটা ওই বাইজির হাতে—

—বাইজি! এই যে বলছিলে মেহ্মান?

—আজ্ঞে বাইজি কি মেহ্মান হতে পারে না, হুজুর?

—তা সে বাইজি কোথায় গেল?

—আমি তা জানি না হুজুর। তাঁকে সাহেবের কাছে দোতলায় পৌঁছে দিয়েছিলাম। তারপর আমি আউট-হাউসে চলে যাই। ওখানে সাহেবের জন্য মাছের চপ গড়ে রেখেছিলাম। বিকালের জলখাবার। সেগুলোই ভাজতে বসি। বাইজি যে চা-খাবারের জন্য অপেক্ষা না করে সুট করে সরে পড়তে পারে তা আমি আন্জাদই করতে পারিনি হুজুর!

—আজ সন্ধ্যায় কি এখানে গান-বাজনার আসর বসানোর কথা ছিল? বাইজি একা একা এল, তার সঙ্গে তবল্‌চি বা সারেঙ্গী এল না? তাছাড়া তোমার সাহেব কি একা-একাই জলসা বসাতে চেয়েছিলেন নাকি?

—আজ্ঞে, এ সব কথা উকিলবাবু জানেন। আমি জানি না।

'উকিলবাবু' বলতে কেশবচন্দ্র। জনার্দন জানার বড়বিবির সহোদর।

—ঠিক আছে, সেকথা না হয় কেশববাবুর কাছেই জানতে চাইব। তুমি বরং বল, ট্যাক্সিটা কি বাইজিকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে গেল? আর সেই ষণ্ডামার্কা লোকটা কোন দিকে গেল? ব্যাগটা বাইজের হাতে ধরিয়ে দিয়ে? আবার কি ট্যাক্সিতেই উঠে বসল?

—আজ্ঞে, সেসব আমি নজর করে দেখিনি, হুজুর।

—কেন দেখনি? সেই ষণ্ডামার্কা লোকটাই তো সবচেয়ে সন্দেহজনক। বাইরের বেগানা লোক—তুমি বলছ দশাসই চেহারা—

—তা আমি কি তখন জানি যে, কত্তামশাই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে খুন হয়ে যাবেন?

—বুঝেছি! তুমি তখন বিশ-বাইশ বছরের বাইজির দিকেই লক্ষ্যভেদী অর্জুনের মতো নিবদ্ধদৃষ্টি। তা হোক, মেয়েটির হাতে যে ঝোলা ব্যাগটা ছিল, তার ভিতরে কি ছিল?

—তা আমি কেমন করে জানব হুজুর? আমি তা দেখতে চাইনি। ট্যাক্সিটা বিকেলবেলা গেটের সমুখে এসে দাঁড়াল, আমি তখন বাগানে গাছের গোড়া নিড়িয়ে দিচ্ছি। ট্যাক্সিতে-বসা ওই ষণ্ডামার্কা লোকটা জানতে চাইল—এ বাড়িটার নাম 'জলসাঘর' কি না? আমি বললাম, হ্যাঁ। ও তখন জানতে চাইল মালিক জানামশাই আছেন কি না। আমি তা স্বীকার করায় সে ট্যাক্সি থেকে নেমে এল, পিছনের দরজা খুলে বাইজিকে নামতে সাহায্য করল, তার হাতে র‍্যাশন ব্যাগটা ধরিয়ে দিল আর আমাকে বলল, এঁকে তোমার সাহেবের কাছে নিয়ে যাও। আমি তাই নিয়ে এলাম। সাহেব তখন দোতলার বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বাইজিকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে দেখে নিজেও উঠে দাঁড়ালেন, ভিতর নিয়ে গিয়ে বসালেন। বাইজি বোধহয় বাথরুমে যেতে চাইল। সাহেব আমাকে বললেন, সাড়ে পাঁচটা নাগাদ চা-টা নিয়ে আসিস। দুজনের জন্যই। আমি নিচে এসে দেখি ট্যাক্সিটা চলে গেছে। সেই ষণ্ডামার্কা লোকটকেও আর দেখতে পাইনি। সেও ওই ট্যাক্সিতেই নিশ্চয় ফিরে গেছিল বোধহয়।

—জানামশায়ের মৃতদেহটা আমি যেখানে পড়ে থাকতে দেখেছি সেখানেই পড়েছিল? ওই ভাবেই?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! আমি ওঁকে ছুঁইনি। চা-খাবারের ট্রে-টা টেবিলে চট করে নামিয়ে রেখেই আমি নিচে নেমে আসি বাড়িতে টেলিফোন করতে। এর বেশি আমি আর কিছু জানি না, হুজুর।

—মেয়েটি যে বাইজি তা তুমি কেমন করে জানলে?

—আজ্ঞে সেরেফ আন্‌জাদে। তা নাও হতে পারে।

—সে কি শাড়ি পরে ছিল?

—আজ্ঞে না। মুসলমানী ঢঙের শেরওয়ানি-চুস্ত, ওড়না। তাতেই আন্‌জাদ করেছিলাম ও নির্ঘাৎ বাইজি—ঘরানা-ঘরের ঔরৎ নয়।

এরপর জবানবন্দি দেন কেশবচন্দ্র। তিনি স্বীকার করেন যে, ওই স্ত্রীলোকটি বাইজিই। কী নাম তা ওঁর মনে নেই। তবে ঘটনার সন্ধ্যায় তার মুজরো ছিল। বর্ধমানের তিন-চারজন সঙ্গীতরসিকের নিমন্ত্রণও ছিল। কেশবচন্দ্রকেও নিমন্ত্রণ করেছিলেন জনার্দন। কিন্তু ঘটনাচক্রে দিন-চারেক আগে কাশী থেকে একটি পত্র আসে যে, সেখানে জর্নাদনের জ্যাঠতুতো

বড়ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী মারা গেছেন। তাই অশৌচ পড়ে যাওয়ায় জলসাটা বাতিল করতে হয়। বর্ধমানের অন্যান্য সবাইকে খবর দেওয়া হয়; কিন্তু বাইজিকে খবর দেওয়া যায়নি। জনার্দন যাকে সংবাদ দিতে কলকাতা পাঠিয়েছিলেন সে হতভাগা বাইজির ঠিকানাই খুঁজে পায়নি। তাই নাকি কেশবচন্দ্রের জামাইবাবু দুপুরবেলাতেই 'জলসাঘরে' চলে আসেন। বাড়ির গাড়িতেই। ড্রাইভার ওঁকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে যায়। কথা ছিল, রাত সাতটা নাগাদ ড্রাইভার ওঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। বাইজি যদি আসে তাহলে সন্ধ্যার আগেই আসবে। তাকে কিছু আপ্যায়ন করে এবং নগদ বিদায় দিয়ে কলকাতায় ফেরত পাঠানো হবে।

জব্বর জানতে চান, আপনাদের অশৌচ হলে তো শেভিং করা গুনাহ্ বলে ধরা হয়। তিন-চার দিন জানামশায়েক অশৌচ চলছে অথচ ডেড-বডি দেখে তো মনে হলো উনি ক্লীন-শেভড অবস্থায় বেহেস্তে চলে গেছেন।

কেশব একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলেন, জামাইবাবু সাজপোশাক বিষয়ে একটু বেশি শৌখিন ছিলেন। প্রতিদিন ক্ষৌরি না করলে রাতে তাঁর ঘুম হতো না, অসোয়াস্তি হতো।

—তাই বুঝি? বিশেষ সন্ধ্যেবেলা এক সুন্দরী বাইজির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনা রয়েছে যখন। কিন্তু কানাই বলল, সে বিকালে তার সাহেবের জন্য মাছের চপ বানিয়ে এনেছিল। অশৌচ অবস্থাতেও দৈনিক মাছ-মাংসের খাদ্য না পেলে কি ওঁর ঘুমের ব্যাঘাত হতো?

কেশববাবু একটু হেসে বললেন, এই সওয়ালের জবাব পেতে হলে আপনাকে কষ্ট করে একবার বেহেস্তে যেতে হবে পুলিশ-সাহেব। এটা আমি প্রত্যক্ষ জ্ঞানে জানি না, জানাই জানাতেন।

জব্বর গম্ভীর হয়ে বলেন, জলসাতে বর্ধমানের আর কোন কোন সঙ্গীতপ্রিয়র নিমন্ত্রণ ছিল?

—সেটাও আমার জানা নেই স্যার, জানাই জানতেন।

—বাইজির নামটা কী?

—আগেই বলেছি, আমি জানি না। নির্মল হয়তো জানে, কারণ সেই বাইজিকে কলকাতায় খবর পাঠিয়েছিল। যদিও খবরটা পৌঁছায়নি।

এরপর এজাহার দিতে এল মৃতের বড় ছেলে নির্মল। সেও কেশববাবুর কথা করোবরেট করে। অর্থাৎ সেদিন সন্ধ্যায় জলসার আয়োজন হয়েছিল। কিন্তু বড় জেঠিমার মৃত্যুসংবাদ আসায় সেটা বাতিল করতে হয়। নির্মলের বাবা মধ্যাহ্ন আহারান্তে জলসাঘরে এসেছিলেন। উদ্দেশ্য : বাইজি যদি সন্ধ্যার আগে এসে পড়ে, তবে তাকে কিছু নগদ-বিদায় দিয়ে ফেরত পাঠানো।

জব্বর জানতে চাইলেন, শহরের আর কার-কার নিমন্ত্রণ ছিল? যাঁদের আপনি খবর পাঠান যে, জলসার প্রোগাম ক্যানসেল হয়ে গেছে।

নির্মল বলে, আমার ঠিক মনে পড়ছে না স্যার, খাতাপত্র দেখে বলতে পারব।

জব্বর অবাক হয়ে বলে, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? তাঁরা শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি। আপনার বাবার বন্ধু। তাঁদের আপনি একদফা নেমতন্ন করলেন বাপজানের আদেশে; আবার একদফা সে নিমন্ত্রণ ক্যানসেলও করলেন। অথচ খাতাপত্র না দেখে একটা নামও বলতে পারছেন না?

—পারছি না! সে অপরাধে কি আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করতে চান? আমার মনের অবস্থাটা আপনি বুঝতে পারছেন না?

ছয়

মৃতদেহ মর্গে পাঠিয়ে জব্বর যখন ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের বাড়িতে আসেন তখন রাত সাড়ে সাত। তারামাতলায় এ-পাড়াটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা। তবে ডঃ মৈত্রের বাড়িটা 'জলসাঘরে'র প্রায় বিপরীতেই বলা চলে। জমিদারেরই বাড়ি ছিল এটা। জমিদারের এক অকৃতদার নায়েব এই দ্বিতল বাড়িতে বাস করতেন। তাঁর প্রয়াণের পর ডক্টর মৈত্রের পিতৃদেব গগনচন্দ্র মৈত্র বাড়িটা কিনে নিয়েছিলেন। একতলায় তিনটি ঘর, দ্বিতলে একটি। তবে বর্তমানে বাড়িতে ওঁরা লোকও বেশি নন। ডাক্তারবাবুর বিধমা মা, স্ত্রী আর একটি ছোট বোন : তারাসুন্দরী। স্ত্রী মেমসাহেব। বিলেতে বিদ্যাজর্নের সময় এটি রবিনবাবুর 'কন্‌জুমার্স সারপ্লাস', অর্থাৎ সাদা বাঙলায় ডিগ্রির সঙ্গে : ফাউ। মুফ্‌ৎ! যদিও বছর তিনেক বিবাহ হয়েছে তবু ওঁদের এখনো কোনও সন্তানাদি হয়নি। ছোট বোনটি স্থানীয় কলেজে পড়ে।

কলবেল বাজানোতে দরজা খুলে দিলেন মিসেস সুজান মৈত্র। বৈঠকখানায় বসালেন জব্বর আর তাঁর শাগরেদকে। ভিতরে চলে গেলেন ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে। জব্বর লক্ষ্য করে দেখলেন, বৈঠকখানা ঘরটা আকারে বেশ বড়। সদর-দরজার সামনেই, ঘরের মাঝামাঝি একটা কার্ড-টেবিল। তার চারপাশে চারখানি চেয়ার। বেশ বোঝা যায়, একটু আগে এখানে তাসের আসর বসেছিল। তিনদিকে তিনটি তের-তাসের হাত উপুর করে রাখা। চতুর্থ হাতটা—দরজার বিপরীতের হাতটা—নিশ্চয় ছিল 'ড্যামি'-র। সেখানে তাস চিৎ করে বিছানো রয়েছে। কিন্তু প্রথম ডিল পেড়ে খেলা শুরু হয়নি। যে-কোনো কারণেই হোক, এই সময় হঠাৎ খেলা বন্ধ হয়ে যায়। তাসগুলো আর গুছিয়ে প্যাকেটে ভরার সময় অথবা মেজাজ কারও ছিল না।

একটু পরেই ডাক্তার মৈত্র এলেন। দীর্ঘদেহী। সুঠাম চেহারা। চোখে রিমলেস চশমা। পরনে পায়জামা। ঊর্ধ্বাঙ্গে একটি সিল্কের গাউন। তিনি তাঁর জবানবন্দি দিলেন—

শরীরটা ভাল না থাকায় ডাক্তারবাবু সেদিন চেম্বারে যাননি। দিবানিদ্রা দিয়েছিলেন। বিকালে এক-এক কাপ চা নিয়ে ওঁরা চারজনে বৈঠকখানায় তাস খেলতে বসেন। অক্‌শান ব্রিজ। বেলা তখন তিনটে বা চারটে। খেলছিলেন ওঁরা বাড়ির কজনই—ডাক্তারবাবু আর তাঁর মা খেঁড়ি হয়েছিলেন। তারাসুন্দরী আর তার বৌদি ওঁদের বিপরীতে। ঘণ্টাখানেক তাস খেলার পর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। বাইরে তখন ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। বস্তুত সকাল থেকেই বর্ষা লেগে আছে। ডাক্তারবাবু বসেছিলেন দরজার বিপরীতে। সদর দরজা খোলাই ছিল। হঠাৎ ডাক্তারবাবুর নজর হলো—সামনের ওই জলসাঘর থেকে একজন মহিলা পড়ি-তো-মরি করে ছুটে আসছেন। তাঁর পরনে সালোয়ার-চুস্ত—ওড়নাটা কাদায় সপ্‌সপে, হাতে একটা ভ্যানিটি ব্যাগ। ডাক্তার মৈত্র সবিস্ময়ে উঠে দাঁড়ালেন। মেয়েটি— মহিলাটিই বলা উচিত—ছুটতে ছুটতে আসছিলেন। এ বাড়ির সদর-দরজার কাছাকাছি এসে জলকাদায় তাঁর পা পিছলে গেল। উনি হুমড়ি খেয়ে পড়লেন চৌকাঠের উপর। ওঁরা ধরাধরি করে মহিলাটিকে ঘরে নিয়ে এলেন। ডাক্তার-জননী বাসন্তী দেবী ঝুঁকে পড়ে বলেন, কী হয়েছে মা! তুমি অমন করে...

মহিলাটি জলসাঘরের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে শুধু বললে : খুন!

বলেই সে অজ্ঞান হয়ে যায়।

একটু পরেই অবশ্য সে জ্ঞান ফিরে পায়। ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মতো তাকে ধরাধরি করে দ্বিতলে নিয়ে যাওয়া হয়। তারাসুন্দরী তার ভিজে জামা-কাপড় ছাড়িয়ে নিজের এক সেট

শাড়ি-ব্লাউজ পরিয়ে দেয়। এক গ্লাস হর্লিক্স খেয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়েই মেয়েটি বলে জলসাঘরে জনার্দন জানা খুন হয়ে গেছেন। সে নাকি স্বচক্ষে তাঁকে মৃতাবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছে। ডাক্তারবাবু মেয়েটিকে প্রশ্ন করে যেটুকু জানতে পেরেছেন তা এই :

ওর নাম মিস শশী মুখার্জি। থাকে কলকাতায়। ও পেশাদার বাইজি। আজ সন্ধ্যায় তার মুজরো ছিল ওই জলসাঘরে। সে কলকাতা থেকে সকাল দশটা তিনের লোকালে রওনা হয়ে বর্ধমানে আসে। স্টেশান থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা তারামাতলায় চলে আসে। একটু জিজ্ঞাসাবাদ করতেই লোকজন চিনিয়ে দেয় জনার্দন জানার জলসাঘরটা। তারপর সেই বাড়ির দারোয়ান ওকে জলসাঘরের ভিতরে নিয়ে যায়। দোতলায় একটা ইজি-চেয়ারে বসেছিলেন মালিক। শশী ইতিপূর্বে তাঁকে কখনো দেখেনি, ফটোও দেখেনি। ভদ্রলোক কিন্তু ওকে চিনতে পারেন। অনেকদিন আগে কোন জলসায় বুঝি তিনি ওর ঠুংরি শুনেছিলেন। জনার্দনবাবু ওকে আপ্যায়ন করে বসালেন; কিন্তু জানালেন তাঁর হঠাৎ একটা মৃতাশৌচ পড়ে যাওয়ায় জলসার অনুষ্ঠানটা বাতিল করতে হয়েছে। তিনি ওর যাতায়াত খরচ ও খেসারত বাবদ কিছু টাকা দিতে চান। শশী তখন তাঁকে বলে, তাহলে সে তখনি কলকাতা ফিরে যেতে চায়। জমিদারবাবু বলেন, বেশ তো, তাহলে কিছু চা-জলখাবার খেয়ে যাও। শুধুমুখে তো আমি তোমাকে বিদায় দিতে পারি না। এই বলে, যে দারোয়ানটি ওকে দোতলায় পৌঁছে দিয়েছিল তাকে বলেন চা-টা নিয়ে আসতে। মিনিট পনের আলাপের পর জনার্দন বলেন, তুমি খালি গলাতেই একখানা গান শোনও বরং। মেয়েটি রাজি হয় না। বলে, আপনি বরং চাকরকে চা-খাবারের বন্দোবস্ত করতে বারণ করুন। আমি একা-একা ফিরব তো—বেশি রাত হয়ে গেলে অসুবিধা হবে। তাতে জনার্দন বলেন, আজ রাতে তো তোমার ফেরার কথা ছিল না শশী। গান-বাজনা হলে রাতটা তো তোমাকে থেকে যেতেই হতো। বাইজি রুখে ওঠে, তা আমি থাকব কোথায়? ওই খাটে ? আপনি আর আমি? জনার্দন হেসে বলেন, তা কেন? তুমি একাই থাকবে। ভিতর থেকে ছিটকানি দিয়ে। আমার তো অশৌচ চলছে! আমি আমার বাড়িতেই ফিরে যাব। এইসব কথাবার্তা হতে হতে আরও অনেকটা সময় কেটে যায়। তারপর মেয়েটি বলে, ওই দরজাটা কি বাথরুমের? জনার্দন বলেন, হ্যাঁ, তুমি যাবে? যাও না। মেয়েটি দরজা খুলে বাথরুমে যায়। লোকাল ট্রেনে বাথরুম থাকে না। বর্ধমান স্টেশনেও সে তাড়াহুড়ো করে ট্যাক্সি ধরেছিল। এখন বাথরুমে ঢুকে দেখে স্নানঘরের ওদিকে আরও একটা দরজা আছে। তাতে অবশ্য ছিটকানি লাগানো। ও বাথরুমে থাকতে থাকতেই টের পায় ও-ঘরে জমিদারমশাই কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। পুরুষকণ্ঠ; কিন্তু কথাবার্তা কী হচ্ছে ও বুঝতে পারে না। ও ইচ্ছে করেই দেরি করে বেরিয়ে আসতে। আশা করে, জমিদারবাবু ওই উট্‌কো লোকটাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করে দেবেন। তখনি ওর মনে হয়, পাশের ঘরে একটা বচসা চলছে। দু-চারটি উষ্ণ বাক্যবিনিময়ের পরেই পর পর দুটি অপ্রত্যাশিত শব্দ—প্রথমটি যেন আঘাতজনিত, দ্বিতীয়টি পতনজনিত। তারপরেও সে পুরো এক মিনিট অপেক্ষা করে—এইসময় সে একটি পদশব্দ শুনতে পায়। দ্রুতগতিতে বারান্দা দিয়ে এবং সিঁড়ি দিয়ে কে যেন হেঁটে নেমে গেল। তারপর চরাচর একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে যায়। সাহসে ভর করে মেয়েটি দরজা খুলে ঘরে ফিরে আসে। দেখে, জনার্দন জানা মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর মাথার পিছন দিকটা থেঁৎতে গেছে; আর তা থেকে ঝলকে ঝলকে রক্ত বার হয়ে আসছে। এই অদ্ভুত এবং বীভৎস দৃশ্যটা দেখে মেয়েটি বজ্রাহত হয়ে যায়। তার প্রচণ্ড ভয় করে এবং গা গুলিয়ে ওঠে। খুব তাড়াতাড়ি হাতব্যাগটা তুলে নিয়ে মেয়েটি বারান্দায় বার হয়ে আসে। কাউকে দেখতে পায় না। নিচে নেমে এসে দেখে বাইরে তখনো ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হয়েই চলেছে। আবার সে চারিদিকে

তাকিয়ে দেখে। জনমানবের সাড়াশব্দ পায় না। জমিদারমশায়ের সেই দারোয়ানটা বোধকরি আউট-হাউসে তার ঘরের ভিতর। মেয়েটি ভেবেচিন্তে কিছু করেনি। প্রাণধারণের তাগিদে কাজ। ওই বীভৎস মৃতদেহটার কাছ থেকে সে দূরে চলে যেতে চেয়েছিল। সুরকির রাস্তাটা পার হয়ে গেট খুলেই তার নজরে পড়ে সামনের একটি বাড়িতে সদর দরজা খোলা। সন্ধ্যার অন্ধকার তখনো ঘনায়নি। ও দেখতে পায়, চারজন লোক একটা টেবিলকে ঘিরে বসে আছেন। কিছু না ভেবেই সে ওইদিকে ছুটতে শুরু করে। সিঁড়ি বেয়ে সে বাড়ির দাওয়ায় উঠে আসতে গিয়ে পা-পিছলে পড়ে যায়। তারপর আর কিছু সে জানে না। বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যায়।

জব্বর সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে চান; কিন্তু ডাক্তারবাবু বলেন, তাকে কড়া ঘুমের ইনজেকশান দেওয়া হয়েছে—ঘণ্টা আট-দশ সে অঘোরে ঘুমাবে। তারপরেও তাকে এ বিষয়ে জেরা করা ঠিক হবে কিনা তা পরদিন সকালে পরীক্ষা করে বোঝা যাবে।

জব্বর বলেন, আপনি তো বুঝতেই পারছেন, স্যার, এই জনার্দন জানার বীভৎস মৃত্যুটা জানাজানি হলেই বর্ধমানে একটা বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। পুলিশের বড়কর্তারা হুমড়ি খেয়ে পড়বেন। রাজনৈতিক নেতার দলও! আপনি আজ সন্ধ্যায় ডাক্তার হিসেবে বাধা দিলে আমি নাচার। কিন্তু কাল সকালেই আমি ফিরে আসব। তখন আর বাধা দেবেন না। দিলে, আমি সিভিল সার্জেনকে কল দিতে বাধ্য হব। আর কিছু মনে করবেন না স্যার, আজ রাত্রে আপনার বাড়ির বাইরে আমি কিছু আমর্ড গার্ড-এর ব্যবস্থা করব। ওই স্টার-উইটনেস্ যদি রাতারাতি হাওয়া হয়ে যায় তাহলে ওই সঙ্গে আমার সাতাশ বছরের চাকরিটাও হাওয়া হয়ে যাবে।

—কিন্তু ওই মহিলাটি প্রত্যক্ষজ্ঞানে যেটুকু জানে, যেটুকু সে স্বচক্ষে দেখেছে, তা তো আমাকে বলেইছে। আপনি নতুন করে ওর কাছে আর কী জানতে চান?

—অনেক-অনেক প্রশ্ন, স্যার। প্রথম প্রশ্ন : হাওড়া থেকে কর্ড লাইনে বর্ধমান পর্যন্ত ভাড়াটা কত?

—এই প্রশ্নের অর্থ?

—আমার ধারণা, বাইজি সেটা জানে না। বলতে পারবে না। ও একা আসেনি। যে লোকটা ওকে নিয়ে এসেছিল সেই টিকিট-মিকিট কাটে। ট্যাক্সি ভাড়া মেটায়। সে লোকটা কে, কখন সে পালিয়ে গেল জানা দরকার।

—ও যে একা-একা আসেনি এটা মনে করছেন কেন?

—ডাক্তারসাব! আমার বড়ি-আব্বা যখন ঠ্যাঙ ভেঙেছিলেন তখন আপনিই একতরফা সাওয়াল করতেন, আমি জবাব দিতাম। এখন আমাদের অবস্থানটা বদলে গেছে। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন : আজ বেলা সাড়ে বারোটা থেকে বিকাল চারটে পর্যন্ত মেয়েটি কোথায় ছিল? হিসাব জুড়ে নিন ডাক্তারসাব—দশটার লোকাল বর্ধমানে পৌঁচেছে সাড়ে বারোটায়। স্টেশনেও সে টয়লেটে যাবার সময় পায়নি। কেমন? তড়িঘড়ি ট্যাক্সি ধরে তারামাতলার দিকে রওনা হয়। তাহলে ট্যাক্সিতে এই চার মাইল রাস্তা—স্টেশান টু জলসাঘর—আসতে তার কেন চার ঘন্টা সময় লাগল?

—হয়তো সে দুপুরে কোনো হোটেলে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে খেয়ে নিয়েছে।

—চার ঘন্টা ধরে? খুব ধীরেসুস্থে খেয়েছে বলতে হবে। বেশ, তা থাক। সেক্ষেত্রে কোন হোটেলে? কী কী খেয়েছে তা তাকে বলতে হবে। যাতে আমি হোটেলে গিয়ে তদন্ত করে দেখতে পারি।

—আপনি কি সন্দেহ করছেন মিস্ মুখার্জিই খুনটা করেছেন।

—আজ্ঞে না। সেটা তাঁর ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় ওই জাতীয় বাইজি কক্ষণো অরক্ষিতা অবস্থায় বাড়ির বাইরে পা বাড়ায় না। ট্রেনে চাপা তো অসম্ভব। অথবা একা-একা ট্যাক্সি ভাড়া করা। আমার খবর বাইজির সঙ্গে একজন ষণ্ডামার্কা দেহরক্ষী এসেছিল। কীভাবে তা জেনেছি তা জানতে চাইবেন না। সে লোকটাই টিকিট-মিকিট কাটে, ট্যাক্সি ভাড়া করে। লোকটা ওকে জলসাঘরে পৌঁছে দিয়েই ঘাপ্‌টি মারে। সচরাচর এইসব বাইজি বা দেহব্যবসায়ীর যারা রক্ষক হয় তারা সমাজবিরোধী। খুন-জখম-ডাকাতির মেয়াদ-খাটা গুণ্ডা! সুতরাং জানা দরকার :লোকটা কে, সে কখন জলসাঘর ছেড়ে চলে যায়; এবং কেন সে ওই অরক্ষিতা মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেনি। একা-একা এভাবে কেটে পড়ল?

—আপনি নিশ্চিত যে, মিস্ মুখার্জি একা আসেননি? তাঁর সঙ্গে একজন সঙ্গী ছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চিত। লোকটার হাতে একটা র‍্যাশান ব্যাগের থলিও ছিল। তার ভিতর কোনও পাথর-ভাঙা হাতুড়ি ছিল কিনা এটা অবশ্য এখনো প্রমাণিত হয়নি। আপনার পেশেন্টকে কবুল করতেই হবে যে, সে একা আসেনি। তাহলে কার সঙ্গে এসেছিল? সে লোকটা কখন পালিয়ে গেল? তার সঙ্গে ওর কী বন্দোবস্ত ছিল? জলসা শেষ হতে রাত বারোটা বেজে যেত নিশ্চয়—সেক্ষেত্রে বর্ধমানে ও কোথায় রাত্রিবাস করত? ওই বাইজি আর তার এস্‌কর্ট্?

—এসব প্রশ্ন কি প্রাসঙ্গিক?

—আলবাৎ রেলিভেন্ট। মিস্ মুখার্জি তাঁর জবানবন্দিতে বেশ কিছু মিছে কথা বলেছেন। আমার জানা দরকার কতটা। আমার বিশ্বাস—ওর সেই ষণ্ডামার্কা এস্‌কর্ট্‌টাই আসল খুনী। হয়তো সে বর্ধমানেরই লোক, জনার্দন জানার পূর্বপরিচিত। হয়তো সে ওই অত্যাচারী জমিদারের দ্বারা নিগৃহীত। প্রতিশোধ নেবার সুযোগ নিতেই সে শশী-বাইজির রক্ষক হিসেবে এসেছিল। দারোয়ানটা যখন আউট-হাউসে মাছের চপ ভাজতে চলে যায় এবং ঝেঁপে বৃষ্টি নামায় পথঘাটে মানুষজনও বিরল হয়ে পড়ে, তখন সে একটা পাথর-ভাঙা হাতুড়ি-হাতে নিঃসাড়ে দোতলায় উঠে আসে। বাইজি তখন টয়লেটে। এই সমাধানটা সত্য কিনা আমাকে যাচাই করে দেখতে হবে। গুড নাইট স্যার! কাল সকালেই আমি আবার আসব।

পরদিন প্রতিশ্রুতি মতো সে ডাক্তার-সাহেবের বাড়ি ফিরে আসে। ডাক্তার সাহেব জানান, ইতিমধ্যে ওঁর পোর্টেবল এক্সরে যন্ত্রে দেখা গেছে মেয়েটি ফিমার বোনে একটা হেয়ার-ক্র্যাক হয়েছে। তাকে পনের দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। তাছাড়া সে প্রচণ্ড মেন্টাল শক্‌ও পেয়েছে। সে যাই হোক, ডাক্তার-সাহেবের অনুমতি নিয়ে জব্বর বাইজিকে কিছু প্রশ্ন করেন। মেয়েটি এবার স্বীকার করে যে, সে একা আসেনি। তার সঙ্গে একজন পুরুষ সঙ্গী ছিল। তার প্রকৃত নাম, পরিচয় বা ঠিকানা সে জানে না। যিনি ওই বাইজির অভিভাবক তিনিই তার ব্যবস্থা করে দেন। অভিভাবকের নাম-ঠিকানা সে জানাতে অস্বীকার করে। কলকাতার ঠিকানাও সে জানায় না। জব্বর এ বিষয়ে পীড়াপীড়ি করেননি, কারণ তিনি জানতেন, নির্মল জানার কাছ থেকে সে তথ্য পাওয়া যাবে। তবে শশী-বাইজি বলে তার বাদবাকি এজাহারে কোনও মিছে কথা নেই। লোকটি ওকে পৌঁছে দিয়ে চলে যায়। লোকটা কখন জলসাঘর ছেড়ে যায় তা শশী জানে না। বর্ধমান স্টেশান থেকে তারামাতলায় আসতে তার কেন চার ঘন্টা সময় লাগল সে প্রশ্নের জবাবও মেয়েটি দেয়নি। এ প্রশ্নের জবাবে বলে যে, সে একজন উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে জবাব দেবে।

সমস্ত বিবরণটা শুনে, বাসু-সাহেব বললেন, আমিই তার সলিসিটার হিসাবে নিযুক্ত হয়েছি। ওর কাজিন-ব্রাদার আমার সঙ্গী এই সুরেশচন্দ্রই আমাকে এনগেজ করেছেন। আমি একবার মেয়েটির সঙ্গে এখন দেখা করতে চাই। আপনি টেলিফোনে ডাক্তার মৈত্রকে একটা খবর দিন।

সেই মতোই ব্যবস্থা হলো। টেলিফোনে সাড়া দিল ডাক্তারবাবুর ছোট বোন। দুর্ভাগ্যবশত ডক্টর মৈত্র বাড়ি নেই। গাড়ি নিয়ে আসানসোল চলে গেছেন। বার্নপুরে একজন অফিসারের মা পড়ে গিয়ে পা ভেঙেছেন। উনি সেখানেই গেছেন। কখন ফিরবেন বলা যাচ্ছে না। তবে ব্যারিস্টার-সাহেবের পরিচয় পেয়ে এবং তিনি মিস্ মুখার্জির কাজিন-ব্রাদার সুরেশচন্দ্র কর্তৃক সলিসিটার হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন শুনে মেয়েটি তাঁকে তারামাতলায় আসতে বলল।

সুরেশচন্দ্র একটা হোটেলে উঠলেন। প্রথমেই তাঁর পক্ষে মিস্ মুখার্জির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়—বিশেষ যখন সে ইতিপূর্বেই এ বিষয়ে বারণ করেছে।

স্থির হলো, বাসু একটা ট্যাক্সি নিয়ে তারামাতলায় ডাক্তার-সাহেবের ডেরায় যাবেন। সুরেশের গাড়িতে নয়। সেটা শশী-বাইজির পরিচিত গাড়ি। তাতে শশী সন্দেহ করতে পারে যে, তার নিষেধ অগ্রাহ্য করে সুরেশচন্দ্র বর্ধমানে এসেছে। অসুস্থ মেয়েটির তাতে কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

সাত

'জলসাঘরের' বিপরীতে রাস্তার ওদিকেই রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের ভদ্রাসন। নেমপ্লেটে পরিচয় ঘোষিত। তাছাড়া ট্যাক্সি-ওয়ালা বাড়িটা চেনে। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে বাসু-সাহেব এগিয়ে এসে ডোরবেল বাজালেন। একটু পরেই দরজা খুলে দিল বিশ-বাইশ বছরের একটি সুশ্রী মেয়ে। বাসু অনায়াসে তাকে চিনতে পারেন—ডাক্তারবাবুর কলেজে-পড়া ছোট বোন। মেয়েটিও চিনতে পারে ওঁকে। একটু আগেই সে নিজেই টেলিফোনটা ধরেছিল। ওঁর আগমন-প্রতীক্ষাতেই ছিল। বললও সে-কথা, আপনি নিশ্চয় ব্যারিস্টার বাসু? মিস্ মুখার্জির সলিসিটার?

বাসু মাথা থেকে টুপিটা খুলে 'বাও' করে বলেন, আপনি নিশ্চয় মিস্ তারাসুন্দরী মৈত্র। এখানকার কলেজের ছাত্রী।

মেয়েটি হেসে বলে, ওব্বাবা! আপনি আমাকে চোখে দেখেননি, তবু নাম-ধাম জেনে ফেলেছেন?

বাসু বললেন, এ কথাটা তো আমিও বলতে পারতাম আপনাকে। কী জানেন? পরিবেশ অনেক সময় মানুষের পরিচয় বহন করে। জীবনে যাঁকে চোখে দেখেননি তাঁকে মধ্য-অফ্রিকায় একপাল নিকষকালো কাফ্রির মধ্যে একমাত্র শ্বেতাঙ্গরূপে আবিষ্কার করে স্ট্যানলি-সাহেব তো অনায়াসে বলতে পেরেছিলেন, 'ডক্টর লিভিংস্টোন, আই প্রিজিয়ুম?'

তারা হেসে ফেলে। একঝাঁক কুন্দশুভ্র দাঁতের সারি।

ইতিমধ্যে বাসন্তী দেবীও এগিয়ে এসেছেন। বলেন, দাঁড়িয়ে কেন বাবা, বস।

মেয়েটির দিকে ফিরে তাকে একটা মৃদু ধমক দেন, আগে তো বসতে বলবি।

তারা বললে, সরি! বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বললে, আইয়ে সাব, পাধারিয়ে।

বাসু সঙ্গে সঙ্গে তাকে বলেন, বেশ বোঝা যায়, বাংলাদেশ পার হয়ে এখনো বিহারে ঢুকিনি। আমি ঘরের ভিতরে এসে গেছি, 'পাধারিয়ে' মানে 'পদার্পণ করুন' বা 'ভিতরে

আসুন'—'বসুন' নয়। তারপর বাসন্তী দেবীর দিকে ফিরে বলেন, আমি কেন এসেছি নিশ্চয় জানেন? আপনাদের বাড়িতে যে মেয়েটি পায়ের হাড় ভেঙে বাধ্যতামূলকভাবে অতিথি...

—হ্যাঁ, বাবা জানি। বস তুমি ওই সোফাটায়। কিন্তু মুশকিল হয়েছে যে, রবি তো বাড়িতে নেই, বউমাও গেছে তার সঙ্গে। অথচ...

—অথচ কী?

—রবি বারণ করে গেছে, পুলিশ, সংবাদপত্রের রিপোর্টার বা জনার্দনের আত্মীয়-বন্ধু কেউ এসে যদি ওই মেয়েটির...

বাসু বাধা দিয়ে বলেন, কিন্তু আমি তো ও-তিনের বার। আমি মিস্ মুখার্জির তরফেরই সলিসিটার। কাগজপত্র সব দেখাচ্ছি।

বৃদ্ধা কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, সবই বুঝছি বাবা, কিন্তু রবি কিংবা বৌমা ফিরে আসার আগে আমরা ওটা পারব না। সে পইপই করে নিষেধ করে গেছে। তুমি পরে একবার বরং খোঁজ নিও। রাত আটটার মধ্যে ওরা এসে যাবে নিশ্চয়।

বাসু বলেন, তাহলে ঘণ্টা দুই পরেই না হয় এসে খোঁজ করব। অথবা টেলিফোন করব। দেখি, ট্যাক্সিটা কাছাকাছিই আছে কিনা।

তারাসুন্দরী বলে, হোটেলে গিয়ে তো বইপত্র বা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাবেন। মূল লক্ষ্য তো দু'ঘণ্টা সময় অপব্যয় করা? খেয়াল-খুশিতে? তা সেই সময়ের অপচয়টা এখানেও করতে পারেন। ঘণ্টা দুইয়ের তো মামলা। আমি বরং দু-কাপ চা বানিয়ে আনি। চা না কফি?

বাসু বলেন, আমার জন্য কফি। র। শুধু কফি কিন্তু।

লক্ষ্য করে দেখলেন ঘরের মাঝখানে জব্বরবর্ণিত সেই তাসের টেবিলে তাসগুলো এখনো সেভাবেই ছড়ানো রয়েছে। তেরজন চিৎ, বাদবাকি উবুর। কেউ গুছিয়ে তা প্যাকেটে তোলেনি। বাসু জানলার ধারে একটা সোফায় বসতে বসতে সে কথাই বললেন, তাসগুলো এখনো সেদিনের মতোই টেবিলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে দেখছি।

তারাসুন্দরী কফি বানাতে ভিতর বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, সেদিনের মতোই মানে? আপনি কী করে জানলেন?

—জব্বর সাহেব বলেছিলেন তিনি যখন তদন্তে আসেন তখনো তাসগুলো কার্ড-টেব্‌লে ওইভাবেই পড়ে ছিল। তারপর তো প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে—

বাসন্তী কৈফিয়ত দেন, এ দু'দিন কি আমাদের মাথার ঠিক ছিল, বাবা? একের-পর-এক পুলিশ, সংবাদপত্রের রিপোর্টার, পার্টির লোক, মিউনিসিপ্যালিটির হোমড়া-চোমড়া—

বাসু মেয়েটিকে বলেন, আপনারা তো অক্‌শান-ব্রিজ খেলছিলেন? কে কোথায় বসেছিলেন বলুন তো?

বাসন্তী বললেন, ওকে আবার 'আপনি' কেন? ও তো অনেক ছোট তোমার চেয়ে।

মেয়েটি বললে, শুধু বয়সে নয়, অভিজ্ঞতাতেও। কিন্তু আমরা কে কোথায় বসেছিলাম শুনতে আপনি এত আগ্রহী কেন?

—না, মানে, খোলা দরজার বিপরীতে কে বসেছিলেন? অর্থাৎ কে প্রথম মিস্ মুখার্জিকে জলকাদার মধ্যে ছুটতে ছুটতে আসতে দেখেন?

—ওই চেয়ারটায় বসেছিলেন দাদা। তিনিই প্রথমে দেখতে পান। আপনাকে কি কিছু ম্যাগাজিন দিয়ে যাব? কারণ মা তো এখন যাবে পুজো-ঘরে, আর আমি কফি বানাতে—

বাসু বললেন, না। আমি বরং ততক্ষণ একা-একা পেশেন্স খেলি। দেখি, চারটে সিরিজ বানাতে পারি কিনা।

বাসন্তী পুজো-ঘরে চলে গেলেন, মিস মৈত্র গেল কফি বানাতে। বাসু সোফা থেকে উঠে এসে কার্ড-টেবিলে বসলেন। তাসগুলো গুছিয়ে নিয়ে শাফ্‌ল করলেন; তারপর টেবিলে একা-একাই পেশেন্স খেলতে বসলেন। একটু পরেই তাঁর খেয়াল হলো টেবিলে তাসের সংখ্যা বাহান্ন নয়, একান্ন। উনি গুনে-গুনে হিসাব করে দেখলেন ইস্কাবনের বিবিটা নেই। টেবিলের এপাশ-ওপাশ খুঁজলেন কিন্তু না পেলেন হারানো স্পেডের বিবিকে, না তাসের শূন্যগর্ভ প্যাকেটটা। একটু পরেই দু-পেয়ালা কফি হাতে ফিরে এল মেয়েটি। বাসু তাঁর র-কফির কাপটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে সে-কথাই বললেন, কী ব্যাপার? টেবিলে সর্বসমেত একান্নখানা তাস দেখছি যে, ইস্কাপনের বিবিটা কোথায় গেল?

মিস্ মৈত্র বললে, সে কী? কই দেখি?

সেও গুনে দেখল। না ইস্কাপনের বিবি গা-ঢাকা দিয়েছে। সে উঠে গেল। ওপাশের টেবিলের ড্রয়ার থেকে টেনে বার করল তাস প্যাকেটের খোলটা। তাতে দু-খানা জোকারের সঙ্গে ইস্কাপনের বিবিও লুকিয়ে ছিল। বাসু বাকি তাসগুলো ওর হাতে দিয়ে বললেন, আর পেশেন্স খেলার দরকার নেই। এস, তোমার সঙ্গে বসে গল্পই করা যাক। ওপাশে একটা ঢাকা দেওয়া তানপুরা দেখছি। গানবাজনার শখটা কার? তোমার, না, তোমার দাদা? বৌদি তো মেমসাহেব, তানপুরা বাজান না নিশ্চয়।

তারাসুন্দরী বলল, গানবাজনার শখ আমারও আছে দাদারও আছে, কিন্তু তানপুরাটা ছিল বাবার। ওটা এ বাড়িতে দু-পুরুষের বাসিন্দা। বাবা খুব ভালো ক্লাসিকাল গাইতেন।

—তোমার বাবা? মানে গগনবিহারীবাবু? কত দিন মারা গেছেন তিনি?

—বছর পাঁচেক। দাদা তখন বিলেতে।

—এ বাড়িটা তো তিনিই কিনেছিলেন, তাই না? বছর সাতেক আগে? তার আগে তোমরা কোথায় থাকতে?

—বাবা ছিলেন সরকারি চাকুরে। যখন সেখানে বদলি হয়েছেন তখন সেখানেই থাকতাম। রিটায়ারমেন্ট নেবার পরেই বাবা এই বাড়িটা কিনে নেন।

বাসু সদর দরজার উপর টাঙানো একটা গ্রুপ ফটো দেখিয়ে বলেন, ওই মাঝখানে যিনি বসে আছেন, উনিই তো তোমার বাবা, তাই না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁর ঠিক বাঁ-পাশে যিনি বসে আছেন তিনি অব্‌ভিয়াসলি মা। তার পাশে আমি, তখন ফ্রক পরতাম, আর পিছনে দাদা, স্কুলের ছাত্র।

—আর তোমার বাবার ডাইনে?

—ও ছিল আমার বড় বোন, দিদি।

—ছিল?

—হ্যাঁ, মারা গেছে। টাউফয়েডে। ষোল বছর বয়সে। তা প্রায় বছর দশেক আগে।

একটু পরেই ফিরে এলেন ডঃ মৈত্র। তাঁর স্ত্রী নার্সিং পাস। তিনিও গিয়েছিলেন ডাক্তার মৈত্রের সঙ্গে বার্নপুরে। দুজনে ভাগাভাগি করে ড্রাইভিং করে।

সমস্ত বৃত্তান্ত গুনে তিনি বললেন, আমার মনে হয় পুলিশ মিস্ মুখার্জিকে আসামী করে কাঠগোড়ায় আদৌ তুলবে না। ফলে তার তরফে কোনো সলিসিটারের কোনো প্রয়োজন হবে কি?

বাসু বললেন, মিস্ মুখার্জিকে আসামী না করলেও, খুনীকে ধরতে পারলে শশীদেবীকে কাঠগোড়াতে নির্ঘাৎ তুলবে প্রসিকিউশান। স্টার উইটনেস হিসাবে। ফলে, তাঁর সলিসিটারের নিশ্চয় প্রয়োজন আছে।

—কেন? যা সত্য, যেটুকু সে দেখেছে, জানে, তাই বলে যাবে।

—উনি কি কলকাতা থেকে একা এসেছিলেন?

—না। সে কথা তো মিস্ মুখার্জি পুলিশকে জানিয়েছেন।

—তা থেকে প্রশ্ন হবে, কে তাঁর অভিভাবিকা? কে ওই এস্‌কর্টকে ওঁর সঙ্গে পাঠিয়েছিল? কী তার কলকাতার ঠিকানা? সে সব কথা কি মিস্ মুখার্জি পুলিশকে জানিয়েছেন?

—না জানায়নি; কিন্তু পুলিশ তা এতক্ষণে জেনেছে। নির্মল জানার কাছ থেকে। নির্মলবাবু কলকাতায় ওই ঠিকানায় লোক পাঠিয়েছিল মিস্ মুখার্জিকে এখানে আসতে বারণ করার জন্য।

—আর ওই তথ্যটা? দশটা-দুইয়ের লোকাল ঘটনার দিন বেলা বারোটা-সাতে বর্ধমান স্টেশন ইন্ করেছিল—রেলওয়ে রেকর্ড অনুসারে। আর মিস্ মুখার্জি তারামাতলায় ট্যাক্সি নিয়ে এসে পৌঁছান বেলা পৌনে চারটেয়। ফলে, প্রায় চার ঘন্টার 'অ্যালেবাই'টার হিসেব তো পুলিশ জানে না, নির্মল জানাও জানে না—আপনি জানেন? আমাকে জানাতে পারবেন?

—আমি? কী আশ্চর্য! আমি তা কেমন করে জানব?

—বটেই তো। কিন্তু মিস্ মুখার্জি নিশ্চয় সেটা জানেন। কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে শপথ নিয়ে পাব্‌লিক প্রসিকিউটারের এই সঙ্গত প্রশ্নটির জবাব তাঁকে দিতে হবে। কী জবাব দেওয়া তাঁর পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ তা তিনিও জানেন না, আপনিও না। জানি আমি। ফলে তাঁর কাজিন আমাকে তাঁর তরফে নিযুক্ত করে কোনও বোকামি করেননি।

—কী কৈফিয়ত দেবে শশী?

—সরি ডক্টর মৈত্র, সেটা আমি জনান্তিকে আমার ক্লায়েন্টকেই জানাতে চাই। তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে কি?

—হ্যাঁ নিশ্চয়। যখন তাঁর কাজিন-ব্রাদার আপনাকে এনগেজ করেছেন। মিস্ মুখার্জি তাঁর সেই কাজিন-ব্রাদার সুরেশবাবুকে চিনতে পারছেন, বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করছেন। কিন্তু একটা শর্ত। আপনি আপনার ক্লায়েন্টের সঙ্গে কথাবার্তা যা বলবেন তা আমার উপস্থিতিতে।

—এটা আপনার ছেলেমানুষের মতো কথা হয়ে গেল ডক্টর মৈত্র। আমি তাঁকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করব—হত্যাকারীকে কি আপনি চিনতে পেরেছেন? জবাবে উনি আমাকে—তাঁর সলিসিটারকে—যা বলবেন, সেটা 'প্রিভিলেজড্ কমুনিকেশন'। প্রসিকিউশন আমাকে কাঠগড়ায় তুলে তা জিজ্ঞেস করতে পারবে না। কিন্তু আপনার উপস্থিতিতে যদি প্রশ্নোত্তরটা ঘটে, আপনি কী করবেন ডক্টর মৈত্র? সত্যি কথা বলে মিস্ মুখার্জিকে ফাঁসাবেন? না কি মিছে কথা বলে নিজে পার্জারি কেসে মেয়াদ খাটতে যাবেন? হ্যাফপ্যান্ট পরে, গলায় তক্তি ঝুলিয়ে?

ডক্টর মৈত্র গুম খেয়ে গেলেন। অধোবদনে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, অলরাইট স্যার। য়ু উইন। চলুন, আপনাকে দোতলায় পৌঁছে দিই—

বাসু বললেন, তার আগে আপনাকে দু-একটি প্রশ্ন করার আছে। আপনি তো এই চেয়ারটায় বসে তাস খেলছিলেন, তাই প্রথমেই মিস্ মুখার্জিকে দেখতে পান। কিন্তু কখন? তিনি কি তখন জলসাঘরের ভিতরে, সুরকি-বিছানো রাস্তায়?

—আজ্ঞে না, তিনি তখন জলসাঘরের গেট খুলে সরকারি রাস্তায় নেমে পড়েছেন।

—অলরাইট। সে সময় তাঁর হাতে একটা র‍্যাশেনের ব্যাগ ছিল। সেটা কি ছিটকে পড়ল যখন তিনি পড়ে গেলেন?

ডক্টর মৈত্র অবাক হলেন, র‍্যাশনের ব্যাগ? কই না তো?

—উনি খালি হাতে ছিলেন?

—না। ওঁর বাঁ-হাতে একটা ভ্যানিটি ব্যাগ ছিল। সেটা ছিটকে পড়ে। আমার স্ত্রী সেটা কুড়িয়ে নিয়ে আসেন। আমরা সেটা তুলে রেখেছি।

—তার ভিতরে কী ছিল, তা কি আপনাদের চারজনের কেউ নজর করে দেখেছিলেন?

চারজনেই জানালেন : না।

বাসু-সাহেবের অনুরোধে মিসেস মৈত্র ওঁদের শোবার ঘর থেকে ব্যাগটা নিয়ে এলেন। বাসু সর্বসমক্ষে সেটা খুলে ভিতরটা দেখলেন। ফেরত দিলেন।

ডক্টর মৈত্র বলেন, র‍্যাশন-ব্যাগের কথা তখন কেন বললেন?

—আমার ইন্‌ফরমেশন :মিস মৈত্র কলকাতা থেকে একটা র‍্যাশন-ব্যাগে ভরে দুটি জিনিস নিয়ে আসেন—ওই ভ্যানিটি ব্যাগটি ছাড়া। সেই র‍্যাশন-ব্যাগের ভিতর ছিল নগদে পাঁচ হাজার টাকা এবং একটি লোডেড পিস্তল। এ বিষয়ে আপনাদের চারজনের ভিতর কেউ কিছু জানেন কি?

ডক্টর মৈত্র আবার বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, লোডেড পিস্তল? ও সেটা কোথায় পাবে?

বাসু প্রতিপ্রশ্ন করেন, ওর সম্বন্ধে আপনি কতটুকু জানেন ডক্টর মৈত্র, যে, আমি রাম-শ্যাম-যদু কারও নাম বললেই আপনি বুঝে নেবেন?

মৈত্র থতমত খেয়ে বলেন, তা বটে। আজ্ঞে না, নগদ পাঁচ-হাজার টাকা, পিস্তল বা র‍্যাশন-ব্যাগ সম্বন্ধে আমরা কেউ কিছুই জানি না।

—আপনারা এই টেবিলে বসে চা-পান করতে করতে তাস খেলছিলেন। তাসের বান্ডিলটা তো সময়ের অভাবে গুছিয়ে তোলা যায়নি; কিন্তু চায়ের কাপগুলো কোথায় গেল?

—কী আশ্চর্য! এটা কি একটা প্রশ্ন হলো? এ দু-দিন আমাদের তাস খেলার অবকাশ হয়নি তাই তাসের বান্ডিলটা গুছিয়ে তোলা হয়নি; কিন্তু এ দু-দিন আমরা চা তো খেয়েছি। সুতরাং...

কথার মাঝখানেই বাসু বলে ওঠেন, কতক্ষণ তাস খেলেছিলেন? কটা 'রাবার'?

মৈত্র বিরক্ত হয়ে বলেন, কটা 'বাবার' তা মনেনেই। তবে ঘণ্টা দেড়েক খেলেছিলাম, কি বল সুজান?

সুজান হ্যাঁ-না কিছুই বলে না।

বাসু বলেন, আর একটা প্রশ্ন ডক্টর মৈত্র। আপনাদের এই এলাকাটা বেশ নির্জন—শহরের একান্তে। শহরবাসী জানে, আপনি বিলাতফেরত ডাক্তার, প্রচুর পশার। আপনি বাড়িতে একটা ফায়ার-আর্ম রেখেছেন তো? বন্দুক?

—না বন্দুক নেই, একটা রিভলভার লাইসেন্স নেওয়া আছে।

—সেটা কাইন্ডলি একবার দেখাবেন?

—কেন বলুন তো?

—আপত্তি আছে?

—না, না, আপত্তি কিসের?

এবার আর স্ত্রীকে বললেন না। নিজেই শয়নকক্ষে থেকে নিয়ে এসে যন্ত্রটা দেখালেন। সিক্সচেম্বার ভারী রিভলভার। চেম্বারে ছয়টি গুলি ভরা আছে। বাসু-সাহেব চেম্বার খুলে দেখলেন। তারপর সেটা বন্ধ করে ডাক্তার-সাহেবের হাতে ফেরত দিয়ে বললেন, চলুন এবার দোতলায় যাওয়া যাক।

বাসন্তী দেবী আর সুজান নিচেই রয়ে গেলেন। বাকি তিনজন সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন দ্বিতলে। মিস্ মুখার্জি শুয়ে ছিল ঘরের খাটে। তার বাঁ-পায়ে প্লাস্টার করা। দরজাটা হাট করে

খোলা। ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন বাসু-সাহেব। তর্জনীসঙ্কেতে একজোড়া সাদা সোয়েডের লেডিজ-শু দেখিয়ে মিস্ মৈত্রকে প্রশ্ন করেন, এ জুতো-জোড়া কি তোমার, না মিস্ মুখার্জির?

তারাসুন্দরী জবাব দেয় না। তার দাদার দিকে তাকায়। ডক্টর মৈত্র বলেন, এটা মিস্ মুখার্জিরই। কেন?

—সাদা সোয়েডের জুতোটায় জলকাদা লাগেনি তো?

মিস্ মৈত্র বলে, আজ্ঞে না, লেগেছিল। আমিই ধুয়ে সাফ করে রেখেছি। দামী জুতো-জোড়া তো?

—তা বটে। তাহলে এখান থেকেই আপনারা বিদায় হন। আমি আমার ক্লায়েন্টের সঙ্গে নিজেই আলাপ-পরিচয় করে নেব। কেমন?

আট

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে নেমে এলেন বাসু-সাহেব। দেখলেন চারজন আতঙ্কিত গৃহস্থ তাস-টেবিলের চারপাশে ঘন হয়ে বসে আছেন। নিচু গলায় কী যেন পরামর্শ করছেন। বাসু-সাহেবকে দেখেই সবাই সচকিত হয়ে পড়েন। বাসু বলেন, থ্যাঙ্কু লেডিজ্ অ্যান্ড জেন্টলমেন। আমার কাজ সারা হয়েছে। মিশন সাক্সেসফুল। এবার চলি আমি।

বাসন্তী বললেন, ওর...মানে ওই মেয়েটির কোনো বিপদ নেই তো?

বাসু ইতিমধ্যে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়েছেন। বললেন, না, মাসিমা। আপনার বাড়ির ওই অনিমন্ত্রিত ক্ষণিক অতিথির আর কোনো বিপদ নেই। শুধু তাই নয়, আপনাদের চারজনেরও আর ভয়ের কিছু নেই। আমি আপনাকে নিশ্চিন্ত করে যাচ্ছি। জনার্দন জানার প্রকৃত খুনীকে পুলিশ কোনোদিনই খুঁজে পাবে না।

ডক্টর মৈত্র বলেন, কিন্তু পুলিশ তো কলকাতায় ওর ঠিকানায় গিয়ে সেই গুণ্ডাপ্রকৃতির লোকটার নামধাম সব জানতে পারবে।

বাসু বলেন, তাতে কী? সে তো বর্তমানে গৌহাটি থেকে গুজরাট, কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীরের ভিতর যেকোনো একজন অচিহ্নিত ভারতবাসী!

—কিন্তু পুলিশ যদি কোনো ভুল লোককেই আসামীর কাঠগোড়ায় তোলে? আর মিস্ মুখার্জিকে সাক্ষীর কাঠগোড়ায় ওঠায়? স্টার উইটনেস ফর দ্য প্রসিকিউশান হিসাবে? ওর এই চার ঘণ্টা বেহিসাবী সময়টার কী কৈফিয়ত সে দেবে?

—চার ঘণ্টা বেহিসাবী সময়! মানে? কোন চার ঘণ্টা?

—বাঃ! দশটা দুইয়ের বর্ধমান লোকালে হাওড়া থেকে রওনা হলে...

বাধা দিয়ে বাসু বলেন, তার কোনো এভিডেন্স আছে? ও আদৌ দশটা-দুই বলেনি। ট্রেনটা তো হাওড়া ছাড়ে একটা পঞ্চাশে। প্রসিকিউশনের ক্ষমতা হবে সেটা অপ্রমাণ করার?

—কিন্তু পুলিশের কাছে প্রথম এজাহারে—

—ওঃ পুলিশের কাছে! কোনো ফার্স্টক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্ট্যাম্পকাগজে দেওয়া জবানবন্দি তো নয়। পুলিশ তো ওকে ফাঁসাবার জন্য, অথবা ভুল করে ট্রেনের সময়টা গড়বড় করেছে। প্রয়োজন হলে দেখবেন, একাধিক সাক্ষীর সন্ধান পাওয়া যাবে, যারা হলফ্ নিয়ে বলবে, ওকে হাওড়া স্টেশনে একটা পঞ্চাশের মেনলাইন বর্ধমান লোকালে উঠিয়ে দিয়ে গেছিল।

বাসন্তী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর দু-চোখে জল টলটল করছে। ধরা গলায় বললেন, তোমাকে একটা কথা বলব, বাবা?

—বলুন, মাসিমা।

—অনেক রাত হয়ে গেছে। তুমি আমাদের সঙ্গে যাহোক দুটি খেয়ে নাও। রবি তোমাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

বাসু হাসলেন। বললেন, তা হয় না, মাসিমা। মিস্ শশী মুখার্জি আপনার বাড়িতে অনিমন্ত্রিত এসে পাত পেড়ে যাহোক দুটি খেতে পারেন। সে অধিকার ওঁর আছে। কী অধিকার তা আপনি জানেন। আমি তা পারি না।

বাসন্তী ম্লান হয়ে গেলেন।

বাসু বলেন, এবার আমি আপনাকে একটা কথা বলব, মাসিমা?

—বল বাবা?

ওয়ালেট খুলে একটা নামাঙ্কিত কার্ড বার করে বৃদ্ধার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এই হাঙ্গামার দিন কটা কেটে যাক। মাসখানেক পরে আপনার সুবিধামতো আমরা তিনজনেই এসে চর্বচূষ্য নিমন্ত্রণ খেয়ে যাব। রবিবাবুকে বলবেন ট্রাঙ্ককলে আমাকে নিমন্ত্রণ করতে।

বাসন্তী বিহ্বলের মতো বলেন, তিনজনে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার মেয়ে-জামাইয়ের সাথে একসঙ্গেই পাত পেড়ে খেয়ে যাব আমি।

তারাসুন্দরী খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। বলে, ও ব্বাবা! সেটা মাসখানেকের মধ্যেই হবে কী করে? আমার বিয়ে কি এ মাসেই হবে নাকি? কার সাথে?

বাসু ধমকে ওঠেন, বোকার মতো হেসো না তারা। আমি কথাটা তোমাকে বলিনি। বলেছি তোমার মাকে!

চোখের সেই দু-ফোঁটা জলকে আর ধরে রাখা গেল না। এতক্ষণে মাটিতে ঝরে পড়ল।

বাসু-সাহেব থামতেই সুজাতা বলে, তারপর? গল্পটা শেষ করুন।

বাসু বলেন, ওমা! আবার কী শেষ করব গো? গল্প তো আমার শেষ হয়ে গেছে।

—বাঃ শর্ত ছিল, আপনি এমন একটা গল্প বলবেন, যেখানে আসামীকে চিহ্নিত করেও আপনি তাকে পালিয়ে যাবার সুযোগ দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে শশীর এস্‌কটের নামই তো আপনি জানতেন না।

বাসু বলেন, কী রানু, তুমি কী বল?

রানু বলেন, আমি কী বলব? গল্পটা তো আমার জানা। আমিই তো ধরতাইটা তোমাকে প্রথমে ধরিয়ে দিলাম, *ইস্কাপনের কাঁটা!*

বাসু এবার এ-পাশ ফিরে বলেন, ভাগ্নে, তুমি কী বলছ?

কৌশিক বলে, হ্যাঁ শর্তানুসারে খুনীকে আপনি চিহ্নিত করেছেন, তাকে পালিয়ে যাবার সুযোগও দিয়েছেন। কিন্তু কী করে আপনি কেসটা সল্‌ভ করলেন বুঝে উঠতে পারছি না

—কেন? অ্যানোম্যালিগুলো নজরে পড়ছে না?

—তা কেন পড়বে না! প্রথম কথা, চারজন দেড়-দু'ঘন্টা ধরে তাস খেলতে পারে না, যেখানে তাসের সংখ্যা বাহান্ন নয় একান্ন। স্পেডের বিবি জোকারদের সঙ্গে রাত কাটাচ্ছে। দ্বিতীয়, টাইম ফ্যাকটারেও একটা বিরাট গণ্ডগোল। ঘটনা আটচল্লিশের তখন শশিমুখীর বয়স পঁচিশ। বর্মা থেকে বাঙালিদের ইভ্যাকুয়েশান হয় একচল্লিশে-বেয়াল্লিশে। হিসাব মতো তখন শশীর বয়স আঠার-উনিশ হবার কথা। সে তখন ফ্রক পরা নাবালিকা হতে পারে না। জনার্দন

জানাই নাকি পঞ্চদশী অবস্থায় তাকে লক্ষ্ণৌতে দেখেছেন খুন হবার বছর দশেক আগে। সুতরাং শশীর বাল্য-কৈশোরের কাহিনীটা আদ্যন্ত বানানো। কিন্তু তা থেকে আপনি কী করে আন্দাজ করলেন...

বাসু বললেন, দুটো ক্লু অবশ্য আমার আস্তিনের তলায় রয়ে গেছে। অর্থাৎ যা আমি জানতে পেরেছি, তোমরা জান না। সে দুটির কথা বলার আগে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি নামের ক্লু-টা নজরে পড়েছিল তোমাদের?

কৌশিক বলে, হ্যাঁ, সেটাও খেয়াল হয়েছিল। গগনবাবুর তিনটি সন্তান। বড়টি রবি—'গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা'। ছোটটি 'তারা'। এর মাঝে যদি একটি মেয়ে হারিয়ে যায়—টাইফয়েডেই হোক অথবা কুলত্যাগিনী হওয়ায়, তার নাম কী হতে পারে? তাই 'রবি-শশী-তারা'র সূত্রটা নজরে পড়েছিল। গগনবাবুর ক্লাসিকাল গানের পারদর্শিতা—যা 'জীন' সূত্রে রবি-তারা পেয়েছে, তা শশীরও পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা। আরও একটা সূক্ষ্ম সূত্র : ডাক্তার মৈত্র বারে বারে বাইজির প্রসঙ্গে 'আপনি-তুমি' গুলিয়ে ফেলেছিলেন। একটু আতঙ্কগ্রস্ত হলেই তাঁর অবচেতনে অপরিচিতা বাইজি হয়ে যাচ্ছিল ছোট বোন। কিন্তু খুনটা করল কে? কীভাবে?

বাসু বললেন, যে দুটো ক্লু আমার আস্তিনের তলায় লুকানো আছে তার একটা হচ্ছে ওই গ্রুপ ফটোটা। দশ বছরে চেহারার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে; কিন্তু তবু শশীকে চিনতে পেরেছিলাম আমি। এই ক্লুটা 'ভিশুয়াল'—তোমাদের জানাতে পারিনি। আর দ্বীতিয়টা শশীর 'আনরিজার্ভড কনফেশান'। লীগ্যাল 'প্রিভিলেজড কমুনিকেশন' বস্তুটা কী তা ঠিকমতো সমঝে নেবার পর শশী তার সব কথাই আমাকে খুলে বলেছিল। তাকে আমি বলেছিলাম, আদালতে সাক্ষীর কাঠগোড়ায় এসব বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে সে বলবে 'আমার লীগ্যাল-কাউন্সেলারকে এ-প্রশ্নের জবাব আমি দিয়েছি, তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন। আদালতে সাক্ষ্য দিতে এসে এ প্রশ্নের জবাব দিলে আমি নিজেই নিজেকে 'ইন্‌ক্রিমিনেট' করব।'

সুজাতা প্রশ্ন করে, শশী নিশ্চয় দশটা দুইয়ের ট্রেনেই এসেছিল। সে কি তার দাদার বাড়ির ঠিকানা জানত?

—জানত। গগনবাবুর খুব ন্যাওটা মেয়ে ছিল শশী। কুলত্যাগিনী কন্যাকে যে তিনি ক্ষমা করেছিলেন, তার সঙ্গে যে গোপন পত্রালাপ করতেন, তা তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকেও গোপন রেখেছিলেন। তাই বাসন্তী দেবী, রবি বা তারাসুন্দরী শশীর ঠিকানা জানত না; কিন্তু শশী জানত তারামাতলার বাড়ির ঠিকানাটা। বর্ধমান স্টেশান থেকে সে সরাসরি চলে আসে তার মায়ের কাছে। চার ঘণ্টা বেহিসাবী সময়ের প্রথম ঘণ্টা তিনেকের অশ্রুপ্লাবিত ইতিহাসটা শশী আমাকে বলেনি; কিন্তু শেষ এক ঘণ্টার কথা বলেছিল। রবিই পরিকল্পনাটা ছকে। সে লোডেড রিভলভারটা নিয়ে জলসাঘরের পিছনের বাগানে লুকিয়ে পড়ে। আমি সেটাই আন্দাজ করেছিলাম। তাই তার আগ্নেয়াস্ত্র আছে কিনা জানতে চেয়েছিলাম। শশীকে যখন কানাই দোতলায় পৌঁছে দেয় তখন শশীর হাতে ছিল র‍্যাশন-ব্যাগ। তাতে পাঁচ হাজার টাকা নগদে, আর সুরেশের পিস্তলটা। পরিকল্পনা মতো দ্বিতলে উঠে গিয়ে শশী প্রথম সাক্ষাতেই জনার্দনকে ওই প্রশ্নটা করে—'ওইটা কি বাথরুম'। ইন্‌ফ্যাক্ট তখনো কানাই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যায়নি। জনার্দন তাকে বাথরুমের রাস্তাটা দেখিয়ে দেন। শশী সে ঘরে ঢুকেই ম্যাথরখাটা-দরজাটা খুলে দেয়। রবি এসে বাথরুমে লুকায়। তারপর শশী দরজা খুলে শয়নকক্ষে ফিরে এসে দেখে, জনার্দন ইতিমধ্যে দরজায় ভিতর থেকে ছিটকিনি দিয়ে দিয়েছেন। তাঁর আর তর সইছিল না। শশী টাকা বা পিস্তলটা ব্যাগ থেকে বার করার সুযোগই পায়নি। জনার্দন ব্যাঘ্রঝম্পনে শশীকে

আক্রমণ করেন। পালঙ্কের উপর চিৎ করে পেড়ে ফেলেন। শশীর পরনে শাড়ি-ব্লাউজ ছিল না। ছিল সালোয়ার কামিজ। জনার্দন তাই সহজে ওকে বিবস্ত্র করতে পারেননি। শশী মর্মান্তিক চিৎকার করে ওঠে।...ঘটনার বাকি অংশ বলবার অপেক্ষা রাখে না। রবি রিভলভার নিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো তা থেকে ফায়ার করেনি। সে হত্যা করতে চায়নি। জনার্দনের হাত থেকে নিজের বোনের ইজ্জৎ বাঁচাতে চেয়েছিল। তাই রিভলভারের বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড জোরে জর্নাদনের মাথার পিছন দিকে আঘাত করে। উত্তেজনার জন্যই হোক বা প্রচণ্ড ক্রোধে অথবা হিতাহিত জ্ঞান হারানোতে আঘাতটা আসুরিক হয়ে যায়। জনার্দনের সেরিবেল্লাম চৌচির হয়ে যায়। রবি কামুক লোকটার ঠ্যাঙ ধরে দরজার দিকে কিছুটা টেনে আনে। তারপর র‍্যাশনের থলিটা উঠিয়ে নিয়ে স্পাইরাল সিঁড়ি বেয়ে নিচে বাগানে নেমে যায়। তখন জোর বৃষ্টি নেমেছে। চরাচর শূন্য। শশী বাথরুমের দরজায় ছিটকিনি দিয়ে, মৃতদেহ ডিঙিয়ে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে আসে। কানাই তখন চপ ভাজতে ব্যস্ত। ত্রিসীমানায় কেউ নেই।

নিজের বাড়িতে ফিরে আসার পর ওর সত্যিই একটা নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়। তাকে অন্যত্র পাচার করা সম্ভবপর ছিল না। কানাই তাকে দেখেছে, শনাক্ত করতে পারবে। কোনোক্রমে ধরা পড়লে পলাতকার কেসটা নিদারুণ খারাপ হয়ে যেত। তাই ওই তাসখেলার গল্পটা ফাঁদা হয়। তাড়াহুড়োয় ইস্কাপনের বিবিটা জোকারের সঙ্গে 'ইলোপ' করার সুযোগ পেয়ে যায়। তাস খেলার এভিডেন্সটা জোরদার করতে দু'দিন ধরে তাসের টেবিলে হাত দেওয়া হয়নি। না হলে মিস মৈত্র শশীর জুতোর কাদা ছাড়িয়ে জুতো সাফ করার সময় পেল আর তাসগুলো গুছিয়ে প্যাকেটে ভরতে পারল না? সর্বোপরি 'দিদি' না হলে অচেনা বাইজির জুতো ওই কলেজের ছাত্রীটি সাফ করত থোড়াই!

আশা করি সব সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। আমার গল্পের আর কিছু বুঝিয়ে বলার আছে?

রানু বললেন, আছে বইকি। উপসংহার। বাসন্তী দেবী মাসখানেক পরে মেয়ে-জামাই আর তাদের সলিসিটারকে কী কী পদ রেঁধে খাওয়ালেন?

—না, খাওয়াননি। শশী রাজি হয়নি দ্বিতীয়বার বর্ধমানে যেতে। তারাসুন্দরীর বিয়ের কথা ভেবে। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেকার সমাজ তো! দুনিয়ার দৃষ্টিতে গগন থেকে শশী অস্ত গেছে। টাইফয়েডে নয়, স্বেচ্ছায় কুলত্যাগিনী মেয়েটা পরিবারের নিরিখে চলে গেছে চিরকৃষ্ণপক্ষে। কিন্তু বাসন্তী বা রবিরা তা মানতে চাইতো না। তাই প্রতিবছর পূজাবকাশে ওরা একসাথে ভারতভ্রমণে বেরিয়ে পড়ত। রবি-শশী-তারা, তাদের মা এবং সুজান আর সুরেশ। সেটা শশীর শুক্লপক্ষ। আমি যেহেতু আদালতে সওয়াল করতে উঠিনি তাই কোনও 'ফী' নিইনি। তবে একবার ওদের সঙ্গে, ওদেরই খরচে, রাজস্থান ইত্যাদি বেড়াতে গিয়েছিলাম। মাণ্ডুর সেই বাজবাহাদুরের ভাঙা রাজপ্রাসাদে 'রূপমতী' শশিমুখী আমাকে গেয়ে শুনিয়েছিল একখানা দরবারী কানাড়া—মেজাজী রাগ, সুর ফাঁকতালে : 'বাজত 'ঝাঁঝ-মৃদঙ্গ'!

তারপর পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে। তবু আজও কানে : 'বাজত ঝাঁঝ-মৃদঙ্গ।'

boiRboi.net

হরিপদ কেরানির কাঁটা

রচনাকাল : সেপ্টেম্বর 2000
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি 2001
প্রচ্ছদশিল্পী : গৌতম রায়
উৎসর্গ : গৌতম রায়

গোপালপুর-অন-সী।

উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলায় বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে গড়ে উঠেছে এই মনোরম সাগরবেলা। এককালে এই সমুদ্রতীর বিদেশী পর্যটকদের কাছে খুব প্রিয় ছিল। সারা শীতকাল 'গোপালপুর-অন-সী' থাকত জমজমাট। পুরীর ভিড় নেই, পুরীসমুদ্রের সেই কাকে-খাই কাকে-খাই প্রচণ্ড ঢেউও নেই।

বেলাভূমির প্রায় দক্ষিণপ্রান্তে, মুষ্টিমেয় হোটেলের ঘেঁষাঘেঁষি জটলা থেকে যেন একটু স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে দুর্গের মতো মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে একটি বিলাতী-কেতার হোটেল— 'দ্য নূক'। হোটেল-মালিক—না মালিক নয়, মালকিন, মিসেস নোয়ামি ক্রোম। প্রায় আশি ছুঁই ছুঁই বিধবা। ওঁর স্বামী ছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব রেলের এক জাঁদরেল অফিসার। বিশাল প্রাসাদটি বানিয়েছিলেন অবসর নেবার আগেই, কিন্তু ভোগ করে যেতে পারেননি। বাড়ি শেষ করতে করতেই ওপার থেকে ডাক এসে গিয়েছিল প্রৌঢ় মানুষটির। নিঃসন্তানা নোয়ামি হোটেলটার শেষ রূপারোপ করেছিলেন। লিজাকে ম্যানেজার বানিয়ে এই পান্থাবাসটি চালু রেখেছেন। লিজা ওঁর স্বর্গগতা ভগিনীর নাতনী। কনফার্মড স্পিনস্টার।

সমুদ্রমুখী দ্বিতল বাড়ি। প্রতিটি ঘর থেকেই জানলা দিয়ে সাগরসৈকতের দৃশ্য নজরে পড়ে। হোটেলের সামনে, ক্যানিউটের আদেশ লঙ্ঘন করে অথচ অমাবস্যার ভরা-কোটালের লক্ষ্মণের দেওয়া গণ্ডীর সীমারেখা স্বীকার করে সমুদ্রের জল যতদূর আসে তার থেকে প্রায় বিশ-মিটার ভিতরে সারি-সারি অনেকগুলি বিরাটাকার রঙিন ছাতা খাটানো। সেগুলির কাছাকাছি ইতস্তত ছড়ানো কিছু আরামদায়ক প্লাস্টিকের চেয়ার। সবই সমুদ্রমুখী এবং খালি।

যেগুলি ভর্তি তাতে যাঁরা বসে আছেন তার অধিকাংশই আমাদের পরিচিত। সপরিবারে বাসু-সাহেব আর ব্রজদুলালবাবু।

ব্রজবাবুকে মনে আছে তো? ড্রেস-রিহার্সালের কাঁটার? তাঁরই ব্যবস্থাপনায় ও আগ্রহে এবার পুরীর বদলে এই গোপালপুরে অভিযান। ব্রজদুলাল অকৃতদার, একা মানুষ। অগাধ সম্পত্তি। গতবছর অল্পসময়ের ব্যবধানে তাঁর তিন-তিনটি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর অপমৃত্যু ঘটেছে। বিল শবরিয়া আর ডাক্তার ঘোষাল মারা গিয়েছিলেন বিষপ্রয়োগে আর একজন নিকটবন্ধু ফাঁসিকাঠে ঝুলে। সেসব কথা বিস্তারিত বলা হয়েছে *'ড্রেস রিহার্সালের কাঁটা'*-য়। ব্রজদুলাল তাবপর তাঁর শ্যামবাজারের থিয়েটার হাউসটি বিক্রয় করে দিয়েছিলেন। মেলাঙ্কোলিয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তারে হাওয়া বদলের কথা বলেছিলেন। ওঁর নিজস্ব একটা ফাঁকা বাড়ি পড়ে আছে পুরীতে, কিন্তু সেটা যেন অভিশপ্ত। স্মৃতিবিজড়িত, ক্ষুধিত পাষাণ। তাঁর প্রকাণ্ড গাড়িটা নিয়ে তাই চলে এসেছেন এই গোপালপুর-অন-সীতে। সপরিবারে বাসু-সাহেবকেও পাকড়াও করে নিয়ে এসেছেন দিন-দশেক ছুটি কাটিয়ে যেতে। হোটেলের রিজার্ভেশান থেকে গাড়ি চালিয়ে পৌঁছে দেওয়া সব কিছু করেছে ওঁর একান্ত সচিব অশোক। সে নিজে অবশ্য ফিরে গেছে। ওই প্রকাণ্ড গাড়িতে সড়কপথে আসায় রানী দেবীর হুইল-চেয়ারটা আনতে কোনও অসুবিধা হয়নি।

সকালবেলা প্রাতরাশ সমাধা করে ওঁরা সার বেঁধে বসেছেন সমুদ্রের কিনারে। রানী দেবীর হাতে কী একটা মাসিক পত্রিকা। কিন্তু এক পাতাও পড়া হয়নি। একে সামুদ্রিক ঝোড়ো হাওয়া, তায় প্রতিনিয়তই কানে ভেসে আসছে আশপাশের কথাবার্তা। পত্রিকাটা মুড়ে রেখে পার্শ্ববর্তিনী সুদীপাকে বললেন, গোপালপুর কিন্তু পুরীর তুলনায় অনেক শান্ত।

চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই অনূঢ়া সুদীপা বলে, সমুদ্রের শান্ত রূপটা ভালই লাগে। এখানে সাহস করে স্নান করা যায়। পুরীর ঢেউগুলো সবাই যেন দারা সিং। সুযোগ পেলেই ঠ্যাং ধরে পটকে দেবে। কপাল কেটে যায়, হাঁটু ছড়ে যায়। পুরীর সমুদ্রকে খুরে খুরে পেন্নাম। আমি তো বাপ পুরী গেলে ভুলেও জলে নামি না। এখানে দিব্যি রোজ স্নান করছি।

পায়েল, সুদীপার বান্ধবী—ওরা একই স্কুলে পড়ায়, কলকাতায়,—গ্রীষ্মের ছুটি হওয়ায় একটা ডবল্-বেড রুম বুক করে একসঙ্গে আছে—বললে, সমুদ্র নিয়ে আমার কোনো কম্‌প্লেন নেই ; কিন্তু এতটা নির্জনতা যেন বরদাস্ত হয় না। বুকের ভিতরটা কেমন যেন খালি খালি লাগে।

প্রৌঢ় কর্নেল সমাদ্দার বসেছিলেন অদূরে। এদিকে ফিরে বললেন, বটেই তো। সুটকেস ভর্তি যেসব জমকালো শাড়িগুলো এনেছেন তা পরে সী-বীচে পায়চারি করা বেহুদ্দো। দেখবে কে? দেখ্‌নেবালা কই?

সবাই হেসে ওঠে। সুদীপা জানে আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ পন্থা এসব ক্ষেত্রে : প্রতি-আক্রমণ। বান্ধবীকে সাহায্য করতে তাই বলে, কেন? দেখবেন তো আপনি। একমাত্র আপনিই তো জানেন, লক্ষ্য করে দেখে রেখেছেন : কোন মহিলা একই শাড়ি পরে দু'বেলা বেড়াতে বেরিয়েছেন, কার শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজ ঠিক ম্যাচ করেনি। তাই তো অতবড় একটা বাইনোকুলার নিয়ে এসেছেন কলকাতা থেকে।

কর্নেল একটু ঘাবড়ে যান। বলেন, না, না। এটি আমার নিত্য সহচর। সার্ভিস যুগের বাইনো।

—আই নো।—প্রতি-আক্রমণ চালিয়ে যায় সুদীপা। এককালে ওইটার সাহায্যে শত্রুদের গোপন অবস্থান খুঁজতেন, এখন অবসর নেবার পর সুন্দরীদের গোপন অবস্থানের সন্ধান করেন। বিশেষ করে বহুদূরে যারা সমুদ্রে স্নানরতা।

রানী দেবী ঝগড়া-কাজিয়া থামিয়ে দেবার চেষ্টা করেন : তোমরা অহেতুক ওঁর লেগপুলিং

করছ, সুদীপা আর পায়েল। আর আপনিও বুকে হাত দিয়ে বলুন তো কর্নেল সাহেব, এতটা নির্জনতা কী আপনারই ভাল লাগে? তাছাড়া ত্রিসীমানায় কোনো শপিং সেন্টার পর্যন্ত নেই যে, দু'দণ্ড সময় কাটাতে পারে মেয়েরা।

কথাটা লুফে নেয় অর্পিতা : বলুন তো মাসিমা। বেড়াতে এসে যদি শপিংই না করলাম তাহলে...

কৌশিক চট্‌জলদি পাদপূরণ করে, 'ডেংচি-বিবি' বন্‌ব কী করে?

—'ডেংচি-বিবি' মানে?

কৌশিক শাংকর-ভাষ্য দাখিলের সময় পায় না। কারণ সেই মুহূর্তেই সামুদ্রিক বাতাসে মিশ্রিত হলো ফরাসি সেন্টের একটি উগ্র সৌগন্ধ। সকলেই হোটেলের প্রবেশদ্বারের দিকে তাকালেন—মানে তাকাতে বাধ্য হলেন। সদর-দরজা পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছেন একজোড়া কপোত-কপোতী। কর্তার ঊর্ধ্বাঙ্গে প্রকাণ্ড একটা তোয়ালে, কাঁধে ব্যাগ, নিম্নাঙ্গে নীলরঙের সুইমিং-ট্রাংক। বলিষ্ঠ লোমশ জানুদ্বয়ের আ-প্রাইভেট-পার্টস্ অনাবৃত। কপোতীর পোশাক আরও বিচিত্র। তোয়ালের বালাই নেই। স্রেফ রানী কালার 'বিকিনি'। শ্যামলা গায়ের রঙ, কিন্তু দেহ-সৌষ্ঠব অনিন্দ্য। এই জাতীয় কোনো নায়িকাকে দেখেই বোধহয় কালিদাস তাঁর সেই দিল্‌তোড় 'তন্বী-শ্যামা' শ্লোকটা রচনা করেছিলেন। কারণ 'বিকিনি' পরিধান করায় দেখা যাচ্ছে এঁরও 'নামিতা নিম্ননাভি' ; ইনিও 'শ্রোণীভারাদলসগমনা' এবং বরাঙ্গের 'ভ্যাংদ্বয়' স্তোকনম্রা। না হবে কেন? বয়স তো বহুদিন দেড়কুড়ি অতিক্রম করেছে।

কৌশিক ঊর্ধ্বমুখে একটি দার্শনিক স্বগতোক্তি ছেড়ে দেয় : সম্ভবত এঁরা দুজন সূর্যের এই তৃতীয় গ্রহেরই বাসিন্দা, ই. টি. নন।

অর্পিতা ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করে, ই. টি মানে?

—একস্ট্রা টেরিস্ট্রিয়াল জীব। ওই যাঁরা মাঝে-মধ্যে ফ্লাইং ডিস্‌কে চেপে খেয়ালবশে আমাদের সঙ্গে মূলাকাৎ মানসে পৃথিবীতে আসেন।

কর্নেল সাহেব বলেন, ওঁরা কাল একটু বেশি রাত্রে এসেছেন। আমি লাউঞ্জে বসে তখন একাই থার্ড পেগ্ ড্রাই-মার্টিনীটা শেষ করছি। ভদ্রমহিলাটিকে চেনা-চেনা মনে হলো ; কিন্তু ঠিক—

পায়েল নিরীহের মতো প্রশ্ন করে, ভদ্রমহিলা কি তখনো ওই 'বিকিনিটা' পরেই ছিলেন?

সুজাতা বলে, স্টপ্ য়োর কন্টিনিউয়াস্ লেগপুলিং, পায়েল। আপনারা কি এই নবাগত দম্পতিকে সত্যিই চিনতে পারেননি?

সুদীপা বলে, আমি পেরেছি। এঁরা চিনতে পারছেন না ওঁর গাত্রবর্ণের জন্য। মেকআপ-ম্যানের সেই দুধে-আলতা রঙের প্রলেপটা তো এখন নেই। উনি হচ্ছেন, টলিউডের মোস্ট ফেমাস নায়িকা—পর পর তিনটি বক্স-অফিস বিদীর্ণ করা নবাগতা আর্টিস্ট : অনামিকা সেন।

—'সেন'? না 'ঘোষাল'? জানতে চায় পায়েল।

সুদীপা বলে, আমি ওঁর 'ম্যারিটাল-হিস্ট্রি' নিয়ে গবেষণা করিনি। এটুকু শুনেছি যে, বেশ কয়েকবার উনি বিবাহ করেছেন, কিন্তু প্রথম অভিনয় কালে যে উপাধিটা ছিল—'সেন'—সেটি পরিবর্তন করেননি।

একটু দম নিয়ে সুদীপা আবার বললে, এটি ওঁর চতুর্থ স্বামী : সোমেশ্বর ঘোষাল। ওদের বিয়ে হয়েছে মাস-তিনেক। এটা ওদের 'হনিমুন ট্রিপ' নয়, সে বখেড়া মিটেছিল কাঠমণ্ডুতে।

সুজাতা বলে, ওরে ব্বাবা। তুমি ওদের বিষয়ে এত নাড়ির খবর পেলে কোত্থেকে?

পায়েল সমাধান দাখিল করে, সুদীপা স্কুলে বাঙলা পড়ায়, আবার ফ্রি-লান্স জার্নালিজ্‌ম্‌ও করে। একাধিক সিনেমা পত্রিকায় লেখে।

অর্পিতা জানতে চায়, ওই মিস্টার সোমেশ্বর ঘোষাল কী করেন?

—বর্তমানে ধর্মপত্নীর খিদ্‌মদ্‌গিরি। এককালে ভাল ফুটবলার ছিলেন। সিনিয়ার ডিভিশন টিমে ফরোয়ার্ডে খেলতেন।

অর্পিতা আবার জানতে চায়, কোন টিমে?

—এক-এক সিজ্‌নে এক-এক টিমে। কেন আপনি জানেন না, ফুটবল মরসুমের আগেই নামকরা ফুটবলাররা কোরাসে সেই বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীতটা গাইতে থাকেন: 'কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নিবি গো কিনে?'

ইতিমধ্যে হোটেল থেকে কিছুটা দূরে 'খিদ্‌মদ্‌গার' তার তোয়ালেটা বিছিয়ে দিয়েছে। অনামিকা তার সর্বাঙ্গে ইতালিয়ান অলিভ-অয়েল বার্তোল্লি মর্দন করতে শুরু করেছে।

এতক্ষণে এসে উপস্থিত হলো সমরেশ পালিত। সেও সুইমিং ট্রাংক পরে এসেছে। সবাইকে সম্বোধন করে বলে, গুড মর্নিং এভরিবডি। আপনারা এখনো কেউ জলে নামেননি দেখছি। এরপর বালি যে তেতে উঠবে।

কর্নেল বলেন, আমরা তৈরি হয়ে নিতাম ; কিন্তু ইতিমধ্যে একটি বাধার সৃষ্টি হয়েছে। কেউ স্থানত্যাগ করতে চাইছেন না।

সমরেশ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে। স্ত্রী অর্পিতার দিকে ফিরে বলে, তুমি চট্ করে পোশাক-টোশাক বদলে এস। আমরা এখনই জলে নামব।—তারপর কর্নেলের দিকে ফিরে বলে, হ্যাঁ, কী-একটা বাধার কথা বলছিলেন যেন আপনি। কোনও হাঙর-টাঙর কি পথ ভুলে এ-পাড়ায় এসে পড়েছে?

অর্পিতা স্নানের পোশাক পরতে চলে গেল সমরেশের হাত থেকে চাবিটা নিয়ে। কর্নেল বললেন, আপনি বুলস-আই হিট করেছেন মিস্টার পালিত। হাঙর। না, হাঙর নয় : কিলার হোয়েল। ওই যাকে বলে : 'অর্কা', অর্থাৎ জ'স ছবির নামভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছিলেন।

সমরেশ বসেছিল কপোত-কপোতীর দিকে পিছন ফিরে। অভিনব দৃশ্যটা এখনো তার নজরে পড়েনি। বলে, হেঁয়ালিটা একটু ভেঙে বলবেন, কর্নেল সাব?

কর্নেল একটি ফৌজি লব্‌জ্ ঝাড়লেন, সোলজার। 'বাউট টার্ন।

সমরেশ বুঝল। একশ আশি ডিগ্রি ঘুরে বসল। তারপর সে যেন স্থানকালপাত্র ভুলে গেল। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। ভাল করে দেখে নিয়ে আবার বসে পড়ল। অসঙ্কোচে টেনে নিল কর্নেল সাহেবের হাত থেকে তাঁর 8"×4" বাইনোকুলারটা। অসঙ্কোচেই চোখে লাগাল। যেন বজ্রাহত হয়ে গেছে সে।

ইতিমধ্যে তৈলমর্দনান্তে বাংলা ফিল্‌ম্ তথা সিরিয়ালের দিল্‌তোড় নায়িকা উবুড় হয়ে শুয়েছেন তোয়ালের উপর। সানট্যান্ড হবার বাসনা তাঁর। অগত্যা ছুটি পেয়ে ওঁর খিদ্‌মদ্‌গার এদিকে পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসে। তোয়ালেটা গাত্রচ্যুত হওয়ায় তার লোমশ দেহের নব্বই শতাংশই নগ্ন। যুক্তকরে সকলকে সমবেত নমস্কার করে বলে, গুড মর্নিং এভরিবডি। লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলমেন। আমরা দুজন কাল রাত্রে এসেছি। উঠেছি বাইশ নম্বর ঘরে। থাকব দিনসাতেক। আপনাদের কারও সাথে আমাদের আলাপ নেই। সেই কাজটা সারতেই উঠে এলাম। সর্বাগ্রে নিজের পরিচয়টা দিই। পিতৃদত্ত নাম : সোমেশ্বর ঘোষাল। এককালে ছিলাম : ফুটবলার। সিনিয়ার ডিভিশনে রাইট-ঈন খেলতাম। এক শ্যালিকাপুত্র স্টপারের লেঙ্গিতে ডান 'ফিমার বোনটা' বল-সকেট জয়েন্ট থেকে বেরিয়ে আসে। আমরা হ্যাঁ পেনাল্টি পেয়েছিলাম। জিতেও ছিলাম। কিন্তু আমি আর ফুটবল ময়দানে ফিরে আসতে পারিনি।

কর্নেল বললেন, হাউ স্যাড।

—ইয়েস্ স্যার। ইটস্ দ্য 'স্যাডেস্ট অফ অল' ফাউল্‌স্ ইন মাই ফুটবলার্স কেরিয়ার। বর্তমানে আমি আমার ওই বেটার সেভেন-এইটথ্-এর খিদ্‌মদগারি করে গ্রাসাচ্ছাদন করি।

সমরেশ জানতে চায়, 'বেটার সেভেন-এইটথ্' মানে?

সোমেশ্বর বললে, আপনি বিবাহিত কিনা জানি না। হলে নিশ্চয়ই অস্থিতে-অস্থিতে অবগত আছেন : 'বেটার হাফ' কাকে বলে। বিবাহের সময় আমার উনি ছিলেন 'বেটার থ্রিফোর্থ'। আমার পরিচয় ছিল অনামিকা সেনের ফুটবলার হাজবেন্ড। ল্যাংড়া হয়ে যাবার পর আমি হয়ে গেছি 'ওয়ার্স-ওয়ান-এইট্থ্'। উনি ন্যাচারালি 'বেটার সেভেন-এইট্থ্'। সে যাক্, আপনাদের পরিচয়গুলি সংগ্রহ করি—সাতদিন একত্রে থাকতে হবে যখন।

কর্নেল আগ্ বাড়িয়ে বলেন, সবার আগে আপনি বসুন। আমি হলাম ইন্ডিয়ান আর্মির অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল বিল্বমঙ্গল সমাদ্দার। একাই আছি একতলার 2/1-এ। ইনি স্বনামধন্য পি. কে. বাসু বার-অ্যাট্-ল। মিসেস বাসু। এঁরা দুজন—পায়েল আর সুদীপা একই স্কুলে পড়ান। আছেন দোতলায়। এঁদের পাশের ঘরেই মিস্টার কৌশিক আর সুজাতা মিত্র। ওদের সঙ্গে একটি কিউট বাচ্চা...কী যেন নাম?

সুজাতা পাদপূরণ করে : মিঠু।

—হ্যাঁ মিঠু। আর ইনি ব্রজদুলালবাবু। এসেছেন একাই। এছাড়া আছে আর একটি কাপ্ল—সমরেশ আর... ওই তো, নাম করতে করতেই এসে পড়েছেন ওঁর বেটার হাফ।

সুইমিং কস্টুমের উপর একটা হাউসকোট চাপিয়ে ঠিক সেই মুহূর্তেই ভিতর থেকে এগিয়ে এল অর্পিতা।

সোমেশ্বর পর্যায়ক্রমে নমস্কার করে যাচ্ছিল। অর্পিতাকেও করল। অর্পিতা গায়ে তোয়ালে জড়িয়ে একটা চেয়ারে বসল। সোমেশ্বর বললে, দেখুন, আমি শ্রুতিধর নই। এতগুলি নাম ঠিক ঠিক মনে রাখতে পারব না। আপনাকে আমি কর্নেল-সাহেব, আর ওঁকে ব্যারিস্টার-সাহেব বলে ডাকব। ইনি ন্যাচারালি বাসু-মাসিমা। তাহলে তিনটি নাম মনে রাখার দরকার হবে না...

ঠিক সেই সময়ে তিন-চার মিটার দূরত্বে বালুশয্যালীনা অনামিকা মিহি গলায় হাঁকাড় পাড়ে, ডার্লিং। একটু শুনে যাও প্লিজ...

সোমেশ্বর রওনা দেবার আগে বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বললে : আদালতের 'সমন', স্যার। আগে সেটা সেরে আসি। নাহলেই আদালত অবমাননা।

ব্রজদুলাল বলেন, ছোকরা খুব ফুর্তিবাজ। মুখে-চোখে কথা। তাই না বাসু-সাহেব?

—অন্তত সেই রকম একটা 'ইমেজ' তৈরি করার চেষ্টা করছে।—বাসু-সাহেবের মন্তব্য।

দূর থেকে দেখা গেল—অনামিকা ফ্লাস্কটা খুলতে পারছে না। সোমেশ্বর সেটা খুলে ওকে কিছু কফি ঢেলে দিয়ে আবার ফ্লাস্কটা বন্ধ করে দিল। ওরা নিম্নস্বরে কী যেন আলাপচারী করল। তারপর সোমেশ্বর এদিকে এগিয়ে আসতে থাকে। অনামিকা উঠে বসে। সমুদ্রের দিকে মুখ করে কফি পান করতে থাকে। এখন তার প্রোফাইল দেখা যাচ্ছে। সমরেশ নির্লজ্জের মতো আবার তুলে নিল কর্নেল সাহেবের চেয়ার থেকে তাঁর দূরবীনটা।

সোমেশ্বরের সেটা নজরে পড়ল। ঘাড় ঘুরিয়ে বাইনোকুলারের লক্ষ্যমুখটাও লক্ষ্য করল। অনামিকা এতক্ষণে সামনে ফিরেছে। তারিয়ে তারিয়ে কফি পান করছে। সোমেশ্বর রসিকতা করে সমরেশের কাঁধে একটা হাত রাখল। সমরেশ চমকে বাইনোটা নামিয়ে নিতেই সোমেশ্বর বলে, আপনি যা ভাবছেন তা নয়, ওটা স্নাইপ নয়, স্যান্ডপাইপার। স্নাইপ সুস্বাদু, কিন্তু স্যান্ড-পাইপারের মাংস অখাদ্য।

সমরেশ রীতিমতো অপ্রস্তুত হয়ে বলে, স্যান্ডপাইপারই হবে বোধহয়।

বাইনোটা ফেরত দেয়। সকলেই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসে। সোমেশ্বর বলে, এতক্ষণে সবার গলাই নিশ্চয় শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে। আমাকে এক-রাউন্ড ড্রিংস-পরিবেশনের অনুমতি দিন। বলুন কে কী নেবেন? কর্নেল সাহেব?

—বীয়র। যদি মাছরাঙা পাওয়া যায়। না হলে ব্ল্যাক লেবেল।

বাসু-সাহেব এত সকালে কিছু নিতে রাজি হলেন না। মিসেস্ বাসু—কোক ; ব্রজদুলালও বীয়র ; কৌশিক চাইল ভদ্‌কা উইথ ক্যানাডা-ড্রাই।

সোমেশ্বর দুই দিদিমণির দিকে ফিরে বলল, আপনারা দুজন?

দুই বান্ধবীর চোখাচোখি হলো। সুদীপা বলল, যা হোক দুটো সফ্‌ট্ ড্রিংস।

সোমেশ্বর বলে, 'জিন-অ্যান্ড-লাইম'ও কিন্তু লেডিজ ড্রিংক। এক পেগে কিছু নেশা হবে না। আর এখানে ছাত্রীরা তো কেউ নেই। অসুবিধাটা কোথায়?

পায়েল স্বীকার করল, আমি জীবনে কখনো খাইনি কিন্তু।

সোমেশ্বর বলে, তবে জন্মের শোধ এখানেই পরীক্ষাটা করে ফেলুন। আই স্ট্যান্ড গ্যারান্টি। এক পেগে কোনও নেশা হবে না। হয় না।

সমরেশ বলল, আমারও তাহলে ওই 'জিন-অ্যান্ড-লাইম'।

সোমেশ্বর অর্পিতার দিকে ফিরে বলল, আপনি কি নেবেন, মিসেস্ পালিত?

—আমি একটা সফ্‌ট নেব : কোক্।

কৌশিক উঠে দাঁড়ায়। বলে, আপনি নিজ স্বীকৃতিমতে শ্রুতিধর নন। সব গুলিয়ে ফেলবেন। চলুন, আমিও যাই আপনার সঙ্গে।

ওরা দুজনে সবে 'বার'-এর দিকে গেছে এমন সময় সামুদ্রিক হাওয়ায় ভেসে এল একটা সকাতর আহ্বান : ডার্লিং। কৌটোটা খুলতে পারছি না।

বলে, অনামিকা এদিকে ফিরল। ভিড়ের মধ্যে সোমেশ্বরকে চিহ্নিত করতে চাইল। চোখ থেকে সানগ্লাসটা খুলে। এতক্ষণে বোঝা গেল, কালিদাসের সেই দিল্‌তোড় শ্লোকের ওই বিশেষণটাও মিলে যাচ্ছে : 'চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা'—তা হোক না বয়স, হিসাব মতো দেড়কুড়ি।

সমরেশ আবার শরাহত। সম্মোহিতের মতো সে উঠে দাঁড়াল। অনামিকা তার দিকে তাকিয়ে ভুবনজয়ী একটুকরো হাসি ছুঁড়ে দিল। তারপর কিশোরী মেয়ের মতো আদুরে গলায় বললে : এই ক্রিমের কৌটোটা। কিছুতেই খুলতে পারছি না।

সমরেশ হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গেল সেদিকে। বসে পড়ল ওর বিছানো তোয়ালের পাশে, বালিতেই। এদিকে কর্নেল-সাহেব ততক্ষণে বাইনোর ফোকাসিংটা রি-অ্যাডজাস্ট করে রানিং কমেন্ট্রি শুরু করেছেন : ক্রিমের কৌটোটা সত্যিই আটকে গেছিল কিনা খোদায় মালুম। এখন সেটা খোলা গেছে। কিন্তু মনে হচ্ছে শুধু টিনের কৌটো নয়, আরও কিছু উন্মোচনের আগ্রহ নিয়ে উনি ও-পাড়ায় গেছেন। দুজনে সে বিষয়ে আলাপচারী হচ্ছে...

রানী বলেন, আপনি থামুন তো কর্নেল-সাহেব। আমরা ওই দৃশ্য দেখতে এখানে এসে বসিনি।

—আই নো, আই নো। কিন্তু বাইনোতে তো সী-গাল, স্নাইপ, স্যান্ডপাইপার কিচ্ছুটি দেখতে পাচ্ছি না—শুধু একজোড়া চখা-চখী।

অর্পিতার আর সহ্য হয় না। চিৎকার করে ওঠে, সমর। বেলা বেড়ে যাচ্ছে। চল এবার জলে নামি।

অতদূর থেকে সমরেশ জবাব দিল, তুমি নাম, আমি এখনি আসছি।

কর্নেল রানিং কমেন্ট্রি চালিয়েই যাচ্ছেন : এই ক্রিমটা বোধহয় পিঠে মাখতে হয়। নিজে নিজে মাখা যায় না। তাই একটা হেল্‌পিং হ্যান্ড...

কথাটা অসমাপ্ত রইল। কারণ সেই সময়েই একটি বার-অ্যাটেন্ডেন্ট-এর হাতে ট্রেতে সুরাপাত্র সাজিয়ে ফিরে এল ওরা দুজন। পরিবেশন শুরু হয়ে গেল। কিন্তু 'চিয়ার্স' বলে কেউ চুমুক দিল না। সোমেশ্বরের প্রতিক্রিয়ার জন্য সবাই রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে। সোমেশ্বর তাকিয়ে দেখল। অনামিকা উবুড় হয়ে পড়ে আছে। আর তার পিঠে সমরেশ ওই ক্রিমটা মালিশ করে দিচ্ছে। সোমেশ্বর নির্বিকার। কোনও ভাবান্তর হলো না তার। কর্নেল-সাহেব তাকে বললেন, আপনার বেটার সেভেন-এইট্‌থ্ আপনাকে একটু আগে খুঁজছিলেন।

'চিয়ার্স'। বলে সোমেশ্বর তার হুইস্কিসোডায় একটা চুমুক দিল। হ্যাঁ, এত সকালেও সে হুইস্কি পানে অভ্যস্ত। বললে, বুঝেছি। ওই ক্রিমটা ওর পিঠে মাখিয়ে দেবার জন্য। এ আমার নিত্যকর্মপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। তা নতুন খিদ্‌মদ্‌গার তো ও আজ পেয়েই গেছে। আমার ছুটি।

অর্পিতা গট্-গট্ করে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেল। হাঁটুজলে নেমে আবার একটা হাঁকাড় দিল : সমর। আমি জলে নামলাম কিন্তু...

—ও. কে। আয়াম কামিং ইন আ মিনিট, ডার্লিং।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরের কথা। ইতিমধ্যে স্নানার্থীরা একে একে স্নান সেরে ভিতরে গেছেন। কৌশিক-সুজাতা, পায়েল-সুদীপা, কর্নেল সমাদ্দার প্রভৃতি। বাসু সমুদ্রস্নান খুব উপভোগ করতেন, করেনও ; কিন্তু গতবছর পুরীতে পরপর দু'দিন সমুদ্রস্নান করে সর্দিজ্বরে পড়েছিলেন। এবার তাই রানীর নির্দেশে তাঁর সাগরজলে নামা মানা। ব্রজদুলাল সমুদ্রস্নান পছন্দ করেন না। তাঁর আর্থ্রাইটিস্ আছে। সারা বছর তিনি গরমজলে স্নান করেন। অর্পিতা প্রায় আধঘণ্টা জলে ছিল। বেশ ভালই সাঁতার জানে সে। তটরেখা ছেড়ে মানুষভর জল এলাকায় অনেকটা সাঁতরে ফিরল। মাঝে একবার ডাঙায় উঠে হাঁক পেড়েছিল তার কর্তার উদ্দেশে : কী? তুমি আজ নাইবে। না—না?

সমরেশ রীতিমতো ভদ্রলোক। তার কথার নড়চড় হয়নি—এই এলাম বলে। জাস্ট আ মিনিট।

অর্পিতা রীতিমতো আহত হয়ে পায়ে পায়ে উঠে এল। ওঁদের সামনে দিয়ে মাথা নিচু করে হোটেলের দিকে চলে গেল। ভিজা বেদিং-কস্টিউমের উপর একটা হাউসকোট চাপিয়ে। কেউ তাকে কিছু বলল না। সেও কোনও কথা বলল না। চরম অপমানিতা মনে হলো তাকে।

ছাতার তলা ছেড়ে ইতিমধ্যে বাসু সস্ত্রীক উঠে এসেছেন হোটেলের পোর্চ-এ। পোর্চটাও প্রকাণ্ড—ওভাল শেপ্‌ড্। অনেকগুলি কংক্রিটের বেঞ্চি। মাঝখানে খান-কতক বেতের টেব্‌ল আর পোর্টেব্‌ল্ বেতের চেয়ার। তার একটি দখল করে হুইস্কি-সোডা, স্ন্যাকস্ আর বরফ নিয়ে জমিয়ে বসেছিল সোমেশ্বর। একাই।

অর্পিতা যখন পোর্চের সামনে দিয়ে নতমস্তকে ভিতরে যাচ্ছে, তখন হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সোমেশ্বর। একটু এগিয়ে এসে ডাকল, মিসেস পালিত।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে অর্পিতা। গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে এগিয়ে এল সোমেশ্বর : আপনাকে একটা কথা বলব, মিসেস্ পালিত?

কুঞ্চিত-ভ্রূ অর্পিতা বলল, না। দেখছেন না আমার সর্বাঙ্গ ভিজে। এই কি কথা বলার সময়?

—ও আয়াম সরি। এক্সট্রিমলি সরি—

অর্পিতা তোয়ালে দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে ভিতরে চলে যায়। সোমেশ্বর গ্লাসটা উঠিয়ে নিয়ে এদিকে এগিয়ে আসে। বসে ছিলেন শুধু বাসু-সাহেব আর রানীদেবী। আর রানীর কোলে ঘুমন্ত মিঠু। কৌশিক-সুজাতা জামা-কাপড় বদলাতে গেছে।

বাসু-সাহেব যে টেবিলে বসেছিলেন তার কাছেই ছিল আরও কিছু ফাঁকা বেতের চেয়ার। সোমেশ্বর বাসু-সাহেবকে বলে, একটু বসতে পারি, স্যার?

বাসু সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন। ঘাড় না ঘুরিয়েই বললেন, বস। কিন্তু তুমি স্নানে যাবে না?

—যাব বলেই তো সকাল থেকে তৈরি হয়ে আছি ; কিন্তু ক্লিয়ারেন্স পাচ্ছি কই? সিগ্‌নাল যে এখনো আপ।

বাসু-নীরব রইলেন। রানী অহেতুক মিঠুর পিঠে থাবড়া দিতে শুরু করলেন। সোমেশ্বর বলে, একটা কথা বলতে পারি ব্যারিস্টার-স্যার?

বাসু বিরক্ত হয়ে বলেন, পার। কিন্তু অতি সংক্ষেপে।

—এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না, স্যার?

—অফ্‌কোর্স। লাঞ্চের আগে তিন-পেগ হুইস্কি তো বাড়াবাড়ি বটেই। কী গিলছ ওটা? রয়্যাল স্ট্যাগ?

সোমেশ্বর হাতের গ্লাসটা দেখিয়ে বলে, আমি স্যার এটার কথা বলছি না। বলছি ওই লোচ্চাটার কথা।

বাঁ হাতটা বাড়িয়ে সে নির্জন সমুদ্রবেলায় কপোত-কপোতীকে দেখিয়ে দিল। সমুদ্রসৈকত সম্পূর্ণ নির্জন। শুধু ওই একটা ছাতার তলায় দুজনে ক্রমাগত বক্‌বকম্ করে চলেছে।

সোমেশ্বর যোগ করে, পালিতটা কি এর আগে জ্যান্ত কোনও সুন্দরী মেয়েছেলে দেখেনি?

বাসু জানতে চান, পালিত? কোন পালিত?

—ওই যে সমরেশ পালিত। শালা নাকি কিনু গোয়ালার গলিতে মাঝরাতে কর্নেট বাজায়।

—কী করে জানলে? কে বলেছে?

—কে বলেছে মনে নেই। ওই ইয়ে আরকি...পাঁচজন বলে।

—ও তাই বুঝি?

বাসু উঠে পড়েন। হুইল-চেয়ারটা ঠেলতে ঠেলতে। এ মদ্যপের মাতলামি থেকে পালাবার একমাত্র পথ : স্থানত্যাগ করা।

একটু পরেই ওঁদের ডাকতে এল কৌশিক-সুজাতা। ডাইনিং হলে গিয়ে দেখেন কর্নেল, ব্রজদুলাল, সুদীপা আর পায়েল বসেছে একটা টেবিলে। বিপরীত টেবিলে গিয়ে বসলেন ওঁরা চারজন। লক্ষ্য হলো—ডাইনিং হলের দূরতম প্রান্তে একা বসে মধ্যাহ্ন আহার সারছিল অর্পিতা। হঠাৎ সে উঠে ওয়াশ-বেসিনের দিকে এগিয়ে গেল। মনে হলো আহার অসমাপ্ত রেখেই।

সুজাতা মেনু-কার্ড দেখে লাঞ্চের অর্ডার দিল। রানী জানতে চান, ফুট্‌কির খাওয়া হয়েছে? সুজাতা ঘাড় নেড়ে জানায়, ফুট্‌কির মধ্যাহ্ন আহার সমাপ্ত। ফুট্‌কি হচ্ছে বিশের দিদি। এখন সে মিঠুর দেখ্‌ভাল করে। বিশে কলকাতায়। একা কুম্ভ নকলবুঁদির গড় রক্ষা করছে। কৌশিক বলে, মামু আজ সকালে একেবারে চুপচাপ ছিলেন। একটা কথাও বলেননি। একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন সমুদ্রের দিকে। কী দেখছিলেন, মামু, অমন করে?

—নিম্নচাপ। বহু বহু দূরে সমুদ্রের মাঝখানে একটা নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। সাইক্লোন অনিবার্য। পৌঁছতে দিন দুই-তিন লাগবে মনে হচ্ছে।

—নিম্নচাপ? মানে ঝড়ের লক্ষণ? সাইক্লোন?

—তাই তো আশঙ্কা করছি। ঝড়টা কোন দিক থেকে আসছে, কোন ঘরটা ভাঙবে তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। একটা অসঙ্গতি মিটলেই সেটা বোঝা যাবে।

—অসঙ্গতি! কিসের অসঙ্গতি?—জানতে চান রানী।

—আজ সকালে অনেকে অনেক কথা বলেছে ; কিন্তু তার মধ্যে একটা ভুল আছে। ভ্রান্তি। মিথ্যা কি না জানি না...কিন্তু একটা অনিবার্য অ্যাপারেন্ট-কন্ট্রাডিক্‌শন। যা হয় না তাই...কিন্তু কে বলল? কখন বলল?

—কী জাতের কন্ট্রাডিক্‌শন?

—ধর, কেউ যদি বলে, 'ক্যালেন্ডারে দেখলাম : এ বছর গুড ফ্রাইডের ছুটিটা রোব্বারে পড়ে নষ্ট হয়েছে'—এইরকম আপাত-অসঙ্গতি।

—আই সী। কিন্তু কে বলল? কখন বলল?

—দ্যাট্‌স্ দ্য মিলিয়ন-ডলার কোশ্চেন। কে বলল? এবং কখন বলল? মেমারির পাতা উল্টে দেখ—কী অসঙ্গতি। আগে থেকে সেটা চিহ্নিত করতে পারলে ঝড়ের সময় কাজে দেবে।

সুজাতা বললে, আমার কানে একটা অসঙ্গতি লেগেছে। সোমেশ্বরবাবু বললেন বিয়ের সময় ওঁর বউ ছিল 'বেটার থ্রিফোর্থ' ; কিন্তু ওঁর হাঁটু ভাঙার পর বউ হয়ে গেল 'বেটার সেভেন-এইট্থ্', তাই না? কিন্তু ওদের বিয়ে তো হয়েছে মাত্র তিন মাস। হাঁটুটা কি তার আগে ভাঙেনি?

বাসু বলেন, এটা একটা অসঙ্গতি বটে। কিন্তু ভগ্নাংশগুলো তো কথার কথা। আমি যে ভ্রান্তিটার কথা বলছি তা আরও বড় জাতের। ডেলিবারেট গ্রস বেইট টু এন্টাইস্ আদার্স। মাছের টোপ। কী সেটা?

এখানে সূর্যের আলোর তেজ এখন কমে যায় পৌঁনে ছয়টায়। ওঁরা সদলবলে বেরিয়ে পড়েন সান্ধ্যভ্রমণে। আজ কিন্তু হোটেল-পোর্চেই ওঁদের সবার জন্য অপেক্ষা করছিল একটা বিস্ময়। বাসু-সাহেবের ভাষায় : যা হবার নয় তাই।

পোর্চে সোমেশ্বর আর সমরেশ মুখোমুখি বসে দাবা খেলছে। দর্শকের আসনে বসে আছে অর্পিতা। দুই দাবাড়ু চোখ তুলে চাইল না পর্যন্ত। সুদীপা সোমেশ্বরের দিকে ফিরে বলে, অনামিকা কি ঘরে?

সোমেশ্বরের কানে প্রশ্নটা ঢোকে না। তার আগেই সমরেশের ঘোড়া আড়াই পা এগিয়ে এসেছে। অর্পিতা নিঃশব্দে তার তর্জনী তুলে দেখাল। দূরে-বহুদূরে একটি ছাতার তলায়—এবার ছাতাটি পশ্চিম দিকে হেলেছে—অনামিকা একটি পত্রিকা পড়ছে একমনে। তার পরনে একটা চাঁপা রঙের কাঞ্জিভরম, ম্যাচিং ব্লাউস ও হাইহিল।

ওঁরা পোর্চ ছেড়ে বালুবেলায় নেমে এলেন। কর্নেল আর বাসু-সাহেব পদচারণা শুরু করলেন পশ্চিমমুখো। মেয়েরা পুবদিকে। কৌশিক রইল রানীদেবীর কাছে। ব্রজদুলালও হাঁটতে নারাজ। কৌশিক বলল, বুঝলেন, মামিমা, প্রথমে মনে হয়েছিল জ্যামিতিক ফিগারটা চতুষ্কোণ। পরে বোঝা গেল অর্পিতা নন্এন্টিটি—ওই যাকে বলে, এলেবেলে। সুতরাং জিওমেট্রিক ফিগারটা হয়ে গেল সমকোণী ত্রিভুজ। শীর্ষবিন্দুতে অনামিকা—আর অতিভুজের দুই প্রান্তে দুই যুযুধান ষণ্ড—সেই ইটার্নাল ট্রায়েঙ্গেল। এবেলা দেখছি, তাও ঠিক নয়। প্রবলেমটা অধিবৃত্তের। ইলিপ্স্-এর দুটি ফোসাই—দুই নাভি এখন কাছাকাছি এসে গেছে। মিলে গেলেই অধিবৃত্তটা বৃত্তে পরিণত হবে। বর্তমানে ওই অধিবৃত্তপথে 'নামিতা নিম্ননাভি' অতিদূর দিয়ে নাভিদ্বয়কে পরিক্রমা করছেন।

ব্রজদুলাল বিরক্ত হয়ে বলেন, সাদা বাঙলায় কথা বলতে কি ভুলে গেছ কৌশিক?

কৌশিক বললে, সাদা বাঙলায় : ওদের দুজনের লড়াই-কাজিয়া মিটে গেছে। আর ভয়ের কিছু নেই।

—তুমি তো তাই বলছ, কিন্তু বাসু-সাহেব তখন কি যেন নিম্নচাপের কথা বলছিলেন। একটা নাকি সাইক্লোন হতে পারে।

কৌশিক প্রত্যুত্তর করার সময় পেল না। লক্ষ্য হলো, ওরা তিনজনে পোর্চ থেকে এদিকেই এগিয়ে আসছে। দাবা খেলায় সোমেশ্বর হেরে গেছে। সমরেশ বললে, একটা কথা বলতে এলাম। আমরা কাল খুব সকালে চিল্কা যাব ভাবছি। আপনারা কে-কে পার্টিসিপেট করবেন?

রানী বললেন, ওঁরা সবাই ফিরে আসুন তখন কথা হবে।

সান্ধ্য ভ্রমণান্তে সবাই যখন একত্র হলেন—অনামিকা বাদে, সে ঘরে চলে গেল—তখন প্রস্তাবটা আবার পেশ করল সমরেশ। চিল্কা ওখান থেকে তিন-চার ঘণ্টার মোটরপথ। ওদের পরিকল্পনা প্যাকেট-ব্রেকফাস্ট নিয়ে খুব ভোরে রওনা দেওয়া। লেটেস্ট ছয়টা। তাহলে চিল্কায় গিয়ে রম্ভায় লাঞ্চ সারা যাবে। আবার চারটে নাগাদ রওনা দিলে রাত আটটায় ফিরে এসে এখানে ডিনার করা যাবে। যাত্রীসংখ্যা বুঝে ওরা স্থির করবে কী গাড়ি নেওয়া হবে।

দেখা গেল, বিশেষ কেউই উৎসাহিত হলেন না। অধিকাংশেরই চিল্কা দেখা। সুদীপা আর পায়েল সুজাতাকে জনান্তিকে বললে, ওই দেমাকির সঙ্গে কে যাবে? আজ সারাদিনে এসে আলাপ করবার সময় হলো না তার।

অগত্যা ওরা একটা টাটা-সুমো বুক করল। চারজন আরামসে যাবে। অনামিকা, সোমেশ্বর আর পালিত দম্পতি।

পরদিন নিত্যকর্মপদ্ধতি অনুসারে সূর্যোদয়ের অনেক আগেই বের হয়েছিলেন বাসু-সাহেব। সমুদ্রসৈকতে অনেকটা হেঁটে যখন ফিরে এলেন, ততক্ষণে সূর্যোদয় হয়ে গেছে। তবে মেঘের আড়ালে। হঠাৎ নজর হলো, নির্জন পোর্চে একা বসে আছে অর্পিতা। রুমাল দিয়ে চশমার কাচটা মুছছে। বাসু-সাহেবকে দেখে তড়িঘড়ি চশমাটা নাকে চড়াল। ওর চোখ দুটো লাল। বাসু অবাক হয়ে বলেন, এ কি। তোমরা যাওনি?

ধরা গলায় অর্পিতা বলল, আমি যাইনি। ওরা গেছে।

—তুমি গেলে না কেন?

—ভোর রাত থেকে লুজ-মোশান হচ্ছে। পেটটা আপসেট করেছে।

—স্যাড কেস। তা ওরা তিনজন একদিন জার্নিটা পোস্টপোন্ড করলেই পারত। কাল যেত। চিল্কা তো পালিয়ে যাচ্ছে না।

নতনেত্রে অর্পিতা বলল, ওরা তিনজন নয়, দুজন।

—মানে?

—মিস্টার ব্যানার্জি, আই মীন মিস্টার ঘোষালও যাননি। কাল রাত্রে অত্যধিক ড্রিংক করেছিলেন। এখনো খোঁয়াড় ভাঙেনি।

—আই সী।

বাসু বসলেন সামনের একখানা চেয়ার দখল করে। বেড-টির আগে সচরাচর উনি ধূমপান করেন না। আজ কিন্তু প্রয়োজন হলো। পকেট থেকে পাইপ আর পাউচ বার করতে থাকেন।

—আমি...আমি কী করব বলুন মেসোমশাই? আপনি কী অ্যাডভাইজ দেন? এখন আমার কী করা উচিত?

—বলছি। তার আগে আমাকে কিছু 'ডাটা' দাও দেখি। সমরেশ লোকটা কি বরাবরই এই জাতের? কতদিন বিয়ে হয়েছে তোমাদের? পরস্ত্রীকাতরতা কি ওর স্বভাবজাত?

—পরশ্রীকাতরতা?

—না, আমি 'পরস্ত্রীকাতরতা'র কথা বলেছি। অপরের সুন্দরী স্ত্রী দেখলেই কি ওর মাথা ঘুরে যায়?

—তা কিছুটা যায়। দু'বছর বিবাহিত জীবনে এটা অনেকবারই লক্ষ্য করেছি। তবে এমন মাত্রাতিরিক্তভাবে নয়। সেটা এই প্রথম। এবারই।

—আই সী। দ্বিতীয়ত গান-বাজনার শখটা কার? তোমার না সমরেশের?

—কী আশ্চর্য! আপনি কেমন করে জানলেন?

—অর্পিতা, তুমি আমার পরামর্শ চেয়েছ। গ্র্যাটিস। পরামর্শ আমি দেব। কিন্তু কোনও প্রতিপ্রশ্ন কর না। যা জিজ্ঞেস করছি জবাব দাও।

—গান-বাজনার শখ দুজনেরই। সেই সূত্রেই আমাদের প্রথম আলাপ। ও সেতার বাজায়। আর আমি আধুনিক সঙ্গীত গাই। অবশ্য একটা স্কুলে গানও শেখাই। আর ও চাকরি করে এগ্রিকালচারাল এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে।

—ও এগ্রিকালচারাল এঞ্জিনিয়ার?

—না, না। ও ওখানকার এল. ডি. ক্লার্ক।

—বুঝলাম। তোমরা থাক কোথায়?

—খেলাৎবাবু লেনে। কেন?

'কেন' প্রশ্নটাকে আমল না দিয়ে বাসু বলেন, তোমাদের বাড়ির সামনেই বাঁ দিকে একটা আঁস্তাকুড় আছে, নয়?

অর্পিতা অবাক হয়ে বলে, আছে। আপনি কেমন করে জানলেন? তবে বাঁ দিকে নয়, বাড়ি থেকে বেরিয়েই ডান দিকে...

—না, আমি বাড়িতে ঢুকবার মুখে বাঁ হাতি একটা আঁস্তাকুড় আছে কি না জানতে চাইছিলাম।

—হ্যাঁ, ঢোকার মুখে ওটা বাঁ-দিকেই পড়ে।

—জ্যৈষ্ঠ মাসে, মানে এখন, তাতে কাঁঠালের ভূতি পড়ে? মাঝে মাঝে মরা-বিড়ালের ছানা?

অর্পিতা জবাব দেয় না। তার মুখটা হাঁ হয়ে যায়।

বাসু-সাহেব বললেন ; প্রশ্নের ধরনটা তোমার বোধগম্য হচ্ছে না, তাই না? সুদীপাকে জিজ্ঞেস কর, সে বুঝিয়ে দেবে। ও একটা স্কুলে বাঙলা পড়ায়। যাক সে কথা, তুমি পরামর্শ চাইছিলে ; তাই না? আমার পরামর্শ : ওরা দুজন চিল্‌কা থেকে ফিরে আসার আগেই তুমি সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে তোমার খেলাৎবাবু লেনের বাসায় ফিরে যাও। চাবিটা আমাকে দিয়ে যেও। চেক-আউট করার দরকার নেই।

অর্পিতা স্তম্ভিত হয়ে যায়। বলে, ওকে ওই ডাইনীটার কব্জায় ছেড়ে দিয়ে?

—এক্‌জ্যাক্টলি। ও স্বভাব-ব্যভিচারিণী। তিন-বার বিয়ে করেছে। পুরুষমানুষ আর গল্‌দা চিংড়ির মুণ্ডু ও সমান তৃপ্তির সঙ্গে চিবিয়ে খেতে ভালবাসে। তা হোক, সে বিবাহিতা। তোমার কর্তাকে সে বিয়ে করতে পারবে না। কর্তাও তোমাকে ত্যাগ করতে পারবে না। তোমার পক্ষে এখন সেরা চাল 'কুইন পন'-কে দু'ঘর সামনে এগিয়ে দেওয়া। লিভ দ্য হোটেল অ্যাট ওয়ান্স। লেট দ্য কিং ফলো দ্য কুইন।

—কিন্তু...

ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বাসু বলেন : নো মোর 'কিন্তু' প্লিজ। আমার 'রায়' দেওয়া হয়ে গেছে। অ্যাপিল করতে চাও তাহলে হায়ার কোর্টে যেতে হবে তোমাকে—ঈশ্বরের দরবারে। তর্জনীটা আকাশপানে তুলে দিলেন।

চট করে উঠে দাঁড়ান। ভিতর থেকে তখন ব্রজদুলাল, কর্নেল আর সুদীপা, পায়েল বার হয়ে আসছে। অর্পিতা চটজল্‌দি চোখটা মুছে নেয়।

সকলেই অবাক হলো। অর্পিতার দুঃখের কথা শুনে।

পায়েল সুদীপার কানে কানে জনান্তিকে বলে, শুনেছিস্? ঘোষাল-মাতালটা যায়নি। আকণ্ঠ মদ গিলে ফ্ল্যাট হয়ে নিজের ঘরে পড়ে আছে। তার সুন্দরী বউটাকে নিয়ে কে কী করছে মাতালটার ভ্রূক্ষেপই নেই। ছি-ছি-ছি...

সুদীপা হ্রস্ব-ইকারের বদলে তিনটি য-ফলার মাধ্যমে তার ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ করল : ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা। লোকটা বনমানুষ। সারা গায়ে কী লোম দেখেছিলি? ওয়াক্।

ব্রজদুলাল অর্পিতাকে বললেন, ওষুধ-টষুধ কিছু খেয়েছ? খাওনি? বস এখানে। আমার কাছে ডায়াজিন ট্যাবলেট আছে, নিয়ে আসছি।

তিনি নিজের ঘরে গিয়ে ওষুধটা নিয়ে এলেন, বললেন, এখনই একটা ট্যাবলেট জল দিয়ে খেয়ে ফেল। আর এই অ্যাটিভান ট্যাবলেটটাও। ব্রেকফাস্টে কিছু খেও না, একটু লেবুর জল খেতে পার। যাও, ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নাও। টেনে ঘুম দাও একটা।

অর্পিতা টেবিল থেকে ঘরের চাবিটা উঠিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল।

ব্রেকফাস্টের পর আজ অধিকাংশই ছাতার তলায় বসেননি। পোর্চে বসেছে ব্রিজের আসর মুশকিল হলো 'ফোর্থ-হ্যান্ড' নিয়ে। কর্নেল, পায়েল আর কৌশিক। আর কারও উৎসাহ নেই অনেকে জানেনেই না খেলাটা। অনামিকাদের ঘরে একবার ওরা ঢুঁ মেরেছিল। সুবিধা হয়নি। 'বিরক্ত করবেন না' বোর্ড টাঙিয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে পাঁড় মাতালটা। অবশেষে রানী দেবীই বসলেন কৌশিকের পার্টনার হয়ে। বহুদিন পর তাস ছুঁলেন তিনি। প্রথম মিঠু হারিয়ে যাওয়ার পর এই প্রথম।

প্রাক-লাঞ্চ পর্যায়ে যথারীতি এক রাউন্ড 'অ্যাপিটাইজার' এল—বীয়র, জিন অথবা ভদ্‌কা। মেয়েদের সফ্‌ট্ ড্রিংক। আজ এটা ব্রজদুলালের সৌজন্যে। দু-বোতল বীয়র আর গ্লাস একটি ট্রেতে সাজিয়ে—আর ওই সঙ্গে এক প্লেট চিকেন-টিকিয়া নিয়ে হোটেল-বয়ের সাহায্যে ব্রজদুলাল এগিয়ে এলেন একটা ছাতার তলায়। যেখানে একমনে একটি ইংরেজি বই পড়ছিলেন বাসু-সাহেব। ব্রজদুলাল বললেন, আসুন স্যার, একটু বীয়র 'ইচ্ছে করুন'। বলুন, বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপটার কী অবস্থা?

বাসু বইটা মুড়ে রেখে সাবধানে বোতল থেকে মাছরাঙা-বীয়র ঢালতে ঢালতে বললেন, সাইক্লোনটা এসে পড়ল বলে।

—সেটাকে ঠেকানো যায় না?

—কোনটাকে? ঝড়টাকে? তাই কি সম্ভব? প্রাকৃতিক বিধান। সাবধানতা যেটুকু নেওয়া যায়, নিয়েছি। অর্পিতাকে যথাকর্তব্য পরামর্শও দিয়েছি। এখন দেখা যাক, সে আমার কথা শোনে কি না—

—কী পরামর্শ দিয়েছেন তাকে?

—অবিলম্বে 'দ্য নূক' ত্যাগ করে নিঃশব্দে কলকাতায় ফিরে যেতে।

—আপনি তাকে তাই বলেছেন? দ্যাট সল্‌ভ্‌স্ দ্য প্রবলেম?

—কী প্রবলেম?

—শুনুন তবে :

ঘণ্টাখানেক আগে, মানে সাড়ে দশটা নাগাদ, ব্রজদুলাল ইউরিনালে যাবেন বলে নিজের ঘরে গিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুতেই চাবি দিয়ে নিজের ঘরের দরজাটা খুলতে পারলেন না। অগত্যা রিসেপ্‌শান কাউন্টারের শরণাপন্ন হতে হলো। তখন জানতে পারলেন, তাঁর হাতের চাবিটা মিস্টার অ্যান্ড মিসেস্ পালিতদের ঘরের। অর্থাৎ অর্পিতা পোর্চে যখন ট্যাবলেটের সঙ্গে ঘরের চাবিটা তুলে নিয়েছিল—ঘণ্টা-চারেক আগে, তখন ভুল করে ব্রজদুলালের চাবিটা নিয়ে যায়। যাহোক ম্যানেজমেন্ট ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ওঁর ঘরটা খুলে দেয়। ব্রজদুলাল অর্পিতাকে ডিসটার্ব করতে চাননি। কিন্তু ম্যানেজমেন্ট শোনেনি। ডুপলিকেট চাবি দিয়ে পালিতদের ঘরটা খোলা হয়, ব্রজবাবুর ঘরের দ্বিতীয় চাবির সন্ধানে। কিন্তু তাজ্জব কাণ্ড। সেঘরে অর্পিতা নেই। দীর্ঘ জবানবন্দির উপসংহারে উনি বললেন, আমার মনে হয়, সে আপনার পরামর্শটা শুনেছে। নিঃশব্দেই নিজের সুটকেসটা তুলে নিয়ে কলকাতায় ফিরে গেছে।

বাসু বীয়রে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে পাইপটা ধরালেন। ঘট-ঘট করে মাথা নাড়তে শুরু করলেন।

ব্রজদুলাল বলেন, কী না? ঘাড়-নাড়া বুড়ো বনে গেলেন কেন?

—গুড ফ্রাইডের ছুটিটা রোব্বারে পড়ে নষ্ট হতে পারে না। দ্যাটস্ অ্যাবসার্ড।

—তার মানে?

—সংক্ষেপে বলিতে গেলে : হিংটিংছট।

—আপনার মশাই সব সময়েই হেঁয়ালি।

লাঞ্চ-টেবিলে আর এক বিস্ময়। পায়েল-সুদীপাদের টেবিলে অর্পিতাও আহারে বসেছে। ব্রজদুলাল গুটি গুটি তার কাছে এগিয়ে এসে বলেন, এখন শরীর ঠিক হয়ে গেছে?

অর্পিতা ঘাড় নেড়ে জানায় সে সম্পূর্ণ সুস্থ।

—আমার ঘরের চাবিটা তোমার ব্যাগে।

—আজ্ঞে না। ভুলটা বুঝতে পেরেই আমি সেটা কাউন্টারে জমা দিয়ে দিয়েছি। আমার নিজের ঘরটা ওরা প্রথমে খুলে দিয়েছিল ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে। পরে আপনি জমা দেওয়ায় আমার ঘরের চাবিটাও পেয়ে গেছি।

—আর পেট কামড়াচ্ছে না তো? ঘুমটা হয়েছিল?

—আজ্ঞে না, পেট কামড়ানি একেবারে সেরে গেছে। ঘণ্টাচারেক টানা ঘুমিয়ে শরীরটাও ঝরঝরে লাগছে।

—ভেরি গুড। লাঞ্চেও বুঝে শুনে খেও বাপু। দই খেতে পার। টক দই। ভাজাভুজি বেশি নিও না।

ওঁরা পাঁচজনে এক টেবিলে বসলেন। তখনি নজরে পড়ল ঘরের শেষপ্রান্তে একা-একা বসে খাচ্ছে সোমেশ্বর। চোখাচোখি হতেই হাত তুলে বলল, গুড-ডে।

সুজাতা চাপা গলায় বলে, কিসের গুড-ডে? সকালে খোঁয়াড় ভেঙে উঠেই তো দেখ্‌লি বাপু, খাঁচা খালি। পাখি ফুরুৎ। এটা তোর গুড-ডে?

রানী বলেন, আহ্। চুপ কর। শুনতে পাবে।

সুজাতা নিচু গলায় আরও বলে, কী করে চুপ করি মাসিমা? দেখুন কী তৃপ্তি করে মুরগির ঠ্যাঙ চিবাচ্ছে। ঠিক যে ভঙ্গিতে রম্ভাতে ওর বউ সমরেশবাবুর মুণ্ডুটা চিবাচ্ছে।

এবার ধমক দেয় কৌশিক : তোমার হলো কী সুজাতা? খেতে এসেছ, খেয়ে যাও। কে-কার মুণ্ডু চিবাচ্ছে তা তোমাকে দেখতে হবে না।

ব্রজবাবু পাদপূরণ করেন, যতক্ষণ না সেই বিকিনি-মার্কা বিকিকিনির হাটে তোমার কর্তাটিকে কিনে তার মুণ্ডুটা চিবাতে শুরু করেন।

এ পাড়ায় একটা চাপা হাসির রোল ওঠে।

আহারাদির পর যে যার ঘরে দ্বিপ্রাহরিক 'বেড়াল ঘুম' দিতে এগিয়ে চললেন। রানী দেবীর হুইল-চেয়ারটা ঠেলতে ঠেলতে নিজের ঘরের সামনে এসে বাসু দেখেন সোমেশ্বর করিডরে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট টানছে।

—কী ব্যাপার? তুমি এখানে? আমার প্রতীক্ষায় নাকি?

—ইয়েস স্যার। যদি অনুমতি দেন পাঁচ মিনিট ডিসটার্ব করব।

—হ্যাঁ, কিন্তু ঘড়ি ধরে ঠিক পাঁচ-মিনিট। না হলে আমার ভাতঘুম ছুটে যাবে।

—আপনি মিলিয়ে নেবেন স্যার, চার-মিনিট উনষাট সেকেন্ড এক্সিড্ করবে না।

ঘরে এসে রানী নিজের খাটে উঠে বসলেন। শুলেন না। বাসু পাইপ ধরিয়ে নিজের বিছানায় গিয়ে বসলেন। সোমেশ্বর চেইন-স্মোকারের কায়দায় স্টাম্প থেকে একটা নতুন সিগ্রেট ধরাল। চেয়ারে বসল। হিপ-পকেট থেকে মানিব্যাগটা বার করে বললে, আমি আপনাকে প্রফেশনালি কনসাল্ট করতে চাই। কী অ্যাডভান্স দেব স্যার?

—সংক্ষেপে কেসটা আগে শুনি। গ্রহণযোগ্য মনে করলে 'রিটেইনার' নেব বৈকি। তবে প্রথমেই বলে রাখি বাপু, ডিভোর্সের মামলা আমি নিই না।

সোমেশ্বর আকাশ থেকে পড়ল। বলে, যা ব্বাবা! ডিভোর্স। কী বলছেন স্যার? কাঁটা সিরিজের আঠারোখানা কেচ্ছা আমার মুখস্থ। আপনি আপনার একনিষ্ঠ পাঠককে চেনেন না,

কিন্তু আপনাকে কি আমার চিনতে বাকি? এই দেখুন স্যার, আপনি অহেতুক বাইশ সেকেন্ড নষ্ট করে দিলেন। শুনুন :

—আমার আশঙ্কা : আমি বেমক্কা খুন হয়ে যেতে পারি। আমার স্ত্রীর স্বভাবই হচ্ছে নিত্যনতুন শাড়ি-ব্লাউজ, নিত্যনতুন পুরুষমানুষ। কী করব? এটা ওর রক্তে। আমি মেনে নিয়েছি। কিন্তু আমার অবস্থাটা দেখুন। লেখাপড়া অল্প শিখেছি। চাকরি জুটেছিল ফুটবলার হিসাবে। ঠ্যাঙ ভেঙে আমি অথৈ জলে। একবার বাইসিক্ল কিকে গোল্ডেন গোল করে ফাইনাল জিতেছিলাম। কাগজে ছবি পর্যন্ত বের হয়েছিল। অবশ্য আমার নয় বাইচুঙের। বাইসিক্ল কিকে কেউ গোল করলেই সব খবরের কাগজে বাইচুঙের সেই অনবদ্য ছবিখানি ছাপা হয়। তলায় ক্যাপশানে অবশ্য নতুন গোলদাতার নামটা ছাপা হয়। ফটোতে অ্যাকশন আছে, বাইচুঙের মুখখানা দেখা যায় না। তাতেই এই সুবিধে। ঘটনাচক্রে বিদ্যেধরী মাঠে ছিলেন। তখন তিনি শেষ স্বামীর বন্ধন থেকে সদ্যমুক্ত। প্রেমে পড়লেন আমার। অর্থাৎ তিনিও বাইসিক্ল কিকে উল্টে গেলেন। যেচে আলাপ করলেন। রেজিস্ট্রি বিয়ে করলেন। ঠিক তার পরেই আমি হাঁটু ভাঙলাম। আর্থিক সঙ্গতির দিক থেকে এখন আমি ওঁর নিরুপায় পরগাছা। বডি গার্ড-কাম ড্রাইভার-কাম হ্যান্ডিম্যান-কাম বেড-পার্টনার। অবিশ্যি সপ্তাহে আমার সে সৌভাগ্য জোটে গড়ে দু'দিন। বাকি পাঁচ দিন তিনি বিকল্প ব্যবস্থা করেন। এতে ওঁর স্বভাবব্যাভিচারী চরিত্রটা তৃপ্ত হয়, বেশ কিছু অর্থাগমও হয়। আমার আপত্তি তো নেই, আগ্রহ আছে।...মাসিমা কিছু মনে করছেন না তো?

রানী বলেন, না, না, এসব কেসে আমি অভ্যস্ত। বলে যাও তুমি।

—হঠাৎ এ হারামজাদা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চায়। আমার স্ত্রীকে বলেছে, বেশ কিছু 'অ্যালিমনি' দিয়ে ওই সোমেশ্বরটাকে বিদায় কর। আমিও আমার স্কুল-মিস্ট্রেস স্ত্রীকে ডিভোর্স দেব। আর তারপর রূপকথার রাজপুত্তুর রাজকন্যার মতো আমরা দুজন সুখে থাকব 'এভার আফটারওয়ার্ডস্'। আমি, স্যার, রাজি হইনি, হবোও না। যে হাঁস নিত্যি সোনার ডিম পাড়ে, তাকে কি কেউ 'অ্যালিমনি' নিয়ে বেচে দেয়। ফলে ওরা ডেস্‌পারেট। আমার লাইফের উপর অ্যাটেম্‌ট্ হতে পারে। তিনকূলে আমার কেউ নেই। কিন্তু আমি চাই অপঘাতে আমার মৃত্যু হলে আপনি তদন্ত করে দেখবেন।

—হ্যাভ য়ু ফিনিশড?

—ইয়েস স্যার। এবার আপনার মতামত শুনতে চাই।

—তুমি যা বললে আমি শুনে গেলাম। কেস নিই আর না নিই এটা আপাতত কনফিডেনশিয়াল। এখন আমার ঘুমের সময়। ভেবেচিন্তে তোমাকে পরে জানাব।

—থ্যাঙ্কু, স্যার।

হঠাৎ কোথাও কিছু নেই নিচু হয়ে পদধূলি নিয়ে দ্রুত প্রস্থান করল সোমেশ্বর ইয়েল লকওয়ালা দরজাটা টেনে দিয়ে।

রাত আটটা। কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর রাত্রি। কিন্তু নির্মেঘ আকাশে একটিও তারা দেখা যাচ্ছে না। হোটেলের সম্মুখস্থ মার্কারি-ভেপার ল্যাম্পের দৌরাত্ম্যে। ওঁরা সবাই বসেছিলেন হোটেলের সামনে পোর্চ-এ। কেউ কেউ সামনের বালুবেলায় ছাতার নিচে। হঠাৎ দুম করে লোড-শেডিং হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠলেন বাসু-সাহেব। তুলে নিলেন এক হাতে ছোট টর্চটা, অন্য হাতে কর্নেলের বাইনো। পড়ি-তো-মরি ছুটলেন নির্জন সৈকতে।

—কী হলো?—বলে পিছন-পিছন ছুটে এল কৌশিক।

—লুক অ্যাট দ্যাট সিলেস্টিয়াল কাপ, ওভারটার্নড অন দ্য ফেস অব দ্য সী।

আমাদের দৃষ্টিতে ওরা হঠাৎ-ফুটে-ওঠা এক ঝাঁক অচেনা তারা। আর ওঁর কাছে সবাই

হারানো বান্ধবী। নাগরিক আলোর রোশনাইয়ে ওরা ছিল বোরখাঢাকা। সূর্য এখন বৃষ রাশিতে। ওই তো পশ্চিম দিগ্বলয়ে সিংহ রাশির মঘা—রেগুলাস। উত্তরাকাশে ডেনেব, অভিজিৎ ; দক্ষিণাকাশে বৃশ্চিক রাশি জ্বলজ্বল করছে—তার মধ্যমণিকা অ্যান্টারিস : জ্যেষ্ঠা। বুট্‌স্ নক্ষত্রমণ্ডলী, দু'হাত বাড়িয়ে প্রতীক্ষমানা : স্বাতী।

পর পর দুটি ঘটনায় তন্ময়তা কেটে গেল বাসু-সাহেবের। প্রথমত, লোড-শেডিং শেষ হলো। বাতি জ্বলে উঠল। দ্বিতীয়ত, একটা টাটাসুমো গাড়ি এসে দাঁড়াল পোর্চের কাছে।

গাড়ি থেকে নেমে এল ওরা দুজন। মালপত্র কিছু নেই। দুজনেরই কাঁধে দুটি হাতব্যাগ। অনামিকার পরনে এখন নীলরঙের একটা জর্জেট বেনারসী, ম্যাচিং ব্লাউজ আর নীল হাইহিল, নীল হাতবটুয়া। গেইনস্‌বরো ওকে দেখলে ব্লু-বয়ের পরিপূরক একটি 'ব্লু-গ্যের্ল'-এর ছবি আঁকতেন হয়তো ; আর পঞ্চতন্ত্রের লেখক দেখলে লিখতেন 'সা নীলীবর্ণা সঞ্জাত'।

হাতবটুয়া খুলে ড্রাইভারকে টাকা মিটিয়ে দিল অনামিকা। তারপর চোখ তুলেই দেখতে পেল সামনে দাঁড়িয়ে আছে সোমেশ্বর। আদুরে গলায় সে বলতে গেল, ওহ্। হাউ য়ু মিস্‌ড ইট ডার্লিং। চিল্‌কা ইজ...

কথাটা তার শেষ হলো না সোমেশ্বরের চোখে চোখ পড়ায়। সোমেশ্বরের দক্ষিণ-তর্জনীতে একটি চাবি দোদুল্যমান। ঠাণ্ডা গলায় সে বললে, ন্যাকামি যথেষ্ট হয়েছে। এবার ঘরে যাও। জামা-কাপড় ছাড়গে।

অনামিকা কী একটা কথা বলতে গেল প্রত্যুত্তরে। তারপর লগুড়াহত কুক্কুরীর মতো মাথা নিচু করে স্থানত্যাগ করল। সোমেশ্বর এগিয়ে এল এক-পা। সমরেশের কাঁধের উপর রাখল একটা বাঘের থাবা। তারপর মিহি গলায় বললে, তারপর মিস্টার শুয়োরের বাচ্চা। আপনি কী স্থির করলেন? নিজে থেকেই নামবেন, নাকি আমাকেই সেটা করতে হবে?

সমরেশ নিশ্চয় গিল্‌ট্-কনশাস। আমতা-আমতা করে বলে, এসব আপনি কী বলছেন, মিস্টার ঘোষাল? কোথা থেকে নামব?

—আমার বিবাহিতা স্ত্রীর স্কন্ধ থেকে। নিজেই নামবেন, না আমি ঘাড় ধরে নামাবো?

—আমি...আমি...আমার কী দোষ? আপনি মদের খোঁয়াড়ে উঠতে পারলেন না, আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লেন...

—তাহলে আপনি গোটা ট্রিপটা ক্যানসেল করলেন না কেন? আমরা কাল যেতাম, অথবা পরশু?

—বাঃ। অনেক টাকা যে অগ্রিম দেওয়া ছিল—

—সেটা তো দিয়েছিলেন আমার স্ত্রী, আপনি নয়।

—কারেক্ট। তাহলে প্রশ্নটা আপনার স্ত্রীকেই করবেন। আমাকে কেন?

—আপনাকে শুধু সাবধান করে দিতে চাই ; পরস্ত্রীর সঙ্গে কিছু ফুর্তিফার্তা করতে চান করুন—যদি আপনার স্ত্রীর আপত্তি না থাকে। কিন্তু মনে রাখবেন, আমার বিবাহবিচ্ছেদ-বিশারদা স্ত্রী এবার তাঁর সাতপাকে বাঁধা বাঁধনটা ছিঁড়তে পারবেন না। আপনি যদি কোনও প্রফেশনাল কিলারকে এন্‌গেজ করেন তাহলে তাকে কাইন্ডলি জানিয়ে দেবেন যে, তার টার্গেটের হিপ্-পকেটে সব সময় একটা লোডেড যন্ত্র থাকে। সেটা হিসাব করে যেন সে 'ফি'-টা স্থির করে।

হিপ্-পকেট থেকে একটা ছোট্ট কোল্ট পিস্তল বার করে সে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে ফের লুফে নিল।

সমুদ্রগর্জনে সব কথা হয়তো শোনা যাচ্ছিল না, কিন্তু অধিকাংশই শ্রুতিগোচর হচ্ছিল একসার দর্শকবৃন্দের শ্রুতিতে।

এবার সেদিকে ফিরে সমরেশ বললে, আপনারা দেখুন, উনি রিভলভার দেখিয়ে আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন কর্নেল সমাদ্দার। এক-পা এগিয়ে এসে বলে ওঠেন, ইয়েস। য়ু কান্ট ডু দ্যাট। দ্যাটস্ আ ক্রিমিন্যাল অফেন্স।

সোমেশ্বর বললে, থানা তো কাছেই। একটা এফ্. আই. আর দাখিল করে আসুন না স্যার। স্বয়ং ব্যারিস্টার সাহেবই তো সাক্ষী আছেন।

পিস্তলটা হিপ-পকেটে ভরে সে ফিরে চলল নিজের ঘরে।

রাত্রে ডিনার টেবিলে সবার খেয়াল হলো চারজন বোর্ডার অনুপস্থিত। দু'জোড়া কর্তা-গিন্নি। তারা বোধকরি একটু আড়ালে থাকতে চায়। অন্তত একটা রাত। তাই দূরভাষণে অর্ডার দিয়ে নৈশাহার নিজেদের ঘরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছে।

পরদিন অতি প্রত্যূষ। হোটেলের প্রধান ফটক তখনো তালাবন্ধ। বাসুকে দেখে সিকিউরিটির লোকটা ঘুম-জড়ানো চোখে সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল। প্রশ্ন করে, সান্‌রাইজ দেখবেন, স্যার? লেকিন অখনো বিশ-বাইশ মিনিট দের আছে।

বাসু বললেন, তা হোক। গেটটা খুলে দাও তুমি। সকালের 'ওজোন' নেব একটু লাংসে।

লোকটা কিছুই বুঝল না। অবাক হয়ে তাকাল। বাসু-সাহেব একহারা মানুষ। তিনি কেন 'ওজন' নিয়ে ব্যস্ত হচ্ছেন? যা হোক সে খুলে দিল দরজা।

বাইরে আসতেই ঠাণ্ডা বাতাসের একটা ঝাপটা লাগল মুখে। সেটা উপভোগ করলেন। মার্কারি-ভেপার ল্যাম্পটা নেভানো তাই আবার এক আকাশ তারা। তবে যারা ছিল সন্ধ্যার সাক্ষী তারা অস্তমিত। উঠে এসেছে নতুন তারার একঝাঁক প্রজাপতি। সামনের পিচ-ঢালা রাস্তায় নেমে পড়লেন। শেষরাতের হিমেল আর্দ্র বাতাসটা উপভোগ করতে করতে হনহনিয়ে এগিয়ে চললেন। সূর্যোদয় আজও দেখা যাবে না। পুব-আকাশে মেঘ আছে। হঠাৎ আধো-আলো, আধো-অন্ধকারে বাসু-সাহেবের নজর হলো হোটেল থেকে চাদর মুড়ি দেওয়া কে একজন এগিয়ে আসছে। খর্বকায় ব্যক্তি ; বোধহয় আলখাল্লা জাতীয় কিছু পরা। আরও একটু কাছে আসতে বাসু বুঝতে পারেন : ওটা আলখাল্লা নয়, গাঢ় রঙের নাইটি। আর সেই সঙ্গে চিনেও ফেললেন ওকে : অর্পিতা পালিত।

একটি ছাতার তলায় শিশির-ভেজা চেয়ারেই বসে পড়লেন উনি। অর্পিতা এগিয়ে এসে নীরবে বসল তাঁরে পাশের চেয়ারে। দুজনেই প্রথমে নীরব। শেষে বাসু বলেন, কিছু বলবে আমাকে?

—সেই জন্যেই তো ছুটে এলাম। আমি জানি, আপনি খুব ভোরে বেড়াতে আসেন।

—বল?

—এখন আমি কী করব স্যার?

—ব্যাক টু স্কোয়ার ওয়ান? এ প্রশ্নের জবাব তো কালই দিয়েছি। তুমি শুনলে না। আজও ওই একই পরামর্শ দেব। আমার আশঙ্কা এবারেও তুমি শুনবে না।

—কিন্তু কী করে যাব? ও যে কিছুতেই রাজি হচ্ছে না।

—বুঝলাম। আমার কতকগুলি প্রশ্নের জবাব দাও তো অর্পিতা। কাল সকালে তুমি ভুল করে ব্রজবাবুর চাবিটা নিয়ে চলে গেলে। তারপর কী হলো? কী করলে তুমি?

—ডায়াজিন ট্যাবলেটটা খেলাম। ঘুমের ওষুধটাও খেলাম। তারপর শুয়ে পড়লাম। পাক্কা চার ঘণ্টা টানা ঘুমিয়েছি।

—না। তা তুমি ঘুমাওনি। সাড়ে দশটা নাগাদ হোটেল ম্যানেজমেন্ট থেকে ওরা ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে তোমার ঘরটা খুলেছিল। তখন তো তুমি ঘরে ছিলে না?

—সাড়ে দশটার সময়? ও হ্যাঁ, একবার বার হয়েছিলাম বটে। কলকাতায় একটা এস. টি. ডি. করতে।

—কাকে? তার নাম্বারটা কত?

—কী আশ্চর্য। আপনি বিশ্বাস করছেন না? নম্বর কি আমার মুখস্থ? সে তো আমার ডায়েরিতে লেখা আছে। ঘরে চলুন, দেখে বলছি।

—তার আগে বল, তুমি নিজের ঘরে ঢুকলে কী করে? তোমার হাতে তো ব্রজবাবুর ঘরের চাবি। তাহলে তুমি কেমন করে চাবি খুলে ঘরে ঢুকলে? ওষুধগুলো খেলে? সাড়ে দশটা নাগাদ ডায়েরিটা হাতে নিয়ে এস. টি. ডি. করতে বেরিয়ে গেলে?

—বাঃ। ওরা...মানে, রিসেপশান থেকেই তো ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে আমার ঘরটা আমাকে খুলে দিল।

—সেটা তো বেলা এগারোটা দশে। রিসেপশানের কাউন্টারে যে মেয়েটি বসে তার স্টেটমেন্ট অনুসারে।

হঠাৎ যেন একটা নতুন কথা মনে পড়ে গেল অর্পিতার। বললে, ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আপনাদের ওখান থেকে বেরিয়ে এসে আমি ঘরে আদৌ ঢুকিনি। ওষুধটাও তখন খাইনি। একটা রিক্‌শা ধরে চলে গিয়েছিলাম এস. টি. ডি. বুথে।

—কিন্তু তোমার ডায়েরি তো ঘরে। আর নম্বর তো তোমার মুখস্থ নেই।

—কী আশ্চর্য। আপনি এভাবে জেরা করছেন কেন? আমি অহেতুক মিথ্যা বলতে যাব কেন বলুন? কাল ডায়েরিটা ছিল আমার ভ্যানিটি ব্যাগে। তাই কোনও অসুবিধা হয়নি।

—বুঝলাম। তা তুমি আমার কাছে ছুটে এসেছ কেন?

—ওই তো। একই কথা জিজ্ঞেস করতে। আমি এখন কী করব?

বাসু বললেন, ওই তো, একই জবাব দেব আমি। রিপিট দ্য মিক্সচার। এক্ষুণি হোটেল ছেড়ে খেলাৎবাবু লেনের বাসায় ফিরে যাও। তোমার কর্তা সঙ্গে গেল কি না ফিরেও তাকিয়ে দেখ না।

—কিন্তু...

—কালই বলেছি : কিন্তুর শেষ নেই। আমার রায় আমি দিয়েছি। নিজের অন্তরকে জিজ্ঞেস কর অর্পিতা—এ-কথা কেন আমি বলেছি। তারপর আমার কথায় নয়—বিবেকের নির্দেশে পথ চল।

হন্‌হন্‌ করে এগিয়ে গেলেন বাসু সাহেব।

ব্রেকফাস্ট সেরে আবার সবাই সমবেত হয়েছেন সমুদ্রসৈকতে। তবে আবার সবাই অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন দাবার ছকটা পেতে ওরা দুজন আপনমনে খেলছে। কী বিচিত্র মনুষ্যচরিত্র। কাল রাত্রে যারা লড়াই-কাজিয়ার চূড়ান্ত করেছে তারা আজ এ-ভাবে দাবা খেলে কী করে?

প্রশ্নটা বান্ধবীকে জিজ্ঞেস করল পায়েল, ওদের কি হায়া-কায়া, লজ্জা-শরম কিচ্ছুটি নেই?

সুদীপা প্রতিপ্রশ্ন করে, তুই বনফুলের 'দ্বৈরথ' পড়েছিস?

—না। একথা কেন?

—পড়া থাকলে বুঝতে পারতিস।

হঠাৎ কর্নেল সাহেব বলে ওঠেন, আজ ড্রিংসটা স্ট্যান্ড করব আমি। তবে আমি বুড়ো মানুষ। কৌশিক, তুমি জেনে নাও কে কী খাবে? এন্তাজাম কর।

সমরেশ বলে, আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি, কৌশিকবাবু।

সোমেশ্বর বলে, বাঃ। খেলাটা—?

—ও। আপনার বুঝি নজরে পড়েনি? এই ঘোড়ার কিস্তিতেই তো আপনি মাৎ। আবার চালটা ভুল দিয়েছিলেন আপনি।

সোমেশ্বর হতাশ। বলে, হেত্তেরি। পরপর দু'বার মাত হয়ে গেলাম।

ইতিমধ্যে কৌশিক সংগ্রহ করে জেনে নিয়েছে কে কী নেবে। সকলেই নিজ-নিজ পছন্দ মতো ড্রিংস নিয়েছেন। দিদিমণিদ্বয় আজ 'ভদ্‌কা' পরখ করতে রাজি হয়েছেন। তবে এক-এক পেগ মাত্র। বাসু, কর্নেল আর ব্রজবাবু নিয়েছেন মাছরাঙা। পার্থক্যের মধ্যে সোমেশ্বর আজ আর হুইস্কি নেইনি। নিয়েছে জিন-উইথ্-ফ্রেশ লাইম।

আজ আরও একটা ব্যতিক্রম হলো। ঘিয়ে রঙের একটি বালুচরী পরে হঠাৎ ভিতর দিক থেকে বার হয়ে এল অনামিকা। অমিট্রায়ের ভাষায়—'এ তো আগমন নয়, আবির্ভাব।'

যুক্তকর বুকের সামনে তুলে অনামিকা বললে, আপনাদের কারও সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। দোষটা আমারই। সেই ত্রুটি সংশোধন করতে এলাম। সকলের সঙ্গে পরিচিত হতে। কী জানেন, আমি লোকটা স্বভাবতই আত্মকেন্দ্রিক। ইন্‌ট্রোভার্ট। লোকজনের সঙ্গে সহজে মিশতে পারি না।

সুদীপা এ সুযোগ ছাড়ল না। বলে, তাই বুঝি? অর্পিতাপতির সঙ্গে আপনার দ্রুত গড়ে-ওঠা বন্ধুত্বে আমরা সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি।

অনামিকা অবাক হয়ে বলে, 'অর্পিতাপতি।' তার মানে?

—'অর্পিতার পতি। আমি যষ্ঠী তৎপুরুষে বলেছি। অর্থাৎ সমরেশবাবু।

অনামিকা বুঝতে পারে এরা ওর 'লেগ্ পুলিং' করছে। সোমেশ্বরের কথামতো এ ধাষ্টামো না করলেই ভাল হতো। কিন্তু এখন আর পিছানো চলে না। সুদীপার দিকে ফিরে বলে, আয়াম সরি, অর্পিতাদি। অনেক আগেই আমার উচিত ছিল আপনার সঙ্গে আলাপ করা। সমরেশ আপনার কথা তো সব সময়ে বলে।

সুদীপা প্রতিনমস্কার করে বলে, আমার নাম সুদীপা বাগচি।

অনামিকা বিহ্বল হয়ে ইতিউতি চাইতে থাকে। করুণা হয় রানী দেবীর। অর্পিতার পিঠে একটি হাত রেখে বলেন, এর নাম অর্পিতা। ভারি ভাল মেয়ে।

দুজনেই দুজনকে হাত তুলে শুধু নমস্কার করে। কারও কণ্ঠে কথা ফোটে না। ধপ করে বসে পড়ে অনামিকা। সোমেশ্বরের দিকে ফিরে বলে, আমাকেও একটা ড্রিংস্ দিতে বল : জিন-উইথ-ফ্রেশ লাইম।

মিনিট খানেক আগে সোমেশ্বরের হাতে সমরেশ ধরিয়ে দিয়েছে একটা গ্লাস। সেটা থেকে পান শুরু করেনি সোমেশ্বর। খেলাচ্ছলে শুধু গ্লাসটা অন্যমনস্কভাবে নেড়েই চলেছে। যেন লেবুর সরবতে চিনি মেশাচ্ছে। আসলে সে ভদ্রতা করে গ্লাসটা হাতে ধরে অপেক্ষা করছিল। সবাই একসঙ্গে 'চিয়ার্স' বলে পান শুরু করবে বলে। এখন গ্লাসটা তার স্ত্রীর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে, তুমি এটা নিতে পার, আমি এঁটো করিনি।

পায়েল বললে, এঁটো করলেই বা ক্ষতি কী? কর্তার উচ্ছিষ্ট তো গিন্নিরা খেয়ে থাকেন।

সোমেশ্বর বললে, কী করে জানলেন? আপনি তো বিয়ে করেননি।

পায়েল কী জবাব দেবে ভেবে পায় না। সুজাতা তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। বলে, বাসি বিয়ের দিন কর্তার পাতাতেই তো নববধূকে খেতে হয়, এ তো সবাই জানে।

রানী দেবী সচরাচর এসব তর্কাতর্কিতে থাকেন না। আজ আগ্ বাড়িয়ে বললেন, মনুসংহিতার গৃহ্যসূত্রে বলা হয়েছে "ভুক্তেবাচ্ছিষ্টংবর্ধে দদাৎ।"

পানীয় গ্লাসটা তখনো সোমেশ্বরের হাতে ধরা। যেন এ বিতর্ক শেষ না হওয়া পর্যন্ত গ্লাসটা সে হস্তান্তর করবে না। বলে, তার মানে?

রানী ব্যাখ্যা দেন, গৃহ্যসূত্রাকার শিষ্যকে বলছেন, 'বাপুহে। আহারান্তে যা খেতে পারলে না সেই ভুক্তাবশিষ্ট-সমেত এঁটো পাতাখানা স্ত্রীকে ধরে দেবে।'

সুদীপা বাঙলায় এম. এ.। সে আর নিশ্চুপ বসে থাকতে পারল না। বলে ওঠে, ওসব হচ্ছে

'উইমেনস্ লিব'-এর আগের জমানার কথা, মাসিমা। এখন কর্তারাও হামেহাল গিন্নির এঁটো খেয়ে থাকেন।

সোমেশ্বর একই প্রশ্ন করে, আপনিই বা কী করে জানলেন? আপনারও তো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই, মিস্ বাগ্‌চি।

সুদীপা চট্‌জলদি জবাব দেয়, ওটা আপত্তিকর হলে বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথে আমরা 'মুখচুম্বন' শব্দটা পেতাম না। সেই আনন্দঘন মুহূর্তে কে কার উচ্ছিষ্ট পান করে? বলুন? আমার না থাক আপনার তো সে অভিজ্ঞতা আছে।

রানী ছদ্মভর্ৎসনা করে ওঠেন, মেয়েটার মুখের কোনও আড় নেই।

সোমেশ্বর যেন পরাজয় মেনে নিয়ে এতক্ষণে গ্লাসটা অনামিকাকে হস্তান্তরিত করে। ইতিমধ্যে সমরেশ আর একটি টিন-উইথ-লাইম সোমেশ্বরের টেবিলে নামিয়ে রেখেছে। বস্তুত সকলের হাতেই পানপাত্র পৌঁছেছে। 'চিয়ার্স' বলে সবাই একসঙ্গে পান শুরু করে। ব্যতিক্রম শুধু অনামিকা। তার গলাটা এতক্ষণে শুকিয়ে কাঠ। মদ্যপানে সে অভ্যস্তও। ঢক্-ঢক্ করে প্রায় গোটা গ্লাসটা শেষ করে সক করে টেবিলে নামিয়ে রাখে।

রানী দেবী অনামিকাকে বলতে গেলেন, তোমাদের চিল্কা ভ্রমণটা...

কথাটা তাঁর শেষ হলো না। ওঁর মনে হলো, অনামিকা কেমন যেন করছে। তার ঠোঁট দুটো নীল হয়ে গেছে। বুকের বাঁ-দিকটা খামচে ধরে সে যেন নেতিয়ে পড়ছে।

সুজাতা চিৎকার করে উঠল, কী? কী হয়েছে অনামিকা? তুমি ওরকম করছ কেন?

সবার দৃষ্টি ঘুরে গেল অনামিকার দিকে। অনামিকা ততক্ষণে প্রায় শুয়ে পড়েছে। ঠোঁট দুটো অল্প ফাঁক হয়ে গেছে। মুখটা নীল। শিবনেত্রপ্রায়।

সোমেশ্বর তার উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, কী কষ্ট হচ্ছে অনু?

—বুঝতে পারছি না...বুকে অসহ্য যন্ত্রণা...ওই ড্রিংকস্‌টাতেই...

—এই 'জিনটার' কথা বলছ?

বহু কষ্টে মাথা নাড়িয়ে অনামিকা জানাল : হ্যাঁ, তাই।

—কিন্তু ওটা তো...ওটা তো আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল সমরেশ। ইয়েস। ইট ওয়াজ মাই গ্লাস। গুড গড!

হঠাৎ লাফিয়ে উঠল সে। সমরেশের কলারটা চেপে ধরে বলে, য়ু, সান অফ আ বিচ্। বল্...বল্...আমার গ্লাসে কী মিশিয়েছিলি?

কৌশিক লাফিয়ে পড়ে বাধা দেয়। বলে, কী হচ্ছে এসব? সরে আসুন আপনি— অনামিকাকে নিশ্বাস নিতে দিন...

কিন্তু নিশ্বাসের জন্য বাতাসের আর প্রয়োজন ছিল না অনামিকার। তার ভবযন্ত্রণার অবসান হয়েছে।

কর্নেল চিৎকার করে উঠলেন : ডাক্তার। এক্ষুণি একজন ডাক্তার।

বাসু ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন। অনামিকার কব্জি, বাহুমূল এবং চিবুকের নিচে হাত দিয়ে পরীক্ষা করলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সরি। শী হ্যাজ এক্সপায়ার্ড।

ঘণ্টা দুয়েক পরের কথা। হোটেলের হাউস ডক্টর এসে সরকারীভাবে অনামিকাকে মৃত ঘোষণা করে গেছেন। থানা থেকে দুজন অফিসার এসেছিলেন। তাঁরাও মৃতদেহ পরীক্ষা করলেন। ফটো নিলেন। মৃতদেহকে মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

একে-একে সকলেরই জবানবন্দি নেওয়া হলো। হ্যাঁ, এটা ফ্যাক্ট যে, সমরেশ একটা ট্রে-তে পাঁচ-সাতটি পানীয় সাজিয়ে নিজহাতে 'বার' থেকে লাউঞ্জ পার হয়ে পোর্টিকোর জমায়েতে নিয়ে এসেছিল। সোমেশ্বর ট্রে থেকে যে-কোনও একটি গ্লাস তুলে নেয়নি, বরং

সমরেশই ওই বিশেষ গ্লাসটি তার হাতে ধরিয়ে দেয়। 'বার' থেকে লাউঞ্জ পার হয়ে বাইরে আসতে যে দেড়-দু'মিনিট সময় লাগে, সে সময় সমরেশ একাই ছিল। কৌশিক তখন বার-কাউন্টারে। ফলে এইটুকু সময়ের মধ্যে সমরেশের পক্ষে কোনও নির্দিষ্ট গ্লাসে এক পুরিয়া বিষ মিশিয়ে দেওয়া অসম্ভব কোনও কাজ নয়। তবে, কেউ তাকে এ কাজ করতে দেখেনি। এটাও সবাই দেখেছে যে, সমরেশ যে গ্লাসটা সোমেশ্বরের হাতে দিয়েছিল, সেটাই সোমেশ্বর তার স্ত্রীকে দেয় এবং অনামিকা সে গ্লাস থেকে পানীয়টা অতি দ্রুত খেয়ে ফেলে।

থানা-অফিসার প্রতিটি ঘর সার্চ করেছেন। একটি বিচিত্র বস্তু তিনি আবিষ্কার করেছেন। সমরেশদের ঘর থেকে। সমরেশেরই সুটকেসের একটা সিক্রেট পকেট থেকে। এক 'ফায়াল' ওষুধ—ডিজিটালিস গ্রুপের ঔষধ। নাম : স্টেফেল্‌থিন। ঔষধ বটে, তবে তীব্র বিষও। অ্যাকিউট হার্ট পেশেন্টদের চিকিৎসায় তার অত্যন্ত সীমিত ব্যবহার। সাধারণ মানুষের ব্যাগে সেটা থাকার কথা নয়। নির্মাণকারীর মুদ্রিত তথ্যে জানা যাচ্ছে : ওটা একশ গ্রামের প্যাক। তার আধাআধি ফাঁকা। জানা গেল, বিশ গ্রামই 'ফেটাল ডোজ'—অর্থাৎ বিশ গ্রামই মৃত্যুবাহী বিষ। সমরেশের বক্তব্য : সে ওটার কথা কিছুই জানে না। সে ওটা কেনেনি, দেখেনি, তার সুটকেসে রাখেনি। তার তালাবন্ধ ঘরে অন্য কেউ ওই সিক্রেট ড্রয়ারে ওটা রেখে গেছে এটা পুলিশ বিশ্বাস করেনি। ফলে সমরেশকে পুলিশে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে।

প্রায় উন্মাদিনীর মতো কাঁদতে কাঁদতে অর্পিতা ছুটে এসেছিল বাসু-সাহেবের ঘরে: আপনি ওকে বাঁচান, মেসোমশাই। ও একাজ করেনি। করতেই পারে না।—হাঁটু গেড়ে বসে জড়িয়ে ধরে ওঁর পা দুটো।

বাসু বলেন, উঠে বস, অর্পিতা, পাগলামি কর না। আমি কথা দিচ্ছি সমরেশের জন্য আমি যথাসাধ্য করব।

—আপনাকে কত 'রিটেইনার' দেব, মেসোমশাই?

—এখন নয়। আগে হাজতে গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলি। সে নিজমুখে আমাকে বলুক যে, সে এ কাজ করেনি।

অর্পিতা ছিলে-খোলা ধনুকের মতো সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, তার মানে? আপনার মনে কি বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে যে, সমর এ কাজ করেও থাকতে পারে?

—না নেই। আমার বিশ্বাস : ও নির্দোষ। কিন্তু এটাই আমার কাজের ধারা। তুমি যাও, অর্পিতা। নিজের ঘরে বিশ্রাম নাও গে যাও। আমাকে একটু নিরিবিলি চিন্তা করতে দাও।

লাঞ্চে অধিকাংশই কোনওরকমে পিত্তিরক্ষা করে গেলেন। সকলের সব অনুরোধ উপেক্ষা করে অর্পিতা অনশনে রইল। ঘরে 'ডোন্ট ডিস্টার্ব' বোর্ড টাঙিয়ে ভিতর থেকে ছিটকিনি দিল।

সোমেশ্বরও লাঞ্চে গেল না। একটা জনি-ওয়াকারের বোতল আর তিন-চারটি সোডা 'বার'-কাউন্টার থেকে নিয়ে অর্গলবদ্ধ ঘরে নিজেকে স্বেচ্ছাবন্দী করল।

কৌশিক বাসুকে বলল, চলুন মামু, যাহোক মুখে দেওয়া যাক।

বাসু বললেন, তোমরা তিনজনে কিছু খেয়ে এস। আমার জন্য এক প্লেট স্ন্যাকস্ ঘরে পাঠিয়ে দাও।

—তুমি কি দিনের বেলা ওই সিভাস রিগ্যাল-এর বোতলটা বার করতে চাও নাকি?—রানীর সশঙ্ক জিজ্ঞাসা।

বাসু বিনীতভাবে বললেন, প্লিজ রানু। ইটস্ আ ডে-অব্ এক্সেপ্‌শন।

বিকেল চারটে নাগাদ ওঁর ঘরের টেলিফোনটা বেজে উঠল। দুজনের কারও ঘুম হয়নি। বাসু-সাহেব ফোনটা তুলে আত্মপরিচয় দিতেই ও প্রান্ত থেকে রিসেপ্‌শনিস্ট জানাল যে, গঞ্জাম থেকে এস. পি. মিস্টার এম. এম. পানীগ্রাহী এসেছেন, বাই রোড। নিহত ব্যক্তিটি পশ্চিমবঙ্গের

একজন সেলিব্রেটি শুনে, এবং মৃত্যুটা রহস্যময়, একথা জানতে পেরে। হোটেলে এসে তিনি জানতে পেরেছেন বোর্ডারদের মধ্যে ক্যালকাটা-বারের অতি বিখ্যাত ক্রিমিনাল-সাইড ব্যারিস্টার পি. কে বাসুও আছেন। তাই তিনি বাসু-সাহেবকে সেলাম দিয়েছেন। তিনি যদি কাইন্ডলি...

সন্ধ্যা পাঁচটা। দীর্ঘ এক ঘণ্টা একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষে ওঁরা তিনজন কীসব পরামর্শ করলেন। লোকাল থানা-অফিসার মিস্টার বিনায়ক পাণ্ডে, এস. পি. পানীগ্রাহী আর বাসু-সাহেব। ম্যারাথন-ডিস্‌কাশন এক সময় শেষ হলো।

ওঁরা তিনজনে বার হয়ে এলেন। এস. পি. দৃঢ়ভাবে বাসু-সাহেবের করমর্দন করে বললেন, অশেষ ধন্যবাদ। ঘটনাচক্রে আপনি উপস্থিত না থাকলে হয়তো ভুল পথে কেসটা পরিচালিত হতো।

ওঁরা চলে গেলেন। ইন্টারোগেশনের জন্য অর্পিতা আর সোমেশ্বরকে থানায় নিয়ে গেলেন। আগেও ওদের দুজনের জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই দীর্ঘ আলোচনার সময় এমন কিছু তথ্য জানা গেছে যে, এস. পি. মনে করছেন ওঁদের দুজনকে থানায় নিয়ে গিয়ে আরও নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার।

বাসু নিজের ঘরে গিয়ে দেখলেন সেটা তালাবন্ধ। সব ঘরই তাই। বুঝলেন, সব আবাসিকই সমবেত হয়েছেন বাইরের পোর্চে। অগত্যা সেদিকেই এগিয়ে গেলেন তিনি। হ্যাঁ, যা আশা করেছিলেন : আজ আর ছাতার তলায় কেউ যায়নি। পোর্চেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসেছে। আজ আর 'অ্যাপিটাইজার'-এর কথা কারও মনে পড়েনি। তাস-দাবার আসরও বসেনি। ছোট ছোট গ্রুপে নিচু গলায় সারাদিনের অদ্ভুত ঘটনাগুলির রোমন্থন হচ্ছে। ওই সঙ্গে মানব-চরিত্রের বৈচিত্র্য, অর্পিতার দুর্ভাগ্য, সমরেশের নজিরবিহীন ব্যভিচার আর অনামিকার...

না থাক, আহা, মেয়েটা তো প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্তই করে গেল।

বাসু-সাহেবকে দেখে ঝিমিয়ে পড়া জটলাটা উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বাসু দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখে নিলেন প্রতিদিনের আড্ডাধারীদের মধ্যে চারজন মাত্র অনুপস্থিত: সোমেশ্বর, অর্পিতা, সমরেশ আর অনামিকা।

ব্রজদুলাল বললেন, আপনার সেই ভবিষ্যদ্বাণীটা দারুণভাবে ফলে গেল : সাইক্লোন একটা আসছে। কার ঘর ভাঙবে তা এখনই বোঝা যাচ্ছে না।

বাসু বললেন, সবটা প্রথমেই বোঝা যায় না। তাহলে তো দুর্ঘটনাটা এড়ানোই যেত।

কর্নেল বলেন, শুনলাম অর্পিতা আপনাকে সমরেশের তরফে লিগাল কাউন্সেলার হিসেবে রিটেইন করতে চেয়েছিল। আপনিই নাকি রাজি হননি।

বাসু গ্রীবা সঞ্চালনে স্বীকার করলেন।

কর্নেল সখেদে বললেন, কি করেই বা করবেন? সমরেশ যে অপরাধী এটা তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। সোমেশ্বর পাঁচ-দশ লাখ টাকা পেলেও অনামিকাকে ডিভোর্স দিত না। তাই তাকে দুনিয়া থেকে...

বাসু বাধা দিয়ে বললেন, সমরেশের জামিনের ব্যবস্থা হচ্ছে। কাল সকালেই সে ছাড়া পেয়ে যাবে—

কর্নেল পুনরায় বলেন, সাময়িকভাবে জামিনে ছাড়া পেলেও শেষ পর্যন্ত ওকে শাস্তি পেতেই হবে। কঠিন শাস্তি। ইটস্ এ ক্লিয়ার কেস অব মার্ডার।

—মানছি। খুনই। কিন্তু খুনটা করল কে?

—অবভিয়াস্‌লি সমরেশ। আবার কে?

বাসু বলেন, একটা কথা আমাকে বুঝিয়ে বলুন তো, কর্নেল সমাদ্দার। আপনাদের সকলের

মতে—পুলিশের মতেও—সমরেশ বিষটা মিশিয়েছিল। ধরিয়ে দিয়েছিল সোমেশ্বরের হাতে। কারণ সোমেশ্বর মারা গেলে সে অর্পিতাকে ডিভোর্স করে ওই অত্যন্ত ধনী, সুন্দরী, গ্ল্যামারাস মেয়েটিকে বিয়ে করতে পারে। এই তো? তাহলে সে যখন স্বচক্ষে দেখল যে, সোমেশ্বর সেই বিষমিশ্রিত পানীয়টা অনামিকার হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে, তখন সে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাধা দিল না কেন?—'ওতে একটা মাছি পড়েছে' এই অজুহাতে?

কেউ কোনও জবাব দিলেন না।

বাসু বলে চলেন, এ প্রশ্নের জবাব নেই। পানীগ্রাহীও খুঁজে পাননি। সেকেন্ডলি—ওই বিষের ফায়াল থেকে পঞ্চাশ গ্রাম বার করে নিয়ে কোন্ মূর্খ সেটা নিজের সুটকেসের সিক্রেট ড্রয়ারে লুকিয়ে রাখবে? এটা বিশ্বাসযোগ্য?

ব্রজদুলাল বলেন, কিন্তু সেখানেই তো ওটা পাওয়া গেছে। ওর তালাবন্ধ ঘরে, ওর তালাবন্ধ স্যুটকেসের সিক্রেট পকেটে কে সেটা লুকিয়ে রাখতে পারে বলুন? সে ছাড়া?

—আরও একজনের পক্ষে তা সম্ভব ছিল। ঘরের চাবি যার হেপাজতে হামেহাল আসে, সুটকেসের চাবিটাও এবং স্বামীর সুটকেসে সিক্রেট পকেট কোথায় আছে, তা একজনের পক্ষেই জানা সম্ভব।

কর্নেল বলেন, অর্পিতা? বাঃ। তার কী স্বার্থ?

কৌশিক বলে, আমারও একবার তাই মনে হয়েছিল। এটা একটা সুপরিকল্পিত জয়েন্ট অ্যাডভেঞ্চার। দুজনের মিলিত প্রচেষ্টায়। এটা ধরে নিলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। প্রথমত, অনামিকা বিষমিশ্রিত পানীয়টা পান করছে স্বচক্ষে দেখেও কেন সমরেশ ঝাঁপিয়ে পড়ে বাধা দেয়নি। দ্বিতীয়ত, সোমেশ্বর পানীয়টা হাত বাড়িয়ে নিয়েও কেন চুমুক দেয়নি? নানান কথাবার্তায় সে দেরি করাচ্ছিল আর ক্রমাগত—হ্যাঁ, আমি লক্ষ্য করে দেখেছি...ক্রমাগত হাতের গ্লাসটা নাড়াচ্ছিল। যেমন করে আমরা লেবুর সরবতে চিনি মিশিয়ে নাড়তে থাকি। তৃতীয়ত, কেন হত্যাকারী অতবড় কনক্লুসিভ এভিডেন্সটা নিজের হেপাজতে লুকিয়ে রাখবে? বঙ্গোপসাগরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে না? মানে পঞ্চাশ গ্রামের পুরিয়াটা বানানোর পর। ফোর্থলি, কী ভাবে ওটা ওর সুটকেসের সিক্রেট ড্রয়ারে স্থানলাভ করল? আমার শুধু একটা প্রশ্নের সমাধান হচ্ছিল না, কেন? হোয়াই? কী জন্যে? দুজনে জয়েন্টলি এ দুঃসাহসিক কাজটা কেন করবে? স্বার্থটা কার?

বাসু বললেন, পার্টনার-ইন-ক্রাইম দুজনেরই স্বার্থ এতে জড়িত। সোমেশ্বর তার ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে বরদাস্ত করে শুধু টাকার জন্য। বউটা মরে গেলে সেই একমাত্র ওয়ারিশ। কিন্তু স্ত্রীর অপঘাত মৃত্যু হলে পুলিস তাকেই সন্দেহ করবে—যেহেতু সেই একমাত্র ওয়ারিশ। তাই দুর্ঘটনাটা সর্বসমক্ষে হতে হবে। ওদিকে অর্পিতাও তার ব্যভিচারী স্বামীকে নিয়ে বীতশ্রদ্ধ, বিরক্ত। অপরের সুন্দরী স্ত্রী দেখলেই সমরেশের মাথা ঘুরে যায়। নির্লজ্জ ব্যবহার করতে থাকে। সুতরাং অনামিকা-হত্যার অপরাধটা যদি ওই সমরেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ওদের কাউকেই আর কষ্ট করে ডিভোর্স নিতে হবে না। অনামিকার বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে যাবে ওরা—সোমেশ্বর আর অর্পিতা। অনামিকা মৃত, সমরেশ ফাঁসিতে ঝুলেছে।

পায়েল বলল, কিন্তু এ ষড়যন্ত্রটা ওরা করল কবে, কখন?

—গোপালপুর-অন-সি আসার অনেক আগে। কলকাতায়।

সুদীপা বলে, আপনার কি ধারণা ওরা আগে থেকেই পরস্পরকে চিনত?

—ধারণা নয় সুদীপা। আমি প্রমাণ দেব। সমরেশ কখনো অনামিকাকে দেখেনি; অনামিকাও দেখেনি অর্পিতাকে। তাদের ব্যবহারে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। অনামিকাকে প্রথম দেখে সমরেশের মাথা ঘুরে যায়। আবার অনামিকা প্রথম দর্শনে অর্পিতাকে চিনতে পারেনি।

সুদীপাকে ভেবেছিল সমরেশের স্ত্রী। অথচ অর্পিতা আর সোমেশ্বর পরস্পরকে চিনত গোপালপুর-অন-সীতে আসার আগেই।

কর্নেল বলেন, সেটা কী করে বুঝলেন? কোনও প্রমাণ পেয়েছেন?

—একেবারে সেই প্রথম দিনের ঘটনাগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভেবে দেখুন। সোমেশ্বর এগিয়ে এসে আমাদের সকলের সঙ্গে আলাপ করল। বলল, সে শ্রুতিধর নয়, নামগুলো তার সব মনে থাকবে না। স্মরণ করে দেখুন, সে সময় সমরেশ উপস্থিত ছিল কিন্তু অর্পিতা তার জামা-কাপড় সুইমিং কস্টুম আনতে ঘরে গেছিল। সোমেশ্বর একে একে সকলের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। কর্নেল আগবাড়িয়ে পরিচয়গুলি করিয়ে দিচ্ছেন। সেই খণ্ডমুহূর্তটাকে স্মৃতির মণিকোঠা থেকে ফিরিয়ে আনুন। কর্নেল বললেন, কৌশিক-সুজাতার সঙ্গে আছে একটি ক্যিউট বাচ্চা। কী নাম যেন? সুজাতা বলেছিল, মিঠু। কর্নেল 'ক্যিউটা' তুলে নিয়ে বলেন, "হ্যাঁ মিঠু। আর ইনি ব্রজদুলালবাবু। এসেছেন একাই। এছাড়া আছে আর একটি কাপল, সমরেশ আর...ওই তো, নাম করতে করতেই এসে পড়েছেন ওঁর বেটার হাফ।..." মনে করে দেখুন, কর্নেল সমরেশের কী উপাধি তা বলেননি। এরপর অনেকে অনেক কথা বলেছে। সোমেশ্বর সবাইকে এক-কোর্স করে ড্রিংক অফার করল। সুদীপা আর পায়লকে পীড়াপীড়ি করে জিন নিতে বাধ্য করল। তারপর সে অর্পিতার দিকে ফিরে জানতে চাইল, সে কী নেবে? কিন্তু ঠিক কী ভাষায়? কী বলেছিল সে... বলুন? এনিবডি—

সকলেই মাথা নিচু করে ভাবছে। তিন দিন আগে একটি খণ্ডমুহূর্তের কথা মনে করে বলা প্রায় অসম্ভব। রানী ইতস্তত করে বললেন, আমার যতদূর মনে পড়ে : সোমেশ্বর অর্পিতার দিকে ফিরে বলেছিল, আপনি কী নেবেন, মিসেস্ পালিত?

লাফিয়ে ওঠেন বাসু : এক্জ্যাক্টলি। হান্ড্রেড-পার্সেন্ট কারেক্ট। নাউ আন্সার দ্যাট মিলিয়ান ডলার কোশ্চেন : সোমেশ্বর কেমন করে জানল সমরেশের বেটার হাফ: 'পালিত'? বোস নয়, ঘোষ নয়, চ্যাটার্জি নয়, পতিতুণ্ড নয়? পালিত? পূর্বপরিচিতি ছাড়া এটা হয় না, হতে পারে না।

ব্রজদুলাল বললেন, কারেক্ট। ওদের নিশ্চয় পূর্বপরিচয় ছিল।

বাসু বলেন, আর সেটা গোপন করার চেষ্টাও প্রকট। আমার মনে আছে, অর্পিতা আমার কাছে একবার সোমেশ্বরের প্রসঙ্গে 'মিস্টার ব্যানার্জি' বলে পরক্ষণেই সংশোধন করে নিয়ে বলেছিল 'মিস্টার ঘোষাল'।

সকলে চুপ করে ভাবছে, কোথাও কোনও অসঙ্গতি আছে কি না।

বাসু আবার বলেন, অনামিকা আর সমরেশ যেদিন চিল্কা যায় সেদিন এই দুজন ষড়যন্ত্রকারী সম্পূর্ণ বহাল তবিয়তে ছিল। সোমেশ্বর আদৌ মদ্যপানে বেহুঁশ হয়নি, আর অর্পিতারও পেট কামড়ানো শুরু হয়নি। ওরা দুজন কায়দা করে বোকা দুটোকে চিল্কা পাঠিয়ে দিয়েছিল। আমি জানি না—আন্দাজ করছি—অর্পিতা আর সোমেশ্বর হয়তো তাদের প্রাকবিবাহ জীবনের প্রেমিক-প্রেমিকা। ব্রজদুলালবাবুর ওষুধ অর্পিতা আদৌ খাইনি। সে সোজা চলে গিয়েছিল সোমেশ্বরের ঘরে। নটা থেকে বারোটা সোমেশ্বরের বাহুবন্ধে সে জানতই না যে, তার হেপাজতে যে চাবিটা আছে তা ব্রজদুলালবাবুর ঘরের। মামলা যখন আদালতে উঠবে তখন এসব এভিডেন্স খুঁটিয়ে দেখা হবে। কোন দোকান থেকে সে কলকাতায় এস. টি. ডি করে। কত নম্বরে? কার সঙ্গে কথা বলে? পেটের ব্যথা সত্ত্বেও কেন সে টেলিফোন করতে যায়? কী জরুরি প্রয়োজন ছিল?

কর্নেল বলেন, দুর্ঘটনাটা এড়ানো যেত না?

বাসু বলেন, কী করে যাবে, বলুন? ওরা যে কীভাবে খুনের পরিকল্পনাটা ফেঁদেছে তা তো জানি না। আমি ক্রিমিনালদের জোড়টা ভাঙতে চেয়েছিলাম। অর্পিতা কলকাতা চলে গেলে সোমেশ্বর ঘাবড়ে যেত। একা হাতে অগ্রসর হতে সাহস পেত না। আর হয়তো সমরেশও

ঘাবড়ে গিয়ে কলকাতা ছুটতো। কিন্তু অর্পিতা কিছুতেই স্থানত্যাগে রাজি হলো না। ফাঁসির দড়ি যেন ওকে টানছিল। 'নিয়তি' ছাড়া একে আর কী বলবেন বলুন?

সকলেই নতমস্তকে এই নতুন সমাধানটার কথা ভাবছে। বাসু-সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। বলেন, আর নয়, আপনারা সবাই গোপালপুর-অন-সীতে এসেছিলেন কেন? মৃত্যুরহস্যের কিনারা করতে নয়। সমুদ্রের ধারে বেড়াতে। সূর্যাস্ত হতে আরও পাঁচ-সাত মিনিট। আজ পশ্চিমাকাশে মেঘও নেই। সুতরাং : আউট য়ু গো, নেচার লাভার্স। সুদীপা-পায়েল তোমরা একদিকে যাও। এই ফুটকিটাকেও নিয়ে যাও সঙ্গে করে। মিঠু রানীর কাছে থাকবে। কৌশিক। সুজাতা। তোমরা যাও ওদিক পানে।

ওরা একে একে রওনা হয়ে পড়ে। কর্নেল সাহেবও লম্বা লম্বা পা ফেলে মার্চের ভঙ্গিতে এগিয়ে যান। ব্রজদুলাল বলেন, মিসেস্ রানী বাসুর মেমারি তো অসাধারণ। ঠিক বলে দিয়েছেন।

বাসু স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বললেন, ও শুধু আমার সহধর্মিণীই নয়, শী ইজ মাই উইন্‌সাম ম্যারো।

ব্রজদুলাল হালে পানি পান না। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ওঁর পড়া নেই। তিনি বিজ্ঞের হাসি হাসেন। কী করবেন? পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে এমন বিড়ম্বনা মাঝে মাঝে সইতেই হয়। রানী বৃদ্ধ বয়সেও রাঙিয়ে ওঠেন।

ব্রজদুলাল নতুন প্রসঙ্গের অবতারণা করেন : আপনার কী মনে হয়? সমরেশ আবার বিয়েথা করে সংসার পাতবে?

বাসু বলেন, জানি না। কেমন করে জানব?

রানী আগ্‌বাড়িয়ে বলেন, আমার বিশ্বাস সে আর ঘর-সংসার করতে চাইবে না। কাল সকালেই সে হয়তো ছাড়া পাবে। আমার ধারণা : জামিন নয়, পার্মানেন্টলি। ওঁরা চার্জ ফ্রেম করবেন অর্পিতা আর সোমেশ্বরের বিরুদ্ধে। কিন্তু হোটেলে ফিরে এসে সমরেশ বেচারি কারও দিকে চোখ তুলে চাইতে পারবে না।

বাসু বলেন, অর্পিতা জনে জনে তার ব্যভিচারী স্বামীর কেচ্ছার কথা বলে বেড়াতো। চোখের জলে, কিন্তু রসিয়ে রসিয়ে। অথচ ভেবে দেখ : শিল্পীরা কখনো-সখনো অমন হয়ে থাকেন। পল গোগ্যাঁ থেকে পাব্‌লো পিকাসো কি তাঁদের প্রথমা পত্নীর প্রতি একনিষ্ঠ থাকতে পেরেছিলেন?

ব্রজদুলাল বলেন, রাইট। আই পিটি হিম্।

—নো, স্যার।—প্রতিবাদ করে ওঠেন বাসু। সে শিল্পী, আপনার করুণার পাত্র নয়। স্বীকার করি : ও হরিপদ কেরানির চেয়েও বড় জাতের দুর্ভাগা :

ঘরেতে এসেছিল সে
কুচক্রী খুনীর বেশে
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।

—তাহলে তো সে করুণারই পাত্র?—আবার বলেন ব্রজদুলাল।

—আজ্ঞে না। সমরেশ মাথা নিচু করে ফিরে যাবে তার খেলাৎবাবু লেনের বাসায় প্রতিবেশীরা জানতে চাইবে, অর্পিতা কোথায়? ও জবাব দিতে পারবে না। কিন্তু মাঝরাতে ও উঠে যাবে ছাদে। মাদুর বিছিয়ে বসবে। তার সেতারে মূর্ছিত হবে সিন্ধু-বারোয়াঁর তান। সে সুরের সপ্তমস্বর্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যাবে, সমরেশ পালিত, হরিপদ কেরানি আর আকবর বাদ্‌শা।

boiRboi.net